# আত্মকথা

## আবুল মনসুর আহমদ

আত্মকথা – আবুল মনসুর আহমদ / Atmakatha by Abul Mansur Ahmad

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪২৫, নভেম্বর ২০১৮

প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: মাসুক হেলাল

মুদ্রণ : আর জে জেড প্রিন্টার্স ২৫৭ ফকিরেরপুল, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭৮, ঢাকা

# প্রকাশকের কথা

আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন ব্যক্তিত্ব। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, আইনজীবী ইত্যাদি নানা পরিচয়ে তিনি পরিচিত ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ব্যঙ্গধর্মী রচনার ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে তার স্থান আজও কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর স্মৃতিকথাধর্মী বইগুলোও আমাদের সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এ দেশের তথা উপমহাদেশের গত এক শতাব্দীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য তাঁর এই বইগুলো পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তার আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর এবং আত্মকথা এমন দুটি বই। ইতিমধ্যে আমাদের প্রকাশনা সংস্থা থেকে আমরা তার আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর বইটির একটি সুমুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেছি। বইটিতে লেখক গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অভ্যুদয়-পরবর্তীকাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এবার আমরা প্রকাশ করছি তাঁর আত্মকথা বইটি।

আত্মকথায় আবুল মনসুর আহমদ তাঁর পারিবারিক পটভূমি, শৈশব, বাল্য ও কৈশোর, শিক্ষা, সাহিত্য, আইন পেশা ও সংসারজীবনের কথা লিখেছেন। বইটিতে লেখকের বয়ান কেবল নিজ জীবন ও অভিজ্ঞতার কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ, নানা ঘটনা। ও চরিত্রের কথাও এতে উঠে এসেছে। স্মৃতিচারণার আঙ্গিকে লেখা সময়ের এই অন্তরঙ্গ বর্ণনা লেখকের অনুপম রচনাশৈলীর গুণে পাঠককে যে কেবল আকৃষ্ট করবে তা-ই নয়, আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব এবং তার প্রবণতাগুলোকে বুঝতেও অনেকখানি সাহায্য করবে। এক কথায় বলা যায়, পূর্ব বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের পটভূমি ও তার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পেতে বিশেষ সহায়ক এ বই। সেদিক থেকে ইতিহাস বা সমাজ নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাঁদের জন্য এ বইটির মূল্য অত্যধিক।

প্রথমা প্রকাশন বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই পুনঃপ্রকাশের একটি পরিকল্পনা নিয়েছে। মূলত নবীন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠক ও গবেষকদের কথা ভেবেই আমাদের এই পরিকল্পনা। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা পুনর্মুদ্রণের অভাবে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারেও পাওয়া যায় না, কিংবা হয়তো যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুমোদন নেওয়া ছাড়াই ও নিতান্ত অযত্নের সঙ্গে ছাপা হচ্ছে, এমন কিছু নির্বাচিত গ্রন্থ লেখক বা তাদের উত্তরাধিকারীদের অনুমতি নিয়ে পুনঃপ্রকাশ করছি। প্রথম পর্যায়ে জীবনী, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ও গবেষণাধর্মী বইয়ের ক্ষেত্রেই মূলত আমাদের উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থাকছে।

প্রসঙ্গত, বিভাগোত্তরকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূখণ্ডটির জন্য আবুল মনসুর আহমদ একটি বিশেষ ভাষারীতির প্রস্তাব করেছিলেন। সেই

ভাষারীতির পক্ষে নিজস্ব যুক্তিগুলোই শুধু তিনি তুলে ধরেননি, আপন লেখালেখির ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব সে ভাষারীতিকে অনুসরণ করেছেন। বলাই বাহুল্য, লেখকের রচনাশৈলী হিসেবে আমরা সর্বত্র তার সে ভাষারীতি অক্ষুণ্ণ রেখেছি। বানানের ক্ষেত্রেও লেখক কিছু স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমান গ্রন্থেই এ সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত তুলে ধরেছেন। কিন্তু তার সে নিয়ম আমরা পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারিনি। এর একটি কারণ, বইটির পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোতে দেখা যায় একই শব্দের বানান দুই বা তিন রকমে ছাপা হয়েছে। লেখকের প্রস্তাবিত বানানরীতির সঙ্গেও যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগতিপূর্ণ নয়। এ অবস্থায় বানানের সমতা রক্ষার তাগিদ থেকে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হয়েছে। তবে ‘জ’ ও ‘য’-এর ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটিভাবে লেখকের মতকেই প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেছি। বস্তুত পাঠক ও গবেষকদের জন্য মূল্যবান এই বইটির একটি সম্ভব নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। বইটির এই নতুন সংস্করণ প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য লেখকের পুত্র ও ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনামের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মতিউর রহমান

ঢাকা, নভেম্বর ২০১৮

# ভূমিকা

আত্মজীবনী লেখার কাজটা কঠিন। অসাধারণও। কঠিন এই জন্য যে এর বেশির ভাগ কথাই স্মৃতি হইতে লিখিতে হয়। যখনকার কথা লেখা হয়, তখন আত্মজীবনী-লেখক চিন্তাও করেন নাই যে ভবিষ্যতে একদিন তিনি নিজের জীবনী লিখিবেন। আত্মজীবনী লিখিবার মত জীবনের অধিকারী তিনি কোনো দিন হইবেন, এটা ধারণাও অনেকে ছেলেবেলা করিতে পারেন না। ছেলেবেলা সবাই ছেলেমানুষই থাকেন। মন-মস্তিষ্ক পাকিতে তখনো অনেক দেরি। বড় হইয়া তিনি কী হইবেন, কী করিবেন, তার স্পষ্ট ধারণা-চিন্তাও তখন তিনি করিতে পারেন না। পারেন না মানে তখনকার চিন্তা-ভাবনার বেশির ভাগই থাকে অবাস্তব কল্পনা-বিলাসিতা। এ ব্যাপারে মনীষী ও অমনীষীর মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নাই। যা কিছু পার্থক্য তার বেশির ভাগই পরিবেশগত। আমাদের তরুণেরা যারা কলেজ-ভার্সিটিতে মেধাবী ও যশস্বী ভাল ছাত্র থাকেন, তাঁদের অধিকাংশেরই উচ্চকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন সরকারি চাকরি কামনায় সীমাবদ্ধ। আমাদের কালে ছিল ডিপটিগিরি। আজকাল সেটা সিনিয়র সিভিল সার্ভিস। অধুনা কিছু ভাল ছেলের মধ্যে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ার ও অধ্যাপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাত্রজীবনেই দেখা যায়। এঁদেরও কেউ ভবিষ্যতে আত্মজীবনী লিখিবেন, এমন ধারণা সাধারণত পোষণ করেন না। কারণ এই শ্রেণীর প্রতিভাবানেরা আত্মজীবনী লিখিয়াছেন তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নাই। বরঞ্চ যাদের বাপ-দাদাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচলন আছে, তাদের মধ্যে বাপ-দাদার লাইনটার কথাই আগে মনে পড়া স্বাভাবিক। ডিপটির ছেলে ডিপটি, উকিল-ব্যারিস্টারের ছেলে উকিল ব্যারিস্টার, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়াটাকেই অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। এমনকি চাষির ছেলে চাষি, শ্রমিকের ছেলে শ্রমিক, পীরের ছেলে পীর ও জমিদার-জোতদারের ছেলে জমিদার-জোতদারই থাকিবে এমন ধারণা সাধারণত বাপ-মা ও মুরুব্বিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও এটাই সাধারণ জীবন-চিন্তা। যে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন লইয়া মুরুব্বিদের এই সব চিন্তা-ভাবনা, সে শিশু কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কিছুই জানে না। না জানিলেও কালক্রমে অনেক লোকই মুরুব্বিদের এই ধ্যান-ধারণায় সংক্রমিত হয়।

এ বিষয়ে এত কথা বলিবার কারণ এই যে, যে-শিশু যে-পরিবেশে যে ধরনের জীবন গড়ন-যাপনের স্বপ্ন কল্পনাই করুক না কেন, শৈশবে কারো মনে ভবিষ্যতে আত্মজীবনী লিখিবার কল্পনা থাকে না। এ চিন্তা মানুষের মনে। সর্বপ্রথম জাগে তখনই, যখন ব্যক্তিটির জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। জীবন-নদী প্রায় পার হইয়া আসিয়াছেন। ওপারের ঘাট দেখা যায়-যায়। ঠিক এই মুহূর্তে আত্মজীবনী লেখা মানে জীবন-পথে পিছন ফিরিয়া দেখা। যারা বিনা-ঝড়-তুফানে নিরাপদে স্বাচ্ছন্দ্যের পানসিতে চড়িয়া জীবন-নদী পার হইয়াছেন, তাঁদের পিছন ফিরিয়া দেখিবার কিছু নাই। সুতরাং আত্মজীবনী লিখিবারও কিছু থাকে না। এই দিক হইতে বিচার করিলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিরাপদ জীবন আসলে কোনো জীবনই নয়। অথচ বিপুল অধিকাংশের জীবনই এমনি ধরনের বৈচিত্র্যহীন মামুলি জীবন। কাজেই সমাজের দিক হইতে অর্থহীন জীবন। কিন্তু সংসারের প্যারাডক্স এই যে আমরা অধিকাংশই এমনি জীবন যাপন করিতে চাই। বিষয়ী লোকের বিবেচনায় এটাই আদর্শ জীবন। কাজেই এমন নিরাপদ জীবনই অধিকাংশের কাম্য। যারা এর ব্যতিক্রম, যাদের জীবনসংগ্রাম সংঘাতপূর্ণ, নিরাপদ জীবন। ইচ্ছা সত্ত্বেও যারা যাপন করিতে পারেন নাই, ঝড়-

তুফানের সঙ্গে লড়াই করিয়া যাঁদের জীবন কাটিয়াছে, ভব-নদী পার হইতে গিয়া যাদের জীবন তরী ডুবি-ডুবি করিতে-করিতে কিনারা লইয়াছে, তাঁদের মধ্য হইতেই সাধারণত আত্মজীবনী লেখার যোগ্য ও অধিকারী লোকের আবির্ভাব। সে ঝড়ঝঞ্ঝা আদর্শ জীবনযাপনের ইচ্ছাতেই ঘটুক, আর নিছক বিষয়ী জীবনের সাফল্যের সন্ধানেই ঘটুক, উভয় শ্রেণীর লোকেরই আত্মজীবনী লেখার অধিকার জন্মে। উভয়ের জীবনই দুর্বলতা-সরলতা ও ব্যর্থতা-সফলতার মেঘ ও রৌদ্রের জীবন। সংগ্রামের জীবন। সরল ও খোলাখুলিভাবে বর্ণিত হইলে তা অপরের শিক্ষা গ্রহণের জীবন।

এই সংগ্রাম ও নিরাপত্তা, উভয়টারই বিচার হয় জীবনসায়াহ্নে। কাজেই জীবনের অর্থপূর্ণতার উপলব্ধি হয় জীবনের সন্ধ্যাতেই। এই কারণে আত্মজীবনী লেখার ইচ্ছা ও সংকল্পও জন্মিতে পারে এই মুদ্দতেই। এই জীবন-সন্ধ্যায় দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিবার ও বুঝিবার একমাত্র উপায় না হইলেও প্রধান উপায় স্মৃতি। প্রধানত এই স্মৃতির উপর ভরসা করিয়াই আত্মজীবনী লেখকের গোটা জীবনের আশা-নিরাশা, সুখ দুঃখ, সাফল্য-অসাফল্য, ভুল-ত্রুটির খতিয়ান লিখিতে হয়। অথচ এই বয়সে স্মৃতির বাতিটাও অনেকটা ধোঁয়াটে হইয়া যায়। এই ধোয়াটে স্মৃতিতে ভর করিয়াই আত্মজীবনী লিখিতে হয়। লেখাও হয়। কারণ সাধারণ গল্পী লোকের মতই আত্মজীবনীকারদের কথা বলিবার আগ্রহ খুবই প্রবল। কথা বলার চেয়ে লেখা অনেক বেশি শ্রমসাধ্য। তাই এখানে ইচ্ছা-আগ্রহটা হওয়া চাই আরো বেশি প্রবল।

এই প্রবল ইচ্ছার প্রেরণা হইতে পারে দুইটা : এক. সংগ্রাম-সাফল্যের বাহাদুরি করা। দুই. ভাবীকালের লোকদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজের জীবনের কাহিনী বলা। এই দুইটি উদ্দেশ্যই লেখকের সচেতন মনে জাগরূক নাও থাকিতে পারে। অবচেতন মনে গোপন থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর আত্মজীবনীর মধ্যেও একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য সাবধান পাঠকের কাছে ধরাও পড়ে। একটিতে লেখক বাছিয়া-বাছিয়া শুধু নিজের গুণ ও সাফল্যের কথাটাই প্রধান করিয়া তোলেন। গুণগুলির অতিরঞ্জন করেন। দোষগুলি চাপিয়া যান। অপরটিতে লেখক সত্য ও সরল কথায় নিজের ভাল মন্দ ও দোষ-গুণ উভয়টাই পাঠকের কাছে তুলিয়া ধরেন। সচেতন-অবচেতন মনের দরুনই এ পার্থক্যও লেখকের অজ্ঞাতেই হইতে পারে। বাহাদুরিটাও। অনিচ্ছাকৃত হইতে পারে। আবার বিনয়ের নিরপেক্ষতাটাও চেষ্টাকৃত হইতে পারে। আমাদের মধ্যে যেমন বদ-মেজাজি ও বিনয়ী উভয় প্রকার লোক আছেন এবং এই বদ-মেজাজিদের মধ্যে সাধুতা ও বিনয়ীদের মধ্যে ভণ্ডামি থাকিতে পারে, আত্মজীবনী-লেখকদের মধ্যেও তা-ই আছে। তবু নিজের দোষ উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। সেটা মুখে ও কাগজে-কলমে স্বীকার করা আরো কঠিন। এই কারণে আত্মজীবনী লেখার কাজটা এমন কঠিন।

আর অসাধারণ এই জন্য যে যাদের জীবনী জানা ও পড়ার যোগ্য, যাদের জীবনকথা অপরের জন্য স্মরণীয় ও শিক্ষণীয়, যেসব প্রতিভাবান মনীষী, রাষ্ট্রনেতা ও জননায়ক দেশ ও দশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাঁদের আত্মজীবনী লিখিবার দরকারই হয় না। অপরেই তাদের জীবনী লেখেন। তাঁদের সহকর্মী ও অনুসারীরা ত লেখেনই, দেশ-বিদেশের শক্তিশালী লেখকেরাও লিখিয়া থাকেন। যারা ব্যক্তিগতভাবে এই সব নেতা-নায়কদের জানেন না বা দেখেন নাই, তারাও লেখেন। গবেষণা করিয়া তাঁদের জীবনের অজানা কথা, ঘটনা ও বৃত্তান্ত আবিষ্কার করেন।

তবে এই ধরনের জীবনী ও আত্মজীবনীর মধ্যে পার্থক্য আছে। অপরের জীবনী-লেখকেরা সাধারণত তাদের নায়কের জীবনের ভাল দিকটাই দেখান। এই সব লেখক সাধারণত যার-তার নায়কের ভক্ত-অনুরক্ত হওয়ায় তাঁদের লেখা গুণাবলি বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। নিতান্ত ভক্ত-অনুরক্ত না হইলে সাধারণ ভদ্রতা ও শালীনতার খাতিরে আলোচ্য ব্যক্তির জীবনের অপর দিকটা চাপিয়া যান। আর ভক্ত-অনুরক্তেরা ত শুধু গুণাবলির বর্ণনা করিবেনই। তাতে কিছুটা অতিরঞ্জনও করিতে পারেন। লেখক-ভেদে এই ধরনের জীবনী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাহিত্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও প্রকৃত তথ্যের দিক হইতে এগুলি সত্যনিষ্ঠ, অতএব শিক্ষণীয় না-ও হইতে পারে। পক্ষান্তরে জীবনী লেখক যদি নায়কের বিরোধী পক্ষের লোক হন, তবে তাঁর রচনা হয় প্রধানত নিন্দা-কুৎসা। আলোচ্য ব্যক্তিকে লোকচক্ষে হেয় করিবার অপচেষ্টা। তাতে প্রকৃত ও সত্য জীবনী লেখা হয় না। ফলে অধিকাংশ জীবনী হয় প্রশংসা ও গুণকীর্তন, নয় ত নিন্দা ও ছিদ্রান্বেষণ। কোনোটাই ঐতিহাসিক সত্য হয় না।

এই কারণেই বোধ হয় সব দোষ-গুণ বিচার করিয়া সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও জীবনী অপেক্ষা আত্মজীবনীই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য হিসাবে যদি না-ও হয়, তবু রিপোর্ট হিসাবে ত বটেই। আগামী দিনের পাঠকের স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট হিসাবেই বোধ হয় জীবনীর আবশ্যকতা বেশি। আত্মজীবনী লিখিবার প্রবল ইচ্ছা ও সামান্য অধিকারও যাদের থাকে, তারা আর কিছু না হউক, আব্রাহীম লিংকনের এই মূল্যবান কথাটি নিশ্চয়ই মনে রাখেন : নিজের কথা লেখা যেমন তৃপ্তিদায়ক, তেমনি কঠিন। কারণ নিজের দোষের কথা স্বীকার করিতে লেখকের বুকে যেমন বাজে, লেখকের আত্ম-প্রশংসাও তেমনি পাঠকের কানে পীড়া দেয়।

তাছাড়া প্রায় সকল আত্মজীবনী-লেখকের মধ্যে যে দুইটি গুণ থাকিতেই হয়, তার একটা নির্ভয়ে ও অসংকোচে সত্য কথা বলার অভ্যাস; আর অপরটা বাপ-দাদার প্রতি বিবেকবান শ্রদ্ধা। একটু গভীরভাবে তলাইয়া বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এই দুইটা অত্যাবশ্যক গুণের মূল কিন্তু মাত্র একটি। সেটা ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এখানে দুই-একটা কথা বলা দরকার। মানুষ মাত্রেই একটি ব্যক্তি, একটি শখছ, একটি ইন্ডিভিজুয়াল। কাজেই হরেক ব্যক্তির একটা ব্যক্তিত্ব থাকিবার কথা। আসলে যা থাকে তাকে ব্যক্তিত্ব বলা যায় না। সেটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি, পার্সনালিটি নয়। আত্মজীবনীকারের যে ব্যক্তিত্বের কথা আমি বলিতেছি সেটা ইন্ডিভিজুয়ালিটি নয়, সেটা পার্সনালিটি। ইন্ডিভিজুয়ালিটি সাধারণ; আর পার্সনালিটি অসাধারণ। দর্শন-মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে আমরা ইগো, অহম, আত্মা, রুহু, শখছিয়াত, ইন্ডিভিজুয়ালিটি বা পার্সনালিটি যে নামই দেই না কেন, জিনিসটা কিন্তু শুধু মানসিক অবস্থা নয়। মনটাও শুধু অরূপ চিন্তা-স্রোত নয়। অনুভূতির দলা বা পিণ্ডও না। মনোবিকলনের বিচারে কোনো ব্যক্তির বেলা এই চিন্তা-অনুভূতির সুসংগত সুগঠিত অবস্থাকেই তার ব্যক্তিত্ব বলা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ওটাই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ মনের যে অবস্থাটি ব্যক্তির কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে বহিঃপ্রকাশ লাভ না করিবে, ততক্ষণ তাকে পার্সনালিটি বলা যাইবে না।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সংসার-সমাজ-জীবনের জন্য এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দরকার নাই। এই ব্যক্তিত্ব ছাড়াই মামুলি, এমনকি সুখী ও নিরাপদ ব্যক্তি-জীবনও চলিয়া যায়। শুধু চলিয়া যায় না,

মামুলি সাধারণ নিরাপদ জীবনে এটাই কাম্য, এ কথা আগেই বলিয়াছি। কথাটার তাৎপর্য এই যে সমাজের প্রচলিত আচার-আচরণ, পরিবারের মামুলি দায়দায়িত্ব ও রাষ্ট্রের আইন-কানুন চোখ বুজিয়া মানিয়া চলার নামই আদর্শ নাগরিক জীবন। এমন নির্বিরোধ জীবন যাপন করিতে পারিলেই তা সফল হইল। এটাই জনমত।

কিন্তু এমন জীবন লইয়া জীবন্তিকা হইতে পারে, জীবনী হইতে পারে না। আত্মজীবনী ত নয়ই। এমন জীবনে পার্সনালিটি অর্থে ব্যক্তিত্ব থাকে না বলিয়াই সে জীবনে দশ বা দেশের শুনিবার বা বুঝিবার কিছু থাকে না। যেসব ব্যক্তিত্ব দেশ ও দশের জীবন প্রভাবিত করে, রাষ্ট্রনায়কেরা নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। কিন্তু রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে যারা শুধুই রাজনৈতিক নেতা বা পলিটিশিয়ান, তাঁদের ব্যক্তিত্ব স্টেটসম্যানদের ব্যক্তিত্বের থনে অনেকখানি পৃথক। পলিটিশিয়ানদের ব্যক্তিত্ব পরিণামে দেশ ও দশের অনিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু স্টেটসম্যানদের ব্যক্তিত্ব কদাচ ত করে না। ব্যক্তিত্বের সাধারণ গুণ এই যে, ব্যক্তিত্ব বাড়ায়। ব্যক্তিত্ববান মনীষীর সংশ্রবে মানুষ ব্যক্তিত্ববান হয়। বিজ্ঞানী-দর্শনী, শিক্ষক-অধ্যাপক, সাধু-দরবেশ, শিল্পী-আর্টিস্ট, সাহিত্যিক-সাংবাদিক, এমনকি ব্যক্তিত্ববান সওদাগর-ব্যবসায়ীরাও নিজেদের ব্যক্তিত্ববলে ছাত্র, অনুসারী ও সহকর্মীদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব প্রসার করিয়া তাঁদের ব্যক্তিত্ববান করিয়া থাকেন। স্টেটসম্যানরা এই দিক হইতে বিজ্ঞানী-দর্শনী, শিক্ষক-অধ্যাপক, সাধু-দরবেশদের সকল গুণে গুণান্বিত। কিন্তু সাধারণ রাষ্ট্রনায়কেরা তা নন। বরঞ্চ তার ঠিক উল্টা। অসাধারণ ব্যক্তিত্ববান রাষ্ট্রনায়কেরা প্রায়ই সহকর্মী ও অনুসারীদের ব্যক্তিত্ব শুধু সংকুচিত করেন না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদেরে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্বহীন করিয়া ফেলেন। এর সবটুকুই যে নেতার ইচ্ছাকৃত তা-ও নয়। সহকর্মী ও অনুসারীরা ইচ্ছা করিয়াই নেতাকে ডিক্টেটরে ও নিজেদেরে চাটুকারে পর্যবসিত করেন। নেতার অপরাধ শুধু এইটুকু যে তিনি এতে বাধা দেন না, বরঞ্চ কাজে-কর্মে সমর্থন করেন। একমাত্র সমর-নায়কেরা ছাড়া আর সব ডিক্টেটরই গোড়ায় সোজাসুজি নির্বাচিত না হইলেও জনমতের সমর্থনেই নেতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রক্ষমতার বলে কালক্রমে ডিক্টেটরের স্বৈরাচারে উন্নীত হয়। এই ধরনের ডিক্টেটরদের কেউ কেউ দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ উপকার করিয়াছেন, এটা সত্য হইলেও এ কথাও সমানভাবে সত্য যে এঁরা দেশ ও জাতির আত্মমর্যাদাবোধ ঘোরতরভাবে ক্ষুণ্ন করিয়াছেন। এর কারণ এই যে এঁদের শাসন-আমলে নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণ সাধারণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে অর্থনীতি ও শিল্প-বিজ্ঞানের দিকের উন্নতির চেয়ে আত্মিক দিকের ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হইয়াছে। এই দিক হইতে বিচার করিয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সকল অবস্থায় গণতন্ত্রকেই একনায়কত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর শাসন-পদ্ধতি বলিয়াছেন। এতে এটাই স্বীকৃত হইয়াছে যে মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সবচেয়ে বেশি সুযোগ যে রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায়, সেটাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা, সেটাই আদর্শ বিধান। কিন্তু বর্তমানে দুনিয়ায় যে পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী দুই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু আছে, তার কোনোটাতেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান নাই। এই কারণেই এ যুগে মানব-সমাজে ব্যক্তিত্বহীন মানুষই নিয়ম, আর ব্যক্তিত্ববান লোকেরা ব্যতিক্রম মাত্র। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বিচার বা সন্ধান করা খুবই কঠিন কাজ। দুনিয়াতে বিজ্ঞান-দর্শনের যত গবেষণার কাজ আছে, মানুষের মনের বৈচিত্র্যটাই তার মধ্যে সবচেয়ে দুরূহ কাজ। দর্শন-বিজ্ঞানের গহিনে প্রবেশ না করিয়াও বলা যায়, মনের বিকাশ ও প্রকাশ মানুষের ব্যক্তিত্বে। এই ব্যক্তিত্বের খানিকটা বাপ-মার দেওয়া। খানিকটা দেওয়া পরিবেশের। অন্য। কথায় খানিকটা ওয়ারিসি; আর খানিকটা অর্জিত। কোনটা কতটুকু তা লইয়া মতভেদ আছে। এক

পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াও দুইজনের ব্যক্তিত্ব সমান হয় না, এটা যেমন সত্য, আবার এক বাপের দুই সন্তানও সমান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় না, এটাও তেমনি সত্য। তাই এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়, ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির স্বকীয়তা, তার নিজেরই ব্যাপার। ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই গোড়ার কথায়, জন্মের কথায়, বাপ-মার কথায় আসিতে হয়।

এইখানেই পাঠক আত্মজীবনীকারের অরিজিন জানিতে চান। লেখক ত বলিতে বাধ্য। আত্মজীবনী-লেখক শিল্পী-সাহিত্যিকই হউন, আর রাষ্ট্রনায়কই হউন, তাঁর সম্বন্ধে জানার কৌতূহল মানুষের স্বাভাবিক। এ কৌতূহল শুধু তাঁর সৃষ্ট শিল্পকর্ম বা তাঁর রাজনৈতিক সাফল্য-অসাফল্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পরিবেশিক বিচরণ-আচরণ, বিবর্তন-উদ্বর্তনের ব্যাপারেও প্রসারিত। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা জীবনী-লেখকের কর্তব্য। না করিলে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে। কাজেই কর্তব্যও পালিত হইবে না। এখানেই আত্মজীবনী-লেখকের বংশপরিচয়, সে-বংশের সামাজিক স্তর ও পরিবেশ, তাদের জীবিকা ও জীবনধারণ-প্রণালি, তাদের ধর্মীয় ও কালচারের আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে উল্লেখ করা নিতান্ত প্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। এই প্রাসঙ্গিকতা পাঠকের জন্য যেমন আবশ্যক, লেখকের জন্যও ঠিক তেমনি আবশ্যক। শুধু আবশ্যক নয়, অপরিহার্য। কোনো ব্যক্তির জীবনী সম্যক জানিতে হইলে ব্যক্তিটিকে আগে জানিতে হইবে। ব্যক্তিটির সঠিক পরিচয় পাইতে হইলে তাঁর বংশ-পরিবার, সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ জানিতে হইবে। মানুষের দেহ-মনের ক্রমবিকাশের উপর তার পরিবার ও পরিবেশের প্রভাব সর্বাধুনিক গবেষকেরাও স্বীকার করিয়াছেন। বংশ-পরিবার ও সমাজ পরিবেশ এই দুই-এর মধ্যে ব্যক্তিজীবনে কোনটার প্রভাব বেশি, এ বিষয়ে গবেষক-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে ও আছে। কিন্তু এ দুই এর সমন্বয় যে ব্যক্তি-জীবনকে মূলত সংগঠিত করিয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নাই। এই কারণেও ব্যক্তির পরিবার ও পরিবেশের খবর। জানিতে হয়। আর যেহেতু জীবনী বা আত্মজীবনী লেখা একটা বাস্তবভিত্তিক সৃষ্টিকর্ম, মানে ইতিবৃত্তমূলক শিল্পকর্ম, সেই হেতু বংশ-পরিচয়হীন জীবনকথা বা আত্মজীবনী হয় ক্রটিপূর্ণ বিকলাঙ্গ শিল্প। আত্মজীবনী-লেখক যদি অভিজাত বংশের লোক হন, তবে বাপ-মার ও বংশের পরিচয় দেওয়া যেমন সহজ, তেমনি আনন্দদায়ক। কিন্তু আত্মজীবনী-লেখক যদি তা না হন, তিনি যদি গরীব, নিরক্ষর, চাষি-মজুরের সন্তান হন, তবে কী হয়। নিজের অনভিজাত বংশের কথা, বাপ-মার নিরক্ষরতা বা দারিদ্র্যের কথা, বলা তত সহজ নয়, আনন্দদায়ক ত নয়ই। কাজেই এ ক্ষেত্রে কাজটা কঠিন। কঠিন বলিয়াই এ শ্রেণীর আত্মজীবনী-লেখকের ব্যক্তিত্ব আরো সবল, আত্মমর্যাদাবোধ আরো তীক্ষ্ণ, সত্যপ্রিয়তা আরো ধারালো হওয়া দরকার। উদ্ববর্তন প্রকৃতির নিয়ম। অতীত হইতে যেমন বর্তমান এবং বর্তমান হইতে যেমন ভবিষ্যতের জন্ম, দাদা হইতে বাপ এবং বাপ হইতে তেমনি বেটার জন্ম। একটা ছাড়া অপরটা হয় না। একটার ইতিহাস ছাড়া অপরটারও ইতিহাস হয় না। কোনো লোকের জীবনী শুধু তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনার বর্ণনা, তার ধ্যান-ধারণার বিকলন ও তাঁর কাজ-কর্মের বিবরণ নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে তার আচরণ, এই সব ব্যাপারে তার দেহ-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও তার বা তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই কারণে উক্ত ব্যক্তির জীবনী বা আত্মজীবনী খোলা ময়দানে তাঁর ফটোগ্রাফের সমতুল্য। খোলা ময়দানে কোনো লোকের ফটো নিলে যেমন উপর-নিচের ডাইন-বায়ের ও পেছনের ল্যান্ডস্কেপটা আপনি ফটোতে আসিয়া পড়ে, তেমনি একটি ব্যক্তি-জীবনীর আলেখ্যে তার পিছনের ঐতিহ্যের ছবি ও ডাইনে-বাঁয়ের পরিবেশের রূপ ধরা পড়িতেই হইবে।

আরেকটা কথা বলিয়াই আমার এই ভূমিকা শেষ করিব। আমি আত্মজীবনী লেখিবার উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সে জীবনকথা লোকেরা পড়িবেন বা সে বিশ্বাসে প্রকাশক লোকসানের ঝুঁকি না লইয়া তা ছাপিবেন, এমন ধারণার মধ্যে একটা উপলব্ধি আছে। সেটাকে অহংকারও বলা যাইতে পারে। এমন অহংকার ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ। ব্যক্তিত্বহীন লোকের অহংকার থাকিতে পারে না। কাজেই অহংকারটা দোষের নয়। অহংকার প্রকাশের ধরনটাই দোষের। দায়িত্ববোধের উপলব্ধিটাই অহংকার। এটা আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্মান-জ্ঞানেরই নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র। এর একটাও দোষের নয়। কিন্তু অহংকার যখন দম্ভের আকারে প্রকাশ পায়, তখন সেটা শুধু দোষের হয় না, বোকামিও হয়। আমার অহংকার, আমার আত্মবিশ্বাস ও আমার আত্মমর্যাদাবোধ যতক্ষণ তোমার ঐ-ঐ অনুভূতিকে আহত ও অপমানিত না করে, ততক্ষণ আমার এগুলি গুণ, সুতরাং গর্বের বস্তু। কিন্তু যেই এগুলি দম্ভের আকারে তোমার অনুভূতিতে আঘাত করিল, সেই মুহূর্তে সে-গুণগুলি দোষে পরিণত হইল। কাজেই নিজের অহংকার ও আত্মসম্মানবোধ লইয়া অতি সাবধানে চলিতে হয়। এ যেন রশির উপর দিয়া নাচিয়া যাওয়া, টাইট-রোপ-ড্যাসিং। পা ফসকাইয়া, কি ব্যালেন্স হারাইলা, ত গেলা।

এবার আত্মকথার বিষয়বস্তু ও ঘটনাবলি সম্পর্কে পাঠকদেরে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব। পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাবলির বিবরণী স্পষ্টতই স্মৃতিকথা। ব্যক্তিগত ঘটনার প্রায় সবটুকুই এই শ্রেণীর। কিন্তু যেসব ঘটনার সাথে নেতৃবৃন্দ ও বন্ধুবান্ধবদের সম্পর্ক আছে, সেগুলি যথাসম্ভব পুরাতন কাগজপত্র সংবাদপত্রের কাটিং অথবা পকেট-ডায়েরি বা নোটবই হইতে নেওয়া হইয়াছে। এসবেরও বিস্তারিত খুঁটিনাটি স্মৃতিকথাই। তাও আবার বুড়া মানুষের স্মৃতি। শৈশবের কথা লিখিয়াছি এই বুড়া স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই বটে, কিন্তু এটাও সত্য যে মানুষের শৈশবের স্মৃতিই বেশি নির্ভরযোগ্য। এ বই লিখিতে শুরু করি ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইউব শাহির জেলখানায় বসিয়া। অবসরমত আস্তে আস্তে লিখিয়া শেষ করি ১৯৬৮ সালে। পাবলিশারদের ইচ্ছাতে আমার এই জীবনকথার রাজনৈতিক দিকটা আলাদা করিয়া ঐ সালেই আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পাঁচ বছরে সে বই-এর তিন-তিনটা সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ক্রমে আকারও তার বড় হইয়াছে। পরাধীন বা ঔপনিবেশিক দেশের মানুষের জীবনের অনেকখানি জুড়িয়া থাকে সক্রিয় রাজনীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। আমার বেলাও আমার জীবনে রাজনীতি ঢুকিয়াছিল, বরঞ্চ আমিই রাজনীতিতে ঢুকিয়াছিলাম, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সক্ষমতা অক্ষমতা উপেক্ষা করিয়াই। এই কারণে আমার রাজনীতির কথা আকারে বড় হইয়াছে তার মূল্য কমই হউক আর বেশিই হউক।

কিন্তু আমার নিজের মত এই যে আমার মত গরীব গৃহস্থের সন্তানের জন্য রাজনীতির ভিতরের চেয়ে বাহিরের জীবনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির ভিতরের চেয়ে বাইরেই করিবার মত কাজ ও বলিবার মত কথা আমার অনেক বেশি ছিল ও আছে। আমার অতৃপ্তি আজও বলে আমার করার কাজ ও বলার কথা আজও শেষ হয় নাই। অবশ্য সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীর মতই রাজনীতির ক্ষেত্রে আমারও নেতা, পথপ্রদর্শক ও সহকর্মী ছিলেন। সেখানে ছিলাম আমি পার্টি মেম্বর, অনেকের একজন। কিন্তু রাজনীতির বাইরে ছিলাম আমি একা ও একক। চিন্তায় ও কাজে আমার নিজের পথ সেখানে আমাকেই নির্দেশ করিতে হইয়াছে। আমার চিন্তার বিষয়বস্তু আমাকেই ঠিক করিতে হইয়াছে। এক কথায়, আমি নিজেই এখানে আমার নেতা ও পথপ্রদর্শক। আমার দায়িত্বও এখানে

একক। সে দায়িত্বও কাজেই কঠিন। আমার সে দায়িত্ব পালনে আমার সাফল্য-অসাফল্য দুইটাই পাঠকদের জন্য শিক্ষণীয়। রাজনীতির বাইরের আমার জীবন কাজেই যেমন বিস্তৃত, তেমনি গভীর। আজকার এই আত্মকথায় আমার সেই জীবনই বর্ণিত হইয়াছে। এইটি লেখার পর অতিবাহিত হইয়াছে পাক্কা দশ বছর। কাজেই দক্ষতা, ক্ষমতা, জ্ঞান, মতবাদ ও ধ্যান-ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে আমার এই দীর্ঘ মুদ্দতে। কিন্তু যখন যা লিখিয়াছি, অবিকল তা-ই রাখিয়াছি। পরবর্তী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা মতবাদের আলোকে আগের লেখার পরিবর্তন বা সংশোধন করিবার চেষ্টা করি নাই। অথচ করিবার যথেষ্ট অবসর ছিল ও আছে। বর্তমানে আমি বিষয়ী অর্থে সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা। হাঁটু-ভাঙা আর্থরাইটিস রোগে উকালতি ছাড়িয়াছি। রাজনীতি ছাড়িয়া আমি এডার স্টেটসম্যান, চেম্বার পলিটিশিয়ান বা রাজনৈতিক হরি-ঠাকুর হইয়াছি। সাংবাদিকতা ছাড়িয়া এখন কলামিস্ট বা কমলাকান্ত হইয়াছি। হার্ট স্পেশিয়ালিস্ট ডাক্তারদের নির্দেশে তারও মাত্রা কমাইয়াছি। পলিটিক্যাল হরি-ঠাকুর হওয়ার ব্যাপারে আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে অনেক কথা লিখিয়াছি। সাংবাদিকতায় কমলাকান্ত হওয়া সম্পর্কেও এই পুস্তকের সাংবাদিক জীবন-খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই বই লেখা শেষ করিয়া যখন এই ভূমিকা লেখায় হাত দিয়াছি, তখন আমি স্ত্রী পুত্র-নাতি-নাতনি লইয়া পরম সুখ-শান্তিতে ও যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে প্রচুর অবসরে এমন একটি জীবন যাপন করিতেছি, যখন পদমর্যাদার লোভ লালসা, নিন্দা-প্রশংসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে উঠিয়া সকল ব্যাপারে সচেতন নিরপেক্ষতার ও সকলের প্রতি সদয় ইনসাফের মনোভাব লইয়াই ওপারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি।

আবুল মনসুর আহমদ

ধানমন্ডি, ঢাকা

১০ আগস্ট ১৯৭৩

# সুচিপত্র


০১. বংশ-পরিচয় ১-১৮
০২. জন্ম ও শৈশব ১৯-৩৫
০৩. প্রাইমারি শিক্ষা-বাড়িতে ৩৬-৪৯
০৪. নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা-দরিরামপুর ৫০-৬৪
০৫. মাধ্যমিক শিক্ষা-নাসিরাবাদে ৬৫-৭৯
০৬. উচ্চশিক্ষা-ঢাকা শহরে ৮০-৯৫
০৭. গোঁড়ামির পরিবেশ ৯৬-১১০
০৮. গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া ১১১-১২২
০৯. প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ১২৩-১৩৪
১০. অনিসলামি মুসলমান ১৩৫-১৪৮
১১. হক্কুল এবাদ ১৪৯-১৫৩
১২. প্রচলিত পথে অগ্রসর ১৫৪-১৬৯
১৩. সাহিত্য-সাধনা ১৭০-১৮৮
১৪. গণভিত্তিক সাহিত্যিক মোড় ১৮৯-১৯৫
১৫. স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি ১৯৬-২০৮
১৬. রাষ্ট্রিক বনাম কৃষ্টিক স্বাধীনতা ২০৯-২১৫
১৭. সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি ২১৬-২২৩
১৮. দ্বিতীয় পর্যায় ‘দৈনিক কৃষক’ ২২৪-২২৯
১৯. তৃতীয় পর্যায় ‘নবযুগ’ ২৩০-২৪২
২০. চতুর্থ পর্যায় ‘ইত্তেহাদ’ ২৪৩-২৫৩
২১. দাম্পত্য জীবন ২৫৪-২৭০
২২. উকালতি জীবন ২৭১-২৮৮
২৩. বিষয়ী জীবন ২৮৯-৩০৪
২৪. শেষ কথা ৩০৫-৩০৭

# ফিরিস্তি


## প্রথম খণ্ড : পটভূমি

**অধ্যায় এক :** বংশ-পরিচয়

জন্মস্থান, পূর্বপুরুষ, শরা কবুলের আগে, সামাজিক অনাচার, ধুতি বনাম তহবন্দ, গাজী সাহেবের প্রত্যাবর্তন, গাজী সাহেবের তবলিগ, গাজী সাহেবের জনপ্রিয়তা, গাজী সাহেবের বিবাহ ও সন্তানাদি।

**অধ্যায় দুই :** জন্ম ও শৈশব

জন্ম, স্বাস্থ্য ও ভাগ্য, রোগ ও চিকিৎসা, নিদ্রাচর, ঘুমে চিৎকার, আকস্মিক দুর্ঘটনা, শৈশবের কড়াকড়ি, পারিবারিক প্রথা, সমসাময়িক অবস্থা, প্রাচুর্য ও সরলতা, দাদাজীর এন্তেকালের পর, খেলাধুলার স্বাধীনতা, চুরুট-তামাকের কড়াকড়ি।

## দ্বিতীয় খণ্ড : শিক্ষাজীবন

**অধ্যায় তিন :** প্রাইমারি শিক্ষা-বাড়িতে

চাচাজীর নিকট, ইয়াকুব মুনশীর নিকট, পাঠশালায়, স্বদেশি ধুতি, পাঠ্য বিষয়, ধানীখোলা-বৈলর বিরোধ, আলিমুদ্দিন মাস্টার, মাস্টার সাহেবের ছাত্রপ্রীতি, স্বপ্নে মুখরেজ তালাফুয।

**অধ্যায় চার :** নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা-দরিরামপুর

ত্রিশাল-দরিরামপুর-বনাম ও বেনাম, হেডমাস্টারের নজরে সত্যবাদিতা, হেডমাস্টারের ডাক-হরকরা, হেডমাস্টারের 'ভুল', 'ভুল' সংশোধন, মহিষ ও মহিষী, পণ্ডিত মশায়ের অভিনব দণ্ড, স্কুলে যাতায়াত, বই-পুস্তকের থলি, থলির সুবিধা, বিপজ্জনক রাস্তা, দুইটি ব্যক্তিত্বের প্রভাব, করোনেশনের পুরস্কার।

**অধ্যায় পাঁচ :** মাধ্যমিক শিক্ষা-নাসিরাবাদে

মৃত্যুঞ্জয় স্কুল, হিন্দু-মুসলমান পৃথক বেঞ্চি, প্রথম বিরোধ, ঢিলের জবাবে ঢিল, প্রথম মিলাদ শরিফ, বাংলায় মিলাদ, ঢাকা দর্শন, নাম-নামা।

**অধ্যায় ছয় :** উচ্চশিক্ষা-ঢাকা শহরে

জগন্নাথ কলেজে, যায়গীর-হাকিম সাহেবের বাড়িতে, পথে পাওয়া টাকার সদ্ব্যবহার, কেতাবি সাধুতা বনাম বিষয়ী সাধুতা, হোস্টেল-জীবন বনাম যায়গীর-জীবন, ঢাকার মহল্লা-জীবন, ঢাকা

কলেজ–এস এম হোস্টেল, খেলাধুলা, গলা সাধনা, মাধ্যম রকমের ভাল ছাত্র, ল্যাংলি সাহেবের শেষ উপদেশ, সমকালীন শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষাজীবনের শেষ নাই।

---

## তৃতীয় খণ্ড : ধর্ম-জীবন

---

**অধ্যায় সাত :** গোঁড়ামির পরিবেশ

নফলিয়াতের পাবন্দি, শৈশবের বাড়াবাড়ি, টুপি নিষ্ঠা, মযহাবী-বিরোধ, আমার একগুঁয়েমি, প্রথম সংঘর্ষ, মযহাবী বিরোধের তৎকালীন রূপ, করটিয়ার কাহিনী, ময়মনসিংহ শহরে সংঘর্ষ, দাদাজীর উদারতা, গোঁড়ামি ও আদব-লেহায, মযহাবী সংকীর্ণতা মরিয়াও মরে না, আমার জবাব।

**অধ্যায় আট :** গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া

উদারতার ক্রমপ্রসার, ডা. বিপিন বিহারী সেন, খৃষ্টান, নামাজ রোযার শিথিলতা, কবর-পূজা, পীর-পূজা, ধর্মমত বনাম চরিত্র, সব ধর্ম সত্য, না সব ধর্ম মিথ্যা? খোদা-বিশ্বাস বনাম ধর্মবিশ্বাস, নাস্তিকতা, মি. ল্যাংলির সহনশীলতা, অধ্যাপক ভট্টাচার্য, এ্যাগনস্টিক।

**অধ্যায় নয় :** প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া

খিলাফত ও স্বরাজ আন্দোলন, পুনরায় ধর্মে মতি, ওয়ায়ে নূতনত্ব, পীরগিরির উপক্রম, নূতন পরিবেশ, মোল্লাকি-বিরোধী লীগ, মওলানা মলিহাবাদী, মোল্লা-বিরোধের প্রসারিত রূপ, আচার-সর্বস্বতার কুফল, ধর্মান্তর গ্রহণ অনাবশ্যক, ধর্মত্যাগ অসম্মানসূচক, ধর্মে-ধর্মে টলারেন্স, সর্বধর্ম-সমন্বয় বনাম সর্বধর্ম-পরিচয়, ইসলাম-হিতৈষী' বনাম মুসলিম-হিতৈষী'।

**অধ্যায় দশ :** 'অনিসলামি মুসলমান'

স্পর্শকাতর মুসলমান, চাল-চলনে গোঁড়ামি, মিঠাই বর্জন, বেশ্যা-বর্জিত, ফ্যাসটিডিয়াস, মুসলমানের পর্দা-প্রথা, ভিক্ষা বৃত্তি, মুসলিম-হিত বনাম হিন্দু-অহিত, ইসলাম বনাম মুসলমান, ধর্ম ও ঔষধ, শাঁস ও খোসা, ধর্ম বনাম ধর্মীয় দল, ধর্ম বনাম আল্লাহ, মানব বনাম মুসলমান।

**অধ্যায় এগার :** হক্কুল এবাদ

বুদ্ধির মুক্তির সামাজিক দিক, মুক্তবুদ্ধি বনাম চিন্তার অস্থিরতা, বিজ্ঞান ধর্মবিরোধী নয়, অন্ধভক্তি নয়, অর্জিত উপলব্ধি, শ্রেষ্ঠ মাবুদ, বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ আইনস্টাইন, ধর্ম-বোধের ভিত পাকা, ধর্মের রুহানিয়াত অব্যয়।

## চতুর্থ খণ্ড : সাহিত্যিক জীবন (মামুলি)

**অধ্যায় বার :** প্রচলিত পথে অগ্রসর

কৈফিয়ত, শৈশবের খোরাক পুঁথি, পুঁথির নিশা, গদ্য সাহিত্যের সাথে পরিচয়, শৈশবে সম্পাদকতা, কৈলাস বাবুর প্রভাব, আতিকুল্লাহ, হাজী আহমদ আলী, আহমদিয়া লাইব্রেরি, বৃদ্ধ মিতাজির দোওয়া, উচ্চতর পরিবেশ, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব, কাব্য-সাধনা, মাইকেলের প্রভাব, পুস্তক বাইন্ডিং, চোরের উপর বাটপারি।

**অধ্যায় তের :** সাহিত্য-সাধনা

কবি হওয়ার অপচেষ্টা, গদ্যে প্রথম সাফল্য, অনুবাদ, আল এসলাম, পিওর আর্টের বিতর্ক, সাহিত্যিকদের সাথে প্রথম পরিচয়, প্রথম বইয়ের কপিরাইট, আরবি-ফারসি বনাম বাংলা শব্দ, প্রথম স্যাক্রিফাইস, দ্বিতীয় স্যাক্রিফাইস, সাহিত্য সমিতির সেক্রেটারি, চাদা আদায়, চাঁদা দান, সাহিত্য-জীবনের মুদ্দত ভাগ, অভিনব বিষয়বস্তু।

## পঞ্চম খণ্ড : সাহিত্যিক জীবন (গরমামুলি)

**অধ্যায় চৌদ্দ :** গণভিত্তিক সাহিত্যিক মোড়

উৎপ্রেরণা-জাত জাতীয় চিন্তা, সাহিত্য-জীবন, খণ্ডতার সংগত কারণ, পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা, নূতন উপলব্ধি, জটিলতা বৃদ্ধি, আমার উভয়সংকট, পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম সাহিত্যের দ্বিধাবিভক্তি।

**অধ্যায় পনের :** স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি

সোজা পথ সহজ না, প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা, পশ্চিমাদের অদূরদর্শিতা, পূর্ব বাংলার দুধারী বিপদ, বাংলা সাহিত্যের মুসলমানি রূপ, বাংলা সাহিত্যের বাঙ্গাল রূপ, বিভ্রান্তির হেতু, আমাদের কথ্য ভাষার শক্তির উৎস, মনিব' ও 'চাকরের' ভাষা, আমার একাকিত্ব'।

**অধ্যায় ষোল :** রাষ্ট্রিক বনাম কৃষ্টিক স্বাধীনতা

মার্কিন নজির, স্বাতন্ত্র-বোধের উন্মেষ, ওয়েবস্টারের দৃঢ়তা, দেশি শত্রুতা বনাম বিদেশি শত্রুতা, দূরদর্শী বিদেশির সদুপদেশ, উপলব্ধির বাস্তবায়ন, জনগণের জয়।

## ষষ্ঠ খণ্ড : সাংবাদিক জীবন

**অধ্যায় সতের :** সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি

এক ঢিলে দুই পাখি, 'ছোলতান', 'মোহাম্মদী', 'দি মুসলমান, 'খাদেম, প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি।

**অধ্যায় আঠার :** দ্বিতীয় পর্যায়

'দৈনিক কৃষক', 'কৃষক'-এর অর্থাভাব, ব্যক্তিগত বিপদ, অর্থাভাবের সংগত কারণ, খান বাহাদুর মোহাম্মদ জান, মি. এইচ দত্ত, নীতিগত বিরোধ, কৃষক' ত্যাগ, সাংবাদিকতার নূতন জ্ঞান, সম্পাদক বনাম মালিক।

**অধ্যায় উনিশ :** তৃতীয় পর্যায়

'নবযুগ', বেনামী সম্পাদক, আমার রাজনীতিক সাংবাদিকতা, আমার ব্যক্তিগত সংকট, নজরুলের ধর্মে মতি, নজরুলের আধ্যাত্মিকতা, নজরুলের রোগ লক্ষণ, মি. দত্তের আবির্ভাব, লজ্জাকর দুর্ঘটনা, আগুনে ইন্ধন, নবযুগে চাকুরি খতম।

**অধ্যায় বিশ :** চতুর্থ পর্যায়

'ইত্তেহাদ', আমার চরম সাফল্য, মুসলিম সাংবাদিকতার অসুবিধা, সমাজ-প্রাণতা বনাম বাস্তববাদিতা, 'ইত্তেহাদ'-এর প্রয়াস, 'ইত্তেহাদ'-এর জনপ্রিয়তার কারণ, 'পাঠকের মজলিস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদারতা, 'ইত্তেহাদ'-এর অপমৃত্যু, কলামিস্ট মাত্র।

## সপ্তম খণ্ড : আমার সংসার-জীবন

**অধ্যায় একুশ :** দাম্পত্য জীবন

বিবাহ, বয়সের দূরত্ব লোপ, কচি ঘাড়ে ভারী বোঝা, কুশলী নিপুণা গিন্নি, কলিকাতার জীবন, সংকল্পে দৃঢ়তা, বিবিই জিতিলেন, বিবির প্রভাবের ব্যাপকতা, আমার স্বাস্থ্যের দিকে অতন্দ্র দৃষ্টি, সুখী দাম্পত্য জীবন।

**অধ্যায় বাইশ :** উকালতি জীবন

শুরুতে নৈরাশ্য, খান সাহেব সাহেব আলী, নূতন অভিজ্ঞতা, 'অনুকিলী'-সততা, ফিস আদায়, টাউট প্রথা, 'নোবল প্রফেশন', মিথ্যাই সত্য, সত্যের জন্যে মিথ্যার ভূমিকা, আলীপুরে।

**অধ্যায় তেইশ :** বিষয়ী জীবন

বংশগত দুর্বলতা, উস্তাদের শিক্ষা, সাধু থাকা কঠিন না, নবাব সাহেবের উপদেশ, অর্থম-অনর্থম, চিত্রগুপ্তের বাজেট, নিজের বাড়ি, নিজের বাড়ি বনাম ভাড়াটিয়া বাড়ি, জ্ঞান ও বুদ্ধি, আহাম্মকের পাহারাদার তকদির, 'অজাতশত্রু', সততা ও তুকাব্বরি, শেষ কথা।

# ০১. বংশ-পরিচয়

## প্রথম খণ্ড – পটভূমি

## অধ্যায় এক – বংশ-পরিচয়

১. জন্মস্থান

পাঠকগণ, ভুল বুঝিবেন না। এ বংশ-পরিচয় মানে কোনো ডাইনেটি বা শরিফ খান্দানের কুরসিনামা বা বংশলতা নয়। এ বংশ-পরিচয় পাড়াগাঁয়ের একটি সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৃষক-পরিবারের অতি সাধারণ জীবনমানের ও দিনযাপনের সুখ-দুঃখের কথা। বর্তমান লেখক এমনই একটি কৃষক-পরিবারের সন্তান। সেজন্য তার আত্মজীবনী লেখার মধ্যে তার বংশের এবং আত্মীয়-স্বজনের কথা অমনি আসিয়া পড়ে। সব আত্মজীবনী-লেখকের বেলাতেই এটা সত্য। দুনিয়ার সব দেশের সর্ব শ্রেণীর আত্মজীবনী লেখকেরাই যে নিজেদের বংশ-পরিচয় দিয়া আত্মজীবনী শুরু করিয়াছেন, সেটা এই কারণেই। আত্মজীবনীকার অভিজাত বংশের সন্তানই হউন, আর সমাজের নিচের তলার সাধারণ মানুষের সন্তানই হউন, সবাই একই ধরনের বাপ-মার ঘরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিতান্ত এতিম না হইলে বাপ-মার সংসার ও পরিবেশেই তিনি লালিত-পালিতও হইয়াছেন। অভিজাত বংশের সন্তান ও কৃষক-শ্রমিক বংশের সন্তানের মধ্যে সাধারণত গর্ব-অহংকার ও লজ্জা-সংকোচের যে একটা কমপ্লেক্স থাকা খুবই স্বাভাবিক, আত্মজীবনী লেখার অধিকারীদের অধিকাংশের মধ্যে ঐ বয়সে তেমন কোনো কমপ্লেক্স আর থাকে না। কৌলীন্যবোধ ও হীনম্মন্যতার উর্ধ্বে যারা উঠিতে পারেন, সাধারণত তাঁদের মধ্যেই আত্মজীবনী লেখার অধিকার ও ইচ্ছার উন্মেষ লাভ ঘটে। যে বয়সে আত্মজীবনী লেখার অধিকার ও বাসনা জন্মে, সেটা প্রায় জীবন-সন্ধ্যা। সে বয়সে বংশের উচ্চতা ও নীচতার কথা চিন্তা করার মত মনের অবস্থা অনেকেরই থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে তারা হন নিজেরাই এক একটি বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

তাছাড়া প্রকৃত আত্মজীবনী শুধু একটি ব্যক্তির জীবনকথা নয়। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির ত নয়ই। আত্মজীবনী-লেখক যে শ্রেণীর লোকই হউন না কেন, তার জীবনকথা মানেই তার শৈশবের পরিবেশের কথা। বংশ ও পরিবারের পরিবেশটাই ব্যক্তি-জীবনে সবচেয়ে গুরুতর প্রভাবশালী পরিবেশ। এ বিষয়ে আমি এই পুস্তকের ভূমিকায় আরো বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে এইটুকুর উল্লেখই যথেষ্ট যে, ভূমিকায় যে ব্যক্তিত্ব, শখছিয়াত বা পার্সনালিটির কথা বলিয়াছি, তার অর্ধেক বাপ-মা পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার, আর অর্ধেক পরিবেশের দান। কাজেই ব্যক্তিমাত্রেই পিতৃ-পুরুষ ও পরিবেশের নিকট সমভাবে ঋণী–সে ঋণের আনুপাতিক হার যা-ই হোক না কেন। কাজেই আত্মজীবনী বুঝিতে হইলে যার জীবনী সে ব্যক্তিটিকে বুঝিতে হইবে। ব্যক্তিটিকে বুঝিতে হইলে ঐ দুইটিও বুঝা দরকার। তাই সবাই এ কাজটা করেন। আমিও করিলাম।

ময়মনসিংহ জিলা। ত্রিশাল থানা। ধানীখোলা গ্রাম। এই গ্রামই আমার জন্মভূমি। বর্তমানে এটা বিশাল গ্রাম, একই গ্রামেই একটা ইউনিয়ন। ধানীখোলার উত্তরে গোপাল নগর, দক্ষিণে ত্রিশাল,

পূর্বে বৈলর ও পশ্চিমে রাধাকানাই। এই চারটা গ্রামও এক-একটি ইউনিয়ন। এই চৌহদ্দির মধ্যে ধানীখোলা ইউনিয়নের আয়তন কমবেশি পঁচিশ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। দুইটি নদী। একটির নাম সুতোয়া। অপরটির নাম নাগুয়া। সুতোয়াই বড়। বেগুনবাড়ি রেলস্টেশনের নিকট ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে। ধানীখোলার পূর্ব সীমার আগাগোড়াই এই নদী। দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া অন্য নদীর সহিত মিশিয়া অবশেষে শীতলক্ষ্যাতে পড়িয়াছে। এই দৈর্ঘ্যে ইহার উভয় তীরে বহু বাজার-বন্দর আছে। কিন্তু শুধু সুতোয়া নামেই ইহার দৈর্ঘ্য বিশ মাইলের বেশি। আমাদের ছেলেবেলা এই নদীতে বছরের বার মাস বড় বড় নৌকা চলিত। তার মধ্যে পাঁচ শ মণ হইতে হাজার মণের পালওয়ালা নৌকাও অনেক থাকিত। এখন এই নদীর উপর চারটা পাকা ব্রিজ হইয়া যাওয়াতে আগের মত বড় নৌকার আর যাতায়াত নাই।

অপর পক্ষে নাগুয়া খুব ছোট নদী। উত্তর দিকে ধলি বিল নামক একটি বিল হইতে বাহির হইয়া ধানীখোলাকে উত্তর-দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া ক্ষীরো নদীতে পড়িয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য দশ মাইলের বেশি হইবে না। আমাদের ছেলেবেলায় এই নদীতেও বার মাস পানি থাকিত। মালবাহী নৌকাও চলাচল করিত। এখন অনেক জায়গাতেই তীরবর্তী সব গাছপালা কাটিয়া ফেলায় এবং নদীর ঢালুতে ফসলাদি আবাদ শুরু হওয়ায় নদীটি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

ধানীখোলা গ্রামে মৌযার সংখ্যা বাইশটি। একই গ্রামে দুইটা হাই স্কুল, দুইটা মাইনর স্কুল ও ছয়টি প্রাইমারি স্কুল আছে। এছাড়া একটি ডাক্তারখানা, সরকারি কৃষি ফার্ম, কমিউনিটি সেন্টার, মিলন সমাজ, পাবলিক পাঠাগার, তাঁতের স্কুল, তহসিল কাছারি, বাজার ও পোস্টাফিস আছে।

কিন্তু এক শ বছর আগে ধানীখোলা এর চেয়েও উন্নত ছিল। এর মর্যাদা আরো উঁচা ছিল। তখন ধানীখোলা ছিল ময়মনসিংহ জিলার পাঁচটি উল্লেখযোগ্য শহরের একটি। এ সম্পর্কে তৎকালীন সরকার প্রকাশিত প্রামাণ্য পুস্তক স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস-অব-বেঙ্গলএর উল্লেখ করা যায়। পুস্তকের লেখক বিখ্যাত স্ট্যাটিসটিশিয়ান ও ঐতিহাসিক ডবলিও ডবলিও হান্টার। বইখানা প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ ইংরেজি সনে। তার আগের বছর মানে ১৮৭৪ সালের বিবরণ এতে আছে। এই পুস্তকের ৪১৪ পৃষ্ঠায় ময়মনসিংহ জিলার পাঁচটি বৃহত্তম শহর’ এই শিরোনামার যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাতে যথাক্রমে নাসিরাবাদ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও ধানীখোলার নাম আছে। দেখা যায় অধিবাসী-সংখ্যার ভিত্তিতেই শহরগুলির মান নির্ণীত হইয়াছিল। এই পাঁচটি শহরের মধ্যে নাসিরাবাদ শহর সারা জিলার ও সদর মহকুমার, জামালপুর শহর জামালপুর মহকুমার, কিশোরগঞ্জ শহর কিশোরগঞ্জ মহকুমার হেডকোয়ার্টার ছিল। কেবল শেরপুর ও ধানীখোলাই ছিল বেসরকারি শহর। সরকারি শাসনক্ষেত্রে শহর গড়িয়া উঠা খুবই স্বাভাবিক নিশ্চিত ব্যাপার। কিন্তু বেসরকারি জায়গায় শহর গড়িয়া উঠা কম কথা নয়। হান্টার সাহেবের হিসাবমত দেখা যায়, ঐ সময়ে ধানীখোলা শহরে মোট বাসেন্দা ছিল ছয় হাজার সাত শ ত্রিশ। তার মধ্যে মুসলমান ছিল চার হাজার ছয় শ পঁয়ত্রিশ, হিন্দু ছিল দুই হাজার পঁচানব্বই, খৃষ্টান বা অন্য কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক ধানীখোলায় ছিল না। অধিবাসী সংখ্যা সামান্য নয়। কারণ জিলার হেডকোয়ার্টার নাসিরাবাদ শহরের লোকসংখ্যা ছিল তখন দশ হাজার আটষট্টি জন মাত্র।

এই সময় ময়মনসিংহ জিলার মাত্র চারটি মহকুমা ছিল–সদর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ও আটিয়া। বর্তমানের নেত্রকোনা মহকুমা তৎকালে সদর মহকুমার এলাকাভুক্ত ছিল। আটিয়া মহকুমাই পরে

টাঙ্গাইল মহকুমা ও আরো পরে টাঙ্গাইল জিলা হয়। আটিয়া শহরই আটিয়া মহকুমার প্রধান নগর ছিল। কিন্তু একটি মহকুমার হেডকোয়ার্টার হইয়াও আটিয়া উল্লেখযোগ্য শহরের তালিকাভুক্ত হইতে পারে নাই। কারণ আটিয়া মহকুমা ও তার হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় মাত্র ১৮৬৯ সালে। তার আগে পর্যন্ত আটিয়া মহকুমা জামালপুর মহকুমার এলাকাভুক্ত ছিল। জামালপুর মহকুমাই এই জিলার সর্বপ্রথম মহকুমা। এটি স্থাপিত হয় ১৮৪৫ সালে। জামালপুর মহকুমা স্থাপিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সারা জিলা নাসিরাবাদ হইতেই শাসিত হইত। নাসিরাবাদ শহরে জিলার হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় ১৭৬৮ সালে।

হান্টার সাহেবের বর্ণনায় দেখা যায়, তৎকালে এই জিলার ফরাযীদের প্রাধান্য ছিল। এ সম্পর্কে স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস-অব-বেঙ্গল-এর ৪০৯ পৃষ্ঠায় হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন :

In Farazis centre much of the wealth and influence of the district some of its members being large landlords. Many of the poorer of the Farazis were formerly known as sympathisers of the Whabi's disaffection and a small number went from Mymensingh to the rebel camp beyond our North Western frontiers for the purpose of co-operating with the fanatics of that part of the country.

অর্থাৎ ফরাযীদের হাতেই এখন এ জিলার ধনসম্পদ ও প্রভাবের অনেকখানি কেন্দ্রীভূত। তাদের কয়েকজন বড় বড় জমিদার। ফরাযীদের মধ্যকার অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণীর অনেকেই ওহাবি বিদ্রোহের সমর্থক ছিল বলিয়া জানা যায়। এদের মধ্যে অল্প কয়েকজন সীমান্তপারের ধর্মান্ধদের সাথে সহযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ হইতে উত্তর-পশ্চিম পারের বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়াছিল।

হান্টার সাহেবের বর্ণিত এই 'অল্পসংখ্যক লোক আসলে কতজন ছিলেন, তা আজও জানা যায় নাই।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক গবেষকেরা একদিন সে খবর দেশবাসীকে দিতে পারিবেন, তাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে এই অহংকার আমি কিছুতেই গোপন। করিতে পারিতেছ না যে, আমার পূর্বপুরুষের একজন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আমার দাদাজীর জ্যেষ্ঠ সহোদর গাজী আশেক উল্লা সাহেব।

## ২. পূর্বপুরুষ

সম্ভবত ১৮২৭-২৮ সালের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে মওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর চার খলিফার অন্যতম মওলানা এনায়েত আলী স্থানীয় খলিফা মওলানা চেরাগ আলীসহ তবলিগ উপলক্ষে ধানীখোলা তশরিফ আনেন। তাদের প্রচারকালে আমার দাদার বাবা আছরউদ্দিন, আমার নানার বাবা মহব্বত উল্লা ও তার বেহাই খোদাবখশ এবং সোনাখালী মৌযার জাবু নামক এক ব্যক্তি, এই চারজন মওলানা সাহেবের হাতে শরা কবুল করেন। এটাকে মুরিদ হওয়া বলা হইত না। কারণ এঁরা পীর-মুরিদির বিরোধী ছিলেন। এই চারজন পূর্বেকার বংশ পদবির স্থলে ফরাযী' পদবি লাভ করেন। স্বভাবতই সামাজিক ক্রিয়াকলাপে এরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ। হইয়া

পড়েন। পরবর্তীকালে মহব্বত উল্লা ফরাযীর পুত্র মেহের উল্লা ফরাযীর এক মেয়েকে আমার বাবা আবদুর রহিম ফরাযী বিবাহ করেন। খোদা বখশ ফরাযীর পুত্র জলিল বখশ ফরাযী মেহের উল্লা ফরাযীর এক বোনকে বিবাহ করেন এবং জাবু ফরাযীর পুত্র আবদুল গফুর ফরাযী আমার দাদার বড় ভাই গাজী আশেক উল্লার মেয়েকে বিবাহ করেন।

যা হোক, মওলানা এনায়েত আলী ও মওলানা চেরাগ আলীর হাতে শরা গ্রহণের সময় আছরউদ্দিন ফরাযীর তিন পুত্র ছিলেন : জ্যেষ্ঠ আশেক উল্লা, মধ্যম আরয উল্লা, কনিষ্ঠ আরমান উল্লা। জ্যেষ্ঠ আশেক উল্লার বয়স তখন অনুমান আঠার-উনিশ। সবেমাত্র মুখ ভরিয়া দাড়ি-মোচ উঠিয়াছে। তিনি তখন। স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়িতেন। মওলানাদ্বয়ের প্রেরণায় আশেক উল্লা সাহেব সৈয়দ আহমদ শহীদের মোজাহিদ দলে ভর্তি হন এবং তাঁদের সঙ্গে সরহদ্দে চলিয়া যান। দাদাজী আরমান উল্লার বয়স তখন মাত্র আট-দশ বছর।

এই ঘটনার সময়কাল ১৮২৭-২৮ সাল অনুমান করা হয় এই জন্য যে আমাদের পারিবারিক প্রবাদ মোতাবেক আশেক উল্লা সাহেবের মোজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার পাঁচ বছর পরেই বালাকোটের যুদ্ধ হয়। বালাকোটের যুদ্ধ হয় ১৮৩১ সালের মে মাসে। বড় ছেলে ইসলামের জন্য জান দিয়া শহীদ হইতে অথবা গাজী হইতে গিয়াছে, এই জন্য আছরউদ্দিন ফরাযীর মর্যাদা প্রতিবেশীদের কাছে এবং আলেম-ওলামাদের কাছে বাড়িয়া যায়। তিনি স্থানীয় ফরাযীদের মাতব্বর হন।

হান্টার সাহেবের কথা অন্তত আমাদের বংশ সম্বন্ধে মাত্র অংশত সত্য। প্রথমত আমাদের পারিবারিক পদবি ফরাযী ছিল সত্য; কিন্তু আমার মুরুব্বিরা কেউ হাজী শরিয়ত উল্লা বা তার পুত্র দুদু মিয়া সাহেবের মুরিদ ফরায়েযী' ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদের ওহাবি বলিয়াও স্বীকার করিতেন না। আমার দাদা আশেক উল্লা সাহেব যে মোজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন, সেটাকেও তারা ওহাবি আন্দোলন বলিয়া মানিতেন না। তৃতীয়ত, আমার দাদা গাজী আশেক উল্লার সাথে এ জিলার আরো যারা জেহাদে গিয়াছিলেন, তাদের কয়েকজনের পরিবারের সাথে পরবর্তীকালে আমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। তাঁরা কেউই হাজী শরিয়ত উল্লার ফরায়েযী জমাতের লোক নন। তবে হান্টার সাহেবের উক্ত-মত আমাদের পূর্বপুরুষেরা সত্যিই গরীব কৃষক শ্রেণীর লোক ছিলেন। বস্তুত, আমার শৈশবে মুরুব্বিদের ফরায়েযী' ও 'ফরাযী' শব্দ দুইটার পার্থক্য সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন দেখিয়াছি। কেউ তাদের ফরায়েযী' বলিলে তারা মুখে আপত্তি করিতেন, মনে কষ্ট পাইতেন এবং অনেক সময় চটিয়াও যাইতেন। এই ভুল আমাদের সমাজের বা আত্মীয়-স্বজনদের কেউ করিতেন না। আমাদের স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষকতা ও মাঠে-মসজিদে ওয়ায-নসিহত করিতে বরিশাল, নোয়াখালী এবং ঢাকা হইতে অনেক আলেম-ওলামা আসিতেন এবং আমাদের বাড়িতে মেহমান হইতেন। ঢাকা হইতে যেসব আলেম আসিতেন, তাঁদের সবাই আমাদের জমাতি ছিলেন। নোয়াখালী হইতে আগত আলেমরা সবাই ছিলেন হানাফি জমাতের। একমাত্র বরিশাল জিলা হইতে আগত আলেমরা আধাআধি হানাফি এবং আধাআধি মোহাম্মদী, মানে আমাদের জমাতের লোক ছিলেন। মোহাম্মদী আলেমদের কেউই আমাদের 'ফরায়েযী' বলিতেন না। ফরাযীই বলিতেন। কোনো হানাফি আলেমও আমাদেরে 'ফরায়েযী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। হানাফি আলেমদেরেও আমাদের অঞ্চলে খুবই তাজিম ও সম্মান করা

হইত। বস্তুত, আমাদের বাড়ির মাদ্রাসায় শিক্ষকদের বেশির ভাগ হানাফি ছিলেন। তারা আমাদেরে উর্দু-কি পহেলি কিতাব পড়াইবার পরই নামাজ-রোযা-হালাল-হারাম শিখাইবার জন্য রাহে-নাজাত ও মিফতাহুল জান্নাত পড়াইতেন। তবে পড়াইবার সময় তারা তাহরিমা বান্ধা, জোরে আমিন কওয়া, রেকাতে-রেকাতে বসা, রুকুতে নিচা ও উঁচা হওয়ার সময় রফাদায়েন করা ইত্যাদি ব্যাপারে হানাফি মোহাম্মদী মতের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতেন। এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ প্রথম প্রথম আমাদের পরিবারকে যখন ফরায়েযী পরিবার বলিতেন, তখনই আমার মুরুব্বিরা আপত্তি করিতেন। তর্কও হইত। কিন্তু আমি তখন ওসব কিছুই বুঝিতাম না। তার অনেক পরে আমি যখন শহরের ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ি, তখন সিটি স্কুলের আরবি-ফারসি টিচার জনাব মৌ. মাসুম আলী সাহেব আমাদের মেসের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনিই প্রথম আমাকে এলমা করিয়া ফরায়েযী' ও 'ফরাযী' শব্দ দুইটির পার্থক্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কারণ তিনি নিজেও একজন ফরাযী ছিলেন। তাকে কেউ ফরায়েযী বলিলে তিনি কঠোর প্রতিবাদ করিতেন। তিনি আরবি ব্যাকরণের বিভিন্ন সংজ্ঞার উল্লেখ করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি নিজে তখন ফারসি পড়িতাম বলিয়া তার সব কথা বুঝিও নাই, যাও বুঝিয়াছিলাম তাও মনেও নাই সব। তবে যেটুকু মনে আছে এবং বাড়িতে গিয়া যতটুকুতে চাচাজীর অনুমোদন পাইয়াছিলাম তা এই যে ফরিযা' শব্দটার বহুবচন ফরায়েয হইতে ফরায়েযী' শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ফরাযী' শব্দটা আসিয়াছে সোজাসুজি ফরয ইতে। বিশেষত ফরায়েযী' শব্দটা পদবি হিসাবে ব্যবহারের অসুবিধাও ছিল। মুসলমান উত্তরাধিকার আইন মোতাবেক শরিকদের প্রাপ্য অংশের হিসাবকেও ফরায়েয করা বলা হইত জনগণের স্তরেও। সেজন্য ফরায়েযী শব্দটার একাধিক অর্থবোধক বিভ্রান্তির আশঙ্কা ছিল। তাছাড়া হাজী শরিয়তুল্লা সাহেবের অনুসারী ফরায়েযীরা গ্রামে জুম্মা ও ঈদের জমাত করা নাজায়েয মনে করিতেন। অথচ আমাদের জমাতের লোকেরা গ্রামে জুম্মা ও ঈদের নামাজ পড়া অবশ্যকর্তব্য মনে করিতেন। আমাদের বাড়িতেই জুম্মার মসজিদ ছিল। তাতে সারা গায়ের ছেলে-বুড়া জুম্মার নামাজ পড়িতেন। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি আশপাশের তিন-চার গাঁয়ের লোকেরা এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান মাতব্বর ইউসুফ আলী মৃধা সাহেবের বাড়ির সামনের বিশাল মাঠে খুব বড় ঈদের জমাতে শামিল হইত। দাদাজীর মুখে শুনিয়াছি তিনি বাপের আমল হইতেই ঐ ঈদগাতেই ঈদের জমাত করিয়া আসিয়াছেন। আজকাল অবশ্য সে ঈদের মাঠ ভাঙ্গিয়া চার-পাঁচটা মাঠ হইয়াছে। যা হোক আমাদের পরিবারের 'ফরাযী' পদটি যে হাজী শরিয়তুল্লা-দুদু মিয়া সাহেবদের অনুসারী ফরায়েযী নয়, আশা করি এতেই তা পরিষ্কার হইল। তবে প্রশ্ন। থাকিয়া যায়, আমাদের পরিবারের ফরাযী' পদবিটি আসিল কোথা হইতে? এ সম্পর্কে কোনো লিখিত দলিল প্রমাণ নাই। সবই দাদাজী ও তার সমবয়সী লোকজন ও তৎকালীন আলেম-ফাযেলদের মুখে শুনা কথা। তাঁদের কথা হইতে বুঝা যায় যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভীর অন্যতম খলিফা মওলানা এনায়েত আলী, মওলানা চেরাগ আলী ও তাদের স্থানীয় সহকর্মী দেলদুয়ারের মওলানা মাহমুদ আলী তরিকায়ে-মেহাম্মদিয়ায় তবলিগ কাজে এই অঞ্চলে আগমন করেন। তারা অনেক সময় আমাদের বাড়িতেই রাত কাটাইতেন। এঁদের প্রচারের ফলেই এ অঞ্চলের লোকেরা ক্রমে-ক্রমে শরা কবুল করেন। শরা কবুল করা মানে ইসলাম গ্রহণ নয়। কারণ আগে হইতেই এ অঞ্চলের বিশেষত ধানীখোলা গ্রামের বিপুল মেজরিটি মুসলমান ছিলেন। কাজেই উপরিউক্ত আলেমরা এ অঞ্চলে 'শরা' জারি করিতে আসিতেন, ইসলাম প্রচারে আসিতেন না। তাঁদের প্রচারকালে ধানীখোলা গ্রামের প্রায় আধাআধি লোক কালক্রমে শরা' কবুল করেন। এঁরা সকলেই মোহাম্মদী জমাতভুক্ত। পরবর্তীকালে **১৮৩১**

সালে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী ও তাঁর অনেক সহকর্মী এবং খলিফাঁদের কেউ-কেউ বালাকোটের যুদ্ধে শাহাদতবরণ করিলে আহমদ শহীদের পাঁচ খলিফার অন্যতম মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেব নিজে এবং তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রধান মওলানা আবদুল আউয়াল সাহেবানের তবলিগের ফলে এতদঞ্চলের অনেক মুসলমান শরা কবুল করেন। তবে এঁরা প্রায় সকলেই হানাফি মযহাবভুক্ত।

মওলানা এনায়েত আলী ও মওলানা চেরাগ আলীর তবলিগে এ অঞ্চলের যাঁরা শরা কবুল করিয়াছিলেন, তাঁদেরও সকলের ফরাযী পদবি নাই। তারা আগের মতই শেখ, খা, সর্দার, মণ্ডল, তরফদার, তালুকদার ইত্যাদি পারিবারিক পদবি লইয়াই থাকিতেন। শুধু আমাদের পরিবারেরই ফরাযী' পদটি আসিল কোথা হইতে? এ অঞ্চল হইতে একমাত্র আমাদের পরিবার থনেই একজন মোজাহিদ বাহিনীতে ভর্তি হইয়াছিলেন, সে কারণেই কি উক্ত আলেমগণ আমাদের পরিবারকেই ‘ফরাযী’ লকব দিয়াছিলেন? তাও নয়। আমাদের পরিবার ছাড়াও এ অঞ্চলে আরো তিন-চার ঘর ‘ফরাযী আছেন, অথচ তাদের পরিবার হইতে কেউ জেহাদে যান নাই।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে প্রকৃত ব্যাপার এই যে মওলানা এনায়েত আলী ও মওলানা চেরাগ আলী সাহেবদের হাতে ও মওলানা মাহমুদ আলী সাহেবের সাক্ষাতে এ অঞ্চলের যে চারটি পরিবার সর্বপ্রথম শরা কবুল করিয়াছিলেন, শুধু তাদেরেই ফরাযী লকব দেওয়া হইয়াছিল। এই চারি পরিবারের মধ্যেই পরবর্তীকালে বিবাহ-শাদির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। আমার দাদার পিতা আছরউদ্দিন সাহেবের সাথে একই সময়ে যে তিনজন শরা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁদের একজন মহব্বত উল্লা, দ্বিতীয়জন খোদা বখশ, তৃতীয়জন জাবু। শরা কবুল করিয়া এঁরা যথাক্রমে আছরউদ্দিন ফরাযী, মহব্বত উল্লা ফরাযী, খোদা বখশ ও জাবু ফরাযী নামে পরিচিত হন। আছরউদ্দিন ফরাযীর কনিষ্ঠ পুত্র আরমান উল্লা ফরাযীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার পিতা আবদুর রহিম ফরাযী সাহেব পরবর্তীকালে মহব্বত উল্লা ফরাযীর পুত্র মেহেরুল্লা ফরাযীর কন্যা মীর জাহান খাতুনকে বিবাহ করেন। ইনিই আমার মা। খোদা বখশ ফরাযীর পুত্র জলিল বখশ ফরাযী আমার নানা মেহেরুল্লা ফরাযীর পিতা মহব্বত উল্লা ফরাযীর এক কন্যাকে বিবাহ করেন। জাবু ফরাযীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল গফুর ফরাযীর নিকট বহুকাল প্রায়, ষাট বছর, পরে গাজী আশেক উল্লা সাহেব তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যাসন্তান ফাতেমা খাতুনকে বিবাহ দেন। এইভাবে গোড়ার চার ফরাযী পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

শরা কবুল করিয়া আমার প্রপিতামহ আছরউদ্দিন সাহেব ‘ফরাযী’ হইবার আগে তাদের পারিবারিক পদবি ছিল মাদারী। তাঁর বাবার নাম ছিল ফালু মাদারী। দাদাজীর কথিত মতে তাদের এই পদবি বংশানুক্রমিক। নয় পুরুষের নাম তিনি জানিতেন। গড়গড় করিয়া একদমে নয় পুরুষের নামও বলিতেন। সকলের নাম আজ আমার মনে নাই। কোনো কাগজপত্রেও লেখা নাই। তারা কেউ লেখাপড়া জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। দাদাজীর কওয়া এবং তার সমবয়সী বুড়াদের সমর্থিত মাত্র চারটি নাম আমার মনে আছে। তদনুসারে ফালু মাদারীর বাপ ছিলেন কালু মাদারী, তার বাপ ছিলেন ছাবু মাদারী ও তাঁর বাবার নাম লেদু মাদারী। এঁদের ধারাবাহিকতারও গ্যারান্টি আমি দিতে পারিতেছি না। ছেলেবেলার শোনা কথা আশ্চর্য রকম স্মরণ থাকে। এই দাবিতেই নামগুলি বলিতেছি, কিন্তু দাদাজীর কওয়া নয়টি নামের মধ্যে মাত্র চারটির উল্লেখ করিতেছি বলিয়া আমার

নিজের মনেও সন্দেহ আছে, পূর্বপুরুষদের পারম্পর্য ঠিকমত উল্লিখিত হইল কি না। তবে তাদের সকলের পদবি যে মাদারী ছিল, তাতে সন্দেহ নাই। মাদারী পদবি ছিল কেন, সে বিষয়ে দাদাজী ও গ্রামের বুড়া মুরুব্বিরা একই কথা বলিতেন। তাই এখানে তার উল্লেখ করিতেছি।

৩. শরা কবুলের আগে

শরা জারি হইবার আগে আমাদের অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা, গোরপূজা ইত্যাদি যেসব বেশরা প্রথা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে 'মাদার পূজা' ছিল প্রধান। এবং এটা বার্ষিক মচ্ছব। হিন্দুদের মহোৎসবেরই এটা অপভ্রংশ নিশ্চয়। পূজা কথাটাও মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কালু গাজীর মত মাদার গাজীও মুসলমানদের কিংবদন্তির 'হিরো' ছিলেন। তবে 'মাদার পূজা' বা কোনো পূজাতেই কোনো মূর্তিপূজা হইত না।

প্রতিবছর ধান মাড়াই হইবার পরই, সাধারণত মাঘ মাসে এই 'মাদার পূজার মচ্ছব' হইত। খুব লম্বা সোজা একটা আস্ত বাঁশ খাড়া করিয়া গাড়া হইত। বাঁশটির আগাগোড়া নিপিস করিয়া চাছিয়া-ছুলিয়া সুন্দর করা হইত। শুধু আগার দু' একটা কঞ্চি পাতা-সুদ্ধা রাখিয়া দেওয়া হইত। ঐ কঞ্চির নিচেই একগোছা পাট বাঁধা হইত। এই পাটের গোছাটি কোনো বছর মেজেন্টর লাগাইয়া লাল রং করা হইত। কোনো বছর নীল লাগাইয়া নীল রঙা করা হইত। এই রং বদলানোর কোনো ধর্মীয় কারণ ছিল, না একটার অভাবে আরেকটা লাগানো হইত, দাদাজী তা বলিতে পারিতেন না। যা হোক, বাঁশের আগায় ঐ লাল-নীল রঙের একগোছা পাট ঝুলানো হইত এবং বাঁশটির আগাগোড়া চুন-হলুদ ও গোড়ায় হলুদ ও সিন্দুরের ফোঁটা দেওয়া হইত। বাঁশের গোড়ায় অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া উঁচা ভিটি বানানো হইত এবং তা লেপিয়া-পুঁছিয়া ফিটফাট করা হইত। তিন দিন ধরিয়া এই বাঁশটি খাড়া থাকিত। এই তিন দিন ধরিয়াই এই বাশ ঘিরিয়া ঢাল-তলোয়ারসহ নাচিয়া কুঁদিয়া ঢোল-ডগর যোগে মাদারের গান, গাজীর গান ও জারিগান গাওয়া হইত। এই তিন দিনই, বিশেষত প্রথম দিন এই বাঁশের চারদিক মেলা বসিত। মেলায় অনেক জিনিস বিকিকিনি হইত।

'মাদার পূজার' পুরোহিতকে মাদারী বলা হইত। তিনি ছিলেন গ্রামের ধর্মীয় গুরু। তিনি ছুঁইয়া না দেওয়া পর্যন্ত বাঁশ খাড়া হইত না। তিনি আবার চুঁইয়া না দেওয়া পর্যন্ত বাঁশ নামানো হইত না। মাদার বাঁশ খাড়া করিবার পর মাদারী সাহেব বাঁশের গোড়ায় ভিটিতে লাল রঙের নয়া গামছা পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন। দর্শকেরা সেই গামছায় যার-তার নজর দিত। তৎকালে টাকা আধুলির প্রচলন খুব কমই ছিল। অধিকাংশেই কড়ি, আধলা, পয়সা, ডবল পয়সা ও বড়জোর আনী-দুআনী ব্যবহার করিত। মাদারীর নজরেও কাজেই তা-ই ফেলিত। কিন্তু ঐরূপে যে পয়সা জমা হইত, তাতেই মাদারী সাহেবের সম্বৎসর চলিয়া যাইত।

মাদারীর পূজা ও মেলার সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য দাদাজী ওটাকে হিন্দুদের চড়কপূজার সহিত তুলনা করিতেন। তত্বালে আমাদের বাড়ির অদূরেই হিন্দুপাড়া ছিল। প্রতিবৎসর চৈত্র মাসে সংক্রান্তির দিনে তাদের চড়কপূজা হইত। গ্রামের বাজার-সংলগ্ন খোলা মাঠে, তদভাবে চাষের জমিতে পূজা হইত ও মেলা বসিত। খুব লম্বা ও বেশ মোটা। একটা শাল-গজারি কাঠ খাড়া করিয়া গাড়া হইত। তার আগায় থাকিত একটা আড়ি কাঠ। আড়ি কাঠের দুই মাথা হইতে দুইটা মযবুত রশি মাটিতক ঝুলিয়া থাকিত। আড়ি কাঠটা খাড়া কাঠের সঙ্গে এমন কেড়কি কৌশলে

লাগানো হইত যে আড়ি কাঠের রশি ধরিয়া খাড়া কাঠের চারপাশে দৌড়াইলে আড়ি কাঠও ভনভন করিয়া ঘুরিত। আমরা যখন দেখিয়াছি, তখন আড়ি কাঠের দুই পাশের রশি ধরিয়া লোকেরা মাটির উপরেই দৌড়াদৌড়ি করিত। কিন্তু আমরা বুড়াদের কাছে শুনিতাম যে আগেরকালে দুইজন লোক ঐ দুই রশি ধরিয়া শূন্যে ঝুলিয়া ঝুলিয়া চড়কগাছের চারিদিকে ঘুরিত। কিন্তু নিজ চক্ষে ওটা আমরা কোথাও কোনো দিন দেখি নাই। যা হোক ঐ চড়কপূজায় পূজা-পালি ছাড়া একটা মেলা বসিত। এই মেলায় চিনি-বাতাসা, খই-মুড়ি চিড়া, কদমা-জিলাপি-মিসরি, বাঁশি ও খেলনা ইত্যাদি ছেলেমেয়ের প্রিয় জিনিস পাওয়া যাইত। এছাড়া দাও, কুড়াল, কোদাল, লাঙলের ঈষ ও ফাল ইত্যাদি কৃষকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাইত। মোট কথা, এই বার্ষিক মেলা সকল দিক দিয়া জাতি-ধর্মনির্বিশেষে ছেলে-বুড়া-পুরুষ-নারী সকলের জন্যই বহু আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছিল। দাদাজী আমাদেরে বুঝাইতেন মাদারীর মেলা অবিকল এই রকম ছিল। তিনি বলিতেন, 'মাদার পূজা'ছিল বেশরা। মুসলমানদের চড়কপূজা। তার বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন হইতেই আমাদের বাড়িতে ঐ 'মাদার পূজা'ও মেলা বসার প্রথা বন্ধ হয়। তিনি বলিতেন যে, ঐ মেলা বন্ধ হওয়ায় প্রথম-প্রথম স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাঁর নিজেরও খুবই খারাপ লাগিয়াছিল, তাও তিনি স্বীকার করিতেন।

৪. সামাজিক অনাচার

শরা জারির আগে আমাদের অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে যেসব আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সে সম্বন্ধে দাদাজী ও তার সমবয়সীদের মুখে এইরূপ শুনিয়াছি :

তৎকালে নামাজ-রোযা খুব চালু ছিল না। ওয়াকতিয়া ও জুম্মার নামাজ বড় কেউ পড়িত না। এ অঞ্চলে কোনো মসজিদ বা জুম্মার ঘর ছিল না। বছরে দুইবার ঈদের জমাত হইত বটে, কিন্তু তাতে বড়রাই শামিল হইত। কাজেই জমাতে খুব অল্প লোক হইত। ঈদের মাঠে লোক না হইলেও বাড়ি বাড়ি আমোদ-সামুদ হইত খুব। সাধ্যমত নূতন কাপড়-চোপড় পরিয়া লোকেরা বেদম গান-বাজনা করিত। সারা রাত ঢোলের আওয়াজ পাওয়া যাইত। প্রায়ই বাড়ি-বাড়ি ঢোল-ডগর দেখা যাইত। বা ঈদের গরু কোরবানি কেউ করিত না। কারণ জমিদারদের তরফ হইতে উহা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ ছিল। খাশি-বকরি কোরবানি করা চলিত। লোকেরা করিতও তা প্রচুর।

তরুণদের ত কথাই নাই, বয়স্কদেরও সকলে রোযা রাখিত না। যারা রোযা রাখিত, তারাও দিনের বেলায় পানি ও তামাক খাইত। শুধু ভাত খাওয়া হইতে বিরত থাকিত। পানি ও তামাক খাওয়াতে রোযা নষ্ট হইত না, এই বিশ্বাস তাদের ছিল। কারণ পানি তামাক খাইবার সময় তারা রোযাটা একটা চোঙার মধ্যে ভরিয়া রাখিত। কায়দাটা ছিল এই : একদিকে গিরোওয়ালা মোটা বরাক বাশের দুই-একটা চোঙা সব গৃহস্থের বাড়িতেই আজও আছে, আগেও থাকিত। তাতে সারা বছর পুরুষেরা তামাক রাখে। মেয়েরা রাখে লবণ, সজ, গরমমসলা, লাউ-কুমড়ার বিচি ইত্যাদি। আগের কালে এ রকম চোঙার অতিরিক্ত দুই-একটা বাড়ি-বাড়িই থাকিত। রোযার মাসে মাঠে যাইবার সময় এই রকম এক-একটা চোঙা রোযাদাররা সঙ্গে রাখিত। পানি-তামাকের শখ হইলে এই চোঙার খোলা মুখে মুখ লাগাইয়া খুব জোরে দম ছাড়া হইত। মুখ তোলার সঙ্গে সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি গামছা, নেকড়া বা পাটের টিপলা দিয়া চোঙার মুখ কষিয়া বন্ধ করা হইত, যাতে বাতাস বাহির হইয়া না আসে। তারপর আবশ্যকমত পানি-তামাক খাইয়া চোঙাটা আবার মুখের কাছে ধরা হইত। খুব

ক্ষিপ্রহস্তে চোঙার ঢিপলাটা খুলিয়া মুখ লাগাইয়া মুখে চুষিয়া চোঙার বন্ধ রোযা মুখে আনা হইত এবং সেঁক গিলিয়া একেবারে পেটের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত। খুব ধার্মিক ভাল মানুষ দু'একজন এমন করাটা পছন্দ করিতেন না বটে, কিন্তু সাধারণভাবে এটাই চালু ছিল।

আছরউদ্দিন ফরাযী ও তার তিনজন সাথি শরা কবুল করার পরেও জনসাধারণের মধ্যে বহুকাল যাবৎ ঐ আচার প্রচলিত ছিল। ঐ চারি বন্ধুর প্রচারে ক্রমে ক্রমে আরো অনেক লোক শরা কবুল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সারা গ্রামবাসীর তুলনায় তাঁরা ছিলেন নগণ্য মাইনরিটি।

৫. ধুতি বনাম তহবন্দ

তৎকালে তহবন্দ পরা খুবই শরমের ব্যাপার ছিল। সবাই কাছা দিয়া কাপড় পরিত। শরা জারির আগে ত বটেই, শরা জারির পরেও এটা চালু ছিল। ঈদের জমাতেও লোকেরা কাছা দিয়া ধুতি পরিয়াই যাইত। নামাজের সময় কাছা খুলিতেই হইত। সে কাজটাও নামাজে দাঁড়াইবার আগে তক করিত না। প্রথম প্রথম নামাজের কাতারে বসিবার পর অন্যের আগোচরে চুপি চুপি কাছা খুলিয়া নামাজ শেষ করিয়া কাতার হইতে উঠিবার আগেই আবার কাছা দিয়া ফেলিত। শরম কাটিবার পর অবশ্য নামাজের কাতারে বসিবার আগে ত বটেই, অযু করিবার আগেই কাছা ভোলা চালু হইয়াছিল। পক্ষান্তরে শরা কবুল করিবার পর আছরউদ্দিন ফরাযী ও তাঁর সঙ্গীদের পরিবারের তরুণদের সকলে না হইলেও অন্তত বয়স্করা নামাজ বন্দেগির সময় ছাড়াও চব্বিশ ঘণ্টা তহবন্দ পরিয়া থাকিতেন। এটা নাকি তাঁদের পীরের হুকুম ছিল, শরা কবুলের অন্যতম শর্ত ছিল। সাদা লুঙ্গিকেই আগে তহবন্দ বলা হইত। দাদাজীর আমলে রঙিন লুঙ্গি কেউ দেখেন নাই। রঙিন লুঙ্গির প্রথম প্রচলন হয় বার্মা হইতে। লুঙ্গির প্রচলন হওয়ার আগে পর্যন্ত সকলেই তহবন্দ পরিত। সাড়ে চার হাত লম্বা মার্কিন (অধোলাই লংক্লথ) বা নয়ানসুখ (ধোলাই লংক্লথ) কাপড়ের দুই মাথা একত্র জুড়িয়া সিলাই করিলেই তহবন্দ হইত।

ফরাযীদের জন্য এই তহবন্দ পরা বাধ্যতামূলক ছিল। হান্টার সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁর বইয়ের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :

Farazis can be distinguished by their dresses. They do not wear dhuti. He dresses differently from other Musalmans and wraps his dhuti or waiste cloth round his body without crossing it between his legs.

অর্থ : ফরাযীদের তাদের পোপাশাক দেখিয়াই চিনা যায়। অন্যান্য মুসলমানদের থনে তারা ভিন্ন রকমের পোশাক পরে। তারা তাদের ধুতি বা তহবন্দ শরীরের চারিদিকে পঁ্যাচাইয়া পরে, দুই পায়ের ভিতর দিয়া কাপড় পার করায় না অর্থাৎ কাছা দেয় না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আজকাল যেমন শুধু পাড়ওয়ালা কাপড়কেই ধুতি বলা হয়, আগের কালের রেওয়াজ তা ছিল। না। কাছা দিয়া কাপড় পরাকেই তখন ধুতি পরা বলা হইত। আজকাল হিন্দুরা ধুতি পরাকেই কাপড় পরা' বলিয়া থাকেন। তাদের বিচারে প্যান্ট পাজামা পরা আর কাপড় পরা আলাদা ব্যাপার।

আছরউদ্দিন ফরাযী সাহেব ও তার সঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে তহবন্দ পরা চালু করিলেও প্রতিবেশীদের মধ্যে তা চালু করিতে পারেন নাই। আছরউদ্দিন সাহেব শুধু মুখে-মুখেই এ বিষয়ে

প্রচার করিতেন। কাউকে যবরদস্তি করিতেন না। দাদাজীর কাছে শুনিয়াছি তাঁর বাবা আছরউদ্দিন ফরাযী তার নিতান্ত বাধ্য অনুগত এক লোককে বলিয়া-কহিয়া তহবন্দ পরিতে রাজি করিয়াছিলেন। একদিন তহবন্দ পরিয়াই সে তোক তহবন্দ ফেলিয়া আবার ধুতি পরিয়া আছরউদ্দিন সাহেবের কাছে আসেন এবং মাফ চান। ফরাযী সাহেব তাঁকে তম্বি করিলে জবাবে সে লোক কাঁচুমাচু হইয়া বলেন, তহবন্দ পরিয়া রাস্তা চলিতে আমার ভারি শরম লাগে। কারণ কাছা না দিলে মনে হয় আমি কাপড়ের নিচে ন্যাংটা রহিয়াছি।' ফরাযী সাহেব হাসিয়া তহবন্দ পরা হইতে তাকে রেহাই দেন।

আছরউদ্দিন সাহেব তহবন্দ পরার তাকিদ করিলে সাধারণত লোকেরা এই ধরনের জবাব দিত, 'আমরা শরা কবুল করিয়াছি বটে, কিন্তু ফরাযী হই নাই। তহবন্দ পরা শুধু ফরাযীদের কর্তব্য। সব মুসলমানের কর্তব্য নয়। অর্থাৎ জনসাধারণের রায় এই ছিল যে গোড়াতে যে চারজন মওলানা এনায়েত আলী সাহেবের হাতে শরা কবুল করিয়াছিলেন, তাঁরাই ফরাযী এবং তহবন্দ পরা শুধু তাদেরই জন্য বাধ্যতামূলক। যারা পরে ঐ ফরাযীদের হাতে শরা কবুল করিয়াছেন, তাঁরা ফরাযীও নন, তহবন্দ পরাও তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। শুধু তহবন্দ পরার মত শরমের কাজ এবং কারো-কারো মতে শাস্তি হইতে রেহাই পাইবার আশাতেই জনসাধারণ ফরাযী শব্দের এরূপ সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছিল, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালক্রমে এটাই চালু হইয়া গিয়াছিল। এতদঞ্চলে শুধু এই চার পরিবারই ফরাযী বলিয়া পরিচিত। আর কোনো পরিবার এই পারিবারিক পদবি লাভ করে নাই। কোনো বেনামাজি বাবু-কেসেমের লোক হঠাৎ নামাজ ধরিলে, দাড়ি রাখিলে এবং সাদা লুঙ্গি ও লম্বা কোর্তা ধরিলে আজ পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করে, 'লোকটা একেবারে ফরাযী হইয়া গিয়াছে।' এতে মনে হয় ফরাযীরা ধর্মে কর্মে চালে-চলনে এবং পোশাক-পাতিতে গোঁড়া মুসলমান, এ ধারণা তকালেও ছিল।

আছরউদ্দিন ফরাযী ও তাঁর সঙ্গীরা তহবন্দ পরার জন্য লোকজনকে পীড়াপীড়ি না করিলেও লোকজনেরা কিন্তু ফরাযী সাহেবদের অত সহজে ছাড়িয়া দেয় নাই। শরমের খাতিরে লোকেরা নিজেরা ত তহবন্দ পরিতই না, অপরে তহবন্দ পরিয়া রাস্তাঘাটে চলাফেরা করিলেও বোধ হয় তাদের শরম লাগিত। কাজেই ফরাযীরাও যাতে তহবন্দ পরিয়া রাস্তাঘাটে চলাফেরা না করেন, তার চেষ্টা তারা সর্বদাই করিত। তহবন্দ পরাকে তারা নানা প্রকার মুখরোচক, অনেক সময় অশ্লীল রসিকতার দ্বারা আক্রমণ করিত। তহবন্দকে তারা কাপড় না বলিয়া 'চারা গাছের খাঁচা', 'বালিশের ওসার' ইত্যাদি কবিত্বপূর্ণ আখ্যায়িত করিত। ফরাযীরা কাপড়ের নিচে বিলাইর বাচ্চা পোষে', শুনাইয়া-শুনাইয়া এই ধরনের আশালীন রসিকতাও করিত। অপেক্ষাকৃত মুখপোড়া লোকেরা বলাবলি করিত, 'অঙ্গবিশেষ বড় হইয়া যাওয়াতেই ফরাযীরা কাছা দিতে পারে না।'

এসব ত গেল মৌখিক যুলুম। এর উপর ছিল শারীরিক যুলুম। এই যুলুমের সুপ্রচলিত একটা ট্যাকটিকস ছিল এইরূপ : খুব লম্বা সরু বাঁশের আগায় কলকাঠি বাধিয়া লোকেরা রাস্তার ধারের ঝোপে-জঙ্গলে বসিয়া থাকিত। কোনো তহবন্দ-পরা ফরাযী ঐ রাস্তায় চলিবার সময় পিছন হইতে ঐ কলকাঠি তহবন্দের নিচের পারে আটকাইয়া হেঁচকা টান মারা হইত। তাতে ফরাযী সাহেব একেবারে উলঙ্গ হইয়া পরিতেন। দুষ্কৃতকারীরা অট্টহাস্য করিতে করিতে জঙ্গলে লুকাইয়া পড়িত। এসব কথা গ্রামের মাতব্বরদের কানে গেলে তারা বলিতেন যে দুষ্ট ছেলেরাই এসব অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, তাদেরে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু কোনো দুষ্ট ছেলেই শাস্তি পাইত না।

কাজেই বুঝা যাইত, তলে তলে মুরুব্বিদের সমর্থনেই দুষ্ট ছেলেরা এসব দুষ্টামি করিতেছে। স্বয়ং আছরউদ্দিন ফরাযী সাহেবকেও অনেক সময় এসব যুলুমের শিকার হইতে হইয়াছে। কাজেই ফরাযীরা সাবধানতা হিসাবে কোমরে গিরো দিয়া তহবন্দ পরিতে লাগিলেন। গিরো দিয়া তহবন্দ পরায় অতঃপর উলঙ্গ হইয়া পড়ার লজ্জা হইতে তাঁরা রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু কলকাঠির টানে তাদের তহবন্দ ফাঁড়িয়া যাইতে লাগিল। এতেই বোধ হয় দুষ্কৃতকারীদের প্রাণে দয়া হইল। কারণ ফরাযীদের লজ্জা দিয়া তহবন্দ ছাড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তহবন্দ ছিঁড়িয়া তাঁদের লোকসান করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

৬. গাজী সাহেবের প্রত্যাবর্তন

দাদাজীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। সেটা গদর বা সিপাহী বিদ্রোহের মুদ্দত। ঐ সময়ে একদিন গ্রামের উত্তরপাড়ার কয়েকজন তোক একটি কাবুলি পোশাক পরা লোককে আমাদের বাড়িতে নিয়া আসেন। উনিই দাদাজীর বড় ভাই আশেক উল্লা সাহেব। প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিনি দেশ ছাড়িয়াছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরে তিনি কোনো প্রকার চিঠিপত্র বা খবর-বার্তা দেন নাই। গিয়াছিলেন সবেমাত্র দাড়ি-গোঁফ-গজানো তরুণ। আসিয়াছেন কাঁচা-পাকা চাপ দাড়িওয়ালা আধবুড়া মানুষ। কাজেই বড় ভাইকে চিনা দাদাজীর পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। সঙ্গে আসা লোকজনেরা যা বলিয়াছিলেন তা এই : ঐ কাবুলি মার্কা লোকটাকে তাঁরা তাঁদের বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করিতে দেখেন। কৌতূহলী হইয়া তাঁরা কাছে যাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। লোকটি দুর্বোধ্য ভাষায় যা বলেন, সেসব কথার মধ্যে আছরউদ্দিন, আরমান উল্লা, আশেক উল্লা এই তিনটি নাম তাঁরা বুঝিতে পারেন। তাতেই পাড়ার মুরুব্বিদের মনে পড়ে আছরউদ্দিন ফরাযীর জেহাদে যাওয়া ছেলের কথা। আছরউদ্দিন ফরাযীর বড় ছেলে জেহাদে গিয়াছেন, এ কথা এই অঞ্চলে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেরই জানা ছিল। তিনি যখন জেহাদে যান, তখন আছরউদ্দিন ফরাযী সাহেবের বাড়ি উত্তরপাড়া মৌযাতেই ছিল। তারপর তিনি দক্ষিণ দিকে প্রায় আধমাইল দূরে অন্য মৌযায় আসিয়া বাড়ি করেন। এটাই আমাদের বর্তমান বাড়ি। আশেক উল্লা সাহেব স্বভাবতই তা জানিতেন না। সুদূর অতীত বাল্যের স্মৃতির বলেই তিনি সাবেক পৈতৃক ভিটাতে নিজেদের বাড়ি তালাশ করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে আছরউদ্দিন ফরাযী নিজে, তাঁর স্ত্রী এবং দ্বিতীয় পুত্র আরজ উল্লা এন্তেকাল করিয়াছেন। আরজ উল্লা বিবাহের আগেই মারা যান। কাজেই এই সময় ফরাযী বাড়িতে কেবল আমার দাদা আরমান উল্লা, তার স্ত্রী বিবি মহরম, আয়েযুননেছা নামে আট-দশ বছরের এক মেয়ে এবং আবদুর রহিম নামে দুই-এক বছরের একটি ছেলে। বহুদিন পরে পাওয়া বড় ভাইকে আমার দাদাজী আরমান উল্লা অতি আদরে গ্রহণ করিলেন। প্রতিবেশীদের সহায়তায় বাড়ির ভিতরে তার থাকিবার ঘর করিয়া দিলেন।

আশেক উল্লা সাহেব প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর বিদেশ থাকিয়া মাতৃভাষা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। শোনা যায়, তিনি আরবি-ফারসি-উর্দুতে খুব ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দাদাজীর নিকট হইতে এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য খবর সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। দাদাজী নিজে লেখাপড়া জানিতেন না। আমাদের এক আত্মীয় ছিলেন কারী মেয়েযুদ্দিন সাহেব। তিনি গাজী সাহেবের সাথে অনেক দিন কাটাইয়াছিলেন। তাঁর মুখে শুনিয়াছি, তিনি গাজী সাহেবের নিত্য সহচর ছিলেন। ধানীখোলা গ্রামের মৈশাটিকি মৌযার মুনশী আজিম উদ্দিন সাহেবও একজন আলেম

ছিলেন। তিনিও গাজী সাহেবের অন্যতম সহচর ছিলেন। পারতপক্ষে কারী সাহেব ও মুনশী সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া গাজী সাহেব কোথাও সভা করিতে বা বেড়াইতে যাইতেন না। এই কারী সাহেব আমাদের কাছে বলিয়াছেন, গাজী সাহেব আরবি-ফারসি-হিন্দিতে খুব লিয়াকত রাখিতেন। হিন্দি মানে এখানে উর্দু। বর্তমানে আমরা যাকে উর্দু বলি, আমাদের ছেলেবেলায় তাকেই হিন্দি বলা হইত। আমি যখন ছেলেবেলা আমাদের বাড়ির মাদ্রাসায় চাচাজীর কাছে এবং পরে অন্যান্য মৌলবীর কাছে রাহে-নাজাত, তিফতাহুল জান্নাত, ফেকায়ে মোহাম্মদী, দুরাতুন নাসেহীন ইত্যাদি উর্দু কেতাব পড়িতাম, তখনও ঐসব কেতাবকে উস্তাদজিরা হিন্দি কিতাব বলিতেন। মাদ্রাসা ছাড়িয়া যখন মাইনর স্কুলে ইংরাজি পড়া শুরু করি, তখনও আমাদের ক্লাসে অপশনাল বিষয় হিসাবে একটি পুস্তিকা পাঠ্য করা হয়। তার নাম ছিল উর্দু কি পহেলি কিতাব। হিন্দিকে উর্দু বলিতে এই প্রথম শুনি। পুস্তকে উর্দু লেখা থাকিলেও মাস্টার ছাত্র সবাই ওটাকে হিন্দি ক্লাস বলিতাম।

যা হোক, কারী ময়েযুদ্দিন সাহেবের কাছে শুনিয়াছি যে গাজী সাহেব ফারসি ও হিন্দিতে পশ্চিমে চিঠিপত্র লিখিতেন। সেসব চিঠিপত্র অবশ্যই ডাকে যাওয়া আসা করিত না। লোক মারফত যাওয়া-আসা করিত। মোজাহিদদের এ অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। প্রধানত গাজী সাহেবের সাথে সলা-পরামর্শ করিতেই তাঁরা আসিতেন। এঁদের অধিকাংশই পাটনা, কলিকাতা, মালদহ, এমনকি লাহোর, লাখনৌ হইতেও আসিতেন। কথাবার্তা, দেখা-সাক্ষাৎ খুব গোপনেই হইত। কারী সাহেব ও দাদাজীর মতে ঐ সময় কলিকাতা, মালদহ ও রাজশাহীতে কোনো কোনো মোজাহিদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা চলিতেছিল। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানাও ছিল কি না তা দাদাজী বা কারী সাহেব বলিতে পারিতেন না। তবে কারী সাহেব বলিতেন, গাজী সাহেবের মোজাহেদি নাম ছিল মওলানা শিহাবুদ্দিন। ঐ নামেই গাজী সাহেবের নামে পত্রাদি আসিত। গাজী সাহেবের মত সব মোজাহেদিদেরই একটি করিয়া ফী নাম (ছদ্মনাম) ছিল। তথাপি গাজী সাহেব কাউকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ গায়েব হইয়া যাইতেন। সপ্তাহ, মাস এমনকি কখনো-কখনো দুমাস, ছমাস পরে আবার বাড়ি ফিরিতেন। এমন চলিয়াছিল দশ-বার বছর। জীবনের শেষ দিনতক গাজী সাহেবকে সপ্তাহে একবার থানায় হাজিরা দিতে হইত। আমাদের থানা ছিল তখন কোতোয়ালি। তখনও ত্রিশাল থানা হয় নাই। গাজী সাহেব দশ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া কোতোয়ালি হাজিরা দিতে যাইতেন। ভাষার জন্য প্রথম দিকে কিছুদিন তাঁর অসুবিধা হইলেও তা থাকে নাই। আঠার বছরের কওয়া মাতৃভাষা মানুষ ত্রিশ বছরেও ভুলিয়া যাইতে পারে না। অতি অল্প দিনেই গাজী সাহেব মাতৃভাষায় দখল পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন। তখন হইতেই তিনি লোকজনের সাথে পুনরায় মিলা-মিশা করিতে লাগিলেন।

### ৭. গাজী সাহেবের তবলিগ

অল্প দিনেই গাজী সাহেবের অনেক শিষ্য-শাগরেদ জুটিয়া গেল। এদেরে সঙ্গে লইয়া তিনি শরা জারিতে লাগিয়া গেলেন। তিনি জেহাদে যাইবার সময় শরা জারি সম্বন্ধে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার কিছুই তিনি দেখিতেছেন না বলিয়া আফসোস করিতেন। কারী ময়েযুদ্দিন ছাড়া গাজী সাহেবের আরো দুইজন নিত্য সহচরের সঙ্গে আলাপ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। এঁদের মধ্যে একজন আমার দূর সম্পর্কের নানা মুনশী ওয়ালী মাহমুদ মির্যা। আরেকজন আমাদের নিকট প্রতিবেশী ইব্রাহিম শেখ। মির্য়া সাহেব গাজী সাহেবের তালবিলিম’ হিসাবে তার

সাথে-সাথে ঘুরিতেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের বাড়ির মসজিদের ইমাম ছিলেন। আর ইব্রাহিম শেখ ছিলেন গাজী সাহেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র দেহরক্ষী। কিশোর ইব্রাহিম শেখ পুরা ছয় ফুট উঁচা বিশালকায় জোয়ান ছিলেন। গায়ে ছিল তাঁর পাঁচজনের শক্তি। আমাদের আমলে এই ইব্রাহিম শেখ দস্তুরমত বুড়া হইয়া গিয়াছেন। তবু তার বিশাল কায়া দেখিলে ও তাঁর বুলন্দ আওয়াজ শুনিলে ভয় হইত। গ্রামে কথা চলতি ছিল যে, ইব্রাহিম শেখকে দেখিলে ভূতেও ডরায়। এই ইব্রাহিম শেখের মুখে আমরা গাজী সাহেবের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক চাক্ষুষ বিবরণী শুনিয়াছি। আমার দাদাজী, কারী ময়েযুদ্দিন, নানা ওয়ালী মাহমুদ মির‍্যা এবং ইব্রাহিম শেখের নিকট যা-যা শুনিয়াছি তার সংক্ষিপ্তসার এই :

গাজী সাহেব তহবন্দ নিয়া বেশি মাথা ঘামাইতেন না। কারণ নিজে তিনি পাজামা পরিয়া থাকিতেন। আর তত দিনে লোকেরার তহবন্দ-বিদ্বেষ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অনেকেই জুম্মার বা ঈদের দিনে বাড়ি হইতে তহবন্দ পরিয়া রওনা হন। অবশ্য কিছু লোক কাছা দিয়াই মসজিদে বা ঈদের জামাতে আসিত এবং এখানে অযু করার আগে বা পরে কাছা খুলিয়া তহবন্দ পরিত। তেমন লোক আজও আছে। আজকাল যেমন টুপি-ছাড়া নামাজিরা জমাতে শামিল হইয়া কাতারে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে কিশতি টুপি বা রুমাল বাহির করিয়া তাহাই মাথায় চড়ান, তেমনি তৎকালে অনেক লোক কাতারে দাঁড়াইবার পর কাছা খুলিয়া মুছুল্লি হইতেন।

যা হোক, গাজী সাহেব তহবন্দ ফেলিয়া গান-বাজনার উপরই হামলা চালাইলেন বেশি। আছরউদ্দিন ফরাযী সাহেবের আমলে শরা কবুলের শর্ত ছিল চারটি : (১) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে হইবে, (২) রোযায় চোঙা ব্যবহার চলিবে না (৩) কাছা দিয়া কাপড় পরিতে পারিবে না, (৪) গান বাজনা বন্ধ করিতে হইবে।

এসবের মধ্যে গাজী সাহেব গান-বাজনা বন্ধের দিকেই অধিকতর দৃষ্টি দিলেন। ওয়াযের মহফিলে ছাড়া বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়াও তিনি গান-বাজনার কুফল বর্ণনা করিতেন। কিছুকাল প্রচারের পরেও যারা গান-বাজনা ছাড়িল না, তাদের উপর গাজী সাহেব বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যারা ঢোল ডগর বিক্রয় করিয়া ফেলিতে দেরি করিল, গাজী সাহেব লাঠি দিয়া পিটাইয়া তাদের ঢোল-ডগর ভাঙ্গিয়া গুড়া-গুঁড়া করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। গাজী সাহেবের ভয়ে যারা দিনের বেলায় বা নিজ বাড়িতে গান-বাজনা করিত না, তারা গভীর রাতে মাঠে-জঙ্গলে বসিয়া গান-বাজনা করিতে লাগিল। এই ধরনের লোকের বাদ্যযন্ত্র তালাশ করিতে গিয়া গাজী সাহেব এদের বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িতেন। এ কাজ করিতে গিয়া গাজী সাহেব দু'একবার শারীরিক বিপদের সামনে পড়িয়াছেন। সন্দেহজনক লোকের বাড়িতে গিয়া প্রথমে পুরুষ মুরুব্বিদেরে এবং অন্দরে ঢুকিয়া মেয়েদেরে বাদ্যযন্ত্রের কথা পুছ করিতেন। পরিবারের অপরাধীকে ধরাইয়া দিতে স্বভাবতই কেউ রাজি ছিল না। বরঞ্চ ঐ পরিবারের একাধিক লোকই গান-বাজনা করিয়া থাকে। কাজেই। সকলেই একবাক্যে মিছা কথা বলিত। ঐ বাড়িতে বাদ্যযন্ত্র থাকার কথা মুখ পুঁছিয়া না করিত। কিন্তু গাজী সাহেব ত আর নিজের কানকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি গভীর রাত্রে ঐ বাড়িতেই বাজনার আওয়াজ নিজ কানে শুনিয়াছেন যে। কাজেই গাজী সাহেব বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া ঘরে-ঘরে আনাচে-কানাচে উগারের উপর-নিচে ও ডুলি-ডালায় বাদ্যযন্ত্রের তালাশ করিতেন। এক-আধটা বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেলে আর রক্ষা ছিল না। সঙ্গীগণকে ঐ বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিবার আদেশ দিয়া গাজী সাহেব বাড়ির লোকদের

হেদায়েত করিতে লাগিতেন। ভাঙার কাজে কোনোরূপ শৈথিল্য, বিলম্ব অথবা অসম্পূর্ণতা দেখিলে গাজী সাহেব নিজের হাতের লাঠি দিয়া বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিতে শুরু করিতেন। বাদ্যযন্ত্রকে বাদকেরা যে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, সে জ্ঞান। গাজী সাহেবের ছিল না। নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিতে দেখিয়া দু'একবার দু'এক তরুণ যুবক আত্ম-সম্বরণ করিতে পারে নাই। বেহুঁশ হইয়া গাজী সাহেবকে তারা আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। উপস্থিত লোকজন গাজী সাহেবকে রক্ষা করিয়াছে। নইলে দু-একবার তিনি নিশ্চয়ই আহত হইতেন।

৮. গাজী সাহেবের জনপ্রিয়তা

শরা-শরিয়ত সম্বন্ধে গাজী সাহেব এমন কড়া, সুতরাং আন-পপুলার হওয়া সত্ত্বেও অন্য দুই-একটি কারণে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি গ্রামের যুবকদেরে কুস্তি-কসরত ও লাঠি-তলওয়ার খেলা শিখাইতেন। লাঠি ও তলওয়ার খেলার একটা উস্তাদির নমুনা ছিল এইরূপ :

গাজী সাহেব লাঠি বা তলওয়ার হাতে এক জায়গায় দাঁড়াইতেন। তাঁর চারপাশে আট-দশ হাত দূরে-দূরে চারজন লোক দাঁড়াইত। তাদের এক-এক জনের কাছে এক-এক ধামা বেগুন। চারদিক ঘিরিয়া পাঁচ গাঁয়ের লোক ভিড় করিয়া তামাশা দেখিত। ধামাওয়ালা চারজন লোক ক্ষিপ্ত হস্তে একযোগে গাজী সাহেবের মাথা হইতে কোমরের উপর পর্যন্ত শরীর সই করিয়া বেগুন ছুড়িতে থাকিত। গাজী সাহেব কখনও শুধু লাঠি বা শুধু তলওয়ার, কখনো বা এক হাতে লাঠি এক হাতে তলওয়ার লইয়া একই জায়গায় দাঁড়াইয়া চরকির মত ঘুরিতেন এবং লাঠি বা তলওয়ার অথবা লাঠি ও তলওয়ার ঘুরাইতেন। দর্শকেরা বিস্ময়ে দেখিত, একটি বেগুনও গাজী সাহেবের গায়ে লাগে নাই। লাঠি বা তলওয়ারে ঠেকিয়া বেগুনগুলি মাটিতে পড়িয়া যাইত। ধামাওয়ালাদের ধামার বেগুন শেষ হইলে গাজী সাহেব তার হাতের লাঠি বা তলওয়ার ঘুরানো বন্ধ করিতেন। তখন সকলে মিলিয়া একটা-একটা করিয়া দেখিত যে তলওয়ারে লাগা বেগুনগুলি সব দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে, আর লাঠিতে লাগা বেগুনগুলিতে লাঠির দাগ পড়িয়াছে। এইরূপ উস্তাদির জন্য জনসাধারণের কাছে, বিশেষত যুবকদের কাছে, গাজী সাহেবের জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল। গাজী সাহেবের হুকুমে জান দিবার জন্য তৈয়ার ছিল গাঁয়ের শত-শত যুবক। কিছুকাল পরে পুলিশ নাকি তলওয়ার খেলা নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। কাজেই গাজী সাহেব আর তলওয়ার ব্যবহার করিতেন না। শুধু লাঠি খেলিয়া এই উস্তাদি দেখাইতেন। তলওয়ারের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে গাজী সাহেব অগত্যা রাম। দাও দিয়া সে খেলা দেখাইতেন। কিন্তু তাতে দর্শকদের মন ভরিত না।

শাগরেদদের ও স্থানীয় যুবকদের কাছে গাজী সাহেবের জনপ্রিয়তার আরো অনেক কারণ ছিল। তারা বিশ্বাস করিতেন, গাজী সাহেব জিন-পরি পালিতেন। তাঁদের মধ্যে আমার ছেলেবেলায় যাঁরা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁদের অনেকেই নিজের চক্ষের দেখা বলিয়া অনেক নজির দিতেন। এঁদের মধ্যে পূর্ব-বর্ণিত কারী ময়েযুদ্দিন সাহেব, আমার দূর সম্পর্কের এক দাদা রমজান আলী শাহ ফকীর, আমার দূর সম্পর্কের এক নানা পূর্ব-বর্ণিত ওয়ালী মাহমুদ মির্যা, আমাদের নিকট প্রতিবেশী বাবুজান শেখ, শরাফত শেখ ও পূর্ব-বর্ণিত ইব্রাহিম শেখ প্রভৃতি আরো অনেকে এই ধরনের মাযেজার সাক্ষ্য দিতেন। কোনো দিন পথ চলিতে-চলিতে গাজী সাহেব ওয়ালায়কুমুস সালাম বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেন এবং অদৃশ্য লোকের সাথে হাল-পুর্সি করিতেন। কথা শেষ করিয়া আসোলামু আলায়কুম বলিয়া আবার পথ চলিতে শুরু করিতেন। তা না করা পর্যন্ত সঙ্গী-সাথিরা কেউ কথা

বলিতে পারিতেন না। আবার কোনো দিন সঙ্গী-সাথিদেরেও জিন দেখাইতেন। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা বড় বটগাছতলায় দাঁড়াইয়া পড়িতেন। সঙ্গীদেরে বলিতেন, তোমরা যদি জিন দেখিতে চাও তবে এক-একজন গাছের একটি করিয়া পাতা একটানে ছিঁড়িয়া আনো। সকলে এক-একটা পাতা হাতে গাজী সাহেবের সামনে দাঁড়াইতেন। তিনি এক-এক করিয়া সকলের পাতায় শাহাদত আঙুল দিয়া কী যেন লিখিতেন ও ফুঁ দিতেন। যার তার পাতা যার তার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিতেন, 'এক ধ্যানে পাতার দিকে চাহিয়া থাকো, মনে মনে সোবহানাল্লাহ পড়িতে থাকো। সাবধান, আমার হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত চোখ তুলিয়ো না বা অন্য দিকে নজর ফিরাইয়ো না।' সকলে তা-ই করিতেন। কী তাজ্জব। সকলে দেখিতেন বিরাট ধুমধাম ও শান-শওকতের সাথে একটা নবাব-জমিদারের বিয়ার মিছিল যাইতেছে। সকলে অবাক বিস্ময়ে ঐ মিছিল দেখিতেছেন। অমন সময় গাজী সাহেব বলিয়া উঠেন, "তোমরা চোখ তোলো। সকলে দেখিলেন, চারিদিকে ফাঁকা। যে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানেই দাঁড়াইয়া আছেন।

এসব কাহিনীর নির্ভরযোগ্য কোনো সাক্ষী পাওয়া যাইত না। যাকে আমরা জীবনে মিথ্যা বলিতে দেখি নাই, সেই দাদাজী আরমান উল্লা ফরাযী কখনো তার বড় ভাইয়ের এইসব মাযেজার সাক্ষ্য দিতেন না। দাদাজীর সত্যবাদিতারও আমি খুব বড় সাক্ষী নই। কারণ আমার বয়স যখন মাত্র ষোল বছর, সেই ১৯১৩ সালেই দাদাজী এন্তেকাল করেন। কিন্তু তার সমবয়সীরাও বলিতেন, দাদাজীকে মিথ্যা কথা বলিতে তারাও দেখেন নাই। দাদাজী খুব দৃঢ়তার সাথেই এই বলিয়া বড়াই করিতেন, 'আমি জীবনে কোর্টে সাক্ষ্য দেই নাই। আমার ন পুস্তের মধ্যে কেউ দিয়াছেন বলিয়াও শুনি নাই। তারা সাক্ষ্য দিতেন না মানে মামলার কোনো পক্ষই তাঁদেরে সাক্ষী মানিত না। দাদাজী বলিতেন, কথাটা সত্যও, যে মামলার পক্ষেরা কেউ সত্য কথা বলিবার জন্য সাক্ষী মানে না। যার-তার পক্ষে কথা বলিবার জন্যই মানে। যা হোক, আমার দাদাজী গাজী সাহেবের উপরিউক্ত মাযেজার একটাও সাক্ষী ছিলেন না। অন্য লোকের মুখে শুনিয়া দাদাজীকে জেরা করিলে তিনি বলিতেন, তিনি নিজে ও সব কিছু দেখেন নাই। বড় ভাইয়ের বুযুর্গির কোনো হানি না হয়, সে উদ্দেশ্যেই বোধ হয় বলিতেন, 'আমি মিয়া ভাইর সাথে খুব কমই বেড়াইতে বাহির হইতাম।'

কিন্তু সাক্ষীদের সকলেই কমবেশি আলেম ছিলেন। প্রতিবেশী বুড়া মুরুব্বিদেরও অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ ছিল না। একমাত্র উক্ত শাহ রমজান আলী ফকির ছাড়া আর কেউই পীরগিরি ব্যবসাও করিতেন না। রমজান আলী শাহ ফকির সাহেব শুধু পীরগিরি ব্যবসাই করিতেন না; তিনি নিজেও জিন-পরি পালেন বলিয়া দাবি করিতেন। তিনি আমাদের বাড়িতে প্রায়ই মেহমান হইতেন, আমাদের কাছে বড়াই করিতেন, তার অধীনে এমন শক্তিশালী জিন আছে, যে তার হুকুমে পুকুরপাড়ের ঐ কাঁঠালগাছটা উখড়াইয়া ছুড়িয়া ঐ দূরে ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু আমাদের হাজার আবদার অনুরোধেও তিনি কোনো দিন তাঁর জিন দিয়া কাঁঠালগাছ উখড়ান নাই।

জিন-পরি-ভূত-প্রেতে লোকেরা আজও বিশ্বাস করে। আগে আরো বেশি বিশ্বাস করিত। আগেকার জনসাধারণের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার লেভেল বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই গাজী সাহেব সম্বন্ধে ঐ সব কিংবদন্তির উল্লেখ করিলাম।

৯. গাজী সাহেবের বিবাহ ও সন্তানাদি

গাজী সাহেব ১৮/২০ বছর বয়সে ১৮২৭/২৮ সালে মোজাহেদ বাহিনীতে যোগ দেন। ত্রিশ-বত্রিশ বছর পরে প্রায় ১৮৬০ সালের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে কমবেশি পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ বাড়ি ফিরিয়া আসেন। আমার দাদাজী ও গাজী সাহেবসহ আমাদের পূর্বপুরুষেরা সবাই কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। কিন্তু সবাই আমারই মত লম্বা ছিলেন। পরিমাণমত মোটাসোটা, উঁচা-নাক, চাপ দাড়িওয়ালা ছিলেন। গাজী সাহেব ব্যায়ামবীর ও যোদ্ধা হওয়াতে তিনি দেখিতে আরো বলিষ্ঠ এবং সুপুরুষ ছিলেন। সেইজন্য ঐ পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাকে বুড়া দেখাইত না। মাথার চুল ও দাড়ি-মোচে বেশ পাক ধরিয়াছিল বটে, তবে খুব কাছে না গেলে তা দেখাই যাইত না।

কাজেই স্বয়ং দাদাজী, আত্মীয়-স্বজন ও শিষ্য-শাগরেদরা সবাই ধরিলেন তাঁকে বিয়া করিয়া সংসারী হইতে। তিনি অনেক ওযর-আপত্তি দেখাইয়া, এমনকি নিরাপত্তার অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়া, ঘন ঘন তাঁর আত্মগোপনের হেতুর দিকে ইশারা করিয়া অনেক দিন বিয়া ঠেকাইয়া রাখিলেন। আনুমানিক পাঁচ-ছয় বছর পরে তিনি বিয়া করিলেন। বিয়া করিলেন এক শাগরিদের মেয়েকে। তাঁর বাড়ি ছিল ফুলবাড়িয়া থানার পশ্চিম সীমান্তে বালাশর নামক গ্রামে। অন্তরঙ্গ শাগরিদরা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, শাহাদাঁতের পবিত্র ময়দানে বালাকুটের নামের সাথে এই গ্রামের মিল আছে বলিয়াই গাজী সাহেব সেখানে বিয়া করিতে রাজি হইয়াছেন।

যা হোক, ঘরে ভাবি আনিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাদাজী পৈতৃক ভূসম্পত্তির (তত্ত্বালে প্রায় ২শ বিঘা) অর্ধেক ভাগ করিয়া বড় ভাইকে দিয়া দিলেন। সেই জমি চাষাবাদ করিবার জন্য ভাল-ভাল বর্গাদারও ঠিক করিয়া দিলেন তিনিই। গাজী সাহেবের থাকিবার জন্য দাদাজী আগেই ভাল একটি ঘর করিয়া দিয়াছিলেন। এখন পৃথক পাকঘরও বানাইয়া দিলেন। দাদাজীর নিজের দুই-তিন জোড়া হাল ও দরকারমত বছরিয়া কামলা ছিল। দাদাজী তাদের সঙ্গে লইয়া হাল-চাষাবাদ, গৃহস্থের সব কাজকর্ম নিজে করিতেন। কিন্তু গাজী সাহেব ঐসব কিছুই পারিতেন না বলিয়া সব জমি বর্গাপত্তন দিয়া দিলেন। কিন্তু গাজী সাহেব এর পরেও প্রায়শ কাউকে না বলিয়া নিরুদ্দেশ হইতেন বলিয়া গাজী সাহেবের সংসারের হাট-বাজারটাও দাদাজীকেই করিয়া দিতে হইত।

এই বিয়ার ঘরে প্রথমে ফাতেমা নাম্নী একটি মেয়ে হইল। কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় প্রসবের সময় একটি পুত্রসন্তানসহ গাজী সাহেবের বিবি সাহেবও এন্তেকাল করিলেন। গাজী সাহেব দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে রাজি হইলেন না। ইতিমধ্যে দাদাজীর ঘরে যমিরুদ্দিন ও ছমিরুদ্দিন নামে আরো দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন। গাজী সাহেব দ্বিতীয়বার বিয়া না করার আরো একটি যুক্তি পাইলেন। দাদাজীকে বলিলেন, খোদার রহমতে তোমারই যখন তিনটি পুত্র হইল তখন এরাই আমাদের খান্দানের নাম রাখিবে। আমার আবার বিয়ার দরকার নাই। দাদাজী ও আত্মীয়-স্বজনের উপরোধ এড়াইবার জন্যই যেন গাজী সাহেব এবার বেশ কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হইলেন।

গাজী সাহেব মাঝে-মাঝে নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় যান প্রায় সবাই তা অনুমান করিতে পারিতেন। কারণ অতীতে অনেকবার এমন ঘটিয়াছে। তাঁর যাওয়ার স্থান ছিল সাধারণত মোজাহেদ ভাইদের বাড়ি। দাদাজীর মুখে ছেলেবেলা এইসব মোজাহেদ ভাইদের নাম প্রায়ই শুনিয়াছি। এখন আর সকলের নাম-ঠিকানা মনে নাই। যে কয়জনের নাম মনে আছে, তাঁদের মধ্যে আটিয়া (বর্তমান

টাঙ্গাইল) মহকুমার দেলদুয়ারের মৌ, ইব্রাহিম, আকালুর খোন্দকার যহিরুদ্দিন ও জামালপুর মহকুমার নূর আলী তরফদারের নাম মনে আছে। নূর আলী সাহেব জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন। কাজেই তিনি দেশে আর ফিরিয়া আসেন নাই। খোন্দকার যহিরুদ্দিন বোধ হয় পুলিশের ধাওয়ায় আকালু ত্যাগ করিয়া জামালপুরের বানেশ্বরদী গ্রামে চলিয়া আসেন এবং সেখানেই বিয়া-শাদি করিয়া বসবাস করিতে শুরু করেন। শহীদ নূর আলী সাহেবের এক পুত্র ছিলেন। তিনি তখন বিবাহ করিয়াছিলেন। কাজেই গাজী সাহেবের যাওয়ার স্থান ছিল আটিয়ার একটি : মৌ. ইব্রাহিমের বাড়ি, আর জামালপুরে দুইটি : খোন্দকার যহিরুদ্দিনের এবং নূর আলী তরফদারের বাড়ি। দাদাজী ও আত্মীয়েরা এসব জায়গায় খোঁজ করিতেন না, শুধু অনুমান করিতেন। তৎকালে খোঁজখবর লওয়ার ও যাতায়াতের মোটেই সুবিধা ছিল না। কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকিয়া গাজী সাহেবই ফিরিয়া আসিয়া এই সব ও অন্যান্য জায়গার নাম করিতেন।

বেশ কিছুদিন পরে এবার ফিরিয়া আসিলে দাদাজী ও আত্মীয়-স্বজনেরা একরূপ জোর করিয়া আমাদের পুরাতন আত্মীয় ফুলবাড়িয়া (বর্তমানে ত্রিশাল) থানার মাগুরজোড়া গ্রামের মৌ. আহসানুল্লাহ সাহেবের এক বোনের সাথে বিয়া দেন। গাজী সাহেবের এই বিয়া স্থায়ী হয়। এই ঘরে জাফর নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গাজী সাহেবের দেশ ভ্রমণের বাতিকও দূর হয়। গাজী সাহেব বিবাহিতা কন্যা ফাতেমা ও নাবালক পুত্র জাফর সাহেবকে রাখিয়া অনুমান ষাট বছর বয়সে এন্তেকাল করেন। তৎকালে বয়স আন্দাজ-অনুমান করিয়াই বলা হইত। তেমন অনুমানের কতকগুলি অবিস্মরণীয় ঘটনাকেই হিসাবের খুঁটি ধরা হইত। যেমন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১২৭৬ সালের আকাল), গদর (সিপাহী বিদ্রোহ ইং ১৮৫৮ বাং ১২৬৫), বালাকুটের জেহাদ (বাং ১২৩৮ ইং ১৮৩১), তিতুমীরের লড়াই (১৮৩১ ইং) ইত্যাদি। দাদাজীর জন্মতারিখও এ ধরনে হিসাব করা হইত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে বাপজী ও চাচাজীর কুষ্ঠি ছিল। দাদাজীর বন্ধু এক বামন ঠাকুর নাকি ঐ কুষ্ঠি তৈয়ার করিয়াছিলেন। চাচাজী নজুমিকে কুফরি বলিতেন। কিন্তু নিজের কুষ্ঠিটি তিনি ছিঁড়িয়া ফেলেন নাই। গণক ছাড়া কেউ কুষ্ঠি পড়িতে পারিতেন না। তবে জন্ম-মৃত্যুর সন বুঝা যাইত। কুষ্ঠি অনুসারে বাপজীর জন্ম ১২৬৫ সন ও চাচাজীর জন্ম ১২৭২ সন। বাপজী ১৩৪১ সালে ইং ১৯৩৪ সালে ৭৯ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। চাচাজী ৮৫ বৎসর বয়সে ১৩৫৭ সালে (ইং ১৯৫০) এন্তেকাল করেন। দাদাজীর কোনো কুষ্ঠি ছিল না। নিজের জন্মতারিখ তিনি বলিতে পারিতেন না। তবে তিনি তাঁর বয়স পঁচানব্বইর কাছাকাছি দাবি করিতেন। ১৯১৩ সালে এন্তেকালের সময় দাদাজী আমাদের অঞ্চলে সর্বজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ ছিলেন। গদরের (সিপাহী বিদ্রোহের) দুই-তিন বছর পর গাজী সাহেব যখন দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন দাদাজীর বয়স প্রায় চল্লিশ ছিল, এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। এই হিসাবে দেখা যায়, আমার পূর্বপুরুষের সকলেই মোটামুটি দীর্ঘায়ু ছিলেন। দাদাজী বলিতেন, তাঁর বাবা আছরউদ্দিন ফরাযী সাহেবও সত্তরের অধিক বয়সে মারা যান। আমার একমাত্র ফুফু আয়েযুননেসা দুইবার সন্তানহীন অবস্থায় বিধবা হওয়ার পর আর বিবাহ বসেন নাই এবং শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেই থাকেন। তিনি কমবেশি তিরানব্বই বৎসর বয়সে ১৩৫০ সালে (ইং ১৯৪৩) এন্তেকাল করেন।

গাজী সাহেবের এন্তেকালের কয়েক বছর পরে তার একমাত্র পুত্র জাফর সাহেব নওগাঁ (আসাম) চলিয়া যান। দেশভাগ হওয়ার আগেত বছরে দু'বছরে একবার জাফর চাচা আমাদেরে দেখিতে আসিতেন। তিনি তখন খুব অবস্থাশালী মাতব্বর 'গা বুড়ো' ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে আসামেই

এন্তেকাল করিয়াছেন বোধ হয় প্রায় আশি বছর বয়সে। আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য, দুই-একবার বড়দের জন্যও, এন্ডিমুগার কাপড় ও অন্যান্য উপহার আনিতেন। বর্তমানে (১৯৬২) তার ছেলেরা শিক্ষিত ও অবস্থাশীল ভারতীয় নাগরিক।

আছরউদ্দিন ফরাযী সাহেবের তিন পুত্র হওয়ার পর চতুর্থ সন্তান হয়। একটি মেয়ে। এই মেয়ে প্রসব করিয়াই আছরউদ্দিন সাহেবের বিবি এন্তেকাল করেন। আছরউদ্দিন সাহেব এর পরেও বহুদিন বাঁচিয়া ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নাই। নবজাত শিশুকন্যাকে তিনি তাঁর বিশেষ বন্ধু কাজীর শিমলা গ্রামের জানু খোন্দকার সাহেবের কাছে পোষ্য দেন। জানু খোন্দকার সাহেবের কোনো সন্তানাদি না থাকায় বন্ধুর মেয়েকে পোষ্য নিয়াছিলেন। কিন্তু পোয্য নেওয়ার কয়েক বছর পরেই তার এক পুত্রসন্তান। লাভ হয়। ইনিই কাজীর শিমলা গ্রামের খোন্দকার মিজানুর রহমান। জানু খোন্দকার সাহেব তার পালিত কন্যাকে যথাসময়ে নিজের আত্মীয়ের মধ্যে যোগ্য ঘরে পাবনা জিলার চৌহালী গ্রামের খোন্দকার বাড়িতে বিবাহ দেন। সেখানে আমার উক্ত দাদির এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্র খোন্দকার আলাউদ্দীন আহমদ বিখ্যাত আলেম ও ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ছিলেন। ভাইবোন উভয়েরই বংশধরেরা আজিও সুখে-সম্মানে বাঁচিয়া আছেন।

## ০২. জন্ম ও শৈশব

## অধ্যায় দুই – জন্ম ও শৈশব

### ১. জন্ম

বাংলা ১৩০৫ সালের ১৯ ভাদ্র (ইং ১৮৯৮, ৩ সেপ্টেম্বর) শনিবার ফযরের ওয়াতে আমার জন্ম। আমি বাপ-মার তৃতীয় সন্তান। আমাকে পেটে লইয়াই মা গুরুতর অসুখে পড়েন। সে রোগ দীঘস্থায়ী হয়। আমার জন্মের অনেক দিন পরে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। কয়েক দিন স্থায়ী বেদনার পরে আমি ভূমিষ্ঠ হই এবং প্রসবের পরেই মা অজ্ঞান হইয়া পড়েন। আগের দুই প্রসবে মার কোনোই কষ্ট হয় নাই। কাজেই আমার প্রসবের সময়কার মার। এই কষ্ট ও এই অজ্ঞান হইয়া পড়াকে বাড়ির সকলে অশুভ লক্ষণ মনে। করেন। মা শ্বশুর-শাশুড়ির আদরের বউ ছিলেন। মার জন্য সকলে কান্নাকাটি জুড়িয়া দেন।

এদিকে দাই আমাকে প্রসব করাইয়া ঘোষণা করে যে মৃত সন্তান হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় দাইদের অমন কথায় কেউ বিশ্বাস করিতেন না। নিজ চক্ষে সন্তান দেখিবার জন্য সবাই উদ্বিগ্ন হইতেন। কিন্তু আদরের বড় বউয়ের মরা-বাঁচা লইয়া সবাই এত ব্যস্ত ছিলেন যে মরা সন্তান দেখিবার জন্য কেউ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কাজেই মরা সন্তানটিকে যথাসময়ে দাফন-কাফন করা সাপেক্ষে আমাকে একটি সুপারির খোলে ঢাকা হয় এবং বাইরে ফেলিয়া রাখিলে কাক-কুকুরে নিয়া যাইতে পারে বলিয়া ঘরের এক অন্ধকার কোণে রাখা হয়।

মেয়ের অন্তিম অবস্থায় খবর পাইয়া আমার নানা মেহের উল্লা ফরাযী আসেন মেয়েকে দেখিতে। নানাজী গৌরবর্ণ দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর চাপদাড়ি ও সুউচ্চ বাঁশির মত নাকটা দেখিবার মত ছিল। নাকের আগাটা ময়না পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা ছিল। নানার মুখে শুনিয়াছি তাঁর বাবা মহব্বত উল্লা ফরাযী আরো গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর নাকটা নাকি আরো সুন্দর ছিল। যা হোক, নানাজী ছিলেন এ অঞ্চলে ডাকসাইটে ধানুরি (ধন্বন্তরি) কবিরাজ। তিনি মেয়েকে দেখিয়া-শুনিয়া এবং তয়-তদবিরের পরামর্শ দিয়া মরা নাতিটি দেখিতে চাহিলেন। তাঁকে ঘরের কোণে রাখা সুপারির খোলটি দেখাইয়া দেওয়া হইল। নানাজী সুপারির খোলটি খুলিয়া আমাকে দেখিলেন। নাড়ি ও বুক পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করিলেন, সন্তানের জান এখনও কবয হয় নাই, যত্ন-তালাফি করিলে এখনও বাঁচিবার আশা আছে। আমার দাদি নানাজীর কথায় দাইকে লইয়া তদবির-তালাফির কাজে লাগিলেন। নানাজীর কথামত কিছুক্ষণ তালাফি করিবার পরই আমি কাঁদিয়া উঠি। নানাজী আমার কানে কলেমা তৈয়ব বারবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বাড়িময় এবং শেষে পাড়াময় চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। নানাজীর প্রশংসায় দেশ ফাটিয়া যায়। তিনি জিন পালিতেন, এ ধারণা লোকের আগেই ছিল। এবার প্রমাণ হইল তিনি মরা মানুষও বাঁচাইতে পারেন। আমার জ্ঞান হইবার পরও বহুদিন দাদি-ফুফু-চাচি এই গল্প করিতেন। বলিবার সময় দাদির নিজের এবং আমার মারও চোখ পানিতে ছলছল করিয়া উঠিত। আমি নিজেও খুব পেট-কান্দুয়া ছিলাম, অর্থাৎ কথায়-কথায় কাঁদিয়া ফেলিতাম। আমিও ঐ গল্প শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। দাদি-ফুফু বা মা যাকে হাতের কাছে

পাইতাম, তাঁরই কোলে মাথা লুকাইয়া ফ্যাক-ফ্যাক করিয়া কাঁদিতে থাকিতাম। মার কাছে ছিল এসবই শোনা কথা। কারণ, এসব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাঁর অজ্ঞান অবস্থাতেই। তবু তিনি বহুবার ঐ শোনা কথা বহু মেয়েলোকের কাছে আবৃত্তি করিয়াছেন। আমি কাছে থাকিলে আমাকে বুকে জড়াইয়া বলিতেন, আল্লা আমার হারানো মানিক ফিরাইয়া দিয়াছে।

২. স্বাস্থ্য ও ভাগ্য

আমার স্বাস্থ্য বরাবর খারাপ ছিল। প্রধান কারণ মার দুধ পাই নাই। আমার জন্মের পর পুরা এক বছর মা অসুস্থ থাকেন। গরুর দুধ ও ভিমটা কলাই ছিল আমার একমাত্র খাদ্য। বোধ হয় এ কারণেই আমার পেটের অসুখ সর্বদা লাগিয়াই থাকে। ফলে আমার শরীর স্বাভাবিক পুষ্টি লাভ করে নাই। দূর হইতে আমার বুকের ও পাঁজরার হাড়ি গোনা যাইত। হাত-পা লম্বা লম্বা শুকনা কাঠি আর মাথাটা ইয়া বড়। দাঁড়াইলে মনে হইত ঝাঁটার শলার আগায় একটা বেগুন গাঁথিয়া খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। বস্তুত, এই উপমাটাও লোকজনের দেওয়া। এইরূপ স্বাস্থ্য ও জন্মের সময়কার ঐ অনৈসর্গিক ঘটনার জন্য আমার মুরুব্বিরা আমার জীবন সম্পর্কে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন। তারা প্রায়ই বলিতেন, "এটা কি বাঁচিবে? মায়া বাড়াইয়া কোনো দিন না কোনো দিন আমাদেরে কান্দাইয়া চলিয়া যাইবে। মুরুব্বিদের এই সন্ত্রাস আরো বাড়াইবার জন্যই বোধ হয় আমার শরীরের উপর দিয়া ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইত। মরিতে-মরিতে বাঁচিয়া উঠিতাম।

আমাদের অঞ্চলেও তৎকালে অনেক গণক ঠাকুর ছিলেন। বাপ-মা আদরের ছেলেপিলে দেখিলেই গণক ঠাকুরেরা যা যা বলিয়া থাকেন, আমার বেলায়ও তা-ই বলিলেন। তারা আমার হাত দেখিয়া বলিলেন, ছেলের কপালে রাজটিকা আছে। বাঁচিয়া থাকিলে এ ছেলে কোনো দিন দেশের রাজা হইবে। কিন্তু এর ভাগ্যে বড় বড় ফাড়া আছে। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিলেই সেসব ফাড়া কাটিয়া যাইবে।

রাজভাগ্য ও ফাড়া গণকদের মুখে অবিচ্ছেদ্য। এটাই তাদের স্টক-ইন ট্রেড। কারণ, এ দুইটি কথায় কোনো বাপ-মার মন স্থির থাকিতে পারে? কোনো কৃপণ মা-বাবার টাকার থলির মুখ এর পরেও বন্ধ থাকিতে পারে? বলেন, গণক ঠাকুর ঐ যে কী বলিলেন ওটা করিতে কত খরচ লাগে? খরচ? খরচ আর এমন বেশি কী? একরূপ কিছুই লাগিবে না। কিন্তু ছেলেটার জন্ম শনিবারে কিনা। তাই শনি ও রাহু এই দুইজনে প্রতিযোগিতা করিয়া ছেলেটার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। কে কার আগে বেশি অনিষ্ট করিতে পারে? কাজেই দশ-বার টাকা লাগিয়া যাইবে। কঠিন স্বস্ত্যয়ন কিনা। আরেক গণক আসিয়া বলিলেন, দশ টাকা লাগিবে কেন? কোন গণক বলিয়াছে শনি এ ছেলের দুশমন? সে গণকই নয়। এ ছেলের জন্ম যখন শনিবারে তখন স্বয়ং শনিই এর রক্ষক: যেমন চোরের হেফাযতে ধন রাখা। যে চুরি করিবে সেই চোরই যদি হয় পাহারাদার, তবে সেটা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? শনি এই ছেলের রক্ষক হওয়ায় স্বয়ং বৃহস্পতি এই ছেলের প্রতি অনুকম্পা করিবে। কাজেই এই ছেলে বিদ্যার সাগর ও বুদ্ধির রাজা হইবে। তবে যেসব ছোটখাটো গ্রহের কুদৃষ্টি আছে, সেগুলি কাটাইতে হইবেই। তাতে চার টাকার বেশি খরচ লাগিতে পারে না।

এই গণক ঠাকুরই ভাল। বুঝেও ভাল, অথচ সস্তাও। আমার দাদি, মা ও বাড়ির মেয়েদের সকলেরই ইচ্ছা হইত, সস্তায় আমার সব ফাড়া কাটাইয়া আমার রাজভাগ্যের আকাশটা একদম মেঘশূন্য করিয়া রাখিতে। তলে-তলে বাপজীরও সমর্থন ছিল। কিন্তু দাদাজী ও চাচাজীর জন্য কিছু করা

সম্ভব ছিল না। তারা দুইজনই ছিলেন একদম পাক্কা ফরাযী। হাদিস-কোরআনের বাহিরে কোনো কথা বলা বা কাজ করা তাদের দ্বারা ত কল্পনাও করা যাইত না। অপরেও তাদের সামনে করিতে পারিতেন না। ফলে আমার জীবনের ফাড়াকাটাইবার জন্য গণকদের কথিত কোনো বেশরা কাজ হইল না বটে, তবে প্রচুর তাবিজ-কবচ দেওয়া হইতে লাগিল।

৩. রোগ ও চিকিৎসা

আমার দাদির মামু মফিজুদ্দিন আখন্দ ও খালাতো ভাই রমজান আলী শাহ ঝাড়-ফুঁক তুকতাক ও তাবিজ-কবচের ব্যবসা করিতেন। রমজান আলী শাহ জিন-পরি পালিতেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। এই দুইজনই একত্রে এবং পৃথক পৃথকভাবে আমাকে অনেক ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবচ দিয়াছেন। ঐ সব তাবিজ-কবচে কোনো কুফরি কালাম ইস্তেমাল করা হয় নাই, এই সম্পর্কে আমার মুরুব্বিরা নিশ্চিত হইয়া লইতেন। আখন্দ সাহেব বলিতেন, তিনি তাঁর তাবিজে কালামুল্লার আয়াত ও আরবি হরফ ছাড়া কিছু ব্যবহার করেন না। আর শাহ সাহেব? তিনি আখন্দ সাহেবের এক ডিগ্রি উপরে যাইতেন। তিনি দেখাইতেন যে তিনি বোখারার কাগজের উপর যাফরানের কালিতে যইতুন কাঠের কলমে তাবিজ লিখিয়া থাকেন। এঁরা দুইজনই ছিলেন হানাফি। কাজেই এরা পীর-মুরিদির ব্যবসা করিতেন। আমার মুরুব্বিরা মোহাম্মদী। পীর-মুরিদির তারা ঘোর বিরোধী। কাজেই একজন দাদাজীর মামাশ্বশুর ও আরেকজন শালা হওয়া সত্ত্বেও তাদের দেওয়া তাবিজ-কবচ সম্পর্কে এত সাবধানতা অবলম্বন করা হইত। তবু এই দুইজন মিলিয়া আমাকে এত তাবিজ-কবচ দিয়াছিলেন যে আমার গলা, কোমর ও দুই বাহুতে তিল ধারণের জায়গা থাকে নাই।

পেটের পীড়া ও হাড্ডিসার দেহ ছাড়া আমার আরো দুইটা বড় রোগ ছিল। আমার উপরিউক্ত দুইজন চিকিৎসক এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, শেষোক্ত দুইটাই আমার আসল রোগ। প্রথমোক্ত দুইটা শেষোক্ত দুইটার কুফল মাত্র। আমার রোগ দুইটি ছিল এই : (১) আমি নিদ্রাচর বা সমনামবুলিস্ট ছিলাম। আমি ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতাম। বরাবর রাত্রেই এটা হইত। মাত্র দুইবার দিনের বেলা হইয়াছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় আমি বাড়ির বাহিরে অনেক দূরে চলিয়া যাইতাম। আমি শৈশবের শেষ পর্যন্ত বাপ-মার সাথে একই বিছানায় শুইতাম। আমাদের বাড়ির নিয়ম ছিল শুধু নবজাত শিশুই বাপ-মার বিছানায় থাকিতে পারিত। তার বড়রা দাদির ঘরে তার বিছানায় যাইত। এই হিসাবে আমার ছোট ভাইয়ের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমার দাদির বিছানায় যাওয়ার কথা। কিন্তু আমার বেলা তা হয় নাই। আমার ছোট ভাই ও বহিন এক-এক করিয়া বছরখানেক বয়সেই মার বিছানা ছাড়িয়া দাদির বিছানায় চলিয়া গেল। কিন্তু আমি মার কাছেই থাকিয়া গেলাম।

৪. নিদ্রাচর

আমার বাপ-মা দুজনই ঘুমে খুব হুশিয়ার ছিলেন। অর্থাৎ ঘুম তাদের খুব পাতলা ছিল। সামান্য শব্দেই তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তাছাড়া মা প্রায় সারা রাতেই নফল নামাজ ও অন্যান্য এবাদত করিয়া কাটাইতেন। কাজেই তাদের নিকট হইতে রাতে উঠিয়া যাওয়া খুবই কঠিন ছিল। তবু কেমন করিয়া না জানি, আমি তাদের পাশ হইতেই ঘুমের ঘোরে উঠিয়া যাইতাম। অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁরা টের পাইতেন। আমার খোঁজে তারা যে হৈচৈ শুরু করিতেন, তাতে সারা বাড়ির এমনকি পাড়ার লোক জাগিয়া উঠিত। লণ্ঠন, পাট সোলার বুন্দা, বাঁশের মশাল ইত্যাদি লইয়া চারদিকে

আমার তালাশ করা হইত। সাধারণত বাড়ির আশপাশেই আমাকে পাওয়া যাইত। মাত্র দুইবার আমাকে বাড়ি থনে দূরে মাঠে পাওয়া গিয়াছিল। তালাশকারীরা দেখিয়াছেন, আমি জাগ্রত লোকের মতই সাবধানে পথ চলিতেছি। আঁকা-বাঁকা, উঁচা-নিচা, আইল-বাতরের কোথাও আমি হোঁচট খাইতেছি না। পুকুরাদি, জলাশয়ে না পড়িয়া সাবধানে ও-গুলির পাড় বাহিয়া চলিতেছি। এই অবস্থায় আমাকে ধরিয়া কোলে তুলিবার পরই আবার ঘুম ভাঙ্গিত। তখনই আমি কান্নাকাটি শুরু করিতাম।

এইভাবে বেশ কিছুকাল যাওয়ার পর বাড়ির সকলের উপদেশে বাপজীর ঘরের কেওয়াড়ে ভিতর থেকে শিকল লাগানো হইল। আমি ছেলেমানুষ। খুব সকাল-সকাল ঘুমাইয়া পড়িতাম। বাবা-মা শোবার সময় দরজার শিকল লাগাইয়া শুইতেন। ঘুমন্ত অবস্থায় আমি শিকল খুলিয়া বাহির হইয়া যাইতাম। কপাটের উপরের চৌকাঠে লাগানো শিকল আমার মত শিশুর নাগালের বাহিরে। তবু সেটা আমি কীরূপে খুলিতাম, এটা সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করিত। এ ঘটনায় আমার মুরুব্বিদের, আত্মীয়-স্বজনের ও পাড়া-প্রতিবেশীর মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিল না যে জিনের আছরেই আমি এসব কাজ করিতেছি। এরপর বাবা-মা পালা করিয়া রাত জাগিয়াছেন। তার মধ্যেও কোন ফাঁকে আমি বাহির হইয়া পড়িয়াছি। বাবা-মার কাছে পরে শুনিয়াছি, বসা অবস্থায়ও তারা যখনই এক-আধটু ঝিমাইয়াছেন, সেই ঝিমানের ফাঁকেই আমি আলগোছে বাহির হইয়া গিয়াছি।

দিনের বেলার একটি ঘটনা এইরূপ : সেদিন আমাদের বাড়িতে ছোটখাটো একটি মেহমানি। বাড়ির পুরুষেরা সবাই বাহির বাড়িতে মেহমানদেরে লইয়া ব্যস্ত। বাড়ির মেয়েরা সকলে রান্না-বাড়ায় অতিরিক্ত খাটুনির পর যোহরের প্রায় শেষ ওয়াতে কেউ গোসল করিতে, কেউ নামাজ পড়িতে ব্যস্ত। আমার খুবই ক্ষিধা পাওয়ায় মেহমানদের খাওয়ার আগেই মা আমাকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল আমি ভিতর বাড়ির উঠানের কোণের নারিকেলগাছের অনেকখানি উঁচায় উঠিয়া দুই হাতে গাছটা জড়াইয়া ধরিয়া আছি। নারিকেল-সুপারিগাছে উঠিতে দুপায়ে জুড়োম দরকার হয়। কিন্তু আমি খালি পায়েই গাছে উঠিয়াছি। বিশ হাত উঁচা গাছের অর্ধেকের বেশি উঁচায় আমি উঠিয়াছি। সকলেই বুঝিলেন আমি ঘুমের ঘোরে গাছে উঠিয়াছি। এটাও তাঁরা বুঝিলেন হৈচৈ করিলেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং হুঁশ হওয়া মাত্র আমি ভয় পাইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইব। এবং মারা যাইব। সারিসুরি করিয়া বাহির বাড়িতে খবর পাঠানো হইল। বাড়ির ও আত্মীয়-স্বজনের অনেক পুরুষ মানুষ আসিলেন। চাকর-বাকরেরাও সকলে আসিল। জাল, খেতা, ফরাস, চাদর, চট যা জুটিল সব আনিয়া লোকজনেরা নারিকেলগাছ ঘেরিয়া এসব পাতিয়া ধরিলেন। একজন দক্ষ গাছ-বাওয়ালোক গাছে উঠিলেন। আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় কোলে তুলিয়া লইলেন। আমার ঘুম ছুটিতেই চিৎকার শুরু করিলাম। কিন্তু লোকটি আমাকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া নিচে নামিয়া আসিলেন। সকলে আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। মা-দাদি তাঁরা খুশিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

### ৫. ঘুমে চিৎকার

আমার দ্বিতীয় রোগটা ছিল ঘুম হইতে চিৎকার করিয়া উঠা। এই চিৎকার অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিত। তেমন শীতের মধ্যেও ঘামে আমার সারা গা ও কাপড়-চোপড় ভিজিয়া যাইত। স্বপ্নে আমি ভয়াবহ কিছু একটা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিতাম। কিন্তু সেটা কী, গোছাইয়া বলিতে পারিতাম না। তখনও

বুঝিতাম, এই বৃদ্ধ বয়সে আজও বুঝি, ব্যাপারটা শুধু অনুভব করিবার, বর্ণনা করিবার নয়। অনুভব করাটাও নিতান্ত আবছা-আবছা। আজও যতদূর মনে পড়ে, তাতে এইটুকু বলা যায়, গরু-মহিষের গাড়ির চাকার মত বড় লোহার একটা খুব ভারী চাকা ভনভন করিয়া ঘুরিতে-ঘুরিতে আমার কাছে আসিয়া আমার চোখ-মুখ ঝলসাইয়া দিত। কে যেন সবলে আমাকে সেই চাকায় উঠাইয়া দিত। আমাকে লইয়া সেই চাকা ঊর্ধ্ব দিকে বন্দুকের গুলির বেগে ছুটিতে থাকিত। তাতেই আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত। আমি চিৎকার করিয়া উঠিতাম। কিন্তু সহজে সে স্বপ্ন ছুটিত না।

এই দুইটা রোগ আমার দশ-এগার বছর বয়স পর্যন্ত ছিল। বয়স হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আমার এই রোগ সারিয়া থাকুক, আর চিকিৎসার ফলেই সারিয়া থাকুক, কৃতিত্ব সবটুকু পাইয়াছিলেন আমার দাদার মামাশ্বশুর মফিযুদ্দিন আখন্দ সাহেব। কারণ শেষ চিকিৎসা করিয়াছিলেন তিনি একা, অনেকবারই তিনি আমাকে তাবিজ-কবচ ও পানি-পড়া দিয়াছেন বটে কিন্তু সেটা তখন ছিল এজমালি। রমজান আলী শাহ্ সাহেব ছাড়া মাঝখানে 'পাবনার মৌলবী' নামক এক আলেম একাদিক্রমে তিন মাস আমাদের বাড়ি থাকিয়া আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকেন এই আখন্দ সাহেব। তার শেষ চিকিৎসাটা ছিল এইরূপ : চারটি তাজা রক্তজবা ফুল যোগাড় করা হইল। চারটি নয়া মাটির টোফা কিনা হইল। আখন্দ সাহেব চারটি রক্তজবায় আরবি আয়াত পড়িয়া-পড়িয়া দশ-দশ বার ফুঁ দিলেন এবং আমার মাথায়, চোখ, মুখে ও বুকে ঐ ফুল ছুঁয়াইয়া মাটির টোফায় ভরিলেন। নিজ হাতে টোফার মুখে ভাল করিয়া লেপিয়া-পুঁছিয়া আমাদের বাড়ির চার কোণে চারটি টোফা পুতিলেন। টোফা পপাতা জায়গা চারটি নিজে সযত্নে লেপিয়া পুঁছিয়া দিলেন। এই সব লেপা-পোছার কাজেও আখন্দ সাহেব প্রতিবার হাত চালাইবার সময় এক-একটি আরবি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সারাক্ষণ তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিলেন। তাতেই এই সব খুঁটিনাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। লেপা-পৌঁছার পর তিনি আদেশ করিলেন ঐ চারটি জায়গা যেন কেউ, বিশেষ করিয়া আমি, কখনও পায়ে না মাড়াই।

মুরুব্বিদের কাছে শুনিয়াছি, এরপর আমি আর কোনো দিন ঘুমের ঘোরে হাঁটি নাই বা ঘুম হইতে চিৎকার করিয়া উঠি নাই।

### ৬. আকস্মিক দুর্ঘটনা

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার শরীরের উপর দিয়া সাংঘাতিক বহু দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে বড়-বড় কয়টা এইরূপ :

(ক) প্রথম আঘাত পাইয়াছিলাম বাপজীর নিজের হাত হইতে। তিনি একদিন একটা কোদালের আছাড়ি লাগাইতেছিলেন। কোদাল-কুড়ালের আছাড়ি টাইট করিবার জন্য উল্টা দিক হইতে কাঠ বা বাঁশের কচি মারিতে হয়। বাবজি। এই কাজটিই করিতেছিলেন। আছাড়িটা লম্বা হওয়ায় তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুগুর পিটাইয়া কচি ঢুকাইতে ছিলেন। এক হাতে কোদাল ধরিয়া আরেক হাতে পিটাইতে ছিলেন। একটা বাড়ি বেকায়দায় পড়ায় হাত হইতে কোদালটা ছুটিয়া সবেগে উল্টা দিকে মাটিতে গিয়া পড়ে। আমি তখন মাত্র আড়াই বছরের শিশু। সবেমাত্র দৌড়িতে শিখিয়াছি। আমি হঠাৎ কোথা হইতে দৌড়িয়া বাপজীর কাছে আসিতেছিলাম। ঐ কোদাল আসিয়া পড়িল আমার মাথায়। আমি চিৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। লহুতে আমার মাথা লাল হইয়া গেল। বাপজী

হায় কী করিলাম’ বলিয়া আমাকে কোলে করিয়া বাড়িতে ঢুকিলেন। ভাগ্যিস আমার মাথায় কোদালটার মুখ না লাগিয়া এক পাশ লাগিয়াছিল। মুখ লাগিলে আমার কচি মাথা দুই ফালা হইয়া যাইত। সেটা না হওয়ায় ঐ বিপদেও সকলে সান্ত্বনা পাইলেন এবং আল্লার দরগায় শোকরিয়া জানাইতে লাগিলেন। আমার দাদি ও মা উভয়ের কাটা-ছেঁড়ার ধন্বন্তরি ঔষধ জানিতেন। সেটা পাড়াগাঁয়ে সহজলভ্য একটি গাছড়ার রস। সেই ঔষধ লাগাইয়া আমার মাথায় গালপাট্টা বাধিয়া দেওয়া হইল। এটা সারিতে প্রায় এক মাস লাগিয়াছিল। এই আঘাতের দাগ আজও আমার তালুতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(খ) করাতিরা একবার আমাদের একটা খুব বড় কড়াইগাছ কাটিয়াছিল। সেটা মাটিতে পড়িবার পর কুড়াল দিয়া ওটার ডাল ছাঁটা হইতেছিল। বহু লোক ভিড় করিয়া তামাশা দেখিতেছিল। সে তামেশগিরদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তামেশগিররা সকলেই আমার চেয়ে বড় ও লম্বা। কাজেই তামেশগিরের মধ্যে আমি ডুবিয়াছিলাম। অথচ করাতিদের কুড়ালের কোপে একটা ডালের বড় একটা ধারালো টুকরা ভনভন করিয়া উড়িয়া সকল তামেশগিরদেরে ডিঙ্গাইয়া আমার মাথায় বিধিয়া পড়ে। আমি গুরুতররূপে। আহত হইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়ি। ধরাধরি করিয়া বাড়িতে আনার অনেকক্ষণ পরে আমার হুঁশ হয়। এটা ঘটে আমার ছয়-সাত বছর বয়সে। এর দাগ আজ পর্যন্ত আমার কপালের দিকে মাথায় আছে।

(গ) তখন আমার বয়স নয়-দশ বছর। সে সময় আমাদের অঞ্চলে অবস্থাপন্ন সব গৃহস্থের বাড়িতেই এক বা একাধিক দৌড়ের ঘোড়া ছিল। শুকনা দিনে মোহররম পর্ব পড়িলে সেই পরবের দিনে অথবা হিন্দুদের চড়কের মেলার সময় পাঁচ গ্রামে ঘোড়দৌড় হইত। আমাদেরও একটা ঘোড়া থাকিত। দুই-এক বছর পর-পর ঘোড়া বদল করা হইত। খুব ছেলেবেলা হইতেই আমার ঘোড়া দৌড়াইবার শখ ছিল। স্কুল হইতে ফিরিবার পর বিকালে মাঠে ব্যাটবল (ক্রিকেট), ডাংগুটি বা কপাটি খেলিতাম। খেলা শেষ করিবার পর এবং মগরেবের নামাজের আগ পর্যন্ত আধঘণ্টা খানেক ঘোড়া দৌড়াইতাম। গ্রামের ঘোড়াওয়ালারাও এই সময় যার তার ঘোড়া লইয়া বাহির হইত। মাঝে মাঝেই একত্রে বাজি রাখিয়া বা আড়াআড়ি করিয়া ঘোড়া দৌড়াইতাম। ঘোড়-সওয়ারদের মধ্যে কিন্তু আমার মত অল্প বয়সের কেউ ছিল না। আমার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল এই যে, মাঠে ঘোড়া দৌড় শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে আমাদের পুকুরপাড় হইতে তিন-চার রশি দূরে থাকিতেই লাগাম ছাড়িয়া দিয়া ঘোড়র পেটে গোড়াতালি দিতাম। ঘোড়া পবনের বেগে লম্বী দৌড় দিত। আমি লম্বীর সাথে তাল রাখিয়া দুই হাতে তালি বাজাইয়া ঘোড়াকে শাবাশ দিতাম। টাল সামলাইবার জন্য দরকার হইলে এক-আধবার বাম হাতে ঘোড়ার বাক বা গদির ইলট ধরিতাম। টাল সামলাইয়া আবার ছাড়িয়া দিতাম। এটা রোজই করিতাম।

সেদিন দেরিতে বাহির হইয়াছিলাম। কাজেই ফিরিতেও দেরি হইল। বরাবর মগরেবের আযান শুনিয়াই ঘোড়া ফিরাইতাম। এবং মগরেবের জমাতে শামিল হইতাম। আমাদের বাড়ির মসজিদে তৎকালে মগরেব ও এশা এই দুই ওয়াক্তিয়া নামাজেও পাড়ার লোকেরা জমাতে শামিল হইত। সেদিন কিন্তু আযান শুনিয়াই ঘোড়া ফিরাইলাম না। যাই যাচ্ছি করিয়া আও দুই একটি চক্কর দিলাম। অবশেষে ঘাটতি পূরণের আশায় ঘোড়াটিকে বরাবরের চেয়ে তেজের লম্বী দৌড় দেওয়াইলাম।

আমার গোড়াতালির জবাবে ঘোড়াটা পিছনের পা দিয়া বাতাসে একটি লাথি মারিয়া বাতাসের আগে ছুট দিল।

আমাদের পুকুরের পুব পাশের প্রশস্ত পাড়াটায় পাট লাড়িবার জন্য সারি সারি বাঁশের আড় বাঁধা ছিল। পাটের মওসুম শেষ হইয়াছে। কাজেই আড়গুলি খোলার সময় হইয়াছে। দুই-এক দিনের মধ্যে খোলা হইবে এই অবস্থা। এই আড়ের সারির মধ্যে দিয়াই প্রশস্ত যাতায়াতের রাস্তা। এই রাস্তা দিয়াই আমি বরাবর অনায়াসে ঘোড়া চালাইয়া থাকি। বাহির হইবার সময়ও এই রাস্তা দিয়াই ঘোড়া দৌড়াইয়া গিয়াছি। বরাত মন্দ। ইতিমধ্যে কোনো কারণে একটা আড়ের বাঁশের গিরো খুলিয়া বাঁশের আগাটা রাস্তার দিকে গলা বাড়াইয়া ছিল। বাঁশের আগাটা ছিল একদম কলম কাটা। অন্ধের মত ঘোড়া ছুটাইয়া যখন এই জায়গায় আসিলাম, তখন হঠাৎ আমার নজরে পড়িল বাশের এই কলমকাটা আগাটা তির বেগে আমার ডান দিকের গলা সোজা আসিতেছে। চক্ষের নিমেষে ওটা আমার গলা ভেদ করিয়া ফেলিবে। লাগাম আমার হাতে ছিল না। কাজেই ঘোড়া থামাইবার প্রশ্ন উঠে না। জৈবিক উৎপ্রেরণা বশে ডাক হাতে ঘোড়ার বাঁক ধরিয়া বাম হাতে বাঁশের আগাটা ঠেকাইবার চেষ্টা করিলাম। কিসে যে কী হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না। পরে শুনিয়াছি এবং অনুমান করিয়াছি যে ঘোড়ার গতিবেগে আমার হাতের চাপে বাশের গোড়ার দিকে দুই-একটা গিঁরো ছিঁড়িয়া যায় এবং তাতে বাঁশের আগাটা নুইয়া পড়ে। ফলে বাঁশটা আমার গলায় বা বুকে বিঁধিয়া বাম উরুতে গভীর খাদ করিয়া এক দলা গোশত উল্টাইয়া বাঁ দিকে বাহির হইয়া যায়।

তখন বাহির বাড়িতে কোনো লোকজন ছিলেন না। সবাই মগরেবের নামাজ জমাতে পড়িতে ছিলেন। ঘোড়াটা প্রথমে টাটু দৌড়ে পরে দুগামা গতিতে বাহির বাড়ির উঠান পার হইয়া দেউড়ির ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং সোজা উত্তরের ভিটির দাদাজীর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়ায়। দাদি তখন নামাজ শেষ করিয়া ওজিফা পড়িতেছিলেন। ঘোড়ার পায়ের আহট ও হ্রেষার আওয়াজ শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মোনাজাত সারিয়া বাইরে আসেন। তিনি দেখেন যে আমি ঘোড়ার পিঠে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছি। আমার মাথা ঘোড়ার বাকের উপর শায়িত এবং দুই হাত দুই দিকে ঝুলিতেছে। আমার কাপড়-চোপড় ও ঘোড়ার শরীর বাহিয়া টপটপ করিয়া লহু পড়িতেছে। ঘোড়ার গদি লহুতে ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি চিৎকার করিয়া বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে ধরেন। মা, ফুফু, চাচি সবাই যার-তার ঘরে নামাজ পড়িতেছিলেন। দাদির চিঙ্কারে আমার মা, চাচি, ফুফু ও চাকরানিরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসেন। বাহির বাড়ি হইতে মুরুব্বিরা সকলে আসেন। আমাকে বেহুশ অবস্থায় ঘোড়া হইতে নামানো হয়। কান্নাকাটির মধ্যে আমার শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। আমার হুঁশ হইতে রাত দুপুরের বেশি হইয়া গিয়াছিল। ততক্ষণে আমার গায়ে হাত-পুড়িয়া-যাওয়া জ্বর উঠিয়াছে। এই ঘা শুকাইতে আমার মাসাধিককাল সময় লাগিয়াছিল। বাঁ হাতের তলায় তিন ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি গভীর ক্ষত হইয়াছিল। এই সত্তর বছরে সেটা ছোট হইয়া এখন এক ইঞ্চি পরিমাণ দাগ আছে। বা উরাতের ঘাটা হইয়াছিল লম্বায় চার ইঞ্চি পাশে দুই ইঞ্চি ও গভীরে দেড় ইঞ্চি। সে ক্ষত শুকাইয়া এই সত্তর বছরেও দীঘে দেড় ইঞ্চি পাশে এক হইয়াছে। গভীরতাটা গোশতে ভরিয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু সিকি ইঞ্চির মত খাদ বা ডিপ্রেশন আজও রহিয়াছে।

এমনি ধরনের অপেক্ষাকৃত কম সাংঘাতিক আকস্মিক আঘাত যে আমি কত পাইয়াছি, তার লেখাযযাখা নাই। আমার শরীরে অনেক দাগই মিশিয়া গিয়াছে। যেগুলি মিলিয়া যায় নাই এবং

মিলিবেও না এমন কাটা দাগের সংখ্যাই সতেরটা। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের মত শরীরের কাটা-ছেঁড়া জখমের সংখ্যা গনিয়া যদি জীবনযুদ্ধের বীরত্বের পরিমাপ করা হইত, তবে আমি বার বছর বয়সের আগেই বীরত্বের মেডেল পাইতাম। পরবর্তী জীবনে আমি যে অহিংস সংগ্রামের একটা পক্ষপাতী হইয়াছি, তার সাথে ছেলেবেলায় এত বেশি খুন-জখমের কোনো সম্পর্ক থাকিতে পারে বলিয়াই এই তুচ্ছ ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম।

৭. শৈশবের কড়াকড়ি

কতকগুলি ব্যাপারে শৈশবে আমাদের সর্বক্ষণ সবাইকে খুবই কড়াকড়ির মধ্যে জীবনযাপন করিতে হইত। কড়াকড়িগুলি যে বাপ-দাদার আরোপিত কড়াকড়ি তা নয়; সামাজিক পরিবেশেই এই কড়াকড়ি আরোপ করিত। এক আধ ওয়াক্ত নামাজ কাযা করিবার উপায় ছিল না। স্কুলে, মাদ্রাসায়, রাস্তা ঘাটে, আত্মীয় বাড়িতে মেহমানিতে, কোথাও আমাদের এক ওয়াক্ত নামাজ তরক হইলে বেনামাজিরাও আমাদেরে তম্বিহ করিতেন। বলিতেন, তুমি ফরাযী বাড়ির ছেলে হইয়াও নামাজ তরক করিয়াছ? কী লজ্জার কথা! যিনি এই তম্বিহটা করিলেন, তিনি জীবনেও পশ্চিম দিকে আছাড় পাড়েন নাই। কিন্তু সে কথা বলিবার উপায় নাই। কারণ সর্বসম্মত জনমত এই যে আর কেহ নামাজ তরক করিলে কিছু আসে যায় না। আমরা ফরাযী বাড়ির নাবালক শিশুরা নামাজ তরক করিলেই সেটা হয় নিতান্ত অন্যায় কাজ।

নামাজ-রোযা সম্বন্ধে যা, গান-বাজনা সম্বন্ধেও তা-ই। আমাদের গ্রামে হিন্দু তালুকদার বাড়িতে, জমিদারের কাছারিতে, পাশের গ্রামের জমিদারবাড়িতে প্রতিবছর কত গান-বাজনা যাত্রা-থিয়েটার হইত। গ্রামসুদ্ধা লোক তাতে ভাঙ্গিয়া পড়িত। কিন্তু আমাদের মুরুব্বিরা কেউ তাতে যাইতেন না। এমনকি আমাদের বাড়ির পুরাতন বছরিয়া চাকরেরা পর্যন্ত ঐ সব গান বাজনা দেখিতে যাইত না। গ্রামের সমবয়সী বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী কারো প্ররোচনায় যদি আমাদের ভাইদের কেউ দিনের বেলাও এক-আধবার এসব দেখিতে গিয়াছি, তবে ঐ সব গান-বাজনার উদ্যোক্তারাই আপত্তি করিয়াছেন। মুসলমান দর্শকেরা বলিয়াছেন, সর্বনাশ, ফরাযী বাড়ির ছেলে হইয়া তুমি গান শুনিতে আসিয়াছ? শিগগির পালাও। হিন্দু উদ্যোক্তারা বলিতেন, তোমরা ফরাযী, গান শোনা তোমাদের নিষেধ। তোমার মুরুব্বিরা জানিতে পারিলে আমাদের দোষ হইবে। তোমরাও শাস্তি পাইবে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে গ্রামের সমবয়সীরা, স্কুলের সহপাঠীরা, এমনকি স্বয়ং মাস্টার সাহেব, যখন সদলবলে যাত্রা-থিয়েটার দেখিতে যাইতেন, তখন আমিও আমরা তিন ভাই তাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতাম।

এটা ত গেল হিন্দুদের আয়োজিত যাত্রা-থিয়েটারের কথা। এমন যে, মুসলমানের আয়োজিত মোহররমের লাঠি খেলা,-ও আমাদের বাড়িতে হইতে পারি না। আমার ছেলেবেলায় মোহররমের লাঠি খেলার প্রচলন বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। মোহররমের দশ দিন ঢাক-ঢোল, কাড়া নাকাড়া, শানাই, ক্ল্যারিওনেটের আওয়াজ রাতদিন পাড়া-গাঁয়ের আকাশ মুখরিত ও মাটি কম্পিত থাকিত। একই গ্রামের বিভিন্ন পাড়া হইতে এক একটি আখড়া বাহির হইত। তারা লাঠি, তলওয়ার (তলওয়ারের বদলা পাজন), সড়কি, বল্লম, চরকি, রামদা লইয়া চমৎকার অনেক সময় বুক কাঁপানো বিস্ময়কর, উস্তাদি খেলা দেখাইত; একাধিক আখড়ার মধ্যে। মোকাবিলা হইয়া গেলে ঐ

সব আখড়ার নেতাদের মধ্যে ডুয়েল প্রতিযোগিতা হইত। এসব প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য বিপুল জনতার ভিড় হইত। মোহররমের লাঠি খেলাকে আমাদের ছেলেবেলা 'লাকড়ি-বাড়ি' বলা হইত।

এই খেলা দেখিবার জন্য আমি গ্রামের অন্যান্য প্রতিবেশীর বাড়িতে যাইতাম। কারণ আমাদের বাড়িতে ঐ খেলা হওয়া নিষেধ ছিল। সব আখড়ার লোকেরাই 'বার্ষিকীর' (বছরিয়া বখশিশ) জন্য আমাদের বাড়িতেও আসিত। কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসিবার সময় অনেক দূর হইতেই বাদ্য বন্ধ করিয়া দিত। এতে আমাদের মনে বড়ই কষ্ট হইত। পাশের বাড়িতে ধুমধামের সাথে লাকড়ি-বাড়ি খেলা হইতেছে। বাড়ির লোকেরা ও তাদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ঘরের উসারা-বারান্দায় বসিয়া নিজেদের উঠানের মধ্যে খেলা দেখিতেছে, তাদের বাড়ির মেয়েছেলেরা ঘরের খিড়কি, দেউড়ি, বেড়ার ফাঁক দিয়া ঐসব সুন্দর-সুন্দর এবং মজার-মজার খেলা দেখিতেছে, অথচ আমাদের পরের বাড়ি গিয়া সে তামাশা দেখিতে হইতেছে; আর আমাদের বাড়ির মেয়েছেলেরা অমন ভাল-ভাল খেলা দেখিতে পারিতেছেন না, এটা আমার খুবই অপমানকর মনে হইত। ছেলেবেলার এই অপমানবোধটা খেলা-তামাশা দেখার আনন্দের ক্ষুধার চেয়ে কম তীব্র ছিল না। তাই সাহসে বুক বাঁধিয়া দাদাজীর কাছে যাইতাম। তিনিই ছিলেন আমার আবদারের বড় জায়গা। তাই তার কাছে আবদার করিতাম। তর্ক করিতাম। তাদেরই মুখে শোনা হাদিসের দোহাই দিয়া বলিতাম, লাঠিখেলা সুন্নত। আমার মনে পড়ে, আমার অনেক জিদাজিদিতে দাদাজী একবার বিনা-বাজনায় লাঠিখেলার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বাজনা ছাড়া খেলা জমে নাই। খেলওয়াড়রাও বেশিক্ষণ খেলা চালাইতে পারে নাই। অতঃপর বাদ্যের পক্ষেও তাঁদেরই মুখে শোনা হাদিসের দোহাই দিতাম। একতারা বাজনা যুদ্ধ-জেহাদের বাজনা। এই যুক্তির কোনো জবাব ছিল না। শেষ পর্যন্ত দাদাজী বলেন, আমার বাপের আমল হইতেই এই রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। আমি সে রেওয়াজ তুলিয়া দিতে পারি না। বাবার আমলে বরঞ্চ এর চেয়ে কড়াকড়ি ছিল। আমাদের বাড়ি হইতে শোনা না যায় এমন দূরে বাজনা বন্ধ করিতে হইত। এখন অনেক ঘন ঘন বসতবাড়ি হইয়া যাওয়ায় সে নিয়ম একটু ঢিলা হইয়াছে। তোমাদের আমলে যা হয় করিয়ো। আমি যত দিন আছি এটা বদলানো যাইবে না।

দাদাজীর কাছে নিরাশ হইয়া বাপ-চাচার নিকট গেলাম। দাদাজীর মতের বিরুদ্ধে কিছু করিতে তারা রাজি হইলেন না। মুরুব্বিদের এই মনোভাবের সমর্থনে আমি কোনোই যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। এই বংশ হইতেই গাজী আশেক উল্লা সাহেবের মত জেহাদি সৈনিকের জন্ম হইয়াছে। এই বাড়িতে বসিয়াই গাজী সাহেব গ্রামের যুবকদেরে লাঠি-তলওয়ার খেলা শিখাইয়াছেন। অথচ তাঁর অবর্তমানে সেই বাড়িতেই লাঠি খেলা ও যুদ্ধের একতারা বাজনা এমন কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দাদাজীর কথা সত্য হইলে গাজী সাহেবের বিদ্যমানেও এ বাড়িতে মোহররমের লাঠি খেলা হয় নাই। কী আশ্চর্যের কথা!

## ৮. পারিবারিক প্রথা

আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার আমাদের বাড়িতে ঘটিত। আমার জ্ঞান হইয়াছে। অবধি দেখিয়াছি প্রতিবছর মোহররমের সময় আমাদের বাড়িতে খুব বড় একটা যিয়াফত হইত। মোহররমের চাঁদ দেখিয়াই আমাদের বাড়ির মেয়ে পুরুষ সকলে নফল রোযা রাখিতে শুরু করিতেন। কাতলের দিন খুব বড় পাঁচগেরামি মেহমানি হইত। তাতে অনেক গরু-খাসি যবেহ হইত। বাড়ির সামনের উঠান ও ময়দান লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। সাদা পোশাক পাগড়িপরা বহু মৌলবী-মওলানা তাতে

যোগ দিতেন। লোক খাওয়ানো ছাড়া গরীব-মিসকিনের মধ্যে অনেক পয়সা-কড়ি বিতরণ করা হইত। ঐ মেহমানির ভগ্নাবশেষ পরদিবস ‘মনজিলের দিন পর্যন্ত চলিত। সেদিনও ছোটখাটো মেহমানি ও দান-দক্ষিণা চলিত। আলেম-ফাযেলরা সকাল হইতে যোহরের ওয়াক্ত পর্যন্ত কালামুল্লা খতম করিয়া বখশিয়া দিতেন। তারপর খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আছরের নামাজ পড়িয়া বিদায় হইতেন। এই ধরনের যিয়াফতে লোক হইত বেশুমার। দাওয়াতি তোক ছাড়াও বিনা-দাওয়াতি গরীব-মিসকিন জমা হইত অনেক। আন্দাজ কমবেশি পাঁচ হাজার লোক খাইত। খরচ কিন্তু তেমন বেশি লাগিত না।

তারিখের পনের-বিশ দিন আগে হইতেই গাছ কাটিয়া লাকড়ি ফাড়া ও শুকানো শুরু হইত। শুধু যিয়াফত বাড়িতে নয়, পাড়ার প্রায় সকলের, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ত অবশ্যই। দুই-তিন দিন আগে হইতে কলাগাছের পাতা কাটা শুরু হইত। এটাও সারা গায়ের প্রায় সব বাড়িতেই। কলাগাছ। হইতে পাতা কাটিয়া সেগুলি আবার এক হাত লম্বা টুকরা করিয়া আঁটি বাধা হইত। এক এক আঁটিতে দশ-পনেরটা টুকরা পাতার এক-একটা বুন্দা থাকিত। দশটা বুন্দায় একটা আঁটি হইত। তার মানে এক-এক আঁটিতে কমবেশি দেড় শ কলাপাতার টুকরা থাকিত। যিয়াফতের দুই-এক দিন আগে হইতেই এ সব ফাড়া লাকড়ি ও এই সব আঁটি-বাঁধা কলাপাতা যিয়াফত বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিত। তাতে যিয়াফত বাড়ির কোনো খরচ লাগিত না। দেনেওয়ালাদের অবস্থাভেদে ও সাধ্যমত নিজেরা অথবা চাকরের মাথায় এই সব যিয়াফত বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিতেন। এটা ছিল তৎকালীন প্রথা ও একরকম বাধ্যকর রেওয়াজ। চাহিলে কেউ ‘না’ করিত না। না চাহিলেই বরঞ্চ মন-কষাকষির কারণ হইত। হাজার থনে বেশি লোকের যিয়াফতেই এই নিয়ম চালু ছিল। ছোটখাটো যিয়াফতে বাড়িওয়ালারা নিজেরাই লাকড়ি ও পাতার ব্যবস্থা করিয়া নিতেন।

লাকড়ি ও বাসন-বরতনের ব্যবস্থা ত এইভাবে হইয়া যাইত বিনা খরচায়। তার পরে ধরুন চাল-ডাল ও খাসি-গরুর কথা। একটা প্রমাণ সাইযের গরুতে পাঁচ শ ও একটা খাসিতে এক শ লোকের খাওয়া হইত। কারণ গোশতের সাথে গোল-আলু মাটিয়া আলু, ফেন কচু (চার-পাঁচ হাত লম্বা মানকচু) তরকারি দেওয়া হইত। গোশত ছাড়াও ডাইল এবং দই অথবা মিঠুরি থাকিত। দই গোয়ালারা দিত। আর মিঠুরিটা যিয়াফতের বাবুর্চিখানাতেই তৈরি হইত। বড় ডেগভর্তি পানির মধ্যে দরকারমত চালের গুঁড়া, চিনি, দুধ ও লবণ দিয়া জাল দিলেই মিঠুরি রান্না হইত।

এই হিসাবে দশটা গরু, দুইটা খাসি, পঁচিশ মণ চাল, পাঁচ মণ ডাল, পাঁচ মণ মিঠুরি বা দশ মণ দই দিয়া পাঁচ হাজার লোক খাওয়ানো যাইত। এতে মোটমাটে পাঁচ শ টাকার বেশি খরচ পড়িত না। গরুর দাম দশ-পনের, খাসির দাম চার-পাঁচ, চালের মণ দেড় টাকা-পাঁচসিকা। দুই-তিন টাকা মণ দই পাওয়া গেলে বরঞ্চ পাঁচ শ টাকার কিছু কমই লাগিত। চার-পাঁচ হাজার লোক বসিবার জায়গা করা খুব কঠিন ছিল না। ধান, সরিষা, কলাই মাড়াই শেষ হইবার পর এবং পাট বুনা শুরু হইবার আগে সকলের বাড়ির সামনে-পাশে বহু বিস্তৃত জমি খালি পড়িয়া থাকিত। নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ি মাত্রেরই দুই একখানা বড় শামিয়ানা, ফরাশ ও শতরঞ্জি থাকিত। মাতব্বরদের বাড়িতেই দুই-তিনটা করিয়া বড় ডেগ থাকিত। প্রতি গ্রামে দুই-একজন করিয়া শখের বাবুর্চি ছিলেন; বড় বড় যিয়াফতে রান্না করা তাদের গৌরবের বিষয় ছিল। এই সব শখের বাবুর্চিরা বিনা পারিশ্রমিকে সহকারী লইয়া ভোর হইতে রান্না শুরু করিতেন, বাঁশের কোনোই অভাব ছিল না। ঘন ঘন খুঁটি

গাড়িয়া গ্রামের পাঁচ দশটা শামিয়ানা টাঙানো হইত। জমি চাষ করা থাকিলে সামান্য মুগুরপেটা করিয়া তাতে ধারি-টাচাইর উপর ফরাশ-শতরঞ্জি ও চট বিছাইয়া সুন্দর বসার ব্যবস্থা হইত। এতে খরচ যা লাগিত, তা উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের বাড়ির মত নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে বছরে একবার চার-পাঁচ শ টাকা খরচ করিয়া এমন যিয়াফতের আয়োজন করা দাদাজীর আমলে মোটেই কঠিন মনে করিতাম না। আমাদের ছেলেবেলা আমাদের অঞ্চলের অনেক মাতব্বর গৃহস্থের বাড়িতেই বছরে বছরে এমন যিয়াফত দেখিয়াছি এবং নিজেরা। খাইয়াছি। কখনও-কখনও এর চেয়েও বড় বিশাল যিয়াফতও খাইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেবের দাদা রিয়াত উল্লা মণ্ডল সাহেবের লিল্লায় যিয়াফতটা হইয়াছিল দস্তুরমত একটা মেলা। সে যিয়াফতে এক শ একটা গরু যবেহ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম।

## ৯. সমসাময়িক অবস্থা

প্রায় এক শ বিঘার জোতদার হইলেও দাদাজীর আমলে আমাদের কোনো বর্গাদার ছিল না। সব জমিই নিজের চাষে থাকিত। দাদাজীর আমলে দেখিয়াছি এইসব জমি আবাদ করিতে তিন-চার জোড়া হাল, দশ-বার জন কামলা খাঁটিত। হালের বলদগুলি ছিল বিশাল আকারের। উচ্চতায় পাঁচ ফুটের নিচে হইবে না। বলদ যেমন বড়, লাঙলগুলিও তেমনি দীঘে-পাশে আলিশান। এইসব হাল বাইবার মত কামলারাও ছিল ইয়া বড় জওয়ান। দাদার আমলের সাধু, ইদু, খিদিরদ্দি, খলবদ্দি, আইনদ্দি প্রভৃতি পাঁচ-ছয়জন বছরিয়া কামলার বিশাল আকারের কথা আজও মনে পড়ে। এরা কেউ উঁচায় প্রায় ছয় ফুট ও ঐ পরিমাণে মোটাতাজা ছিল। কাজে-কামে চলিতও এরা দেও-এর মত। এরা শুধু কাজেই বড় ছিল না, শক্তিতেও ছিল তেমনি অসাধারণ। সে শক্তি তারা শুধু এমনি দেখাইত না, আমাদের গিরস্থির কাজেও লাগাইত। বিভিন্ন রকমের ভারী ভারী বোঝা টানিতে, বিশেষত, মাঠ থনে ধানের আঁটির বোঝা আনিতে, সেই বিপুল শক্তি খাটাইত। ধান কাটিবার সময় যে আঁটি বাঁধা হয়, তারে আমাদের অঞ্চলে বলা হয় মুড়ি। এক-একটা মুড়ির ওজন পাঁচ সেরের বেশি ছাড়া কম হবে না। সাধারণ কামলারা এই ধরনের মুড়ির আটটাতে এক বোঝা বাধিয়া মাঠ হইতে বাড়ির খলায় আনিত। এই আটটা মুড়ি কেউ একটা আঁটি বাঁধিয়া মাথায় করিয়া আনিত। কেউ আবার চার-চারটা মুড়ির দুইটা আঁটি বাঁধিয়া বাহুক কাঁধে করিয়া আনিত। এই বাহুক সম্বন্ধেও সকলের এই ধারণা না-ও থাকিতে পারে। আমাদের অঞ্চলে ধান বাহিবার এই বাহুক গোয়ালা বা ফেরিওয়ালারা বাহুকের মত দুই পাশের দুইটা বোঝা ঝুলাইয়া আনা হয় না। তার বদলে বাহুকের দুই দিক ধানের দুই আঁটির ঠিক মাঝামাঝি ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। সে উদ্দেশ্যে বাহুকের দুই দিকই ধারালো চোখা। এ চোখা মাথা দুইটি ধানের বোঝার ঠিক মাঝখানে এমনি কায়দায় ঢুকানো হইত যে, কোনো দিকে বেশি হইয়া তেছড়াভাবে হেলিয়া পড়িত না। পড়িলে আর বাহুক বওয়া সম্ভব হইত না। এই বাহুকের দুইটা আঁটি বাঁধার মধ্যেও বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলায়। অন্তত দুই রকম কায়দা আছে। এক ধরনে ধানের সব মুড়ির ধানের মুখ নিচ দিকে ঝুলাইয়া বাঁধা হয়। আরেক ধরনে মুড়িগুলি উল্টা-পাল্টা দুই মুখ করিয়া বাধা হয়। তাতে ধানের দিক একদিকে থাকে না। সমান সংখ্যায় দুই দিকে থাকে। এই ধানের বাধার ফলে দুই দিককার বোঝা দুইটার বাহকের কাঁধের উপরের লেভেলে থাকে। এই ধরনের বাধাতেই বাহুক চুকানোতে খুবই উস্তাদি লাগে। মনে হয়, এতে বোঝাটাও কিছুটা পাতলা হয়। কারণ বাহকের চলার তালে-তালে উভয় দিককার বোঝাই ছন্দে ছন্দে নাচিতে থাকে।

এই ধরনের বাহুকেই হউক, আর এক বোঝার মাথায় করিয়াই হউক, অপর কামলারা যেখানে আটটা মুড়ি বহন করিত, সেখানে আমাদের বাড়ির ইদু-সাধুরা দশ-বার-চৌদ্দটা মুড়ি একবারে বহন করিত। এই লইয়া তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইত। এটা সহজ ছিল না। কারণ, এতে প্রত্যেক বারের বোঝার ভার দেড় হইতে দুই মণ ওজনের হইত।

এছাড়া ইদু-সাধুরা আরেক কাজে তাদের শক্তির প্রতিযোগিতা করিত। আমাদের বাড়িতে তৎকালে প্রায় হাজার মণ ধান বিক্রি হইতে। এই বিক্রিটা প্রায়শই দুই-তিন দফার বেশিতে হইত না। তাতে প্রতি দফায় তিন শ হইতে পাঁচ শ মণ বিক্রয় হইত। যেদিন বিক্রিটা হইত, সেদিন আমাদের বাড়ির উত্তরের উঠান (এটাই আমাদের খলা ছিল বলা যাইতে পারে) লোক সমাগমে গমগম করিত। আমাদের কামলারা মাপিয়া দিত। ব্যাপারীদের ঘোড়াওয়ালারা এসব ধান সুতোয়া নদীতে দক্ষিণা ব্যাপারীদের পাঁচ শ মণি নৌকায় নিয়া যাইত। পাঁচসেরি পাথরের দাঁড়িপাল্লায় এই ধান মাপা হইতে। অনেক ধান। কাজেই বড় বড় কান্দি। এক কান্দি হইতে ধান মাপিয়া আরেক কান্দি করিতে স্বভাবতই বেশ দূরে করা যাইত। নইলে অতি শীঘ্রই দুই কান্দি লাগালাগি হইয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল। কাজেই দাঁড়িপাল্লাওয়ালারা প্রতিবারের মাপা ধান খুব দূরে অন্তত চার-পাঁচ হাত দূরে মেলিয়া মারিত। এই লইয়াই আমাদের ইদু-সাধুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে দেখিয়াছি : কে কতদূর মেলিয়া মারিতে পারে। এটা সোজা কাজ নয়! কাজটা করিতে হয় বসা অবস্থা হইতে। পাঁচ সের ধান দুই একবার দশ হাত দূরে ফেলাও কঠিন নয়। কিন্তু চার-পাঁচ শ মণ ধান সারা দিন ধরিয়া মাপিতে হইবে। আগাগোড়া সমান দূরে ফেলিতে হইবে। কাজেই সমান জোরে মারিতে হইবে।

এমন বলবান জোয়ান-জোয়ান কামলারা যখন উঁচা উঁচা বলদ দিয়া হালচাষ করিত, তখন আমার বড় ভাই ও আমি স্কুল ছুটির দিনে হাল ধরিতে চাহিতাম। কামলাদের কেউ কেউ আমাদেরে লাঙল ধরিতে দিত, কিন্তু সাবধানতা হিসাবে আমাদের সাথে সাথে চলিত এবং লাঙলের কুটিতে আমাদের মুঠির কাছে হাত রাখিত। কিন্তু সর্দার কামলারা এতে আপত্তি করিত এবং আমাদেরে সরাইয়া দিত। বলিত, লেখাপড়া জানা লোকের লাঙল ধরিতে নাই। লেখাপড়া জানা লোক লাঙল ধরিলে লাঙলের রেখের নিচের জমি সত্তর হাত পর্যন্ত পুড়িয়া যায়। সে ক্ষেতে কোনো ফসল হয় না। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেক মুনশী-মৌলবী নিজের হাতে হালচাষ করেন। তাতে মাটি পুড়িয়া যায় না। সে নজিরের কথা বলিলে কামলারা জবাব দিত, তাঁরা আরবি-ফারসি পড়িয়াছেন, লেখাপড়া করেন নাই। লেখাপড়া মানে এখানে বাংলা লেখাপড়া। তৎকালে এ কথার গূঢ় মর্ম বুঝিতে পারি নাই। পরে বুঝিয়াছিলাম। লেখাপড়া জানা বাবু ভদ্রলোকেরা নিজ হাতে চাষ না করিবার কী চমৎকার যুক্তি জনপ্রিয় করিয়াছিলেন।

## ১০. প্রাচুর্য ও সরলতা

এরা ছাড়া আমাদের আরো তিন-চারজন বছরিয়া কামলা ছিল। ফসল। লাগানো-মাড়ানো এই দুই সময় এদেরে ছাড়াও মাসুরা (মাসোহারা) কামলাও রাখা হইত। এই সব গৃহস্থির কামলা ছাড়া তিন-চারজন রাখালও থাকিত। বলদা গরু বা হালের বলদের জন্য একজন ও পালের গরু বা ছেটুয়া গরুর জন্য দুইজন রাখাল থাকিত। হালের বলদ দশ-বারটা, আর ছেটুয়া গরু ছিল। প্রায় পঞ্চাশটা। হালের বলদের জন্য পৃথক একটা ও ছেটুয়া গরুর জন্য দুই তিনটা গোয়াল ছিল। পঞ্চাশটা ছেটুয়া গরুর মধ্যে আধাআধি বাছুর ও বাকি সব গাই থাকিত। গাইগুলির মধ্যে আট-

দশটা দুধাল, বাকিগুলির কিছু গাভীন ও কিছু ছাড়ানিয়া (দুধ দেওয়া শেষ হইয়াছে কিন্তু আজও গাভীন হয় নাই এমন) গাই ছিল। দুধের বাছুরগুলিকে গোয়ালের এক কোণে খোয়াড়ের মধ্যে সারা রাত বাধিয়া রাখা হইত। ফযরের ওয়াকতে এক-একটা করিয়া বাছুর ছাড়িয়া তার মায়ের দুধ পানান হইত। দুধ পানান (দুয়ান) শেষ হইলেই গোয়ালের সব গরু ছাড়িয়া দেওয়া হইত। গুরুগুলিও বরাবরের অভ্যাসমত হালটে চলিতে শুরু করিত। আমাদের বাড়ির হালট গিয়া পড়িয়াছে সারা গাঁয়ের এজমালি হালটে। এই হালটের এক শাখা গিয়া পড়িয়াছে নদীর পাড়ে, অপর শাখা গ্রামের মাঠে। ক্ষেতে ফসল থাকার সময় হালটের এই শাখায় গরু যাইত না। সব যাইত নদীর ধারে। সেখানে গাঁয়ের সব গরুর সাথে মিলিয়া জঙ্গলের পাতা-পুতুড়ি ও ঘাস খাইত। বেশি গরুওয়ালাদের নিজস্ব চরাক্ষেত (গরু চরাইবার জন্য পতিত জমি) থাকিত। আমাদেরও কয়েকটা চরাক্ষেত ছিল। বরাবর একই ক্ষেতকে চরাক্ষেত রাখা হইত না। দুই-তিন বছর পরপর বদলানো হইত। এতে একদিক যেমন যথেষ্ট ঘাসে। গরু চরানোও চলিত, আবার কয়েক বছর পতিত পড়িয়া থাকায় এবং গরু বাছুর চরিবার সময় যে পরিমাণ লেদাইত, তাতে ক্ষেতের উর্বরতাও বাড়িত।

এত-এত কামলা ও বলদ গরুর বয়ান শুনিয়া আজকালকার তরুণেরা মনে করিবে, এটা ত একমত হালুয়া রাজার ব্যাপার, আসলে তা কিছু নয়। ঐ যে ছয় ফুট লম্বা জোয়ান কামলাদের কথা বলা হইল, তাদের বার্ষিক বেতন ছিল সর্বোচ্চ পঞ্চাশ-ষাট টাকা। আর রাখালদের বেতন ছিল বছরে দশ টাকা। চাকরি শুরু করিবার প্রথম দিনেই কিংবা দু'এক দিন আগে সব টাকা অগ্রিম দেওয়া-নেওয়া হইত। বয়স্ক কামলারা নিজেরা, আর ছোকরা চাকরদের বাপ-চাচা মুরুব্বিরা এই টাকা নিতেন। অগ্রিম বেতনের টাকা পাওয়ার পর সারা বছর তারা কাজ করিয়া দিত। টাকা মারিয়া দিবার কথা তৎকালে কারো মনেও পড়িত না। বছরের বেতন অগ্রিম আদায় করিয়া পরবর্তী তিন শ পঁয়ষট্টি দিন সে টাকার বদলা খাঁটিয়া দিতে বোধ হয় আজকাল কোনোও লোকই রাজি হইবে না। কেউ যদি রাজি হয়, তবে দু'চার দিনের মধ্যেই নির্বোধ বেওকুফ বেআক্কেল গাধা বলিয়া সর্বত্র তার বদনাম ছড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু আগের লোকেরা এমন ছিলেন না। গৃহস্থরাও না, তাঁদের কামলারাও না। সকলেই সকলকে বিশ্বাস করিতেন। বিশ্বাসের সুযোগ-সুবিধাও ছিল। ধরুন কামলাদের কথাটাই। যে বছরে ষাট টাকা অগ্রিম পাইল, সে ঐ টাকার মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশ টাকায় ষাট-আশি মণ ধান কিনিয়া ফেলিল। তার স্ত্রী-কন্যারা মিলিয়া ধান সিদ্ধ করিয়া বাড়া বানিয়া চাউল করিল। ষাট মণ ধানে চাল হইবে পঁয়তাল্লিশ মণ। আশি মণে হইবে প্রায় ষাট মণ। চাউলের দাম তখন দেড় টাকা মণ। অর্থাৎ ষাট টাকা বেতন পাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই কামলাটি শতাধিক টাকার মালিক হইয়া গেল। আর গৃহস্থের লাভ হইল যে, গাঁয়ের বাছা-বাছা সবল কর্মঠ কামলা তিনি বছরের নামে কিনিয়া ফেলিলেন। অন্যথায় বুনা-লাগানো ও দাওয়ামাড়ির সময় অমন কামলা পাওয়া যাইত না। পাওয়া গেলেও মাসিক বেতন দশ টাকার কম হইত না।

শুধু এই কারণেই যে লোকজন সৎ-সাধু থাকিত, তা নয়। শঠ-প্রবঞ্চক ও ঠক-ধড়িবায হইবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চুরি-ডাকাতি করিবার মত সাহসই তখন জনসাধারণের মধ্যে হয় নাই। আরেকটা দৃষ্টান্ত দেই। প্রতিবছর ফাল্গুন চৈত্র মাসে বিহার হইতে বহু গরুর ব্যাপারী হাজার হাজার গরু লইয়া বাংলাদেশে ঢুকিত। আমাদের এলাকায়ও অনেকে আসিত। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে আগে বহুদূর বিস্তৃত ধানী জমি ছিল। একেবারে খোলা মাঠ। ধান কাটা হইয়া সবটাই একদম ময়দান। শুধু বাড়ির আশপাশে কিছু রবিশস্য সরিষা, কলাই করা হইত। এই ভোলা বিশাল মাঠে হাজার

হাজার গরুসহ এই বিহারী ব্যাপারীরা আস্তানা ফেলিত। সুবিধা অনুসারে সাত দিন হইতে পনের দিন এক-এক আস্তানায় থাকিত। দৈনিক দশ-বিশটা গরু বিক্রি হইলে পাঁচ-সাত শ টাকা জমা হইত। সাত দিনে তিন-চার হাজার টাকা হইত। এই টাকা লইয়া ব্যাপারীরা মাঠের মধ্যে এত দিন রাত কাটাইত। কোনো একটা ডাকাতি-রাহাজানি হয় নাই।

১১. দাদাজীর এন্তেকালের পর

দাদাজী যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন তত দিন উপরে কথিত মেহমানির ধুমধাম পুরা বজায় ছিল। কিন্তু রোযা রাখার নিয়মে শৈথিল্য আসিয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে আমরা ভাইয়েরা রেহাই পাইলাম। কারণ অনেক দূরে হাঁটিয়া স্কুলে যাইতে হইত। মোহররমের ছুটি ছিল মাত্র এক দিন। আমাদের মত অপোগণ্ড শিশুর পক্ষে না খাইয়া স্কুলে যাওয়া কঠিন। কাজেই নফল রোযার জন্য অত কষ্ট করার দরকার নাই। আমরা যেই মাফ পাইলাম, অমনি আরো অনেকে নিজেদেরে মাফ করিয়া দিলেন। রোযা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, যত দিন বাড়িতে দিনের বেলা চুলায় আগুন না ধরে, তত দিন সে বাড়িতে রোযা রাখিতেও কারো কষ্ট হয় না। যেই মাত্র দুই-একজনের জন্য বিশেষ কারণে দিনের বেলা চুলায় রান্না চড়িল, অমনি প্রতিদিন এ বিশেষ কারণে হাজতির সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। আমাদের বাড়িতে মোহররমের নফল রোযার বরাতে ঘটিল তা-ই। যত দিন দিনের বেলা পাকঘরের দরজা বন্ধ ছিল, তত দিন মোহররমের নফল রোযা প্রতাপ লইয়া আমাদের বাড়িতে রাজত্ব করিতেছিল। যেই ছাত্রত্বের হাজতে আমরা কয় ভাই হাজতি হইয়া রেহাই পাইলাম, অমনি গুরুতর অজুহাতের হাজতি দিন-দিন বাড়িয়া গেল। আমরা বড় হইয়া দেখিয়াছি, শেষ পর্যন্ত বাড়ির মুরুব্বি হিসাবে দাদাজী একাই রোযা রাখিতেন। আর মেয়েদের মধ্যে আমার মা এই নফল রোযা রাখিতেন।

দাদাজীর এন্তেকালের পর এই যিয়াফতের আচার ও ধুমধাম আস্তে আস্তে কমিয়া যায় এবং কয়েক বছর পরে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এর কারণ আমার বাপ-চাচার কৃপণতা বা মত পরিবর্তন ছিল না। ছিল অর্থাভাব। দাদাজীর এন্তেকালের পর আট-দশ বছরের মধ্যে আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। একদিকে শরিকানা ভাগে চাষাবাদে ফসলের উৎপত্তি কমিয়া যায়, অপরদিকে আমাদের লেখাপড়ার খরচ বাড়িয়া যায়।

যা হোক, দাদাজীর আমলে মোহররম পর্বে আমাদের বাড়িতে এত ধুম ধড়ক্কি হইলেও দুই ঈদে কিন্তু অমন বিশেষ কিছু হইত না। বকরিদে প্রথম প্রথম দুই-তিনটা ও পরে মাত্র একটা গরু কোরবানি হইত। মোহররম লইয়া এত হৈচৈ করায় অনেক ছাত্র-বন্ধু ও শিক্ষক সন্দেহ প্রকাশ করিতেন আমরা আগে শিয়া ছিলাম। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ আমার বড় দাদা গাজী সাহেব এবং তারপর আমার চাচা মুনশী ছমিরুদ্দিন ফরাযী সাহেব ঘোরতর শিয়াবিরোধী ছিলেন। শিয়াদিগকে কাফের বলিতে চাচাজীকে আমি নিজ কানে শুনিয়াছি।

অথচ মোহররম লইয়া ধুম-ধড়কির কারণ দাদাজীও বলিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, এটা বহুদিন হইতে এইভাবে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল।

## ১২. খেলাধুলার স্বাধীনতা

গান-বাজনা সম্বন্ধে আমার মুরুব্বিরা ঐরূপ কড়াকড়ি করিলেও খেলাধুলার ব্যাপারে তারা উদার ছিলেন। ঘোড়ায় চড়ার কথা আগেই লিখিয়াছি। এ ছাড়া আমরা শুকনার দিনে (অগ্রহায়ণ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত) মাঠে ব্যাটবল, ফুটবল, ডাংগুলি, কপাটি ইত্যাদি অনেক রকম খেলা খেলিতাম। ব্যাটবল মানে ক্রিকেট। আজকালের ছেলেদের মত আমরা ব্যাটবল কিনিতে পারিতাম না। নিজেরাই ব্যাট ও বল বানাইয়া লইতাম। দেবদারুগাছের চেলি অথবা ডাল কাটিয়া আগা চওড়া ও গোড়ায় হাতল করিয়া সুন্দর ব্যাট বানাইতাম। সুন্দর মানে তকালের জন্য সুন্দর। এটা ছিল প্রথম শ্রেণীর ব্যাট। সাধারণত এটাও জুটিত না। এক ফালি তক্তার একদিকে কাটিয়া ধরিবার মত একটা হাতল বানাইতে পারিলেই ব্যাট হইয়া গেল। আর বল? একটা শক্ত ভারী কাঠের গুলি বানাইয়া গাঁয়ের মুচেকে দিয়া তার উপর চামড়া সিলাই করাইয়া লইতাম। এটাই হইল আমাদের বল। এছাড়া কতগুলি লোহার চাকতি একত্রে করিয়া তার উপর খুব করিয়া নেকড়া জড়াইয়া গোল পিণ্ড বানাইতাম। এই গোল পিণ্ডের উপর মিহিন দড়ি দিয়া টাইপ করিয়া জাল বুনিতাম। তাতেও একরকম করিয়া শক্ত মযবুত ও টিকসই বল হইত। ত্রিকাঠি বা স্ট্যাম্প বানানো আরো সহজ ছিল। ত্রিকাঠি উচ্চারণে তিরিকাট ছিল আমাদের ক্রিকেটের বাংলা পরিভাষা। বাঁশের কাবারি বা ইঞ্চি অথবা সুপারিগাছের ফালা একদিকে চোখা করিয়া দুই জোড়া ত্রিকাঠি (তিন কাঠি) বানাইতাম। আমাদের আমলে পাড়াগাঁয়ে একদিক হইতে ওভারে-ওভারে বল করিবার নিয়ম ছিল না। দুই দিক হইতেই বল হইত। দুই দিকেই বৌলার, দুই দিকেই কিপার। খেলার গতিকে যেদিককার বৌলারের হাতে বল গিয়া পড়িত, সেদিক হইতেই বল চালনা হইত। আমাদের খেলার আরেকটা নিয়ম ছিল, আমরা মাথার উপর হইতে বল চালাইতাম না। বরঞ্চ হাত উঁচা করিয়া মাথা বা ঘাড়ের উপর হইতে বল মারিলে সেটা হইত ঢিল-মারা ‘নো বল’। আমাদের বল মারার কায়দা ছিল যাকে বলা যাইতে পারে আন্ডার হ্যান্ডবল মারা। ঝুলানো অবস্থায় হাতটা যতদূর সম্ভব পিছনে নিয়া ঐ ঝুলানোভাবেই অপরদিককার ত্রিকাঠি সই করিয়া বল নিক্ষেপ করা হইত।

ফুটবল সম্পর্কে কিন্তু অতটা আত্মনির্ভরশীল হওয়া সম্ভবও ছিল না, তার দরকারও হইত না। চামড়ার ফুটবল নিজ হাতে তৈয়ার করা কঠিন। কোনোমতে হারি-চাঁদা তুলিয়া তিন টাকা এক আনা জোগাড় করিতে পারিলেই তিন টাকার একটা তিন নম্বরের ফুটবল ও এক আনা দিয়া হুইসেল কেনা হইয়া যাইত। অনেক সময় হুইসেল ছাড়াও আমাদের খেলা হইত। রেফারি বুড়া ও শাহাদত এই দুই আঙুল মুখে ঢুকাইয়া জিভের চাপে সুন্দর হুইসেল মারিতে পারিত।

## ১৩. চুরুট-তামাকের কড়াকড়ি

তৎকালে পাড়াগাঁয়ে আমাদের সমবয়সীদের প্রায় সবাই তামাক খাইত। যারা চাষবাসের কাজ করিতেন, তাঁদের ছোট ছোট ছেলেরা বাপ-চাচার সামনেই তামাক খাইত। কাজে ব্যস্ত বাপ-চাচাঁদের তামাকটা ছেলেরাই সাজিয়া দিত। তামাক সাজিতে গিয়া নিজে দুই-এক টান খাইয়া লইত। ক্রমে এটা অনুমোদিত প্রথা হইয়া গিয়াছিল। একত্রে চাষবাস করিবার সময় এটা অপরিহার্য ছিল। একত্রে মাঠে কাজ করিবে, আর তামাক খাইবার সময় মুরুব্বিদের সম্মান দেখাইতে গিয়া গোপন করিবে, তার সময় ছিল না। সুবিধামত জায়গাও ছিল না। তবু অনেক ছেলে বাপ-চাচার সম্মানে একটু ঘুরিয়া

বসিয়া হুঁক্কায় টান দিত। এই প্রথাই পরে নইচার আড়ালে তামাক খাওয়া’ বলিয়া সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের বেলায় এটা হইবার ছিল না। কারণ আমাদের বাড়িতে তামাক খাওয়া একদম নিষিদ্ধ ছিল। দাদাজী তামাক খাওয়াকে একরূপ হারামই বলিতেন। কাজেকর্মে আচার-আচরণে তামাক খাওয়াকে তিনি হারামের থনে বেশি কড়া নজরে দেখিতেন। আমাদের দশ-পনের জন গৃহস্থির কামলার বেশির ভাগ ছিল তামাকখোর। তাদেরে তামাক না দিলে তারা কাজে জোর পাইত না। তাই বাপজী, চাচাজী ও গ্রামের মাতব্বরদের সুপারিশে কতকটা প্রয়োজনের তাগিদে দাদাজী কামলাদের বেলা তাঁর কড়াকড়ি শিথিল করিয়াছিলেন। কিন্তু আর সকলের বেলা খুব কড়া ছিলেন। ঘোরতর তামাকখোর বড় বড় আত্মীয়েরা আমাদের বাড়িতে আসিয়া তামাক ছাড়াই দিন কাটাইয়া যাইতেন। এ ব্যাপারে দাদাজীর কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না। মুনশী-মৌলবী, আলেম-ফাযেল ও সরকার মাতব্বর সকলের প্রতি সমান নির্দয় ব্যবহার করিতেন। বিদেশাগত মৌলবী-মওলানাদের মধ্যে দু’একজন তামাকখোর, আর প্রায় সকলেই সাদা পাতাখোর থাকিতেন। পানের সাথে জর্দা-মশল্লার মত শুকনা তামাক পাতা খাওয়াকেই সাদা পাতা। খাওয়া বলা হইত। দাদাজী তাঁদেরে আমাদের বাড়িতে তামাক খাইতে ত দিতেনই না, তার জানামতে সাদা পাতা খাওয়াও সম্ভব ছিল না। তামাক চুরুট খাওয়াকে তিনি গু খাওয়া বলিতেন। হুক্কার তামাক খাওয়াকে তিনি কাঁচা গু ও সাদা পাতা চুরুট খাওয়াকে শুকনা গু খাওয়া বলিতেন। দাদাজীর কঠোরতায় তারা কেউ দাদাজীর সামনে সাদা পাতাও খাইতেন না। একটু আড়ালে সরিয়া গিয়া খাইতেন। তামাকের অভাব অসহ্য হইলে কেউ কেউ কামলাদের কাছে চাহিয়া তাদেরই সাজা হুক্কায় দুই-এক দম কষিতেন।

ছেলেবেলার একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। একদিন নামাজের পরে এক মৌলবী সাহেব মসজিদে বসিয়াই ওয়ায করিতেছিলেন। ওয়ায করিতে করিতে তিনি মাঝে মাঝে পানের ডিবিয়া হইতে পানের খিলি বাহির করিয়া মুখে দিতেছিলেন। তিনি ছিলেন দিল্লি-ফেরতা বড় মওলানা। তিনি ছিলেন খুব ‘আম্বলী’ মানে তামাকের আদি। দাদাজীর মতামত তখনও তিনি জানিতেন না। দাদাজীর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, ‘ফরাযী সাহেব, আমার তামাক খাওয়ার আদত আছে। এক ছিলিম তামাকের হুকুম দিন। সমবেত মুসল্লিরা অবাক হইলেন। দাদাজীও বোধ হয় প্রথমে হকচকিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মুসল্লিদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের এক কামলাকে তিনি ভাল করিয়া তামাক সাজিয়া হুঁক্কাটা ধুইয়া-মুছিয়া আনিবার হুকুম দিলেন। কামলাটিও নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছু না বলিয়া তামাক সাজিয়া আনিতে বাহির হইয়া গেল। মওলানা সাহেব আবার ওয়ায শুরু করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কামলা হুক্কা হাতে মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চ স্বরে বলিল, “চাচা মিয়া, তামাক আনছি। ঐ কামলাটি ছিল বেশ বয়স্ক। সে দাদাজীরে চাচা মিয়া ডাকিত। দাদাজী তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘এইখানে। লৈয়া আয়।’

মওলানা সাহেব ঝটিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, না না, তুমি ভিতরে আইসো না। আমি বাইরে আইতেছি।’

দাদাজী পাশে বসা মওলানার চৌগার দামন ধরিয়া বলিলেন, না, না, মওলানা সাহেব, আপনি বাইরে যাইতে পারবেন না, এইভাবে বৈসাই তামাক খাইতে হৈব।’

এরপর দাদাজী ও মওলানা সাহেবের মধ্যে যে কথা-কাটাকাটি হইল তার শেষটায় মওলানা সাহেব তওবা করিয়া তামাক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

## ০৩. প্রাইমারি শিক্ষা-বাড়িতে

# দ্বিতীয় খণ্ড শিক্ষাজীবন

## অধ্যায় তিন প্রাইমারি শিক্ষা-বাড়িতে

১. চাচাজীর নিকট

চাচাজী মুনশী ছমিরুদ্দিন ফরাযী সাহেব আমাদের বৈঠকখানায় একটি ফ্রি মাদ্রাসা চালাইতেন। এটাকে মাদ্রাসাও বলিতে পারেন, মক্তবও বলিতে পারেন। পাঁচ-সাত বৎসরের শিশুরা বগদাদি কায়দা, আম সেপারা ও কোরআন শরিফ পড়িত; অন্যদিকে দাড়ি-মোচওয়ালা যুবকেরা রাহে নাজাত, মেফতাহুল জান্নাত, ফেকায়ে মোহাম্মদী, শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ এবং সাদীর ও ফরিদুদ্দিন আত্তারের পান্দেনামা, জামীর বাহার দানেশইত্যাদি উর্দু ফারসি কেতাবও পড়িত। মক্তবটি ফ্রি ছিল, মানে সকল দিকেই ফ্রি। বেতনও ছিল না, রেজিস্ট্রার হাজিরা বইও ছিল না। যার ইচ্ছা আসিয়া বসিয়া পড়িলেই হইত। যার যখন ইচ্ছা, উস্তাদজিকে বলিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। বসিবার জন্য কোনো বেঞ্চির সারি ছিল না। আমাদের বাহির বাড়ির বিশাল আটচালা ঘরের মধ্যের কোঠায় চারটা হইতে ছয়টা চৌকি (তখতপোশ) লাগালাগি এক কাতারে পাতা ছিল। তার খানিকটায় পাটি ও খানিকটাতে চাটাই বিছানো থাকিত। এদের বেশির ভাগই অতি পুরান ও টুটাফাটা। এই ভাঙ্গা পাটি-চাটাইর উপর বসিয়াই তালেবিলিমরা মাথা ঝুকাইয়া-ঝুকাইয়া পড়া মুখস্থ করিত। চৌকির কাতারের সামনে একটা ডানা ভাঙ্গা কুরসিতে বসিয়া চাচাজী ছাত্রদেরে পড়াইতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, কোনো তালেবিলিমকেই নিজের আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া পড়া দিতে হইত না। পড়ায় ভুল করিলে অথবা পুরান সবক শেষ করিয়া নূতন সবক নিতে হইলে চাচাজী নিজের আসনে বসিয়াই তা বলিয়া দিতেন। সব কেতাবই যেন তার মুখস্থ ছিল। চাচাজীর হাতে থাকিত একটা বাঁশের কঞ্চি অথবা ছিটকি লতার ডাল। ডালই হোক বা কঞ্চি হোক, ওটাকে ছিটকিই বলা হইত। ঐ ছিটকির উদ্দেশ্য ছিল, গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করা অর্থাৎ অমনোযোগী ছাত্রকে পিটাইয়া মনোযাগী করা। সে উদ্দেশ্যে উদ্যত-ফণা সাপের মত সারা দিন ছিটকিটি অমনোযাগী ছাত্রের পিঠ বা হাতের তলা তালাশ করিয়া করিয়া উঁকিঝুঁকি পাড়িত। কিন্তু আমার জীবনে চাচাজীকে মাত্র তিনবার এ ছিটকিটি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। আমাদের গ্রামের রেকাতুল্লাহ ও শহর আলী নামক দুইটি ছাত্রের পিঠে দুইবার এবং আমার নিজের পাছায় একবার; মোটমাট এই তিনবার মাত্র। আমার জন্য আর দরকারও ছিল না। ঐ একটি আঘাতের দাগই বহুদিন শুধু আমার শরীরে নয়, মনেও তাজা ছিল।

যা হোক, পাঁচ বছর বয়সে আমি চাচাজীর মক্তবে ভর্তি হইলাম, মানে অযু করিয়া পাকসাফ হইয়া তহবন্দ পরা অবস্থায় তালেবিলিমদের কাতারের এক কোণে বসিয়া পড়িলাম। আমার বড় দুই ভাই আগে হইতেই মক্তবের তালেবিলিম ছিলেন। কিন্তু আমি অল্প দিনেই তাঁদের সমান পড়া পড়িয়া ফেলিলাম। আমি প্রতিদিন একটার বদলে দুইটা নয়া সবক লইতাম। অল্প দিনেই আমি বগদাদি কায়দা শেষ করিয়া ফেলিলাম। তেলকা ও হালকা উভয় রকম ত্যদিকে আমি উত্তীর্ণ হইলাম।

তেলকা মানে তীরের ফলার অর্ধেকের আকারে ভাঁজ করা চার পরত কাগজের একটি টুকরা। এর এক দিক মোটা, অপর দিক সুইয়ের মত ধারালো। ডান হাতের বুড়া ও শাহাদত আঙুলের ফাঁকে তেলকার মোটা অংশটা ধরিয়া চোখা অংশ দিয়া হরফ দেখানোই তেলকার কাজ। আরবি হরফ সংযুক্ত হইলে একটিমাত্র রেখার মধ্যে তিন চারটি হরফ লুকাইয়া থাকিতে পারে। শুধু নোকতা দেখিয়া সেই হরফগুলিকে চিনিতে হয়। আঙুলের মাথা দিয়া সে অক্ষর দেখানো যায় না। কারণ আঙুলের মাথা হরফের চেয়ে অনেক বেশি মোটা। এ কাজ করিতে হয় তেলকার সূচ্যগ্র মাথা দিয়া। এটা করিতে পারিলেই তালেবিলিম তেলকা পাশ করিয়াছে বলিতে হইবে। আর হালকা হইলে একটি কাগজের টুকরা, তার মাঝখানে একটা ছিদ্র। সকলেরই বোধ হয় মনে আছে, শিশুকালে বর্ণমালা পড়িবার সময় তারা আলিফ, বে, তে, ক-খ-গ বা এ-বি-সি গোড়া হইতে পড়িয়াও যাইতে পারিতেন। হরফও চিনিতেন। কিন্তু মাঝখান হইতে কোনো হরফ দেখাইয়া তার নাম পুছ করিলেই ঠেকিয়া যাইতেন। আগের পিছের হরফ না দেখিয়া যেকোনোও হরফ চিনিতে পারিলেই বুঝা গেল এইবার তালেবিলিমের অক্ষরজ্ঞান পাকা হইয়াছে। এই পরীক্ষাই হালকার কাজ। কেতাবের পৃষ্ঠায় হালকা নামক কাগজের টুকরাটি স্থাপন করিলে একটিমাত্র হরফ দেখা যাইত, ডাইনে বাঁয়ের উপর নিচের আর কোনও হরফ দেখা যাইত না। এ অবস্থায় যে এ হরফটি চিনিতে পারিত, কেবল সেই ছাত্রের হরফজ্ঞান পূর্ণ হইয়াছে।

আমি সমবয়সী এবং সহপাঠীদের সকলের আগে তেলকা ও হালকা পাশ করিয়া আম সেপারার সবক লইলাম। কয়েক মাসের মধ্যে আমি কোরআন শরিফে সবক লইলাম। আমপারাও কোরআন শরিফের অংশ বটে, কিন্তু ওটা কোরআন শরিফের সর্বশেষ পারা। উহার সুরাগুলি ছোট ছোট বলিয়া আলাদা করিয়া ছাপা হইয়াছে। এবং নাম দেওয়া হইয়াছে আমপারা। স্পষ্টতই এটা করা হইয়াছে কোরআন শরিফ পড়ার প্রথম পাঠ হিসাবে। কোরআন শরিফের ত্রিশটা পারার মধ্যে একমাত্র শেষ পারাটিরই বিশেষ নাম রাখা হইয়াছে। 'আমপারা। অর্থ করা যায় সাধারণ পাঠ। ইংরাজিতে বলা যায় জেনারেল লেসন। অপর উনত্রিশটি পারার কোনোটারই বিশেষ নাম নাই। প্রথম পাঠ হিসাবে সুরাটির শুধু বিশেষ নামকরণই করা হয় নাই, তার সুরাগুলির স্থানিক মানও একদম পাল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোরআন শরিফের শেষ পারা শুরু হইয়াছে সুরা নাবা' দিয়া। শেষ হইয়াছে সুরা নাস দিয়া। কিন্তু আমপারা শুরু হইয়াছে সুরা নাস' দিয়া। শেষ হইয়াছে সুরা নাবা' দিয়া। কোরআন শরিফে সুরাসমূহের স্থানিক মান বড় হইতে ছোট। আমপারায় ছোট হইতে বড়। প্রাইমারি ছাত্রদের সুবিধার জন্যই এটা করা হইয়াছে। তারা ছোট ছোট সুরা পড়িয়া ক্রমে ক্রমে বড় বড় সুরা পড়িতে শুরু করিবে। আমপারার এই স্বাতন্ত্রের জন্যই এটি পড়া শুরু করাকেই কোরআন শরিফে সবক লওয়া বলা। হয় না। শুধু 'আলিফ-লাম-মিম', অর্থাৎ সুরা বাকারা পড়িতে শুরু করার নামই কোরআন শরিফ পড়া আরম্ভ করা। আমার বয়স সাত বছর পূর্ণ হইবার অনেক আগেই আমি কোরআন শরিফ মতন পড়া শেষ করিলাম। মতন পড়া' মানে অর্থ না বুঝিয়া কোরআন পড়া। আমি যেদিন কোরআন শরিফে প্রথম সবক লইলাম এবং যেদিন খতম করিলাম, উভয় দিনই আমাদের বাড়িতে ছোটখাটো মেবানি হইয়াছিল। ভাইদের বেলাও তা-ই হইয়াছিল। মেহমান খাওয়ানোকেই মেবানি বলা হইত। তৎকালে অবস্থাপন্ন সকলেই তা করিতেন। আমার বড় দুই ভাইয়ের বেলা সেটা আগে হইয়াছিল। তৎকালে লেখা ও পড়া ছিল দুইটা আলাদা কাজ। বই-পুস্তক হাতে পড়ুয়ারারে পথেঘাটে দেখিলেই বুড়ারা পুছ করিতেন, 'তুমি লেখো, না পড়ো? এ প্রশ্নের কারণ ছিল। মক্তবে শুধু পড়া হইত। লেখা হইত পাঠশালায়। তার মানে বাংলা পড়াইতে লেখার দরকার হইত। আরবি-

ফারসি-উর্দু পড়ায় লেখার দরকার হইত না। মানে, লেখা কাজে লাগিত না অথচ মাদ্রাসায় আরবি ফারসি লেখা ও শিখানো হইত। মতন' কোরআন শরিফ, মসলা-মাসায়েলের রাহে নাজাত বয়াতের গুলো-বুস্তা পড়িতে লেখার কোনো দরকার হয় না। তৎকালে আমাদের বাড়িতে ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন পড়ুয়া অনেক ছিলেন, যারা লিখিতে জানিতেন না বাড়ির মেয়েলোকেরাও অনেকে কোরআন তেলাওয়াত করিতে পারিতেন। বস্তুত আমাদের বাড়ির মুরুব্বিদের মধ্যে একমাত্র চাচাজীই পড়া ও লেখা দুটোই জানিতেন। শুধু লেখা জানিতেন না, স্থানীয় মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি পড়িয়া মুনশী' হওয়া ছাড়াও চাচাজী তত্ত্বালের উচ্চ-প্রাইমারি পাশ করিয়াছিলেন। তাঁর বাংলা ও আরবি হাতের লেখা ছিল অতি চমৎকার, একদম ছাপার হরফ। চিঠিপত্র, জমা খরচ, বছরিয়া চাকররার হিসাবের খাতা তিনি সাধারণ ভাঙা হাতেই লিখিতেন। সে লেখাও তার খুবই সুন্দর ছিল। সে জন্য লোকেরা তাঁকে দিয়া জোরাজুরি করিয়া তমসুক ইত্যাদি লেখাইত। কিন্তু ওসব দলিলে সুদের কথা থাকে। বলিয়া তিনি পরে দলিল তমসুক লেখা ছাড়িয়া দেন।

তাঁর আরবি-ফারসি লেখা এমনকি বাংলা লেখাও ছিল দেখিবার মত। এমন লেখা আনেক কাগজপত্র, ফর্দ ও সিলাই করা জুজ-গাঁথা অনেক খাতা আমরা ছেলেবেলা চাচাজীর কিতাবের বস্তানি ও বাক্সে অনেক দেখিয়াছি। সেগুলি ছিল আরবি-ফারসি-উর্দু ও বাংলা বর্ণমালা, বয়েত-কবিতা অথবা অনেক গদ্য বাক্য। ওসবই তিনি লিখিয়াছিলেন বহু আগে। কিন্তু তখনও সেগুলি ছিল ঝলমলা চকচকা। তৎকালে আজকালের মত বুব্ল্যাকের বোতল বা বড়ি পাওয়া যাইত না। পড়ুয়ারার নিজের হাতে ‘ছিয়াই’ বা কালি বানাইয়া লইতে হইত। চাচাজীরে নিজ হাতে ‘ছিয়াই’ বানাইতে আমরা দেখিয়াছি। নিজেরাও চেষ্টা করিয়াছি। চাউল পুড়া-ভাজার গুড়া, ডেকচি-পাতিলের চুলার কালি ইত্যাদি একসাথে পিষিয়া লাউ-কুমড়ার পাতার রসের সঙ্গে মিশাইয়া এই কালি তৈয়ার করা হইত।

২. ইয়াকুব মুনশীর নিকট

চাচাজীর এই সব গুণ ছিল বলিয়াই বোধ হয় তার মক্তবে পড়া ও লেখা দুইটাই ছিল। তবে লেখাটা বাধ্যতামূলক ছিল না। চাচাজীর মাদ্রাসার ছাত্ররাও ছিল যেমন অনিয়মিত, স্বয়ং চাচাজীও ছিলেন তেমনি অনিয়মিত। তিনি আত্মীয় বাড়িতে বা শহরে বেড়াইতে গেলে তিনি না ফিরা পর্যন্ত মাদ্রাসা বন্ধ থাকিত। তাতে অনেক সময় একনাগাড়ে দুই-তিন দিন পড়াশোনা হইত না। পড়াশোনায় আমার যেহান ভাল এ কথা সবাই বলিতেন। স্বয়ং চাচাজী। ত বলিতেনই। আমাদের বাড়িতে আগন্তুক আলেম-ফাযেলও সকলেই এক বাক্যে-ই বলিতেন। বোধ হয়, এতেই উৎসাহিত হইয়া দাদাজী চাচাজীর মাদ্রাসায় একজন বেতন করা মৌলবী রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। মুনশী ইয়াকুব আলী সুধারামী নামে একজন নোয়াখালীর মৌলবী সাহেব এই সময় আমাদের বাড়ির মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। আজকাল যেমন সবাইকে যাহা তাহা মৌলবী-মওলানা বলা হয়, তৎকালে তা হইত না। আরবি-ফারসিতে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সনদ না পাইলে কাউকে মৌলবী বলা হইত না। তৎকালে আরবি-ফারসিতে এমন সব পণ্ডিত লোককে মুনশী বলা হইত, যাদের সমান জ্ঞান আজকাল অনেক তথাকথিত মওলানারও দেখা যায় না। এই কারণে মৌলবী ইয়াকুব আলী সুধারামী আমাদের অঞ্চলে ইয়াকুব মুনশী নামেই পরিচিত ছিলেন। উভয়েই মুনশী হইলেও সুধারামী সাহেব চাচাজীর চেয়ে সকল দিকেই লায়েক ছিলেন। তার মাহিনা নির্ধারিত হইল পাঁচ

টাকা। এই পাঁচ টাকা বাড়াইয়া কোনো দিন ছয় টাকা করা হয় নাই। কিন্তু মৌলবী সাহেব ঐ বেতনেই তিন বছরকাল আমাদের মাদ্রাসায় পড়াইয়াছিলেন। কারণ তার মাসিক আয় ঐ পাঁচ টাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অনেক বেশি ছিল। আমার এক নানা মুনশী ওয়ালি মাহমুদ মিয়্যা আমাদের বাড়ির মসজিদের স্থায়ী ইমাম ও সারা গায়ের মোল্লা ছিলেন। আঞ্চলিক মোল্লার কাজ ছিল বিয়া পড়ানো, সদকা-আকিকা-কোরবানির গরু-খাসি যবেহ করা, মউতার জানাযা পড়া এবং খতম পড়া। জানাযার মোল্লাকি ছাড়া সদকা-আকিকা-কোরবানির গরু-খাসির চামড়া মোল্লার প্রাপ্য ছিল। এতে মোল্লাজির বার্ষিক আয় খুব মোটা রকমের ছিল। আমার নানা মিয়্যা সাহেব অতিবৃদ্ধ হওয়ায় এক ইমামতি ছাড়া তার আর সব কাজ ও তাদের পাওনা মৌ. ইয়াকুব আলীর অনুকূলে ছাড়িয়া দেন। তাতে মৌলবী সাহেব যথেষ্ট রোযগার করিয়া মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইতে পারিতেন। একাদিক্রমে তিন বছর আমাদের বাড়িতে শিক্ষকতা করিয়া অবশেষে তিনি দেশে চলিয়া যান। শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিলেও যত দিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন প্রতিবছর রমযান মাসে তিনি আমাদের বাড়ি আসিতেন এবং মাসাবধি থাকিয়া গ্রামময় দাওয়াত খাইয়া বেশ টাকা পয়সা লইয়া দেশে ফিরিতেন। ফলত, এ গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা প্রায় সকলেই সুধারামী মুনশী সাহেবের ছাত্র ছিলেন। কাজেই আমাদের গ্রামে তাঁর কদর ও দাওয়াতের কোনো অভাব ছিল না।

'সুধারামী মুনশী' সাহেব আমাদের মক্তবের ভার নেওয়ার পর সেখানে নিয়মমত হাজিরা বই করা হইল। দহম, নহম হাতম, হাতম এই চারিটি শ্রেণীর ছাত্রদের আলাদা করিয়া বসানো হইল। সুধারামী উপরের দুই ক্লাস এবং চাচাজী নিচের দুই ক্লাস পড়াইতেন। আমরা কাজেই উপরের শ্রেণীর ছাত্র হইলাম। সুধারামী সাহেব যত দিন আমাদেরে আরবি-ফারসি পড়াইয়াছেন, তত দিন চাচাজীর নিকট আর পড়ি নাই। কিন্তু ঐ সময় রাত্রে চাচাজীর কাছে বাংলা পড়িতাম। তিনি বর্ণ বানান শিক্ষানামক একখানি চটি বই আমাদের জন্য কিনিয়াছিলেন। চাচাজী মাদ্রাসার জমাতে চাহারম পড়ার পর উচ্চ প্রাইমারি পাশ করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা তার বাক্সে পি ঘোষের পাটিগণিত, গোরীশংকরের বীজগণিত মলাটছেঁড়া ত্রিকোণমিতি বই দেখিয়াছি। পরে আমরা স্কুলে ইংরাজি পড়াশোনা শুরু করিলে চাচাজী নিজে রাজভাষা নামে একখানি বাংলা বই কিনিয়া কিছু কিছু ইংরাজি শিখাইয়াছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষার জন্য তৎকালে ইহা নামকরা পুস্তক ছিল।

সুধারামী সাহেবের পরে পরপর দুইজন মৌলবী আমাদের বাড়ির মাদ্রাসায় মুদাররেসি করিয়াছিলেন। কিন্তু এঁদের দুইজনের একজনও আমাদের বাড়িতে থাকিতেন না। এঁদের প্রথমজন ছিলেন মৌলবী মমতাযুদ্দিন। তিনি থাকিতেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেবদের বাড়িতে। ভোরের বেলা তিনি শামসুদ্দিন, তাঁর ভাই সদরুদ্দিন ও পাড়ার সমস্ত তালেবিলিমসহ দল বাঁধিয়া আসিতেন এবং ছাত্রদের দশটার সময় পাঠশালায় পড়িতে যাওয়ার সুবিধার জন্য যথাসময়ে মাদ্রাসা ছুটি দিয়া দল-বলে চলিয়া যাইতেন। ইতিমধ্যে ধানীখোলা জমিদার কাছারিতে যে একটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, সে কথা একটু পরেই বলিতেছি।

বছরখানেকের বেশি মৌলবী মমতাযুদ্দিন আমাদের বাড়ির মাদ্রাসায় ছিলেন না। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষক হন মৌলবী আবদুল আজিজ। এঁর আমলেই আমাদের বাড়ির মাদ্রাসা উঠিয়া যায়। এই সময় আমরা দুই ভাই ও শামসুদ্দিনরা দুই ভাই ধানীখোলা পাঠশালায় পড়া শেষ করি। শামসুদ্দিনরা চলিয়া যায় শহরে। আমরা চলিয়া যাই দরিরামপুর মাইনর

স্কুলে। আমাদের অভাবে আমার মুরুব্বিরা মাদ্রাসা চালাইতে আর তেমন উৎসাহ বোধ করিলেন না। বোধ হয় প্রধানত সেই কারণেই আস্তে আস্তে শিক্ষক ও অভিভাবকদের অনুৎসাহে মাদ্রাসা উঠিয়া যায়।

৩. পাঠশালায়

ইতিপূর্বে সুধারামী সাহেবের আমলেই আমাদের গ্রামে জমিদার কাছারিতে একটি পাঠশালা স্থাপিত হয়। এই পাঠশালা স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। আমাদের গ্রামের অন্যতম প্রধান মাতব্বর ওসমান আলী সরকার (পরবর্তীকালে খান সাহেব)। ইনি আমাদের দুই ভাইকেই এই পাঠশালায় দিতে দাদাজীকে ধরিয়া পড়েন। তখন আমরা তিন ভাই বাড়ির মাদ্রাসায় পড়িতাম। তার মধ্যে মাত্র একজনকে বাংলা লাইনে দিয়া অপর দুই ভাইকে দীনী লাইনে রাখার জন্য আমার মুরুব্বিরা জিদ করেন। কিন্তু ওসমান আলী সাহেবের পীড়াপীড়িতে এবং দাদাজীর সমর্থনে আমরা দুই ভাই (আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠ মোহাম্মদ মকিম আলী ও আমি) পাঠশালায় ভর্তি হই। পাঠশালায় যাওয়ার সুবিধার জন্য আমাদের বাড়ির মাদ্রাসার সময় বদলাইয়া দুপুর হইতে সকালে আনা হয়। এই সময় আমরা ফারসি শেখ সাদী ও ফরিদুদ্দিন আত্তারের পান্দেনামা ও শেখ সাদীর গোলেস্ত-বুস্তা, উর্দু রাহেনাজাত, মেফতাহুল জান্নাত ও ফেকায়ে মোহাম্মদী পড়িতেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুযদার ফাইয়ুসনামে ব্যাকরণের বইও পড়িতেছিলাম!

জমিদার কাছারিরই একটি বাড়তি ঘরে আমাদের এই নয়া পাঠশালা শুরু হয়। প্রথমে কাছারির অন্যতম নায়েব বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরা নাথ চক্রবর্তীর আত্মীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র চক্রবর্তী আমাদের পাঠশালার শিক্ষক হন। কিন্তু দু-মাস যাইতেই জগদীশ বাবু অন্যত্র চলিয়া যান। তখন আমাদের গ্রামের অন্যতম প্রধান মাতব্বর ও তালুকদার শ্রীযুক্ত উমাচরণ সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র সরকার আমাদের শিক্ষক হইয়া আসেন। জগদীশ বাবু ছিলেন তৎকালের এন্ট্রান্স পড়া যুবক। তিনি উৎসাহী কর্মী, মিষ্টভাষী, সুপুরুষ, মধুর-কণ্ঠী গায়ক ছিলেন। অতি অল্প দিনে তিনি ছাত্রদের মন জয় করিলেন। পড়াশোনা ও খেলাধুলায় জগদীশবাবু আমাদের প্রাণে বিপুল সাড়া জাগাইলেন। বাংলা, অঙ্ক ও শুভঙ্করী শিক্ষাদান ছাড়া তিনি পাঠশালায় ড্রয়িং ও ড্রিলের আমদানি করিলেন। এর উপর তিনি সপ্তাহে দুই এক দিন ইংরাজি পড়াইতে লাগিলেন। তিনি আমাদের দিয়া ওয়ার্ডবুক অথবা স্পেলিং বুক নামে এক আনা দামের বই কিনাইলেন। ইংরাজি পড়া ও চিত্র অঙ্কন করা নিয়া আমাদের বাড়িতে কয়েক দিন মুরুব্বিদের দরবার হইল। শেষ পর্যন্ত ইংরাজি পড়ার এবং মানুষের মূর্তি ছাড়া অন্য রকম চিত্র আঁকিবার অনুমতি পাওয়া গেল।

৪. স্বদেশি ধুতি

এটা ছিল ইং ১৯০৬ সাল। এই সময় স্বদেশি আন্দোলন ও বিলাতী বয়কট শুরু হয়। কিন্তু আমরা অত শত জানিতাম না। যা জানিতাম তা এই যে, আমাদের মাস্টার মশায়, আমাদেরে স্বদেশি ধুতি পরিতে বাধ্য করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, তৎকালে মুসলমানদের মধ্যেও সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাক ছিল ধুতি। মুনশী-মৌলবীরা অবশ্য গায়ে লম্বা কোর্তা ও পরনে পাজামা অথবা তহবন্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মুনশী-মৌলবী নন এমন সব মুসলমান ভদ্রলোকেরা ধুতি পাঞ্জাবি শার্ট এবং শার্ট পাঞ্জাবির উপর গরমের দিনে ঠাণ্ডা কোট ও শীতের দিনে গরম কোট পরিতেন। ধুতি

শার্ট কোটের উপর দামি পশমি শাল পরিয়া তার উপর লাল তুর্কি টুপি পরিতে তৎকালে আমার অনেক মুরুব্বিকেই দেখিয়াছি। চাচাজী মুনশী ছিলেন বলিয়া তিনি সাধারণত তহবন্দের উপর লম্বা কোর্তা পরিতেন। কিন্তু দাদা ও বাপজী মুনশী বা মৌলবী ছিলেন না বলিয়া বাড়িতে যদিও তহবন্দ পরিয়াই থাকিতেন, কিন্তু হাটে-বাজারে ও বিবাহ-মজলিসে যাইবার কালে তারাও ধুতি পরিয়াই যাইতেন। তবে তাঁদেরে পাড়ওয়ালা ধুতি পরিতে খুব কমই দেখিয়াছি। সাধারণত তারা চুলপাড় ধুতি পরিতেন। তালের আঁশের টুপি, ইরানি টুপি বা সাদা গোল টুপিই তাঁদের শিরস্ত্রাণ ছিল।

কিন্তু আমরা মাদ্রাসার যাইবার সময় তহবন্দ ও পাঠশালায় যাইবার সময় ধুতি ও মাথায় লাল তুর্কি টুপি পরিয়া যাইতাম। এটা তস্কালের নিয়ম ছিল। তহবন্দ পরিয়া পাঠশালায় যাওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করিতে পারিতেন না। আমাদের মাস্টার মশায় যখন জোর করিয়া আমাদেরে স্বদেশি ধুতি পরাইলেন, তখন আমরা মনে মনে মাস্টার মশায়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলাম। আমাদের অসন্তোষের কারণ ছিল দুইটি। এক. স্বদেশি ধুতি ছিল বিলাতী ধুতির চেয়ে অনেক মোটা ঘবসা ও খসখসা। দুই. স্বদেশি ধুতির পাড়ের রং ছিল একেবারে কাঁচা। প্রথম ধাপেই পাড়ের রং উঠিয়া গোটা ধুতিটাতেই ছাকা ছাকা রং লাগিয়া যাইত। কাঁচা রঙের চিরন্তন বিশেষত্ব এই যে রং আসল জায়গা হইতে উঠিয়া অন্য জায়গায় লাগিলেই সেটা পাকা হইয়া যায়। সেখান হইতে তাকে আর হাজার চেষ্টায়ও তোলা যায় না। একশ্রেণির লোক আছে যারা ভাল কাজ করিতে পারে না, কিন্তু কুকার্যের উস্তাদ। কাঁচা রঙের স্বভাবও তা-ই। নিজের জায়গায় যে কাঁচা বটে, কিন্তু বেজায়গায় সে একদম পাকা। বিলাতী ধুতির পাড়ের রং এত পাকা ছিল যে, ধুতিটা পুরাতন হইয়া ফাটিয়া-ছিঁড়িয়া যাওয়ার পরও পাড়ের রংটা চকচক করিত। এই পাকা রঙের পাড় দিয়া অনেক কাজ হইত। পক্ষান্তরে বিলাতী ধুতি ছিল মিহিন ও মসৃণ। পরিতে কত আরাম। সে স্থলে দেশি ধুতিতে গায়ের চামড়া কুটকুট করিত।

এমন মোলায়েম মিহিন বিলাতী ধুতি ফেলিয়া যেদিন মাস্টার মশায়ের হুকুমে এবং একরকম যবরদস্তিতে ঘবসা স্বদেশি ধুতি পরিতে বাধ্য হইলাম, সেটা ছিল আমাদের একটা দুঃখের দিন। কিন্তু দুইটা কারণে আমরা বিনা প্রতিবাদে এই দুঃখ বরণ করিলাম। প্রথমত, মাস্টার মশায় অত বড় ফিটবাবু হইয়াও নিজেও ঐ মোটা ঘবসা স্বদেশি ধুতি পরিতেন। দ্বিতীয়ত, তৎকালে উস্তাদকে আমরা বাপ-মার মতই মুরুব্বির গুরুজন মনে করিতাম। তাদের কাজ না পছন্দ করা বা তাদের কথায় 'না' বলা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

## ৫. পাঠ্য বিষয়

আগেই বলিয়াছি, পাঠশালায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাদ্রাসার শিক্ষাও চলিতে লাগিল। সকালে উঠিয়া ফযরের নামাজ পড়িয়াই মাদ্রাসায় পড়িতে বসিতাম। ফাঁক পাইলে এই সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে চিড়া মুড়ি বা খই পিঠা পুঁজিয়া নাশতা করিয়া লইতাম। না হইলে বিনা নাশতাতেই মাদ্রাসায় বসিতাম। এক প্রহর বেলা হইতেই মাদ্রাসা ছুটি হইয়া যাইত। গোসল খাওয়া সারিয়া পাঠশালায় যাইতাম। বাড়িতে ঘড়ি ছিল না। কিন্তু বাড়ির মুরুব্বিদের সকলের, এমনকি মেয়েদেরও, এমন নিখুঁত সময়ের আন্দাজ ছিল যে ঠিক দশটার সময় পাঠশালায় হাজির হইতাম। অবশ্য পাঠশালাতেও ঘড়ি ছিল না। কিন্তু কাছারিতে বড় দেওয়াল ঘড়ি। ছিল। সেটা দেখিয়া দারওয়ান ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেল পিটাইয়া সারা গায়ে সময় ঘোষণা করিত। সাড়ে দশটা হইতে চারটা

পর্যন্ত পাঠশালা বসিত। মাঝখানে আধঘণ্টা লেইজার বাদে মোট পাঁচ ঘণ্টা পড়া হইত। ১৯০৬ সালে যখন আমি প্রথম পাঠশালায় ভর্তি হই, তখন আমার বয়স আট বছর। বাড়ির মাদ্রাসায় আমি তখন মতন কোরআন শেষ করিয়া ফেকায়ে মোহাম্মদী, রাহেনোজাত, শেখ সাদীর পান্দেনামা ও গুলিস্তাঁ পড়িতেছি। যদিও আমাদের বাড়ির মাদ্রাসায় কোনো জমাত ছিল না, তথাপি চাচাজী ও মৌলবী সাহেবরা বলিতেন আমি জমাতে দহমের দরস পড়িতেছি। এই সময় পাঠশালায় 'গ' মিতি, 'খ'-মিতি ও 'ক'-মিতি এই তিনটা শিশু শ্রেণী ও তারপর ১ম ও ২য় শ্রেণী এই পাঁচ বছরের কোর্স ছিল। আমরা দুই ভাইকে প্রথমে 'গ'-মিতিতে ভর্তি করা হইলেও বাড়িতে আমাদের বর্ণ পরিচয় হইয়াছিল বলিয়া তিন মাস পরে 'খ'-মিতি এবং ছয় মাস পরে 'ক' মিতিতে আমাদের প্রমোশন দেওয়া হইল। 'ক'-মিতিতে আমরা এক বছর পড়িলাম এবং এখানেই বাংলা সাহিত্য, অঙ্ক, শুভঙ্করী ও 'ওয়ার্ডবুক' পড়িলাম। সাহিত্য মানে বোধোদয় ও অঙ্কের নামতা, সরল যোগ-বিয়োগ এবং শুভঙ্করী আর্য্যা এই সব পড়িতাম। মাদ্রাসায় তিন ঘণ্টা সময়ে একটি হিন্দি মানে, উর্দু বই, দুইটা-দুইটা ফারসি বই পড়িতাম ও দুপুরে পাঠশালায় পাঁচ ঘণ্টা পড়া হইত। বাড়িতে পড়িবার সময় ছিল মগরেবের ও এশার নামাজের মধ্যেকার দুই ঘণ্টা সময়। এশার নামাজের পরই খাইয়া-দাইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। পরের বছর যখন আমি পাঠশালায় ১ম শ্রেণীতে উঠিলাম, তখন মাদ্রাসায় জমাতে নহমে উঠিলাম। জমাতে নহমে সাদীর বুস্তা, ফরিদুদ্দিন আত্তারের পান্দেনামা ও ফেকায়ে মোহাম্মদীর বৃহত্তর অংশ ছাড়াও নহু সরফ ও মুসদার ফাইউস নামে দুইখানা আরবি ব্যাকরণের বই (উর্দুতে লেখা) পড়িতে হইত। পাঠশালায় প্রথম শ্রেণীতে কঠিনতম সাহিত্য, জটিলতর অঙ্ক ও শুভঙ্করী ছাড়া এই সময় বিজ্ঞান প্রবেশ নামক একখানা বিজ্ঞানের বই এবং শরীর পালন নামক একখানা স্বাস্থ্য বইও আমাদের পাঠ্য হয়। এর উপর ড্রিল-ড্রইং ত ছিলই। তৎকালে আমার মত আট-নয় বছরের শিশুর পক্ষে এতগুলি ভাষা ও বিষয় শিক্ষা খুব ভারী বোধ। হয় নাই।

আমি 'ক'-মিতি হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার অল্প দিন পরেই মাস্টার। মশায় জগদীশ বাবু ছুটি নেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীনেশ চন্দ্র সরকার বড় ভাইর স্থলে একটিনি (এ্যাটিং) করিতে আসেন। জগদীশ বাবু তৎকালে আমাদের অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁর গলা অপূর্ব রকম মিঠা ছিল। কলের গানে গান গাইবার জন্য (গ্রামোফোনে রেকর্ড করাইবার জন্য) তিনি কলিকাতা না কোথায় চলিয়া যান, আর মাস্টারিতে যোগ দেন নাই। দীনেশ বাবুও এন্ট্রেন্স ফেল করিয়া হোমিওপ্যাথিক পড়িতে যান। আমাদের গ্রামের যশস্বী শিক্ষক এতদঞ্চলে প্রায় সকল লোকের উস্তাদ আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেব এই সময় আমাদের শিক্ষক হইয়া আসেন। ইতিপূর্বে পাশের গ্রাম। বৈলরের পাঠশালায় তিনি বহুকাল ধরিয়া শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছিলেন। নিচে লেখা ঘটনাসমূহের কারণে বাধ্য হইয়াই তিনি বৈলর পাঠশালা ছাড়িয়া ধানীখোলার শিক্ষক হইয়া আসেন।

### ৬. ধানীখোলা-বৈলর বিরোধ

বৈলর ও ধানীখোলা পাশাপাশি দুইটি বড় গ্রাম। মাঝখানে সুতোয়া নদী। নদীর একপারে বৈলরের জমিদারবাড়ি ও তৎসংলগ্ন বৈলরের বাজার। নদীর অপর পারে মুক্তগাছার জমিদারদের তিন হিস্যার কাছারি এবং তৎসংলগ্ন বাজার। দুই বাজারই যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী। তৎকালে সুতোয়া নদীর অবস্থা বর্তমানের মত শোচনীয় ছিল না। বার মাস নৌকা চলাচল করিত। বিশেষত, বর্ষাকালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বর্মী, ভৈরব ও চানপুর হইতে মালপত্র লইয়া বড় বড় নৌকা এই নদী দিয়া চলাচল

করিত। আমরা ছেলেবেলা বৈলর ও ধানীখোলা বাজারের ঘাটে বড় বড় নৌকা বাঁধা দেখিয়াছি। বাজারের মহাজনদের দোকানের মাল : লোহা, টিন, ধান, চাউল, হাঁড়ি, পাতিল, কড়াই এই সমস্ত নৌকা হইতে ওঠা-নামা করিতে দেখিয়াছি।

মোটকথা, নদীর দুই পারের দুইটা বাজারই সরগরম অথচ নদী। পারাপারের ব্যবস্থা নাই। জিলা বোর্ডের বা লোক্যাল বোর্ডের তরফ হইতে কোনো পোল বা গোদারা নাই। জমিদারদের তরফ হইতেও না। শুধু হাটবারে জমিদারপক্ষ হইতে হাটুরিয়াদের পারাপারের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হইত। বৈলর বাজারের হাট বসিত শনি ও বুধবারে। ধানীখোলার হাট বসিত শুক্রবার ও মঙ্গলবারে। কাজেই সপ্তাহের মধ্যে চার দিনই জমিদারপক্ষ হইতে নৌকার ব্যবস্থা থাকিত। কিন্তু তাতেও পাবলিকের দুর্দশা দূর হইত না। কারণ অ-হাটের তিন দিন রবি, সোম ও বিষুদবার নদী পারাপারের কোনোই ব্যবস্থা। ছিল না। হাটবারের চার দিনও শুধু বিকাল ও সন্ধ্যাবেলা জমিদারদের নৌকা পারাপার হইত।

কিন্তু নৌকাগুলি ভাড়াটিয়া নৌকা ছিল না। জমিদারদের কিনা নিজস্ব। নৌকা। তাতে পারাপারে পয়সা-কড়ি লাগিত না। জমিদারদের নিজের নৌকা বলিয়া অ-হাটবারেও নৌকাগুলি ঘাটের আশেপাশেই বাঁধা থাকিত। কিন্তু মাল্লারা জমিদারদের লোক বলিয়া তারা নৌকায় থাকিত না। অন্য কাজে যাইত। তবে নদীর পাশের সমান লম্বা দুইটা মযবুত রশি নৌকার দুই গলুইর গোড়ায় বাঁধিয়া দুই পাড়ে দুইটা খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিত। রশি ধরিয়া টানিয়া লগি ছাড়াই এক পাড়ের নৌকা অপর পাড়ে নেওয়া চলিত। এই অবস্থা চলিবার সময় হাটবার লইয়া দুই বাজারের মালিকদের মধ্যে বিরোধ বাধে। এই বিরোধ ফৌজদারি কোর্টে পর্যন্ত গড়ায়। আগেকার জমিদাররা অতি সহজেই প্রজা-সাধারণকে দিয়া নিজেদের স্বার্থে ও পক্ষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করাইতে পারিতেন। জমিদারদের সীমা ও চর জমির দখল লইয়া দুই জমিদারের বিরোধ প্রজাদের নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি করিতে আমি ছেলেবেলা একাধিকবার দেখিয়াছি। তদুপরি এই বাজার-বিরোধটার মধ্যে প্রজা, সাধারণের স্বার্থ সোজাসুজি জড়িত ছিল। কাজেই জমিদারদের বিরোধ অতি সহজেই বৈলর-ধানীখোলাবাসীর বিরোধে পরিণত হইল। দুই গ্রামের লাঠিওয়ালারা নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া লাঠি ঘুরাইতে লাগিল। এক গ্রামের পক্ষে অন্য গ্রামের ভিতর দিয়া চলাচল বিপজ্জনক হইয়া উঠিল।

৭. আলিমুদ্দিন মাস্টার

এই বিপদ আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেবকেও ছাড়িল না। তিনি ধানীখোলার লোক। কাজেই বৈলর যাওয়া তার পক্ষে বিপজ্জনক হইল। তিনি একাই মাস্টারি করিতে যাইতেন না। তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের কয়েকজন ছাত্রও স্বভাবতই তার পাঠশালায় যাইত। এই সময় আমাদের মাস্টারের অভাব হইয়াছিল। সুতরাং, আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেব অতি সহজেই ধানীখোলা পাঠশালার মাস্টারি পাইলেন। ছাত্ররা এবং তাহাদের অভিভাবকেরা আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেবকে পাইয়া খুশি। কারণ, তিনি দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে খুব নাম করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের স্কুলের মাস্টারি নিবার পর আমাদের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া গেল। বাজার লইয়া গন্ডগোল মিটিবার পরে বৈলর গ্রাম হইতেও অনেক অনেক ছাত্র আমাদের স্কুলে চলিয়া আসিল।

আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেব আমাদের পাঠশালার শিক্ষক হইবার পর তিনি এই স্কুলে কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। (এক) পাঠশালার বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভার আয়োজন হইল। গ্রামের ছুটির প্রাক্কালে সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাসে এই বার্ষিক সভা হইত। তাতে পর্দাঘেরা মঞ্চ করা হইত। মাস্টার সাহেব নিজে মঞ্চের ডিরেক্টর হইতেন। নিজ মুখে হুইসেল মারিয়া, নিজ হাতে রশি টানিয়া তিনি মঞ্চের পর্দা খুলিতেন ও বন্ধ করিতেন। ছাত্ররা এক মাস ধরিয়া শিখানো আবৃত্তি ঠিকমত করিতেছে কি না পর্দার পিছন হইতে তিনি দেখিতেন এবং প্রম্ট করিতেন। সভার শুরুতে তিনিই সমাগত অতিথিদিগকে স্বাগত জানাইতেন। সভা শেষে তিনিই সকলকে ধন্যবাদ দিতেন। মোটকথা, আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেব ছিলেন উৎসাহ-উদ্যমের প্রতিমূর্তি। (দুই) তিনি স্কুল গৃহ বদলাইলেন। আগে স্কুলঘর ছিল কাছারির পূর্ব প্রান্তে একেবারে বাজারসংলগ্ন। বাজারের এত নিকটে স্কুল থাকা ভাল নয় বলিয়া তিনি স্কুল সরাইয়া নিয়া গেলেন কাছারির অনেক পশ্চিমে পুকুরেরও পশ্চিম পাড়ে। আগের ঘরটি ছিল টিনের চৌচালা। নূতন ঘরটি হইল ছনের দুচালা। এতে বরঞ্চ ভাল হইল। গরমের দিনে টিনের ঘরে খুব অসুবিধা হইত। এখন ছনের ঘরে আরাম হইল। আরেক কারণে মাস্টার সাহেব বাজারের অত নিকট হইতে স্কুল সরাইয়া নিয়াছিলেন। সেটি তখন বুঝি নাই। বড় হইয়া। বুঝিয়াছিলাম। সে কারণ এই যে অন্যান্য বাজারের মত ধানীখোলা বাজারেও বেশ্যাপল্লি ছিল। তৎকালে বেশ্যাপাড়া ছাড়া বাজার করা যাইত না। (৩) আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেব স্কুলগৃহের মধ্যভাগকে তিন ক্লাসে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কোনো পার্টিশন বা বেড়া-টাট্টি দিয়া নয়, শুধু বেঞ্চি পাতিয়া। একদিকে দ্বিতীয় শ্রেণী, মধ্যভাগে প্রথম শ্রেণী, আরেক পাশে 'ক'-মিতি, 'খ' মিতি ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণী। মাস্টার সাহেব একাই শিক্ষক ছিলেন এবং মাঝখানের ক্লাসে বসিয়া তিন ক্লাসই এক জায়গা হইতে পড়াইতেন। তবু দেখিতে স্কুলটির অভ্যন্তর ভাগ তিনটি আলাদা ক্লাস দেখাইত। (চার) মাস্টার সাহেব তত্ত্বালে ইংরাজি জানিতেন না বলিয়া জগদীশ বাবুর প্রচলিত নিয়ম বজায় রাখিবার জন্য কার্তিক বাবু নামে কাছারির জনৈক আমলাকে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা করিয়া ইংরাজি ক্লাস লইতে রাজি করেন। কার্তিক বাবু এ জন্য কোনো পয়সা-কড়ি নিতেন না। (পাঁচ) তিনি সব সময় টুপি পরিয়া স্কুলে আসিতেন। কখনও খালি মাথায় আসিতেন না। ছাত্রদেরেও টুপি পরিয়া আসিতে বলিতেন। তবে কেউ টুপি পরায় গাফলতি করিলে শাস্তি দিতেন না। তিনি নিজে ধুতি ও তহবন্দ উভয় পোশাকেই স্কুলে আসিতেন। তবে সাব ইন্সপেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসিবার দিন তিনি ধুতি পরিয়াই আসিতেন। তিনি নিজে তহবন্দ পরিলেও ছাত্রদের তিনি তহবন্দ পরিতে তাকিদ দিতেন না। স্কুলঘরের সামনে খানিকটা জায়গা বেড়া দিয়া তিনি নামাজের জায়গা করেন। এই বেড়ার চারদিকে পাতাবাহারের গাছ লাগাইয়া জায়গাটি সুন্দর রাখিতেন। নামাজের জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্যে তিনি নিজে আমাদিগকে লইয়া ঝাড় দিতেন এবং ঘাস লম্বা হইয়া গেলে কাটিয়া ফেলিতেন। প্রতিদিন যোহরের ওয়াক্তে ছাত্রদের লইয়া তিনি নামাজ পড়িতেন। যারা অযু নামাজ জানিত না বা সুরা তকবির পড়িতে পারিত না, তাদেরেও তিনি তার সাথে সাথে উঠবসা করিতে হুকুম দিতেন। একটু একটু করিয়া সকলকেই তিনি নামাজ শিখাইতে চেষ্টা করিতেন। নামাজের জায়গায় বিছাইবার জন্য তিনি ছাত্রদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া চট কিনিয়াছিলেন। এই চট স্কুলের বাক্সে সযত্নে রাখিয়া দিতেন এবং তার চাবি নিজের কাছে রাখিতেন। এইসব চাদা ও ছাত্র-বেতন সম্পর্কে মাস্টার সাহেব সুবিচারি লোক ছিলেন। গরীব ছাত্রদের বেতন ছিল অবস্থাভেদে এক আনা, দুই আনা, চারি আনা। অনেকে ছিল ফ্রি। কিন্তু আমরা দুই ভাই, শামসুদ্দিনরা দুই ভাই ও ওসমান আলী সরকার সাহেবের এক ভাই সাদত আলী এই ধরনের অবস্থাশালী ছাত্রদের

বেতন ছিল আট আনা করিয়া। এছাড়া তিনি অভিভাবকদের নিকট হইতে পাটের মওসুমে পাট ও ধানের মওসুমে ধান তুলিয়া স্কুলগৃহের সাজসরঞ্জাম, যথা টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি, ব্ল্যাকবোর্ড, ভূচিত্রাবলি, গ্লোব, ঘড়ি ও ঘণ্টা কিনিয়াছিলেন এবং এইসব রাখার জন্য প্রথমে বাক্স এবং শেষে আলমারি তৈয়ার করিয়াছিলেন। (ছয়) হাতে-কলমে। বিজ্ঞান পড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের হাতে স্কুল ঘরের পাশে ও পিছনে নানাবিধ ফল-ফুলের গাছ লাগাইতেন। আমরা সকলেই ছিলাম কৃষকশ্রেণির লোক। কাজেই হাতে-কলমে কৃষি-কার্য শিখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি একবার পানি-কাদার মধ্যে রোয়া ধান লাগাইতে আমাদের কামলা লইয়াছিলেন, অর্থাৎ স্কুলের সকল ছাত্রকে তিনি একদিন নিজের বাড়িতে দাওয়াত করিলেন। আমরা প্রায় সকলেই মাস্টার সাহেবের বাড়ি গেলাম। তিনি আমাদিগকে চিড়া ভাজা নাশতা খাওয়াইয়া ক্ষেতে নিয়া গেলেন। আমাদের সকলের হাতে এক এক মুঠা জালা (চারাধান গাছ) দিয়া এবং নিজে এক মুঠা লইয়া কাতার বাঁধিয়া রোয়া লাগাইতে শুরু করিলেন। আমাদের সহপাঠীরা প্রায় সকলেই নিজের হাতে কম-বেশি এ কাজ আগেই করিয়াছিল। আমরা দুই ভাই এবং শামসুদ্দিনরা দুই ভাই এবং সাদত আলী আমরা কেউ কোনো দিন নিজ হাতে রোয়া লাগাই নাই। কিন্তু সে কথা স্বীকার করিয়া বোকা বনিতে কেউ রাজি হইলাম না। আমরা মাস্টার সাহেবের এবং অন্য ছাত্রদের দেখাদেখি রোয়া লাগাইয়া পুরা ক্ষেত শেষ করিয়া ফেলিলাম। মাস্টার সাহেব আমাদের দক্ষতায় খুব খুশি হইলেন। বেলা পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িলে সবাই মাস্টার সাহেবের বাড়ি ফিরিলাম। বাড়ির পাশের নদীতে গোসল করিয়া শরীরে মাস্টার সাহেবের দেওয়া প্রচুর সরিষার তেল মাখিয়া খাইতে বসিলাম। মাস্টার সাহেব আমাদের খাওয়ার জন্য মাছ-গোশত ও দুধ-কলা চিনিতে প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। আমরা তকালেই হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, রোজানা বেতন দিয়া তিনি যদি কৃষিশ্রমিক নিযুক্ত করিতেন, তবে তাদের বেতন ও খোরাকিতে তার অত টাকা লাগিত না। দুই-তিন দিন পরে মাস্টার সাহেব আমাদেরে জানাইয়াছিলেন যে আমাদের রোয়া লাগানো ক্ষেতের বেশির ভাগ চারা মরিয়া গিয়াছে। তিনি চারাগুলি উখাড়িয়া দেখিয়াছেন যে আমরা অনেকেই জালার গোড়া ভাঙ্গিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছি। অতঃপর আর কোনো দিন মাস্টার সাহেব আমাদের নিয়া কোনো চাষের কাজ করান নাই।

(সাত) আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেব আমাদের স্কুলে আর একটি সংস্কার। প্রবর্তন করেন। সেটা হইল শুক্রবার মর্নিং স্কুল। স্কুলের আশপাশে প্রায় আধা মাইলের মধ্যে কোনো মসজিদ বা জুম্মাঘর ছিল না। কাজেই ছাত্রদের জুম্মার নামাজ পড়িবার সুবিধার জন্য তিনি শুক্রবারে সকাল ছয়টায় স্কুল বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এর আগে পর্যন্ত আমরা দুই ভাই জগদীশ বাবুকে বলিয়াই শুক্রবারে অনুপস্থিত থাকিতাম। আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেব এই নয়া ব্যবস্থা করায় আমাদের জুম্মার নামাজের জন্য আর পাঠশালা কামাই করার দরকার থাকল না। শুক্রবার আমাদের বাড়ির মাদ্রাসা বন্ধ থাকিত। কাজেই সকালে স্কুল হওয়ায় সেদিকেও কোনো অসুবিধা হইল না। ছয়টা হইতে এগারটা পর্যন্ত রীতিমত ক্লাস হইত। ছুটির পর আমরা সাড়ে এগারটায় বাড়ি পৌঁছিতাম এবং গোসল করিয়া জুম্মার নামাজে যোগ দিতে পারিতাম।

## ৮. মাস্টার সাহেবের ছাত্রপ্রীতি

এ অঞ্চলে কোনো বড় মেহমানি হইলে এবং সে মেহমানিতে মাস্টার সাহেবকে দাওয়াত করিলে তিনি শর্ত করিতেন, তাঁর সব ছাত্রকে দাওয়াত করিলে তিনি যাইবেন। প্রায় সবাই ছাত্র-সুদ্ধাই মাস্টার সাহেবকে দাওয়াত দিতেন। দাওয়াতের দিন যথাসাধ্য পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়া টুপি মাথায় দিয়া আসিতে সব ছাত্রকে তিনি বিশেষ তাগিদ দিতেন। সম্ভব হইলে ছাত্রদের অভিভাবকদেরেও বলিয়া দিতেন। নিকট প্রতিবেশী ছাত্রদের বাড়িতে গিয়া কাপড়-চোপড় ধুইল কি না খোঁজখবর করিতেন। নির্দিষ্ট দিনে বারটা-একটার সময় স্কুল ছুটি দিয়া সদলবলে মেহমানিতে যাইতেন। একত্রে এক কাতারে তাঁর সব ছাত্রকে বসাইবার জন্য তদবির করিতেন। এমনটি প্রয়োজন হইলে দাওয়াতের মালিকের সাথে দরবার করিতেন। সকল ছাত্রকে ঠিকমত বসাইয়া তিনি স্বয়ং তাদের সাথে বসিতেন। সাকিদারির সময় কোন ছাত্রের পাতে ভাত নাই, কার ভাগে গোশত কম পড়িল, এসব ব্যাপার লইয়া সাকিদারদের সাথে। দর-কষাকষি করিতেন। ফলে মাস্টার সাহেবের সাথে মেহমানিতে গেলে বেশি গোশত ও আদর-যত্ন পাওয়া যায়, ছাত্রদের মধ্যে এ কথা মশহুর হইয়া গিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মাস্টার সাহেব হুইসেল দিয়া সব ছাত্রকে আবার একত্রে জমা করিতেন। ফলইন', 'এটেনশন', রাইট টার্ন', 'সেলিউট ওয়ান-টু-থ্রি' মার্চ' বলিয়া তিনি যিয়াফতের মজলিস হইতে ছাত্রদেরে লইয়া বাহির হইতেন। দর্শকেরা প্রশংসমান এক দৃষ্টিতে সেদিকে চাইয়া থাকিতেন এবং ছাত্রসহ মাস্টার সাহেব দূরে চলিয়া গেলে সকলে মাস্টার সাহেবের শিক্ষকতার তারিফ করিতেন। হাঁ, মাস্টার বটে। ছাত্রদেরে কী সুন্দর শায়েস্তা করিয়াছেন।

ধানীখোলা পাঠশালায় আমার ছাত্রজীবনের শেষ বছর, অর্থাৎ ১৯০৮ সালের খুব সম্ভব ডিসেম্বর মাসে বৈলর বাজারে মুসলমানদের এক বিরাট সভা হয়। এত বড় সভা আমি জীবনের প্রথম এই দেখি। উভয় গ্রামের মাতব্বররা মিলিয়াই এই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। জিলা সদর হইতে এবং বিদেশ হইতে বড়-বড় বক্তা এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। তাদের মধ্যে সিরাজগঞ্জের মুনশী মেহেরুল্লাহ, মৌ. মোহাম্মদ ইসমাইল (পরে খান বাহাদুর) ও মৌ. আবদুর হাকিম নামে একজন স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর আমার মনে স্থায়ী দাগ কাটিয়াছিলেন। এই বিরাট সভায় অনেক ভলান্টিয়ারের দরকার হইয়াছিল। উদ্যোক্তারা আশপাশের সমস্ত স্কুল-মাদ্রাসার কাছে ভলান্টিয়ার চাহিয়াছিলেন। কর্মবীর আলিমুদ্দিন মাস্টার এ ব্যাপারে সমস্ত স্কুল-মাদ্রাসাকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। এক মাস ধরিয়া তিনি আমাদেরে ভলান্টিয়ারি কুচকাওয়াজ ও ফুট-ফরমাস সম্পর্কে এমন সুন্দর ট্রেনিং দিয়াছিলেন যে সম্মিলনীতে সমাগত মেহমানরা মাস্টার সাহেবকে ডাকিয়া নিয়া তারিফ করিয়াছিলেন। আমরা ছাত্ররাও এ সভা হইতে জীবনের খুব মূল্যবান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম।

আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেবের কাছে মোটমাট দুই বছর পড়িয়াছিলাম। এই দুই বছরে আমার অনেক শিক্ষালাভ ঘটিয়াছিল। এই সময়ে আমি আট-নয় বছরের শিশু হইয়াও বুড়া প্রবীণের চেয়েও বেশি নফল এবাদত করিতাম। সে কথা আমি অন্যত্র বর্ণনা করিব। এখানে ঐ ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার এই জন্য যে, হযরত পয়গম্বর সাহেবকে খাবে দেখা ঐ সময় আমার এবাদতের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পয়গম্বর সাহেবকে খাবে কখনও দেখি নাই। তার বদলে সাদা জুব্বা-জাব্বা পাগড়ি-পরা খড়ম-পায়ে তসবি-হাতে একজন সুফি দরবেশকে খাবে দেখিতে পাইতাম। এই সুফি

দরবেশের মুখের অবয়ব তখনও মনে পড়িত না। এখন ত পড়িবেই না কিন্তু এই দরবেশকে খাবে দেখিয়া আমার একটা অসাধারণ লাভ হইয়াছিল। তা এই :

## ৯. স্বপ্নে মুখরেজ-তালাফ্‌ফুয

চাচাজী ছমিরুদ্দিন মুনশী, ইয়াকুব, মৌলবী প্রভৃতি আমার শৈশবের উস্তাদরা কেই কারি ছিলেন না। তাঁদের মুখরেজ-তালাফুয সব আরবি হরফের বেলা নির্ভুল নিখুঁত ছিল না। মুখরেজ মানে হরফ উচ্চারণে অরগান-অব-স্পিচ ঠিক রাখা। হরফগুলির মধ্যে কতকগুলি মূর্ধা বা আলাজিভ হইতে, কতকগুলি তালু হইতে, কতকগুলি দাঁত হইতে, আর কতকগুলি ঠোঁট হইতে জিভের সংস্পর্শে বাহির হয়। অন্যান্য ভাষার চেয়ে আরবিতেই এই দিককার অর্থাৎ মুখরেজ উচ্চারণ খুব কড়াকড়িভাবে পালিত হয়। ইংরাজি একটা 'এ' ও বাংলা একটা স' (ছ)-এর জায়গায় আরবিতে 'সে' 'সিন' 'সোআদ' এই তিনটা হরফ আছে। অথচ এই তিনটার মধ্যে দুইটা হরফই দন্ত্য হইলেও দুইটা উচ্চারণে দাঁত-জিভের দুইটা পৃথক জায়গা স্পর্শ করে এবং অপরটা ঠোঁট হইতে উচ্চারিত হয়। ঠিক তেমনি ইংরাজি একমাত্র 'যেড' হরফের স্থলে আরবিতে যাল, যে, যোআদ ও যোয়-এই চারিটি হরফ আছে। অথচ ঐ চারিটি হরফের নিজেদের মধ্যে প্রচুর উচ্চারণ-ভেদ রহিয়াছে। এই চারিটি হরফের প্রথম দুইটি হরফের মধ্যে যাল'-এর উচ্চারণের সময় দাঁত জিভের আগা স্পর্শ করে এবং যে উচ্চারণের সময় দাঁত জিভের মধ্যভাগ স্পর্শ করে। অর্থাৎ যে'র উচ্চারণ বাংলা য'র, উচ্চারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তেমনি বাংলা 'হ' বা ইংরাজি 'এইচ'-এর উচ্চারণের সঙ্গে আরবি 'হায়হুত্তি'র কোনও মিল নাই। বাংলা-ইংরাজি হ' উচ্চারণের সঙ্গে আরবি 'হায় হাওওয়াজ'-এর মিল রহিয়াছে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য উচ্চারণগত এই সব সূক্ষ্ম পার্থক্যের কোনও মূল্য নাই। তাদের কাছে মাত্র দুইটি হরফে এই পার্থক্য পালন সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ইংরাজি জে ('জি'সহ) ও 'যেডের পার্থক্য ও আরবি 'জিম' ও। 'যে'র পার্থক্য। ইংরাজির 'জে' ও 'জি' (যে শব্দে 'গ' হয় না) এবং আরবির 'জিম' মূর্ধন্য বর্ণ। এগুলি আলাজিভের সঙ্গে জিভের স্পর্শ হইতে বাহির হয়। পক্ষান্তরে ইংরাজি 'যেড' ও আরবির 'যে' (যাল'সহ) দন্ত্য বর্ণ। আরবি যোয়াদ, যোয় যদিও দন্ত্য নয় ঔষ্ঠ্য, তবু তাদের নৈকট্য দন্ত্য 'যে' 'যালের সাথে, মূর্ধন্য' 'জিমের সাথে নয়।

আরবিতে এই আঙ্গিক উৎপত্তিগত পার্থক্য মানিয়া চলাকেই মুখরেজ আদায় করা বলে। ইংরাজিতে এটাকে বলে ফনেটিকস।

পক্ষান্তরে তালাফুযও উচ্চারণ-ভঙ্গি বটে, কিন্তু সেটা হরফের আঙ্গিক বুৎপত্তির উপর নির্ভর করে না। শব্দকে হ্রস্ব, দীর্ঘ, লম্বা, খাটো করা, কোনও হরফ বা শব্দের উপর কম বা বেশি জোর একসেন্ট দেওয়া, বাক্যের কোন জায়গায় থামা বা না থামা, বেশি থামা বা কম থামা ইত্যাদি তালাফফুযের অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজিতে যাকে একসেন্ট এ্যামফেসিস্‌ ও ফুলস্টপ বলা হয়, আরবিতে যাকে মদ্দ, তশদিদ, আয়াত, ওয়াকফা বলা হয়, বাংলায় যাকে পুত, বা দাড়ি বলা হয়, এই সবই তালাফুযের অংশ। একটা খুব সাধারণ দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'চ' মূর্ধন্য হরফ। এটাকে দন্ত্য উচ্চারণ করিলে এটা হইবে মুখরেজের খেলাফ। কিন্তু ঠিকমত 'চ' মূর্ধন্য উচ্চারণ করিয়াও 'চোর' শব্দকে 'চুর উচ্চারণ করিলে এটা হইবে তালাফুফের খেলাফ। সোজা কথায় ইংরাজিতে যাকে বলে ফনেটিকস, বাংলায় ধ্বনিতত্ত্ব, আরবিতে তাই মুখরেজ। তেমনি ইংরাজিতে যাকে বলে পাংচুয়েশন, বাংলায় যতি,

আরবিতে তাই তালাফফুয। বিশেষ করিয়া কোরআন শরিফ তিলাওয়াতে পুরাপুরি মুখরেজ-তালাফুয আদায় করার দিকে বিশেষ তাগিদ আছে। কিন্তু আমার উস্তাদদের মধ্যে বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এমনকি স্থানীয় আলেম-ওলামার মধ্যেও কারো এ বিষয়ের তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল না। বিশেষত, মুখরেজের গুরুত্ব তারা মোটেই বুঝিতেন না। চাচাজীসহ আমার অন্য উস্তাদরা কোরআন তিলাওয়াতে এবং নামাজের কেরাতে মিঠা গলায় খোশ এলহানে সুরা পাঠ করিতেন। শুনিতে অতি মধুর লাগিত। বিশেষত, চাচাজী যখন নামাজে লম্বা কেরাত পাঠ করিতেন তখন ভদ্রার মধুর গুঞ্জন কাপিয়া-কাপিয়া আমার কানে বাজিতে থাকিত। এমন যে চাচাজী তিনিও জাহান্নামকে কখনও 'যাহান্নাম' ইযা জাআকে' নির্বিচারে কখনও ইজা যাআ'। কখনও ইজা জাআ কখনও বা ইযা-যাআ পড়িতেন জিম' ও 'যে'র পার্থক্য যেন তারা বুঝিতেনই না। অন্তত উচ্চারণে তা মানিয়া চলিতেন না। শুধু সে কালে নয়, আজকালও আমি এমন অনেক পণ্ডিত লোক দেখিয়াছি, যারা জে' 'যেড' 'জিম' 'যের পার্থক্য বুঝেন না এবং বেদেরেগ একটার জায়গায় আরেকটা উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বহু অধ্যাপককে 'যিরো'র স্থলে 'জিরো', 'যেনিথের' জায়গায় 'জেনিথ', 'এলিযাবেথের জায়গায় 'এলিজাবেথ', 'জজ'-এর জায়গায় যর্জ' এবং বহু উকিলকে জজকোর্টকে য কোর্ট উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। একবার নুরুযযামান নামক আরবিতে এমএ পাশ একটি যুবক চাকরিপ্রার্থী অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়া নিজের নাম বলিয়াছিলেন, নুরুজ্জামান। সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রথমে ক্রুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। কারণ দেখা গেল, নিজের নাম। আরবিতে এমলা করিবার সময় যে'কে ঠিক 'যে'ই উচ্চারণ করেন, কিন্তু নামের উচ্চারণের সময় দুই 'যে'কে সংযুক্ত করিয়া 'জে' করিয়া ফেলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ও আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাকে ঠিক করিতে পারি। নাই। আমাদের প্রিয় সহকর্মী তরুণ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ পর্যন্ত নিজের নাম মুযিবুর রহমান বলেন। অপর বন্ধু রাজশাহীর উলিক অধ্যাপক মুজিবুর রহমান নিজের নাম অসংকোচে যেড' দিয়া লিখিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বহুকাল সংশোধনের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়া অবশেষে এই দুইজনকেই শহীদ সাহেব প্রকাশ্যভাবে খুব জোরে জোরে মুযিবুর রহমান ডাকিতেন। শৈশবে এই স্বরধ্বনিবোধ জাগ্রত না হইলে বয়সকালে যে এটা আর হইয়া উঠে না, তার প্রমাণ এই সেদিনও পাইয়াছি। আমার পরম স্নেহের পাত্রী এমএ পাশ একটি মেয়েকে এক ঘণ্টার বেশি সময় যেড' ও 'জে'র পার্থক্য বুঝাইতে ফনেটিকসের অনেক গূঢ় তত্ত্ব বুঝাইলাম। অবশেষে মহিলা সগৌরবে বলিলেন : 'এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। 'জেড'টার উচ্চারণটা সত্যই ঐরূপ। বাংলা বর্ণমালায় এই পার্থক্য নাই বলিয়াই বোধ হয় শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জিভের এই অবস্থা।

যা হোক আমার ছেলেবেলায় দেশের অবস্থা এই রূপই ছিল। আমি নিজেও তেমনি শিক্ষা পাইতেছিলাম। এমন সময় স্বপ্নে-দেখা এই সুফি দরবেশ সাহেব আমাকে মুখরেজ-তালাফুয সম্পর্কে খাবেই সবক দিতে লাগিলেন। এক দিন নয়, দুই দিন নয়, পরপর কয়েক দিনই তিনি আমাকে মুখরেজ সম্বন্ধে সবক দিলেন। তিন দিনের খাবের কথা আমার আজিও স্পষ্ট মনে আছে। একদিন তিনি এক বড় জমাতে ইমামতি করিবার সময় সহি মুখরেজ আদায় করিয়া কেরাত পাঠ করিলেন এবং নামাজ শেষে আমাকে একা একদিকে লইয়া গিয়া তিনি কেরাতে কোন হরফ কীভাবে কোন উচ্চারণ করিয়াছেন আমাকে তা বুঝাইলেন। প্রত্যেক হরফের উচ্চারণ তিনি এমন স্পষ্ট ও সহজভাবে করিলেন যে, ঘুম ভাঙার পরেও ঐসব উচ্চারণ সুফি সাহেবের গলার সুরেই আমার

কানে সারা দিন ঝংকৃত হইতে থাকিল। এই সুফি সাহেব নিজের পরিচয় দিতেন না। সে কথা তাঁকে পুছ করিতেও আমার মনে থাকিত না। তবু তার চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল। বরাবর যে একই লোক আসিতেন, সে কথা জোর করিয়াই বলা যায়। কারণ দিনের বেলা অনেক খুঁজিয়া-চিন্তিয়াও অমন সুন্দর চেহারার কোনও আলেম আমার মনে পড়িত না। উনার গলার আওয়াজও কারো সাথে মিলিত না। উনি আর যে-ই হোন, আমাদের আত্মীয় কারী ময়েযুদ্দিন সাহেব যে নন, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। কারণ কারি সাহেব আমাদের বংশের আর সব মুরুব্বিদের মতই ঘোর কালো রঙের লোক ছিলেন। কাজেই এই সুফি সাহেবকে আবার স্বপ্নে দেখিবার জন্য সারা দিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতাম। দেখিতামও তাঁকে। একদিন খাবে দেখিলাম, তিনি আমাদের বাড়ির মসজিদেই খুব বুলন্দ আওয়াজে কোরআন তিলাওয়াত করিতেছেন। তিনি মসজিদের দরজার দিকে মুখ ফিরিয়া বসিয়া তিলাওয়াত করিতেছিলেন। আমি মসজিদের বাহিরের আঙিনায় খেলিতেছিলাম। হঠাৎ তার চিনা মিঠা গলা আমার কানে গেল। আমি কান পাতিয়া তাঁর গলা শুনিলাম। আমি তাঁকে দেখিতেছিলাম বটে, কিন্তু তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। তবু আমার মনে হইল, তিনি আমাকে শুনাইয়া প্রতি হরফের সহি মুখরেজ আদায় করিতেছেন। তিলাওয়াত শেষ করিয়া তিনি কোরআন শরিফ জুযদানে বাঁধিয়া রেহালের উপর রাখিয়া মাথা তুলিলেন এবং আমাকে দেখিতে পাইলেন। নিঃশব্দে হাত উঁচা করিয়া আমি তাকে সালাম করিলাম। তিনি হাত ইশারায় আমাকে ডাকিলেন। আমার অযু ছিল। খুব তাজিমের। সাথে তাঁর কাছে গিয়া বসিলাম। তিনি তখন আমাকে আলেফ-বে-তে-সে পড়াইতে শুরু করিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাকে জিম' 'যাল' 'যোআদ' 'যোয়'-এর উচ্চারণ শিখাইলেন। পাঠশালায় নামতা পড়িবার মত আমি সুফি সাহেবের প্রতি হরফ উচ্চারণে তার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলাম। তৃতীয় দিনের স্বপ্নে আমি বাড়ির পশ্চিম দিকে নাগুয়া নদীর পাড় দিয়া বেড়াইতে ছিলাম। হঠাৎ ঐ সুফি সাহেব আমার সামনে পড়েন। আমি সালাম করি। তিনি কতদূর শিখিয়াছ?' বলিলেন। আমি সবগুলি হরফ উচ্চারণ করিলাম। তিনি বলিলেন : শাবাশ, আর কয়েক দিন চেষ্টা করিলেই ঠিক হইয়া যাইবে।

এই সব স্বপ্নের বিস্ময়কর ফল হইল। আমি মুখরেজ ও তালাফুয এমন রত করিয়া ফেলিলাম যে মাদ্রাসায় সবক লইবার সময় উস্তাদজিদের ভুল ধরিতে লাগিলাম।

## ০৪. নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা-দরিরামপুর

## অধ্যায় চার – নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা-দরিরামপুরে

### ১. ত্রিশাল-দরিরামপুর–বনাম ও বেনাম

১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমি ও আমার বড় ভাই মোহাম্মদ মকিম আলী দরিরামপুর মাইনর স্কুলের ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হই। শামসুদ্দিন ও সদরুদ্দিন দুই ভাইও আমাদের সাথে নিম্ন-প্রাথমিক পাশ করিয়া ময়মনসিংহ শহরে গিয়া জিলা স্কুলে ভর্তি হয়।

দরিরামপুর মাইনর স্কুল ছিল একেবারে নূতন। আমরা যে বৎসর সেখানে ভর্তি হইলাম, সেই বারই উহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইলেও সে নয়া স্কুলে আমাদের উপরের ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস ফোর-ফাইভে এবং সম্ভবত সিক্সেও ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল। কাজেই এক মাইনর স্কুলেই ছাত্রসংখ্যা ছিল দেড় শর কাছাকাছি। তার উপর স্কুলঘরের লাগাই ছিল মাদ্রাসা। মাদ্রাসাটি ছিল পুরান নেসাবের। তাতে ছাত্র ছিল পঞ্চাশের উপর। ফলে মোট প্রায় দুই শ ছাত্র একই জায়গায় পড়াশোনা করিতাম।

স্কুল-মাদ্রাসার সামনেই ত্রিশাল থানা। ত্রিশাল গ্রাম আসলে সুতোয়া নদীর পশ্চিম পারে। থানাটি অবস্থিত নদীর পূর্ব পারের দরিরামপুর গ্রামে। এর কারণ, থানার অবস্থিতি লইয়া দুই গ্রামের মধ্যে বিরোধ হইয়াছিল। নেতৃবৃন্দ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যস্থতায় এই আপস হইয়াছিল যে, থানার অবস্থান হইবে দরিরামপুর গ্রামে, কিন্তু থানার নাম হইবে ত্রিশাল। ইহার ফল এই হইয়াছিল যে থানা প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরই সাবরেজিস্টারি অফিসও স্থাপিত হইয়াছে। থানার অনুকরণে সাবরেজিস্টারি অফিসেরও নাম হইয়াছে। ত্রিশাল। কিন্তু তার অবস্থান হইয়াছে দরিরামপুরে। এই নিয়ম আজও চলিতেছে। এর কয়েক বছর পরে পোস্টাফিস হইয়াছে দরিরামপুরে। নাম তার ত্রিশাল। সম্প্রতি রেভিনিউ, কৃষি, পল্লি উন্নয়ন ও টেলিগ্রাফ অফিস ইত্যাদি যতগুলি সরকারি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইয়াছে; সবগুলির অবস্থান হইয়াছে দরিরামপুরে কিন্তু নাম হইয়াছে ত্রিশাল। সুতরাং এত দিনে দেখা যাইতেছে যে গোড়ার এ আপসরফায় ত্রিশালেরই জয় হইয়াছিল। সব প্রতিষ্ঠানই ত্রিশালের নাম বহন করিতেছে; কিন্তু সন্তান উদরে ধরিতেছে দরিরামপুর। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই নিয়ম চলে নাই। হাইস্কুলের অবস্থান ও নাম দরিরামপুরই রহিয়াছে। সম্প্রতি যে কলেজ স্থাপিত হইয়াছে তারও নাম দরিরামপুর। আমি যখন দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হইলাম, তখন সাবরেজিস্টারি অফিসও মাত্র কয়েক দিন আগে স্থাপিত হইয়াছে। থানা ও সাবরেজিস্টারি অফিসে কার্যোপলক্ষে প্রতিদিন বহু লোক যাতায়াত করিতেছে। দুই শ ছাত্র, প্রায় পনের জন মাস্টার-মোদাররেস। ছাত্রদের অভিভাবকদেরও অনেকে যাতায়াত করিতেন। এই সব লোকজনের নিত্যপ্রয়োজন মিটাইবার জন্য ডিবি রোডের পার্শ্বে বেশ কয়েকটি দোকানপাট খোলা হইয়াছে। কাপড় সিলাই করিবার জন্য একখানা খলিফার দোকান বসিয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা দরকার, ময়মনসিংহ হইতে ডিবি রাস্তা থানা ও সাবরেজিস্টারি অফিসের সামনে দিয়া সুতোয়া নদী পার হইয়াছে এবং ত্রিশাল বাজার ভেদ করিয়া পুড়াবাড়ি পর্যন্ত গিয়াছে। বর্তমানে এই রাস্তা পাকা

হইয়াছে এবং সুতোয়া নদীর উপর পাকা পোলও হইয়াছে। কিন্তু তৎকালে নদীতে পোল হয় নাই। রাস্তাটি ছিল কাঁচা।

যা হোক দুই শ ছাত্রের স্কুলেও পার্শ্ববর্তী স্থানে এত লোক সমাগমে আমি সম্পূর্ণ নূতন জীবনের স্বাদ পাইলাম। এত বড় স্কুল। এত সব ছাত্র। এত সব মাস্টার-মৌলবী। সারা দিন এত লোকের আসা-যাওয়া। দারোগা সাহেব পরেন খাকি হাফপ্যান্ট ও সাবরেজিস্টার বাবু সাদা কোট প্যান্টালুন। তাঁদের যাতায়াত সাইকেলে। অবাক বিস্ময়ে এসবের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। রাস্তা ঘাটে অনবরত লোকজনের ডাক-চিৎকার তো শুনিতামই। খোদ স্কুলের মধ্যেও যেন পড়ুয়াদের আওয়াজ গমগম করিত। এই নয়া পরিবেশ আমার কাছে স্বপ্নের মত লাগিত। আমি যেন স্বপ্নে কোনো অজানা রাজ্যে আসিয়াছি। যেন শীঘ্রই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিল না। আস্তে আস্তে পরিবেশে মিলিয়া গেলাম। সবই বাস্তব হইয়া আসিল। এবং ভালও লাগিল। স্কুলের মাস্টার ছিলেন মোট সাতজন। বাবু বসন্তকুমার সেন ছিলেন হেডমাস্টার। তার বাড়ি ছিল নেত্রকোনা। বাবু কৈলাস চন্দ্র দে ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। তাঁর বাড়ি ত্রিশাল থানার কাঁঠাল গ্রামে। হেডপণ্ডিত ছিলেন বাবু ঈশান চন্দ্র রায় তর্কালঙ্কার। তাঁর বাড়ির ঠিকানা মনে নাই। সেকেন্ড পণ্ডিত ছিলেন জনাব খিদির উদ্দিন খাঁ। বাড়ি ছিল ফুলবাড়িয়া থানার মাগুরজোড়া গ্রামে। হেডমৌলবী ছিলেন মৌ. যহুরুল হক। বাড়ি আমাদেরই পার্শ্ববর্তী গ্রাম বৈলরের কানহর নামক মৌযায়। এ ছাড়া আরো দুইজন শিক্ষক ছিলেন। একজনের নাম মোহাম্মদ শাহজাহান মিঞা। আরেকজনের নাম ছিল জনাব আব্বাস আলী।

শিক্ষকদের মধ্যে হেডমৌলবী মৌ, যহুরুল হক সাহেব আমার এক মামুর সম্বন্ধী। কাজেই তিনি আমাকে আগে হইতেই চিনিতেন। তা ছাড়া তিনি প্রতি শনিবার অবশ্যই এবং সপ্তাহের আরো দুই-এক দিন আমাদের সঙ্গেই বাড়ি আসিতেন। এবং ফিরিবার কালে প্রায় সবদিনই একই সঙ্গেই যাইতেন। কাজেই তার সঙ্গে স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতা হয়। সেকেন্ড পণ্ডিত জনাব খিদির উদ্দিন খাঁ সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়। সেকেন্ড পণ্ডিত জনাব খিদির উদ্দিন খাঁ সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয় অন্য কারণে। আমার চাচা জাফর সাহেব ছিলেন পণ্ডিত সাহেবের নিকট প্রতিবেশী। চাচাজীর প্রতি পণ্ডিত সাহেবের পরিবারের উচ্চ ধারণা ছিল। গাজী সাহেবের পুত্র বলিয়া চাচাজীকে তারা সম্মান করিতেন। প্রায়ই তিনি জাফর চাচার তারিফ করিতেন। সে জন্য মনে মনে পণ্ডিত সাহেবের প্রতি আমি একটা আত্মীয়তা অনুভব করিতাম।

## ২. হেডমাস্টারের নজরে সত্যবাদিতা

হেডমাস্টার বসন্ত বাবুর প্রিয় ছাত্র হই আমি এক আকস্মিক ঘটনায়। সেদিন আমাদের ক্লাসটিচার ছিলেন অনুপস্থিত। আমাদের ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা ছিল চল্লিশের মত। এত বড় ক্লাসে ক্লাসটিচার না থাকিলে যা হওয়ার কথা তাই হইল। তুমুল হট্টগোল চলিতে লাগিল। হঠাৎ হেডমাস্টার বাবু আসিয়া ক্লাসের দরজায় দাঁড়াইলেন। ক্লাসের উপর যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। হেডমাস্টার বাবুকে ছাত্ররা যমের মত ভয় করিত। কাজেই সারা ক্লাস একদম চুপ। নিঃশব্দে সকলে যার-তার সিটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার বাবু গম্ভীর মুখে একপা-দুপা করিয়া ক্লাসে ঢুকিলেন। ভাটার মত চোখ দুইটা সারা ক্লানের উপর দিয়া একবার ঘুরাইয়া নিয়া কঠোর আদেশের সুরে বলিলেন :

“তোমরা সকলেই বসো। যন্ত্রচালিত-মত আমরা নিঃশব্দে বসিলাম। তিনি এইবার বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন : “এইবার কও, গোলমাল করিয়াছে কে?’ ভয়ে সব ছাত্রেরই হাঁটু ঠকঠক করিতেছে। জিভ শুকাইয়া গিয়াছে। কেউ জবাব দিল না। হেডমাস্টার বাবু আবার গর্জন করিলেন : ‘কথার জবাব দাও। বলো, কে গোলমাল করিয়াছ?’

নিথর নিঃশব্দে ক্লাসের মধ্যে আমি অতি কষ্টে দাঁড়াইলাম। আমার হাঁটু ঠকঠক করিতেছিল। সারা গায় ঘাম ছুটিয়া গিয়াছিল। আমার জিভ শুকাইয়া গিয়াছিল। কোনো কথা বলিলাম না। শুধু, ফ্যালফ্যাল করিয়া হেডমাস্টার বাবুর দিকে তাকাইয়া রহিলাম। হেডমাস্টার বাবু আমার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন : তুমি গোলমাল করিয়াছ?

আমার গলা দিয়া কথা আসিতে চাহিল না। কাজেই মাথা ঝুকাইলাম এবং ধরা গলায় বলিলাম : ‘জি, সার। হেডমাস্টার বাবুর মুখের গাম্ভীর্য বিস্ময় কৌতূহলে রূপান্তরিত হইল। তিনি কৌতূহলের সুরে বলিলেন : তুমি একাই গোলমাল করিয়াছ?

আমি আবার শির ঝুকাইয়া ধরা গলায় বলিলাম : ‘জি, সার।

এবার হেডমাস্টার বাবু লম্বা মোচের নিচে মুচকি হাসিলেন। বলিলেন : ‘এত বড় গোলমালটা তুমি একাই করিয়াছ? আর কেউ করে নাই?

আমি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হেডমাস্টার বাবু আবার গম্ভীর সুরে বলিলেন : ‘এক জনে গোলমাল করা যায় না। এই ছেলে সত্য কথা কহিয়াছে। আর তোমার কেউ সত্য কথা কও নাই। এই ছেলে সত্য কথা বলার পুরস্কার পাইবে। সে একা বসিবে। আর তোমরা সকলে স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবা।

বলিয়া হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া স্নেহমাখা সুরে বলিলেন : তুমি বসো। তোমার নাম কী?

আমি নাম বলিলাম। তিনি আবার বলিলেন : তুমি বসো।’ আমি বসিলাম। হেডমাস্টার বাবু আর সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন : তোমরা দাঁড়াইয়া থাকো। সকলে দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বাবু ক্লাস থনে বাহির হইয়া গেলেন।

হেডমাস্টার বাবুর এই শাস্তিতে সারা ক্লাস শান্তই ছিল। আর কেউ কোনও গোলমাল করে নাই। তবু কিছুক্ষণ পরে চুপে চুপে পা ফেলিয়া হেডমাস্টার বাবু আমাদের ক্লাসে উঁকি দিলেন। ছাত্ররা তার আদেশ পালন করিতেছে কি না, তা দেখিবার জন্যই বোধ হয় তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি ক্লাসের দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, সকলে তো দাঁড়াইয়া আছেই, আমিও দাঁড়াইয়া আছি।

তিনি তখন ক্লাসে ঢুকিলেন। আমার দিকে চাহিয়া তিরস্কারের সুরে বলিলেন : “তোমাকে ত আমি বসিতে বলিয়াছিলাম। তুমি দাঁড়াইয়া আছ। কেন?

আমি মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। কোনও জবাব দিলাম না। হেডমাস্টার বাবু এবার কঠোর হইয়া বলিলেন : ‘কেন তুমি বসো নাই? কেন আমার আদেশ অমান্য করিলা?’

আমি ফোৎ ফোৎ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। হেডমাস্টার বাবু অবাক হইয়া আগ বাড়িলেন। আমার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন : 'কাঁদো কেন? কী হইয়াছে?'

হেডমাস্টার বাবুর স্নেহমাখা সুরে আমার সাহস বাড়িল। তখন কান্না রুখিয়া অতি কষ্টে বলিলাম : আমার মিঞা ভাই এই ক্লাসেই আছে। তারে খাড়া রাইখা আমি বসি কেমনে?

হেডমাস্টার বাবু হাসিমুখে বলিলেন : 'তোমার মিঞা ভাই কে?'

আমি আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলাম। হেডমাস্টার বাবু তাঁকে বলিলেন : 'তোমার ছোট ভাই-এর খাতিরে তোমাকেও বসিতে দিলাম। তোমরা দুই ভাই বসো। আর সকলে দাঁড়াইয়া থাকো।'

আমরা দুই ভাই এতক্ষণ দুই জায়গায় ছিলাম। এইবার দুজন একত্র হইয়া আরামসে বসিয়া রহিলাম। আর দাঁড়ানো সহপাঠীদের দুর্দশা হাসিমুখে উপভোগ করিতে লাগিলাম।

এতে আমরা দুই ভাই কিছুদিনের জন্য সহপাঠীদের চক্ষুশূল হইলাম বটে, কিন্তু অল্পদিনেই সে ভাব কাটিয়া গিয়াছিল। তবে এই ঘটনায় আমি হেডমাস্টার বাবুর সুনজরে পড়িলাম। তিনি ঐ গল্প সারা স্কুলে ছড়াইয়া। দেওয়ায় অন্য মাস্টাররা এবং অপর ক্লাসের ছাত্ররা আমাকে খুব ভালবাসিতে লাগিলেন। আমি ছাত্রও ভাল ছিলাম। ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায় সকল সাবজেকটেই ফার্স্ট হইতাম। এটাও আমার জনপ্রিয়তার কারণ ছিল।

এইভাবে হেডমাস্টার বাবুর স্নেহাদরের মধ্যে ক্লাস ফোরে উঠিবার পর হেডমাস্টার বাবুর সাথে আবার আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যায়। সে ঘটনাটি ঘটে এইভাবে :

### ৩. হেডমাস্টারের ডাক-হরকরা

তখনও ত্রিশাল পোস্টাফিস হয় নাই। বৈলরের পোস্টাফিস মারফতই তখনও এই স্কুলের চিঠিপত্র যাতায়াত হয়। বৈলর পোস্টাফিস আমাদের বাড়ির কাছে। স্কুলে যাতায়াত করিতে আমাদের এই পোস্টাফিসের সামনে দিয়াই যাইতে হয়। দরিরামপুর অঞ্চলে সপ্তাহে একবার মাত্র চিঠিপত্র বিলি হইত। বৃহস্পতিবার দিন ত্রিশাল বাজারের হাট বার। বিরাট হাট। পঞ্চাশ হাজার হইতে প্রায় এক লক্ষ লোক এই হাটে জমায়েত হইত। বৈলর পোস্টাফিসের পিয়ন ত্রিশালের বাজারে এই হাটের দিন এক নির্দিষ্ট জায়গায় বসিতেন। স্কুল, মাদ্রাসা, থানা, সাবরেজিস্টারি আফিস ও এতদঞ্চলের সমস্ত চিঠিপত্র এইখান থনেই বিলি হইত। পিয়ন ঐ দিন প্রচুর পোস্টকার্ড, স্ট্যাম্প, ইনভেলাপ নিয়া আসিতেন। ওখানে বসিয়াই বিক্রি করিতেন। বাজারের এক দোকানের বারান্দায় একটি চিঠির বাক্স টানানো ছিল। ঐ দিন পিয়ন ঐ বাক্স খুলিয়া চিঠিপত্র লইয়া যাইতেন। তা ছাড়া পিয়নের হাতে হাতে চিঠি দিয়া দিলেও ডাকে দেওয়া হইয়া যাইত। অবশ্য ত্রিশাল বাজারে প্রবেশ করিবার আগে পিয়নকে দরিরামপুর হইয়া আসিতে হইত। সে জন্য থানা সাবরেজিস্টারি আফিস ও স্কুল-মাদ্রাসার পত্রগুলি অনেক সময় তিনি যার-তার আফিসেই দিয়া আসিতেন। তবু এদের সকলের অসুবিধা হইত।

হেডমাস্টার বাবু যখন জানিতে পারিলেন যে, স্কুলে যাতায়াত করিতে আমরা কয়জন বৈলর পোস্টাফিসের সামনে দিয়াই যাওয়া-আসা করিয়া থাকি, তখন তিনি এক সহজ উপায় বাহির করিলেন। তিনি স্কুলের সমস্ত চিঠিপত্র আমাকে দিয়া পোস্ট করাইতে লাগিলেন। তাতে আমার কোনোই অসুবিধা হইত না। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে চিঠিগুলি পোস্টাফিস ঘরের বেড়ায় মুখ হাঁ-করা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া যাইতাম।

ফলে যেদিন হেডমাস্টার বাবুর চিঠি থাকিত, সেদিন পোস্টাফিস হইয়া যাওয়া আমার উপর বাধ্যতামূলক হইয়া পড়িত। আমাদের বাড়ি হইতে দরিরামপুর যাতায়াত করিবার একাধিক রাস্তা ছিল। পোস্টাফিসের সামনের রাস্তা তার মধ্যে একটি। কবে কোন রাস্তায় যাইব, সেটা নির্ভর করিত সাথীদের উপর। স্কুল হইতে বাহির হইবার সময় এক রাস্তার একই দিকে অনেক ছাত্র চলিতাম। তারপর আগ বাড়িতে-বাড়িতে সাথীসংখ্যা কমিতে থাকিত। একজন-দুইজন করিয়া ভিন্ন রাস্তায় আমরা ভাগ হইয়া পড়িতাম। পোস্টাফিসের কাছে আসিতে আসিতে আমরা চার-পাঁচজনে পরিণত হইতাম। এদের অধিকাংশের মত অন্য রাস্তায় যাইবার পক্ষে হইলে সাধারণত আমি ও মিঞা ভাই তা মানিয়া লইতাম। কিন্তু হেডমাস্টার বাবুর চিঠি ডাকে দেওয়া থাকিলে কিছুতেই আমি অন্য রাস্তায় যাইতে পারিতাম না। সাথীরা রাগ করিয়া আমাকে একা ত্যাগ করিও না। সে অবস্থায় আমার বড় ভাইই আমার একমাত্র সাথী হইতেন। এইটুকু অসুবিধা আমি সহজেই অগ্রাহ্য করিতাম। কারণ হেডমাস্টার বাবু জরুরি চিঠিপত্র আমার হাতে দিয়া বিশ্বাস করেন, এটা কম গৌরবের কথা নয়। বস্তুত এ জন্য আমার অনেক বন্ধু ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছে। আমার উপরের ক্লাসের কয়েকজন বয়স্ক ছাত্র হেডমাস্টার বাবুর চিঠি ডাকে দেওয়ার ভার লইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু হেডমাস্টার বাবু রাজি হন নাই।

নিয়মিতভাবে পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমি এই দায়িত্ব পালন করিয়া চলিলাম। ছয় মাস চলিয়া গেল। কোনও ত্রুটি বা অসুবিধা হইল না। কিন্তু ছয় মাস পরে একটা গোলমাল হইয়া গেল।

ব্যাপারটা এই :

৪. হেডমাস্টারের 'ভুল'

তৎকালে দরিরামপুর স্কুল লোকাল বোর্ড হইতে মাসিক অর্থ সাহায্য পাইত। সে জন্য আইন অনুসারে স্কুলের হেডমাস্টারকে লোকাল বোর্ড অফিসে একটি ষান্মাসিক রিপোর্ট পাঠাইতে হইত। এ বছরের ষান্মাসিক রিপোর্টও যথারীতি তিনি আমাকেই পোস্ট করিতে দিলেন। এটা ছিল একটা লম্বা ইনভেলাপ। অত বড় চিঠি এর আগে আমরা কেউ দেখি নাই। কাজেই পথে আসিতে সাথীরা সবাই এটা দেখিতে চাইল। আমি এক্সারসাইয বুকের মলাটের ফাঁক হইতে বাহির করিয়া সকলকেই দেখাইলাম। কিন্তু কাউকে ছুঁইতে দিলাম না। সাথীদের দেখাইতে গিয়া আমারও কৌতূহল হইল। আমি নিজে পথ চলিতে চলিতে চিঠিটা দেখিতে থাকিলাম। স্পেলিং করিয়া করিয়া ঠিকানাটা পড়িবার চেষ্টাও করিলাম। চিঠিটার ঠিকানা ছিল 'টু দি ভাইস চেয়ারম্যান লোকাল বোর্ড সদর ময়মনসিংহ।' কারণ তৎকালে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের এবং এসডিওরা মহকুমার লোকাল বোর্ডের এক্স-অফিশিও চেয়ারম্যান থাকিতেন। ঐ সব প্রতিষ্ঠানেই নির্বাচিত মেম্বরদের মধ্য হইতে একজন ভাইস চেয়ারম্যান হইতেন। কার্যত এই ভাইস চেয়ারম্যানই ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান

কর্মকর্তা ছিলেন। সে জন্য সাধারণত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লেখা সমস্ত চিঠিপত্র ভাইস চেয়ারম্যানের নামেই পাঠাইবার নিয়ম ছিল। কিন্তু আমি দশ বছরের শিশু। অতশত কি জানি? আমি ক্লাস ফোরের ভাল ছাত্র। ওয়ার্ডবুক আমার মুখস্থ। ম্যান' মানে মানুষ, চেয়ার' মানে কুরসি, এটা তো সোজা কথা। কাজেই চেয়ারম্যান। মানে কুরসি বানাইবার সুতারমিস্ত্রী, এটাও আমার মত ভাল ছাত্রের পক্ষে বুঝা কঠিন হইল না। কিন্তু চিন্তায় পড়িলাম আগের শব্দটা লইয়া। এটা কী? একটা খাড়া টান দিয়া তার গোড়া হইতে ডান দিকে একটা তেরছা টান বেশ লম্বা করিয়া যে হরফটা লেখা হইয়াছে তাতে শব্দটা হয় ভাইস'। কিন্তু এখানে সে শব্দের কোনও মানে হয় না। ভাইস মানে পাপ'। পাপের সাথে চেয়ার বা সুতারমিস্ত্রীর কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কাজেই একটা কিছু ভুল এখানেই হইয়াছে। তাতে সন্দেহ নাই। হেডমাস্টার বাবুকে আমি শুধু শ্রদ্ধা করিতাম না, ভালবাসিতাম। তার মত পণ্ডিত লোক খুব কমই আছে। এই ছিল আমার বিশ্বাস। তাঁরই নিজ হাতে লেখা একটা চিঠি এমন বড় একটা ভুল লইয়া শহরে চলিয়া যাইবে, আর শহরের সরকারি লোকের নিকট আমার প্রিয় হেডমাস্টারের দুর্নাম হইবে, এটা আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। আমি আমার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি খাটাইয়া এই ভুল সংশোধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনেক গবেষণা করিলাম। আমাকে চিন্তিত দেখিয়া এবং সাথীদের হৈ হল্লা ও অট্টহাসিতে বরাবরের মত যোগ দিতেছি না দেখিয়া অনেকেই কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি সবচেয়ে ভাল ছাত্র। এ ব্যাপারে তাদেরে জিগাইবার কী আছে? আমি কিছু না বলিয়া তাদেরে এড়াইয়া চলিলাম এবং চিন্তা ও গবেষণা চালাইয়া গেলাম। ক্রমে সাথী-সংখ্যা কমিতে লাগিল। আমিও অধিকতর সূক্ষ্মভাবে ভাইস কথাটার উপর চোখ বুলাইতে লাগিলাম। এই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে একটা বস্তু আমার নজরে পড়িল। দেখিলাম, "ভি'র খাড়া টান-টান মাথার পিছন দিকে অর্থাৎ বাম দিকে সূক্ষ্ম ও অতি ক্ষুদ্র একটি টান নিচ মুখে হেলিয়া রহিয়াছে। এই টানটি আরো একটু লম্বা হইলেই হরফটা ভি' না হইয়া এন' হইয়া যাইত। বিদ্যুতের বেগে আমার মাথায় একটা অনুপ্রেরণা নাজিল হইল। হাঁ, এটা 'এন'-ই বটে। শব্দটা তবে ভাইস' নয় নাইস'। এবার ব্যাপারটা আমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া গেল। নাইস' মানে সুন্দর। ঠিক, হেডমাস্টার বাবুর সুন্দর চেয়ারের জন্য শহরে অর্ডার দিয়াছেন। চিঠিতে চেয়ারের সাইয মাপ ও কাঠ ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন নিশ্চয়ই। কাজেই অত বড় চিঠি। এইবার আমার মনে পড়িয়া গেল, মাত্র কয়েক দিন আগে হেডমাস্টার বাবু সেক্রেটারি জনাব মানিক হাজী সাহেবের সঙ্গে স্কুলের এবং টিচারদের কমনরুমের চেয়ারের অভাবের কথা এবং শীঘ্রই কতকগুলি ভাল চেয়ার আনিবার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই আলোচনায় হেডমাস্টার বাবু স্কুলের সেক্রেটারি মানিক হাজী সাহেবকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে ভাঙা চেয়ারে বসিতে গিয়া অনেক শিক্ষকের জামাকাপড়ও দু-একবার ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

আর কোনও সন্দেহ থাকিল না। হেডমাস্টার বাবু ব্যস্ত মানুষ। তাঁর অবসর খুবই কম। সেই ব্যস্ততার মধ্যে তিনি তাড়াতাড়িতে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। বস্তুত ব্যাপারটা আমার চক্ষের সামনে এখন স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া তিনি এই চিঠিটা লিখিয়াছিলেন। তাড়াতাড়িতে লিখিবার ফলে নিশ্চয় নূতন সরু নিবেরই দোষে 'এন'-এর বাম। দিকটার টানটা পুরাপুরি পড়ে নাই। আমি লেফাফাটা আরো চোখের কাছে আনিয়া দেখিতে পাইলাম যে, 'এন'-এর বাম দিকটার টানটা না পড়িলেও নিবের একটা আঁচড় ওখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

৫. ‘ভুল’ সংশোধন

সুতরাং আমি স্থির করিয়া ফেলিলাম, চিঠিটা ডাকে দিবার আগে ওটা সংশোধন করিতে হইবে। সাথীদেরে, এমনকি আমার বড় ভাইকে কিছু। বলিলাম না। তাদের সাথে কেন পরামর্শ করিব? আমি ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ইংরাজিতে আমি এক শ নম্বরের মধ্যে পঁচানব্বইর কম কখনও পাই না। আর আমার সাথীরা পঞ্চাশ-ষাটের বেশি কেউ কখনও পান নাই। ইংরাজি শব্দ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব ওদেরে? একটা ফন্দি করিয়া সাথীদের নিকট হইতে আমি আলগা হইয়া পড়িলাম।

বাজারে গেলাম, ঢুকিলাম এক পরিচিত বড় দোকানে। দোকানের ফরাশের কলমদানে দুইটা দোয়াত ও চার-পাঁচটা কলম রাখা ছিল। পরীক্ষা করিয়া তারই একটা বাছিয়া লইলাম। কালি মিলাইয়া অতি সাবধানে ‘এন’ এর বাম দিককার টানটা লম্বা করিয়া ভাইস চেয়ারম্যানকে ‘নাইস’ চেয়ারম্যান করিয়া ফেলিলাম। চুষ কাগজ দিয়া ওটাকে নিপিস করিয়া শুখাইলাম। দৌড়াইয়া পোস্টাফিসে গেলাম। বরাবরের চেয়ে অনেক বেশি সাবধানে চিঠিটা বাক্সে ফেলিলাম। সে উদ্দেশ্যে বাক্সের হাঁ-করা মুখে হাত যতটা ঢুকে ততটা ঢুকাইলাম। চিঠিটা সশব্দে যখন বাক্সের তলায় পড়িল, তখন নিশ্চিত হইয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিলাম। আল্লার দরগায় হাজার হাজার শোকর। আমার প্রাণপ্রিয় গর্বের ব্যক্তি হেডমাস্টার বাবুকে নিশ্চিত অপমানের ও বদনামের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম!

এর দিন দশেক পরে একদিন হেডমাস্টার বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁর কামরায় গিয়া দেখিলাম, তিনি একা গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন। আমি ‘আদাব’ দিয়া সামনে দাঁড়াইলাম। তিনি বিষণ্ণ মুখে বলিলেন : ‘কিছুদিন আগে তোমারে একটা বড় লেফাফা ডাকে দিতে দিছিলাম মনে আছে?’

আমি : মনে আছে, সার।

হেডমাস্টার : তুমি সেটা নিজ হাতে ডাকবাক্সে দিছিলা? না, আর কারো হাতে দিছিলা?

আমি : আমি নিজ হাতেই বাক্সে দিছিলাম সার। সেই দিনই স্কুল থনে ফিরবার পথেই দিছিলাম। কেন সার? কী হইছে?

হেডমাস্টার বাবু আমার প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া নিজেই প্রশ্ন করিলেন : ডাকবাক্সে ফেলবার আগে চিঠিটা বরাবর তোমারই কাছে আছিল? না, আর কারো কাছে দিছিলা?

আমি সোৎসাহে বলিলাম : না সার, আর কারো হাতে দেই নাই। অনেকেই অত বড় চিঠিটা দেখতে চাইছিল। কিন্তু চিঠিটা আমি হাতছাড়া করছি না। আমার হাতে রাইখাই সকলরে দেখাইছি। কেউরেই ছুঁইবার ধরবার দেই নাই।’

হেডমাস্টার বাবু কী যেন চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন : তুমি চিঠিটা ডাকে দিবার আগে লেফাফার ঠিকানা লেখাটা পড়ছিলা?

এতক্ষণে সব ব্যাপারটা আমার চক্ষের সামনে পরিষ্কার হইয়া আসিয়া উঠিল। একটা অজানা অশুভ চিন্তায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমি বলিলাম : ‘জি সার, পড়ছিলাম।’

হেডমাস্টার বাবু আড়চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন : ‘ওতে কোনো রকম ভুল তোমার নজরে পড়ছিল কি?

আমার মনে অশুভ চিন্তা মুহূর্তে কাটিয়া গেল। আমি উৎসাহভরে বলিলাম : ‘হ সার। আপনার তাড়াতাড়ির জন্য একটা টান অস্পষ্ট হৈয়া গেছিল। তাতে ‘নাইস’ শব্দটা ভাইস’ হৈয়া গেছিল। আমি ওটা ঠিক কৈরা দিছিলাম।

মোচের নিচে অতিকষ্টে হাসি গোপন করিয়া গম্ভীর মুখে হেডমাস্টার বাবু বলিলেন : এ ভুল সংশোধনের জন্য স্কুলের সাহায্য কাটা যাবার এবং আমার চাকরি যাবার সম্ভাবনা হইছে। অমন সংশোধন আর কখনও কইর না। ময় মুরুব্বি গুরুজনের ভুল সংশোধন করবার আগে চিন্তাভাবনা কইর।

বলিয়া তিনি আরেকটা লম্বা লেফাফা দেখাইলেন। বলিলেন যে লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাগ করিয়া ঐ পত্রটা পাঠাইয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছেন হেডমাস্টার বাবু তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা-মশকরা করিয়াছেন। অতঃপর হেডমাস্টার বাবু আমাকে ভাইস চেয়ারম্যান শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। আমি লজ্জায় মাটির সাথে মিশিয়া যাইতে থাকিলাম। হেডমাস্টার বাবু আমার দুর্দশা দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন। আমাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়া ক্লাসে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

হেডমাস্টার বাবুর কাছে অত সহজে রেহাই পাইয়া তাঁর প্রতি আমার ভক্তি আরো বাড়িয়া গেল। তিনি আমার এই এই লজ্জাজনক ব্যাপারটা কারো কাছে প্রকাশ করিলেন না। হেডপণ্ডিত ঈশান চন্দ্র রায় মশায়ের নিকট এই ব্যাপারটা ঘটিলে কী যে ঘটিত বলা যায় না। সারা গা কাঁটা দিয়া উঠিল। মাত্র কয়েক মাস আগের ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। ঘটনাটা এই:

### ৬. মহিষ ও মহিষী

আমাদের বাংলা সাহিত্যের বইয়ে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও রানী আলেকজান্দ্রার দুইটা ছবি ছিল। দুইটা ছবিই সমান সাইযের আন্ডার মত গোলাকার। দুইটা ছবিই একই পৃষ্ঠায় পাশাপাশি ছাপা। রাজার ছবির নিচে লেখা ছিল : সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড। আর রানীর ছবির নিচে লেখা ছিল মহিষী আলেকান্দ্রা’। সপ্তম এডওয়ার্ড তখন আমাদের রাজা। সকলেই তাঁর নাম জানিতাম। রাজা-সম্রাটদের ‘বউ’ থাকে, এ জ্ঞানও আমার ছিল। সুতরাং রাজার পাশের ছবির মেয়ে লোকটা রাজার বউ হইবেন, তাতে আমার সন্দেহ থাকিল না। কিন্তু তাঁকে মহিষী বলা হইবে কেন, এটা আমি বুঝিতে পারিলাম না। চাচাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বড় বড় রাজা-বাদশার স্ত্রীকে সম্মান করিয়া মহিষী বলা হয়। চাচাজীর জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া হেডপণ্ডিত মশায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। বুঝিলাম, চাচাজী ঠিকই বলিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় কিছু কিছু অবোধ্য সংস্কৃত আওড়াইয়া ধাতু প্রত্যয় বুঝাইবার। চেষ্টা করিয়া বলিলেন যে সংস্কৃত মহ+ইষ=মহিষ হইতে মহিষী হইয়াছে। আমি যাহা বুঝিবার বুঝিলাম।

এরপর আমার সিদ্ধান্ত দুর্নিবার হইয়া উঠিল। রানীকে সম্মান দেখাইয়া যদি মহিষী বলা যায়, তবে রাজাকে সম্মান দেখাইয়া নিশ্চয়ই মহিষ বলা যায়। যাহা চিন্তা, তাহা কাজ। পাঠ্যপুস্তকের ঐ পাতাটি বাহির করিয়া সপ্তম এডওয়ার্ডের ছবির নিচের লেখাটা বাম দিকে 'সম্রাট' কথাটা সাফ কাটিয়া সে স্থলে যথাসাধ্য ছাপার হরফের মত সুন্দর করিয়া গুট-গুট হরফে মহিষ লিখিয়া রাখিলাম। সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, এমনকি বড় ভাইয়ের কাছে, খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, বড় বড় রাজাকে মহিষ বলা হয়। আমি ক্লাসের ফার্স্ট বয় বলিয়া কেউ আমার কথায় সন্দেহ করিল না। এসব ব্যাপারে আমার মত কেউ মাথা ঘামাইতেন না। আধুনিক ভাষায়, গবেষণা করিতেন না।

পণ্ডিত মশায়ের একটা বরাবরের অভ্যাস ছিল তিনি ক্লাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়াইতেন। তিনি চেয়ারে বসিলেই তার ঘুম পায়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় তিনি এক-এক সময় যাকে সামনে পাইতেন, তার হাত হইতেই খপ করিয়া পড়ার বইটা টানিয়া নিতেন এবং বই দেখিয়াই তিনি ছাত্রদেরে প্রশ্ন করিতেন। তিনি বলিতেন, এতে তার দুইটা উদ্দেশ্য সাধিত হইত। অনেকে দুষ্ট ছেলে আসল পড়ার বইটা হাতে না লইয়া যে কোনও একটা বই খুলিয়া মুখের সামনে ধরিয়া রাখিত এবং পাঠ্যবই পড়িতেছে বলিয়া মাস্টার মশায়কে ফাঁকি দিত। হেডপণ্ডিত মশায়ের ক্লাসে অমন চালাকি করিবার উপায় ছিল না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, কোন ছেলে তার পড়ার বই কত পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে, তা দেখা। সেদিন তিনি এমন করিয়া আমার সাহিত্য বইটা টানিয়া নিলেন। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তাঁর নজর পড়বি-ত-পড় একেবারে রাজা-রানীর পৃষ্ঠায়। তিনি চোখ বড় করিয়াই কপালে তুলিলেন। তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন : "এটা কে করেছে?

বলিয়া তিনি আমার সামনে আঙুল দিয়া ছবিটার কাটা জায়গা দেখাইলেন।

আমি ব্যাপার বুঝিলাম। নির্ভয়ে বলিলাম : আমি।'

পণ্ডিত মহাশয় আমার স্থিরভাব দেখিয়া রুষ্ট হইলেন। কঠোর সুরে বলিলেন : "এটা তোমারে কে শিখাইছে?"

আমি সপ্রতিভভাবে বলিলাম : আপনে সার।'

পণ্ডিত মহাশয় বিস্ময়-ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন : আমি?

তাঁর বাঁ হাতটা আমার ডান কানের দিকে আসিতে আসিতে ফিরিয়া গেল। বলিলেন : তুমিও শেষ পর্যন্ত "বাজাইরা" হৈতছ?

'বাজাইরা' হেডপণ্ডিত মহাশয়ের মুখে সবচেয়ে অপমানকর গাল। যেসব দুষ্ট ছাত্র স্কুল ছুটির পর সোজা বাড়ি মুখে রওয়ানা না হইয়া বাজারের দোকানে দোকানে আড্ডা মারিয়া বেড়ায়, তাদেরই হেডপণ্ডিত মশায় 'বাজাইরা' বলিতেন। তাঁর মতে, এ ধরনের ছেলে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে না। লেখাপড়া তাদের হইবে না। পিতা-মাতার অবাধ্য হইবে এবং শেষ জীবনে তাদের অনেক কষ্ট-লাঞ্ছনা হইবে। হেডপণ্ডিত মহাশয়ের এক 'বাজাইরা' কথার মধ্যে এত এত সুদূরপ্রসারী অর্থ নিহিত

ছিল। কাজেই খুব অপমান বোধ করিলাম। ঘাড় হেঁট করিয়া বলিলাম : রানী মহিষী হৈলে রাজা মহিষ হইব না কেন, সার?

আমার এই অকাট্য যুক্তির কোনও জবাব পণ্ডিত মহাশয় দিতে পারিলেন। তাই তিনি আরো বেশি রাগিয়া বলিলেন: ফের 'যদি' 'বাজাইরার মত তর্ক করো তবে তোমারেও একদিন নারিকেলের ঝোকা' বানাইয়া ছাড়ম। ক্লাসের ফার্স্ট বয় বৈলা খাতির করুম না।'

৭. পণ্ডিত মশায়ের অভিনব দণ্ড

নারিকেলের ঝোকার কথা শুনিয়া আমার পিলা চমকিয়া গেল। কারণ হেডপণ্ডিত মশায়ের এটা নিজস্ব মৌলিক আবিষ্কার। পণ্ডিত মশায় ছিলেন বিশুদ্ধ ব্রাক্ষণ। খুবই শুচিবাইগ্রস্ত লোক। ছাত্রদের কানের ময়লায় তার হাত ময়লা হয় বলিয়া বেশ কিছুদিন ধরিয়া কান মলা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাধ্য হইয়া কোনও ভয়ানক দুষ্ট ছাত্রের কান যদি তাকে মলিতেই হয়, তবে হাতে কাপড় লইয়া কান ধরিয়া থাকেন। সে কাপড়টাও ঐ দুষ্ট ছেলেরই গায়ের চাদর। অথবা শার্টের আঁচল। পারতপক্ষে তিনি আজকাল কারো কান মলেন না। তবু বরাবরের অভ্যাসমত রাগ হইলেই তাঁর বাঁ হাতটা ছাত্রদের কানের দিকে ছোটে। খানিক আগে আমারই কানের দিকে তার হাত ছুটিয়াছিল। আমি ক্লাসের ফার্স্ট বয় বলিয়াই তার হাতটা ফিরিয়া গিয়াছে, তা নয়। তার আঙুলে আমার কানের ফিটের ময়লা লাগিবে বলিয়া। কানমলা ছাড়িয়া তিনি। ইদানীং ছিটকি অর্থাৎ লকলকা বাঁশের কঞ্চি ধরিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন আগে এক দুষ্ট ছেলেকে ছিটকির বাড়ি কশিতেই সে এমন গলা ফাটাইয়া ও মাগো, বাবাগো বলিয়া চিৎকার করে যে সারা স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই ক্লাসের সামনে ভিড় করেন। এমনকি থানা হইতে ছোট বা বড় কোনো দারোগা বাবুও আসিয়া পড়েন।

এরপর হইতে হেডপণ্ডিত মহাশয় ছিটকি ফেলিয়া নারিকেলের ঝোকা'র প্রবর্তন করেন। এই দণ্ডের কৌশলটা এই : তিনজন হইতে পাঁচ-ছয়-সাতজন ছেলেকে একত্রে দাঁড় করানো হইত। তাদের সকলের গলা বেড়িয়া একটা চাদরে দুই মাথা একত্র করিয়া পণ্ডিত মহাশয় নিজ হাতে লইতেন। তারপর দড়ির গিরো কশার মত করিয়া চাদরের দুই মাথায় আতেক্কা হেঁচকা টান মারিতেন। তাতে চাদর-বেড়া সব ছাত্রের মাথা ঠুকঠাক ঠুসঠাস ও ঘটাঘট শব্দ করিয়া পরস্পরের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত করিত। তাতে নারিকেলের ঝোকার আওয়াজ পাওয়া যাইত। তিন-চারবার এরূপ করিলেই ছাত্ররা কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি শুরু করিত আর দুষ্টামি করিব না সার, কাল পড়া শিখিয়া আসিব, আজ মাফ করিয়া দেন স্যার ইত্যাদি।

পাঁচ-সাতটা মাথা একটানে একখানে করা কম শক্তির কাম নয়। কাজেই পণ্ডিত মহাশয় নিজেও নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু সেভাব না দেখাইয়া শুধু ছাত্রদের উপর দয়া পরবশ হইয়াই' সেদিনকার মত ছাড়িয়া দিতেন।

এমন শাস্তি পণ্ডিত মশায় প্রায়ই দিতেন। আমাদের ক্লাসেও হইত। একত্রে অন্তত তিনটা অপরাধী পাওয়া না গেলে নারিকেলের ঝোকা ভাল জমে না বলিয়াই যা কয়েক দিন বাদ পড়িত। এমন

শাস্তির প্রতি আমার একটা ভয়ানক ভীতি ছিল। কাজেই রাজার মহিষ না হওয়ার কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও শুধু নারিকেলের ঝোকা হওয়ার ভয়ে রাজাকে মহিষ বলা হইতে বিরত হইলাম।

৮. স্কুলে যাতায়াত

দরিরামপুর স্কুলে আমি চার বছর পড়িয়াছি। এই চার বছরে আমার অনেক জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তার মধ্যে বিপজ্জনক কায়িক পরিশ্রমই ছিল প্রধান। আমাদের বাড়ি হইতে বৈলর-ধানীখোলা বাজার-ঘাট আঁকাবাঁকা পথে এক মাইল। নদী পার হইয়া ডিবি রোডে আসিতে আরো এক মাইল। ডিবি রোড স্কুল পর্যন্ত তিন মাইল। এই পাঁচ মাইল রাস্তা চার বছর ধরিয়া দৈনিক দুইবার হাঁটিয়াছি। এই দূরত্ব পাঁচ মাইল শুকনা দিনে। বর্ষাকালে এই দূরত্ব অনেক বাড়িয়া যাইত। কারণ ধান-পাট ক্ষেতের আইল-বিল-বাতর ও খাল-বিলে কিনার ঘুরিয়া যাইতে হইত। শুকনা দিনের মত ক্ষেত-পাথালি বা বিল পাথালি চলিবার উপায় ছিল না। ঝড়-বৃষ্টির দিনেও স্কুল কামাই করার সাধ্য ছিল না। তবে বৃষ্টিতে কাপড়চোপড় নিতান্তই ভিজিয়া ডুবডুবা হইয়া গেলে 'রেইনি ডে' পাওয়া যাইত। অর্থাৎ নাম ডাকিয়া হাজিরা বইয়ে হাজির গরহাজির লিখিয়া স্কুল ছুটি দেওয়া হইত। এমন 'সৌভাগ্য' বছরে দুই দিনের বেশি আমার দরিরামপুর জীবনে হয় নাই।

বর্ষাকালে আরেকটা বড় অসুবিধা ছিল। সুতোয়া নদীতে কোনও পোল তো ছিলই না, গোদারাও ছিল না। ধানীখোলা-বৈলর ঘাটে হাটুরিয়াদের পারাপারের সুবিধার জন্য জমিদার পক্ষ হইতে যে নৌকার ব্যবস্থা ছিল, তা সব দিন বা সব সময় পাওয়া যাইত না। পুরা বর্ষাতে থমথমা ভরা নদী সাঁতরাইয়া পার হইবার সাহস বা মুরুব্বিদের অনুমতি ছিল না। অবশ্য অন্যান্য সময় নদী কম-ভরা অবস্থায় কোনও কোনও দিন সাতরাইয়া পার হইয়াছি। এতেও বই-পুস্তক, কালি-কলম, পেনসিল লইয়া আমাদের কোনও অসুবিধা হইত না। তবে এত দূরের রাস্তায় অতগুলি বই-পুস্তক ও খাতাপত্র লইয়া যাতায়াত বাস্তবিকই কঠিন হইত।

৯. বই-পুস্তকের থলি

কিন্তু দরিরামপুর ভর্তি হইবার পর মা আমাদের দুই ভাইকে দুটি জুযদানের মত থলি সিলাই করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে এটা পুরাতন কাপড়ের মযবুত, পরে নয়া মার্কিনের টুকরা দিয়া তৈরি হইত। দশীর তাগা দিয়া জুযদানের মত এসব বড় থলি সিলাই করিতেন। দশী' ও 'তাগা' শব্দ দুইটা আমাদের ছেলেবেলায় খুব চালু ছিল। আজকালের তরুণরা হয়তো এদের কথা শোনেই নাই। তাই এ সম্পর্কে কিছু বলা ভাল। তাগা' মানে সুতা। মোটা সুতাকেই তাগা' বলা হইত। 'দশী' হইল কাপড় বুনিবার সুতার (ইয়ান) ছোট ঘোট বান্ডিল। তৎকালে সুতার বান্ডিল আসিত বিলাত হইতে। এক এক বান্ডিল এক পাউন্ডের (আধসের) হইত। তাঁতি ও জোলারা বাজার হইতে এই বান্ডিল কিনিয়া গামছা, মেয়েদের মোটা রঙ্গিন শাড়ি ও পুরুষদের মোটা লুঙ্গি বুনিত। এক-এক বান্ডিল সুতার দাম ছিল দশ-বার আনা। সুতার দোকানদাররা এক পাউন্ডের বান্ডিল ভাঙ্গিয়া আধপোয়ার (এক আউন্স) ছোট ছোট বান্ডিল বানাইয়া বিক্রয় করিত। গিরস্তরা এই ছোট ছোট বান্ডিলকেই দশী' বলিত। গিরস্তরা বাড়ির মেয়েদের জন্য এই 'দশী কিনিত। মেয়েরা এই 'দশী'র দুই-তিন নাল সুতায় তাগা পাকাইত। এই তাগায় মেয়েরা কথা সিলাই করিত। ছেলেবেলায় মা, ফুফু ও চাচিজানকে এই তাগা দিয়া কাঁথা সিলাই করিতে দেখিয়াছি। দশী'র সুতাগুলি ছিল সাদা। কথায়

নকশি করিবার জন্য তাঁরা লাল-নীল-কালো রঙের সুতা ব্যবহার করিতেন। এই রঙ্গিন সুতা কিনিতে হইত না। মেয়েরা চওড়া পাড়ের যেসব বিলাতী শাড়ি পরিতেন, সেসব পাড়ের রং ছিল যেমন পাকা, সুতাও ছিল তেমনি মযবুত। 'দশীর' মোটা তাগায় সিলাই করিবার সময় মেয়েরা দুই নম্বর সুই ব্যবহার করিতেন। আর নকশি তুলিবার, তহবন্দ সিলাই করিবার এবং জামা-কোর্তা রিপু করিবার সময় পাঁচ নম্বর সুই ব্যবহার করিতেন। ফলে মেয়েদের কাছে দুই নম্বর ও পাঁচ নম্বর সুইই আমি দেখিয়াছি। আমাদের বাড়িতে শুধু চাচিজিকে দশ নম্বর সুই ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। এই দশ নম্বর সুই ও আলেকান্দ্রা মার্কা গুটি সুতা দিয়া তিনি নিজের জন্য কল্লিদার লম্বা কোর্তা সিলাই করিতেন।

১০. থলির সুবিধা

যা হোক, এই দশী তাগা দিয়াই মা আমাদের জন্য থলি তৈয়ার করিতেন। এই থলি বগলেও নেওয়া যাইত, আবার কাঁধে ঝুলাইয়াও নেওয়া যাইত। কাঁধে ঝুলাইবার জন্য কাপড়ের শক্ত পাড় দিয়া কাঁধ-প্যাচা বনাত লাগানো হইত। এই থলিতে পেনসিল, রবার ও কলম-তারাশের (ছোট চাকু) জন্য পৃথক পৃথক জেব থাকিত। প্রথম প্রথম আমরা কাঁধ-পঁাচা থলিতে করিয়া বই-পুস্তক নিতে আপত্তি করিতাম। কারণ এটা দেখিতে আদালত পোস্টাফিসের পিয়ন-পিয়াদার মত দেখাইত। কিন্তু কিছুদিনেই আমাদের এই শরম কাটিয়া গেল। দূরের রাস্তায় এইভাবে বই-পুস্তক বহনের সুবিধাও আমরা বুঝিলাম। দু-একজন শিক্ষক আমাদের তারিফও করিলেন। কোনও ছাত্র কিছু একটা হারাইবার অজুহাত দিলেই মাস্টার সাহেবেরা আমাদের নজির দিতেন। এই থলির দরুনই দরিরামপুরে আমরা ছাত্রজীবনের চারটা বছরে আমি কোনও দিন বই-পুস্তক, খাতা-দোয়াত, কলম-পেনসিল, রবার চুষকাগজ-কলম-তারাশ, কিছুই হারাই নাই। যখন যেটার দরকার হাত দিয়াই পাইয়াছি। অথচ অনেক বেশি বইয়ের ভারী বোঝা বহন করিতে আমাদের কোনও কষ্ট হইত না। কাধ-প্যাচা বনাতটা সাধারণত ডান কাঁধের উপর থাকিত এবং থলিটা বাম কাকালে ঝুলিয়া থাকিত। ক্বচিৎ-কদাচিৎ কাঁধ বদলাইয়া বনাতটা ডান কাঁধ হইতে বাম কাঁধে আনিতাম। তাতে থলিটা বাম কাকাল হইতে ডান কাকালে আসিত।

১১. বিপজ্জনক রাস্তা

এই থলি কাঁধে করিয়া আমরা বাড়ি হইতে বাহির হইতাম স্কুলের নির্ধারিত সময়ের দুই আড়াই ঘণ্টা আগে। অর্থাৎ দশটার সময় ক্লাস বসিলে আমরা সাড়ে সাতটায় বাড়ি হইতে বাহির হইয়া উঁচা-উঁচা পাটের ক্ষেতের সরু-সরু আইল-বাতর দিয়া পানিতে-ডুবা ধান ক্ষেতের আইল হাঁটিয়া নদী পার হইতাম এবং আরো মাইলখানেক হাঁটিয়া বড়দিঘির' নিকটে আসিয়া ডিবি রাস্তায় উঠিতাম। বৈলর, কানহর, কাঁঠাল, ভরাডুবা ইত্যাদি গ্রামের সহপাঠীরা এই বড়দিঘির পাড়ে আসিয়া জমা হইত। ক্লাস আওয়ারের এক ঘণ্টা বাকি থাকিতে এখান হইতে সকলে মিলিয়া রওয়ানা হইতাম। রাস্তার দুই পাশে আরো ছাত্ররা অপেক্ষা করিতে থাকিত। তারা আমাদের সাথে শামিল হইত।

কিন্তু যদি নৌকার অভাবে আমরা সুতোয়া নদী পার হইতে না পারিতাম তবে নদীর কূল বাহিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতে থাকিতাম। বর্তমানে ধানীখোলা বাজার হইতে ত্রিশাল বাজার পর্যন্ত গাড়ি,

ঘোড়া মটর চলিবার উপযোগী যে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা আছে, এমন কোনও রাস্তা তৎকালে ছিল না। তবে দুপায়া একটি রাস্তা ছিল। কিন্তু সে রাস্তা ছিল প্রায় অন্ধকার বিশাল জঙ্গলের ভিতর দিয়া। তাতে আবার কিছু দূর পরপর পনের-বিশ হাত গভীর নদীর ভাঙতি ছিল। দিনের বেলায়ও ঐ রাস্তায় কেউ একা চলিতে সাহস পাইত না। আমাদের মত আট-দশ বছরের শিশুর তো কথাই নাই। কিন্তু আমরা সাহস করিতাম। আমরা দুই ভাই ছাড়াও আমাদের প্রতিবেশী আরো দুইজন ছাত্র দরিরামপুর স্কুলে পড়িত। আমরা এই চারিজন নদীর পাড়ের এই পথে। দক্ষিণ দিকে চলিতাম। নদীর পাড়ে বহু অবস্থাশালী গৃহস্থের বাড়ি ছিল। তাদের বাড়ির ঘাটে পারাপারের সুবিধার জন্য কলাগাছের ভোরা (ভেলা) থাকিত। আমরা বহুদিন এই রকম ভোরায় নদী পার হইয়াছি। নদী পার হইয়া একবার বৈলর গ্রামে যে কোনও মৌযায় পৌঁছিতে পারিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতাম। আইল-বাতর ভাঙ্গিয়া কোনও এক উপায়ে আমরা ডিবি রাস্তা ধরিতে পারিতামই।

এত করিয়াও আমরা প্রায় ঠিক সময়েই স্কুলে পৌঁছিতাম। চার বছরে আমরা দুই এক দিনের বেশি লেইট হইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

রাস্তাঘাটের এই বিপজ্জনক অবস্থার জন্য আমার মুরুব্বিরা সারা দিন উদ্বিগ্ন থাকিতেন। আমার মা সারা দিন আমাদের নিরাপদে ফিরিয়া আসিবার জন্য দমে-দমে আল্লা-আল্লা করিতেন। আসরের নামাজ পড়িয়াই দেউড়ির কাছে। আসিয়া উঁকিঝুঁকি শুরু করিতেন। বাপজী ও চাচাজী সাংসারিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকিতেন বটে, কিন্তু দাদাজী তৎকালে সব কাজ হইতে অবসর নিয়াছেন। কাজেই আসরের নামাজ পড়িয়াই তিনি বাড়ি হইতে বাহির হইতেন এবং নদীর ঘাটের কাছে কোনও দোকান ঘরে বা কাঁচারিতে বসিয়া ঘাটের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। আমরা ফিরিয়া আসিলে আমাদেরে সঙ্গে নিয়া বাড়ি ফিরিতেন। কোনও কোনও দিন ফিরিতে আমাদের এত দেরি হইত যে নদীর পাড়েই দাদাজীকে মগরেবের নামাজ পড়িতে হইয়াছে। লোকজনের মুখে শুনিয়াছি সেদিন দাদাজী নদীর পাড় দিয়া প্রায় এক মাইল রাস্তায় উত্তর-দক্ষিণ করিয়া টহল দিয়াছেন। এবং রাস্তায় যাকে পাইয়াছেন তাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

## ১২. দুইটি ব্যক্তিত্বের প্রভাব

দরিরামপুর স্কুলে ছাত্রজীবনে আমি দুইটি লোকের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হইয়াছিলাম। তার একজন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার কৈলাস বাবু। আরেকজন স্কুল-সংলগ্ন মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ। কৈলাস বাবু আমাকে সাহিত্য সাধনার অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন। সে কথা আমি অন্য অধ্যায়ে বর্ণনা করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে কৈলাস বাবু আমার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিলেন। পড়া-শোনায়, আদব-কায়দায়, স্বভাব-চরিত্রে আমার মত ছেলে তিনি জীবনে আর দুইটি দেখেন নাই, সব সময় সবার কাছে তিনি এই কথা বলিয়া বেড়াইতেন। তিনি ছাত্রদের উপযোগী শিক্ষামূলক নাটক লিখিয়া ছাত্রদের দিয়া অভিনয় করাইতেন। তাতে সব সময় আমাকে নায়কের পাট দিতেন। সব সময় নায়কটি আদর্শ চরিত্রবান যুবক থাকিত। উপসংহারে তার জয় দেখানো হইত। আমি আগে সত্য সত্যই ভাল ছিলাম কিনা দ্বিমত হইতে পারিত। কিন্তু কৈলাস বাবু ভাল বলিতে-বলিতে আমি সত্যই ভাল হইয়া গেলাম।

আতিকুল্লাহ মাদ্রাসার ছাত্র হইলেও তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গায়ক ও চিত্রকর। জীব-জন্তুর ছবি আঁকা নিষেধ আছে বলিয়া আতিকুল্লাহ শুধু লতা পাতা-গাছ-বৃক্ষ ও নদী-নালার ছবি আঁকিতেন। গান না গাহিয়া তিনি বাংলা গজল গাইতেন। লতা-পাতা আঁকা ছাড়া তিনি আরবি ও বাংলা হরফে অতি চমৎকার 'তুগরা' আঁকিতেন। আরবি হরফের তুগরা অনেক কেতাবে পাওয়া যাইত, কাজেই আতিকুল্লাহর আরবি তুগরাতে বড় কেউ আশ্চর্য হইতেন না। কিন্তু বাংলা হরফে তিনি যে তুগরা আঁকিতেন সেটা ছিল সত্যই মৌলিক। চিত্র করা ও তুগরা লেখার কাজে যে সব বিভিন্ন রঙের কালি লাগিত, আতিকুল্লাহ সবই নিজের হাতে তৈয়ার করিতেন। চিত্র ও তুগরা ছাড়াও তিনি সাধারণ চিঠিপত্র ও খাতার কাগজেও এমন সুন্দর হরফে সব লেখা লিখিতেন যে ছাপার হরফ বলিয়া ভুল হইত। তিনি একদিকে তেরছাকাটা খাগের কলম দিয়া বড়-বড় হরফে বহু পোস্টার লিখিয়া ঘরের বেড়ায়, মসজিদের দেওয়ালে লটকাইয়া দিতেন। না বলিয়া দিলে কেউ এগুলিকে হাতের লেখা বলিয়া ধরিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে সরু মিহিন লেখাতেও তিনি উস্তাদ ছিলেন। একদা তিনি ছাপার হরফের মত গুট-গুট পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট অক্ষরে একটি পোস্টকার্ডে একাশি লাইনের একটি পত্র লিখিয়াছিলেন। ছাপার হরফের মত প্রতিটি হরফ এমন স্পষ্ট ও আলগ ছিল যে কোনও অল্প শিক্ষিত লোকও তা পড়িতে পারিত।

এই সব গুণে আমি অল্পদিনেই আতিকুল্লাহর শাগরিদ হইয়া গেলাম। তিনিও আমাকে অকাতরে তার বিদ্যা শিখাইলেন। আমি নিজ হাতে বিভিন্ন রঙের কালি বানাইয়া চিত্র ও তুগরা আঁকায় লাগিয়া গেলাম। অবশ্য এসব গুণে আমি আতিকুল্লাহ সাহেবের ধারে-কাছেও যাইতে পারিলাম না। কিন্তু এতে আমার হাতের লেখার অনেক উন্নতি হইল। আমার ছেলেবেলার উস্তাদ চাচাজী, জগদীশ বাবু ও আলিমুদ্দিন মাস্টার সকলেরই হাতের লেখা ভাল ছিল। বিশেষত চাচাজীর আরবি ও বাংলা লেখা তাঁর পাঠ্যজীবনের খাতা-পত্র আমরা অনেক দেখিয়াছি। হাতে-তৈরি মিসমিসা কালিতে তেরছাকাটা কলমে এসব লেখা অবিকল ছাপা হরফের মত দেখা যাইত। ত্রিশ-চল্লিশ বছরেও কালির চকচকাভাব কমে নাই। বাল্য শিক্ষকের হাতের লেখাই অধিকাংশ ছাত্রের হস্তাক্ষরে প্রভাবিত করে। আমারও করিয়াছিল। কিন্তু নকশি লেখায় আমাকে একমাত্র আতিকুল্লাহ সাহেবই যে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নাই। আতিকুল্লাহ সাহেব আমাকে সাহিত্য সাধনায়ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ কথা আমি অন্য অধ্যায়ে বলিব। এখানে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে প্রায় সমবয়সী সহপাঠীও যে মানুষের জীবনে কত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, আতিকুল্লাহ আমার জীবনে তার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ।

## ১৩. করোনেশনের পুরস্কার

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি ক্লাস ফাইভ হইতে ক্লাস সিক্সে প্রমোশন পাই। ঠিক সেই সময়ে আমাদের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মারা যান। সে জন্য এক সপ্তাহ কাল আমরা ছাত্ররা হাতের বাহুতে কালো ফিতা বাধিয়া চলিতাম। সরকারি হুকুমে হেডমাস্টার বাবুই আমাদেরে এই কালো ফিতা পরিতে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু ফিতা ও সেফটিপিন স্কুল হইতেই সরবরাহ করা হইয়াছিল বলিয়া এতে আমাদের কোনও আপত্তি হয় নাই। বরঞ্চ একটা নয়া অভিজ্ঞতা হিসাবে এটা আমি উপভোগ করিয়াছিলাম।

ঐ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উৎসব দিল্লি দরবার উপলক্ষে সরকারি টাকায় আমাদের স্কুলে উৎসব হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্কুলের সবচেয়ে ভাল ছাত্র হিসাবে, সত্যবাদী ছাত্র হিসাবে এবং নিয়মিতভাবে স্কুলে হাজির থাকার দরুন আমি তিন দফা পুরস্কার পাই। তিন দফায় বাংলা-ইংরাজি মিলাইয়া আমি দশ কি বারখানা ভাল ভাল বাঁধানো বই পুরস্কার পাইয়াছিলাম। ইংরাজি বইয়ের মধ্যে রবিনসন ক্রুসো, আইভানহো, ইভনিংস অ্যাট হোম, গ্রিমস ফেয়ারি টেলস এর নাম এবং বাংলা বইয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী ও নৌকাডুবি এবং জলধর সেনের বিশু দাদার নাম মনে আছে। এই সব বইয়ের দুই-একটি বাদে আর সবগুলিই লাল-নীল-সবুজ রঙের কাপড়ে বাঁধাই ছিল। অনেকগুলিতেই সুন্দর ছবি ছিল। এই সব পুস্তক বগলে লইয়া যেদিন বাড়ি ফিরিলাম এবং আমার বড় ভাই সগর্বে আমার সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে দামি বই পুরস্কার পাওয়ার কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন বাড়ির সকলে আনন্দ-উল্লাস করিতে লাগিলেন। আমি লজ্জা-শরমে খানিকক্ষণ লুকাইয়া থাকিলাম। তারপর পুস্তকের মধ্যে মানুষের ছবি দেখিয়া কেউ কেউ আপত্তি তুলিলেন বটে কিন্তু কিছুদিন আগে চাচাজীর নিজের কেনা আমির হামযা ও জংগনামার মধ্যেও ঘোড়সওয়ার আমির হামযা ও হানিফার পাতা-জোড়া ছবি আছে বলিয়া ছবির আপত্তি বেশি দিন টিকিল না। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি দরিরামপুর মাইনর স্কুলের বিদ্যা শেষ করিয়া ময়মনসিংহ শহরে আসিলাম। এই বছরই দরিরামপুর মাইনর স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়। কাজেই স্কুল কমিটির মেম্বর-সেক্রেটারি সকলে আমাদের দুই ভাইকেই ঐ স্কুলে থাকিয়া যাইতে বলেন এবং দাদাজীকে ধরেন। দাদাজী কিছুটা নরম হইলেন বটে কিন্তু আমি শহরে যাইবার জন্য জিদ ধরিলাম। শেষে আপসরফা হিসাবে অন্তত এক ভাই ঐ স্কুলে থাকা ঠিক হইল। ফলে মিঞা ভাই দরিরামপুর নয়া হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হইলেন। আমি ময়মনসিংহ চলিয়া আসিলাম।

# ০৫. মাধ্যমিক শিক্ষা-নাসিরাবাদে

## অধ্যায় পাঁচ – মাধ্যমিক শিক্ষা-নাসিরাবাদে

### ১. মৃত্যুঞ্জয় স্কুল

১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আমি নাসিরাবাদ শহরে পড়িবার জন্য আসিলাম। ময়মনসিংহ শহরকে তৎকালে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা নাসিরাবাদ বলিত। আমার মুরুব্বিরাও বলিতেন। কিন্তু শহরে আসিয়া দেখিলাম, সবাই এটাকে ময়মনসিংহ বলে, নাসিরাবাদ কেউ বলে না।

শামসুদ্দিন আগে হইতে ময়মনসিংহ শহরে থাকিতেন। সুতরাং তার সাথে একত্রে থাকিবার জন্য তাঁদের মেসেই উঠিলাম। ঐ মেসে আমাদের প্রতিবেশী মাতবর ওসমান আলী সরকার সাহেবের ছোট ভাই সাঈদ আলী সাহেবও থাকিতেন। কাজেই মুরুব্বিদের কথামত বাড়ি হইতে আগেই ঠিক করিয়াই আসিয়াছিলাম, এদের সঙ্গেই থাকিব। সাঈদ আলী সাহেব ও শামসুদ্দিন উভয়েই জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কাজেই জিলা স্কুলেই ভর্তি হইব, ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু গিয়া দেখিলাম জিলা স্কুলে সিট নাই। সাঈদ আলী সাহেব ও শামসুদ্দিন অবশ্য আমার একটা সিটের জন্য অনেক ধরাধরি করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। এতে আমি খুবই নিরাশ হইলাম। আমার আত্মীয়-বন্ধুরা। জিলা স্কুলে পড়েন, সে জন্য জিলা স্কুলের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান ছিল। তা ছাড়া জিলা স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হইবার আরেকটা সাম্প্রতিক কারণ ঘটিয়াছিল। সেই বছরই জিলা স্কুল তার পুরাতন বাড়ি। হইতে নূতন দালানে উঠিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে জিলা স্কুল যে বাড়িতে আছে, এটাই সেই নূতন দালান। এর আগে জিলা স্কুল ছিল জজকোর্টের দক্ষিণ দিকের লম্বা বড় টিনের ঘরটায়। বর্তমানে এই ঘরটা সেটেলমেন্ট বিভাগের রেকর্ড রুমরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, জিলা স্কুলের নূতন বাড়িতে সেই বারই প্রথম স্কুল উঠিয়া আসিয়াছে। নূতন স্কুল দালানের ভিতর-বাইর সবই তকতকা সুন্দর। চারিদিকে সব দেওয়াল নূতন। বিশেষত মাঝখানের হল ঘরটা একটা বিস্ময়ের বস্তু। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কথা বলিলে সারা। হলটায় গম গম করিয়া আওয়াজ ওঠে। এমন সুন্দর স্কুলে পড়িতে পারিব না বলিয়া মনটা এমন খারাপ হইয়া গেল যে রাগে ঠিক করিলাম আবার আমার প্রিয় দরিরামপুরে ফিরিয়া যাইব।

শামসুদ্দিন যে মেসে থাকিত এবং সেখানে আমি উঠিয়াছিলাম তার সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মৌলবী আবদুল হাই। তিনি মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের আরবি ফারসি শিক্ষক। তিনি আমাকে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ভর্তি হইবার উপদেশ দিলেন। মৌলবী সাহেবকে আমার ভাল লাগিয়াছিল। তার উপদেশ আমি রাখিলাম। বিশেষত ঐ মেসে যত ছাত্র ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের ছাত্র। কাজেই মৃত্যুঞ্জয় স্কুলেই ভর্তি হইলাম।

মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ভর্তি হইয়া জিলা স্কুলে সিট না পাওয়ার দুঃখ আমি ভুলিয়া গেলাম। কারণ মৃত্যুঞ্জয় স্কুল আমার কাছে একটা মহাসাগর মনে হইল। স্কুল ত নয়, যেন একটা মেলা। স্কুল বিল্ডিং ত নয়, যেন একটা দুর্গ। কোথাও যে এ দালানের শুরু আর কোথায় যে এটার শেষ, খুঁজিয়া বাহির করা

কঠিন। প্রথম প্রথম আমার মনে হইল এ স্কুলের ছাত্রদেরও লেখাযোখা নাই। মাস্টারের সংখ্যাও অগণিত। পরে জানিয়াছিলাম স্কুলে ছাত্রসংখ্যা দেড় হাজার। শিক্ষক-সংখ্যা চৌত্রিশ জন। দেড় হাজার ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা তিন শর কিছু উপরে। এই হিসাবে জিলা স্কুল অতি ছোট স্কুল। তার মোট ছাত্রসংখ্যাই ছিল পৌনে তিন শ, মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের মুসলমান ছাত্রের চেয়েও কম। তখন এই শহরে অবশ্য সিটি স্কুল ছিল ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের চেয়েও বড়। তার ছাত্রসংখ্যা ছিল সতের-আঠার শ। শিক্ষক ছিলেন চল্লিশের বেশি। কিন্তু মুসলমান ছাত্রের দিক দিয়া মৃত্যুঞ্জয় স্কুলই শ্রেষ্ঠ। সিটি স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল এক শরও কম।

২. হিন্দু-মুসলমান পৃথক বেঞ্চি

এই দিক দিয়া জিলা স্কুলে ভর্তি না হওয়ার দুঃখই শুধু ভুলিলাম না, মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য গর্ব-অহংকার করিতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত ভূপতি চরণ দত্ত, ইংরাজি শিক্ষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র সরকার, বাংলা শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র রায়, গণিতের শিক্ষক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ দত্ত রায় প্রভৃতি মাস্টার মহাশয়ের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলাম। ক্লাসে ভাল ছাত্র বলিয়া নাম করিলাম। ক্লাসের ফার্স্ট বয় শৈলেশ ধর, সেকেন্ড-থার্ড-ফোর্থ যথাক্রমে মনসা চক্রবর্তী, সুধীর রায়, নরেশ ঘোষ সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এ স্তরে পৌঁছিতে কয়েক মাস সময় লাগিয়াছিল। কারণ তৎকালে হিন্দু-প্রধান স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের বিশেষ মর্যাদা ছিল না। আমি প্রথম দিন ক্লাসে গিয়াই বুঝিলাম, হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা পৃথক-পৃথক বেঞ্চিতে বসে। এটা উপরের হুকুমে হয় নাই সে খবর পাইলাম। আপনা-আপনিই এটা হইয়া গিয়াছে। সাধারণত ক্লাসে ছাত্রদের বসিবার জন্য নিয়ম-নির্দিষ্ট কোনও সিট নাই। ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড বয় পর্যন্ত ছাত্ররা শিক্ষকের বাম দিকস্থ কাতারের প্রথম দিকে বসিলেও অন্য ছাত্ররা যার যথা-ইচ্ছামত বসিয়া থাকে। এই বসার গ্রুপিং হইয়া থাকে ছাত্রদের পরস্পরের সখ্য ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। খাতিরের সমপাঠীরা এক বেঞ্চে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া থাকে। এই নিয়মেই মুসলমান ছাত্ররা একসঙ্গে এক বেঞ্চিতে জমা হইয়া যাইত। সাধারণত হিন্দু ছেলেরাই ক্লাসের ভাল ছাত্র বলিয়া ভাল ছাত্রের বেঞ্চিতে শুধু হিন্দু ছাত্রই দেখা যাইত। এই স্বাভাবিক কারণে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা ক্লাসে পৃথক পৃথক আসনে বসিতে বসিতে এটা একরকমের নিয়মে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক থাকায় এই পৃথক বসাটাকে সেই অর্থে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। তা ছাড়া এতে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে হয়তো একটা কমপ্লেক্স গড়িয়াও উঠিয়াছিল। মুসলমান ছাত্ররা হিন্দুদের সাথে এক বেঞ্চিতে বসিতে সাহস পাইত না; আর হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে বসিতে ঘৃণা ও অপমান বোধ করিত। এই অবস্থায় প্রথম দিন ক্লাসে গিয়াই আমি প্রথম কাতারে টিচারের আসনের নিকটে যখন বসিলাম, তখন অনেক ছাত্রই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। আমি অবশ্য আমার ডান দিকে দুই-একজন বসিতে পারে, সে মত জায়গা রাখিয়াই বসিলাম। নূতন নূতন ক্লাসে ভর্তি হইয়াই ক্লাসের প্রথম সিটটায় বসা উচিৎ মনে হইল না। আমি বরাবর ক্লাসে প্রথম সিটটাতেই বসিয়াছি। সেই অভ্যাসবশত প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকিয়াই নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রথম সিটটায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম। কারণ প্রথম দিন বলিয়া প্রায় আধা ঘণ্টা আগেই ক্লাসে গিয়াছি। ক্লাসের অনেক ছাত্র বিশেষত ফার্স্ট বয় শৈলেশ ধর তখনও আসেন নাই। তবু বেঞ্চিতে বসিবার পর আমার মনে হইল ডান দিকে দুই-একজনের বসিবার মত জায়গা ছাড়িয়া দেওয়া আমার উচিৎ। তদনুসারে সরিয়া বসিলাম। আমরা এই দ্বিধা ও দুর্বলতা অন্যান্য সামনের বেঞ্চের ছাত্রদের কেউ-

কেউ বোধ হয় বুঝিতে পারিল। কারণ আমি যে মুসলমান সে সম্বন্ধে ভুল করিবার কোনও উপায় ছিল না। আমার মাথায় ঈষৎ খয়েরি লাল রঙের তুর্কি টুপিটা আমার মুসলমানত্ব ঘোষণা করিতেছিল। এখানে বলা দরকার যে দরিরামপুর স্কুলে পড়িবার কালে ১৯১১ সালে ইতালির ত্রিপলি আক্রমণের প্রতিবাদে আমি তুর্কি টুপিটা পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম। তুর্কি টুপির বদলে একটা ইরানি টুপি কিনিয়াছিলাম। কিন্তু তুর্কি টুপির প্রতি আমার মায়া কাটে নাই। শুধু সকলের সঙ্গে হুজুগে মাতিয়াই অত আদরের টুপি পোড়াইয়াছিলাম। তারপর অল্প দিনেই তুর্কি টুপির প্রতি আমার টান আরো বাড়িয়া যায়। কারণ ইরানি টুপির আর যত গুণই থাকুক না কেন ওটা শক্ত। ওটা ধুইয়া পরিষ্কার করা যায় না। দরকারমত পকেটে ভরাও যায় না। পক্ষান্তরে তুর্কি টুপি নরম। ধুলা বা অন্য ময়লা লাগিলে রিঠা দিয়া ঘোয়া যায়। তারপর কালেবে করিয়া সুন্দর সাইযে বহাল করা যায়। বৃষ্টি-বাদল ইত্যাদি ঠেকা-বাধায় ভাঁজ করিয়া শার্ট-কোটের পকেটে ভরিয়া টুপি বাঁচানো যায়। এসব কারণে ইতালি বয়কটের হিড়িকটা একটু কমামাত্র পরের বছরই অপেক্ষাকৃত সুন্দর একটা তুর্কি টুপি কিনিয়া ইরানি টুপিটাকে বাক্সবন্দী করিয়াছিলাম। এই টুপি পরিয়াই মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে ক্লাস করিতে শুরু করিয়াছিলাম। টুপি-পরা মুসলমান, তা-ও আবার নূতন ছাত্র। কাজেই আমাকে ক্লাসের ফার্স্ট-সেকেন্ড বয়ের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিয়া হিন্দু ছাত্ররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিবে, এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। পরে দু-একজন মুসলমান ছাত্র আমাকে বলিয়াছিল, আমাকে ঐখানে বসিতে দেখিয়া তাদের বুক কাঁপিতেছিল। তবে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তারা নাকি প্রস্তুতও ছিল। সে প্রস্তুতিটা ছিল এই : যদি হিন্দু ছেলেরা শিক্ষকদের কাছে নালিশ করিত এবং তাতে যদি শিক্ষকেরা আমাকে শাস্তি দিতে চাহিতেন, তবে তারা বলিত : পাড়াগা হইতে নূতন আসিয়াছি। শহরের হাল-চাল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই। কাজেই প্রথমবারের জন্য আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হউক।

কিন্তু তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটিল না। যদিও আমার বেঞ্চের দু-একজন ভাল ছাত্র আমাকে ঐ বেঞ্চি ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল এবং যদিও আমি তাদের কথায় কান না দিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া রহিলাম তথাপি কেউ শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের কাছে নালিশ করিল না। শুধু পাশের দুজন ছাত্র আমার গা ঘেঁষিয়া না বসিয়া একটু তফাতে বসিল এবং মাঝে মাঝে আড়চক্ষে আমার দিকে কড়া নজর ফেলিতে লাগিল।

### ৩. প্রথম বিরোধ

ভালয়-ভালয় দিনটা কাটিয়াই প্রায় গিয়াছিল। বিকালের দিকে একজন শিক্ষক আমাদের ক্লাসে আসিলেন। আমাকে তার অতি নিকটে প্রথম বেঞ্চিতে দেখিয়া তিনি মুখ ভেংগাইয়া বলিলেন : মিয়া সাহেবের কোন চিড়িয়াখানা থনে আসা হৈছে? এক লাফেই যে একেবারে গাছের আগায় বসা হৈছে?

আমি সারের কথার কোনও মানে বুঝিলাম না। কিন্তু সারা ক্লাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছাত্রদের সে হাসিতে সারও যোগ দিলেন না, আমিও যোগ দিলাম না। ক্লাসে এমন উচ্চ হাসির রোল তোলার জন্য ছাত্রদেরে তিনি কোনও ধমকও দিলেন না। তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়াই রহিলেন। যেন তিনি প্রশ্নটার জবাবের অপেক্ষায় আছেন। আমি ধীরে ধীরে দাঁড়াইলাম। সারের কথার অর্থ না বুঝিলেও এইটুকু আমি বুঝিয়াছিলাম যে তিনি আমাকে বিদ্রূপ করিলেন; এটাও বুঝিলাম যে, এই স্থানে বসার জন্যই তিনি আমাকে বিদ্রূপ করিলেন। কাজেই মনে মনে আমার খুব

রাগ হইয়াছিল। আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম : এ জায়গায় বসা কি আমার অন্যায় হৈছে সার? কোনও নিষেধ আছে?

শিক্ষক মহাশয় যেন বিস্মিত হইলেন। সারা ক্লাস নিস্তব্ধ হইল। শিক্ষক মশায় একটু তোতলা ছিলেন। সেটা এইবার বুঝিলাম। তিনি দুই-একবার ঠোঁট বাজাইয়া বলিলেন : আমার কথা তুমি বুঝতে পারো নাই মিয়া সাহেব। এই বেঞ্চিতে বসায় নিষেধ নাই সত্য কিন্তু ওখানে বসতে হৈলে ভাল ছাত্র হওয়া দরকার।

আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম। বলিলাম : আমি ছাত্র ভাল কি মন্দ, দু-চার দিন না পড়াইয়া কীভাবে বুঝলেন সার?

মাস্টার মশায় বোধ হয় আরো বেশি রাগিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন : 'অত কথা কইও না মিয়া সাহেব। ভাল ছাত্র হইলে একেবারে ডাইনে গিয়ে বসো। ফলেন পরিচিয়তে। এখন বইসা পড়ো ত মিয়া সাহেব।' কিন্তু আমি বসিলাম না। বুঝিলাম মুসলমান ছাত্রকে মিয়া সাব' বলা তাঁর রোগ। কী যেন ঘাড়ে জিদ চাপিয়া গিয়াছিল। আমি যে ক্লাসে প্রথম আসিয়াছি, সে কথা ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম : কথায় কথায় আমারে মিয়া সাব বলেন কেন সার? আমরা মুরুব্বিদেরেই মিয়া সাব বলি। আমি ত আপনার মুরুব্বি নই; আপনার ছাত্র।

স্পষ্টই দেখিলাম, মাস্টার মশাই একেবারে সিদ্ধ করা শাকের মত মিলাইয়া গেলেন। আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া গজাইতে লাগিলেন। বাংলায়। তিনি দ্বিতীয় শিক্ষক। খুব ভাল পড়াইলেন। শিক্ষক হিসেবে উনাকে আমার খুব পছন্দ হইল। পরে জানিতে পারিলাম তাঁর নাম শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী। মুসলমান বন্ধুরা বলিল : অতুলবাবু মুসলিম-বিদ্বেষের জন্য খুব সুপরিচিত। আমি তার মুখের মত জবাব দিয়াছি বলিয়া অনেকে আমার তারিফও করিল। হিন্দু বন্ধুরা ঐ ধরনের কিছু বলিল না। ঐ ঘটনা সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও কোনও কথা আলোচনা করিল না। কিন্তু কাজে-কর্মে ব্যবহারে তারা প্রমাণ করিল, তারা আমাকে যথেষ্ট সমীহ করে। আস্তে আস্তে ক্লাসের ভাল ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ হইলাম। প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় স্থান দখল করিলাম। ওদের অনেকের সাথে এমন বন্ধুত্ব হইল যা মুসলমান ছেলেদের সঙ্গেও ছিল না। শুধু অতুলবাবু নন, কোনও কোনও হিন্দু সহপাঠীও মুসলমান ছাত্রদেরে 'মিয়া সাব' বলিয়া সম্বোধন করিত। আমি অল্প দিনেই বুঝিলাম অতুলবাবু ভাল শিক্ষক। অতুলবাবুও কয়েক দিনে বুঝিলেন, আমি ছাত্র মন্দ নই। কাজেই মোটামুটি ভাল ব্যবহারই তিনি। করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ একদিন আমার উপর চটিয়া গেলেন। পড়াশোনায় গাফলতির কোনও ব্যাপার ছিল না। আমার পোশাক দেখিয়াই তিনি চটিয়া গিয়াছিলেন। এটা তার কথায় বুঝা গেল। তিনি ক্লাসে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়াই ছাত্রদেরে এক নজর দেখিয়া লইলেন। আমার উপর চক্ষু পড়িতেই তিনি মুখ বেঁকাইয়া বলিলেন : কী মিয়া সাব, আজ যে বড় চিকনাই জামাই বাবুটি সাইজা আসছ?

সত্যই আমি সেদিন একটা ডবল-কাফ ডবল-ব্রেস্টের সদ্য-ইস্ত্রি-করা শার্ট পরিয়া স্কুলে আসিয়াছিলাম। মেসের বন্ধু-বান্ধবের চাপেই আমি এই ডবল ব্রেস্টওয়ালা ইস্ত্রি-করা শার্টটা কিনিয়াছিলাম। সদ্য-ইস্ত্রি-করা লাল-সাদা ডুরির এই শার্টটা পরিয়া আমার নিজেরই কেমন লাগিতে ছিল। ক্লাসের বন্ধুরা কেউ কিছু বলিলে হয়তো আমি এর একটা কৈফিয়ত দিতাম। কিন্তু অতুলবাবুর

উপর আমার আগেরই রাগ ছিল। বিশেষত তিনি বহুদিন পরে আজই আবার ‘মিয়া সাহেব’ বলিলেন। তার উপর আবার চিকনাই জামাই বাবু বলিয়া গাল দিলেন। আমার মন ও মাথায় যেন একটা ঝাঁকি লাগিল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপর আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম : কী কইলেন বাবুজি?

এমন কাজ কেউ করে নাই। এমন কথা কেউ আর বলে নাই। অতুলবাবু গর্জিয়া উঠিলেন : কী, তুমি আমারে বাবুজি কইলা?

আমি : আপনিও ত স্যার আমারে মিয়া সাব কইলেন।

অতুলবাবু ক্লাস থনে বাহির হইয়া গেলেন। হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মজুমদারের কাছে নালিশ হইল। আমার ডাক পড়িল। আমি গেলাম। সত্য কথা সব খুলিয়া বলিলাম। তার সুবিচারে আমি খালাস পাইলাম। অতুলবাবু তিরস্কৃত হইলেন। এই ঘটনার পর অতুলবাবু আমাকে আর কোনও দিন মিয়া সাব বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। হিন্দু সহপাঠীদের মধ্য হইতে আস্তে আস্তে ঐ অভ্যাস দূর হইয়া গেল।

৪. ঢিলের জবাবে ঢিল

কিন্তু অতুলবাবুর প্রতি আমার রাগ কমিল না। অতুলবাবুও যেন আমাকে কোনও দিন ভাল চোখে দেখিতে পারেন নাই। সে জন্য দোষী ছিলাম বোধ। হয় আমিই। কারণ আমার একটা স্বভাবই ছিল এই যে আমাকে যিনি আদর করিতেন তাঁর প্রতি আমি একেবারে গলিয়া যাইতাম। একটা মিষ্টি কথা বলিলে আমি একেবারে নুইয়া পড়িতাম। কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করিলে, তুই তুংকার করিলে আমি আগুন হইয়া যাইতাম। এবং হুঁশ-জ্ঞান হারাইয়া। বেআদবি করিয়া ফেলিতাম। গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিবার কিছুদিন আগে। আমি আমাদের জমিদারের ধানীখোলা কাঁচারির নায়েব শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সাথে তুই’-এর জবাবে তুই’ বলিয়া এমনি এক বেআদবি করিয়াছিলাম। তাতে সারা গায়ে ও কাঁচারিতে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল। আমার ও আমার মুরুব্বিদের বিপদের আশঙ্কা হইয়াছিল। আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর নামক বইয়ে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছি। তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ করিলাম না। শুধু এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই স্বভাব আমার স্কুল-কলেজজীবনেও দূর হয় নাই। বোধ হয়, আজও এই বয়সেও না।

অতুলবাবুর গম্ভীর মুখ ও কড়া চাহনিও আমাকে নরম করিতে পারিল না। বরঞ্চ অনেক মুসলমান সহপাঠী গোপনে গোপনে আমাকে খুব সাহস দিতে লাগিল। তারা বলিল যে অতুলবাবু আমাকে বানর বলিয়াছেন। তারা দেখাইয়াছিল যে একলাফে গাছের আগায় উঠার কথাটার মধ্যেই বানরের ইঙ্গিত রহিয়াছে। কাজেই অতুলবাবুর প্রতি আমার মন নরম হইল না। তিনি ক্লাসে পড়াইবার সময় আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিতেন না। কারণ তাঁর সাবজেক্ট বাংলায় আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। কিন্তু ক্লাসের বাহিরে রাস্তাঘাটে তিনি আমার দিকে চাইতেন না। আমিও তাকে আদাব দিতাম না। অথচ আমি অন্য সব টিচারকেই, এমনকি অন্য স্কুলের টিচারগণকেও পথে-ঘাটে আদাব দিতাম। বন্ধুবান্ধবের প্রশ্নের জবাবে সগর্বে বলিতাম : ‘আমার টিচার না হোক, টিচার ত। অতুলবাবুর বেলায় বলিতাম : আমার সাথে যে যেমন ব্যবহার করিবে, সেই রকম ব্যবহার পাইবে।

এই নীতির চরম করিয়াছিলাম একদিন পোস্টকার্ড কিনিতে গিয়া। এটাও ময়মনসিংহ জীবনের প্রথম বছরের ঘটনা। একদিন ছোট বাজার পোস্ট অফিসে কার্ড কিনিতে গিয়াছি। ছোট পোস্ট অফিস। পপাস্টমাস্টার বাবু একটি জানালার ধারে বসিয়া অফিসের কাজও করেন, কার্ড-স্ট্যাম্পও বেচেন। হেড পোস্ট অফিসের মত এখানে জানালায় কোনও ফোকাম নাই। গরাদের ফাঁক দিয়াই বিকি-কিনি হইয়া থাকে। গরাদের ফাঁকগুলিও এমন চিপা যে তার ভিতর দিয়া অতি কষ্টে হাত আনা-নেওয়া করিতে হয়। অন্যান্য খরিদ্দারের মতই আমিও হাতের মুঠায় দরকার-মত পয়সা লইয়া অতি কষ্টে হাত ঢুকাইয়া মাস্টার বাবুর কাছাকাছি নিয়া মুঠা খুলিলাম এবং নিজের দরকার বলিলাম। মাস্টার বাবু পয়সা নিয়া গনিলেন এবং হিসাব ঠিক হওয়ায় হাত-বাকসের একটি খোপে পয়সা ফেলিয়া আরেকটি খোপ হইতে কার্ড বাহির করিয়া আমার প্রসারিত হাতে কার্ডগুলি দিতে উদ্যত হইলেন। সেখানে কোনও হাত না পাইয়া তিনি মাথা তুলিয়া জানালার দিকে চাহিলেন। ইতিমধ্যে ব্যাপার ঘটিয়াছে এই : মাস্টার বাবু আমার প্রসারিত ডান হাতের তলা হইতে যখন পয়সা নেন তখন আমি দেখিতে পাই যে বা হাতেই পয়সা নিলেন। আমিও অমনি আমার চিকরা ডান হাতটা ফেরত আনিয়া বা হাত ভিতরে ঢুকাইলাম। হাত ঢোকানো ও বাহির করা উভয়টাই একটু শ্রমসাধ্য, সুতরাং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পোস্ট কার্ড তাতে লইয়া মাস্টার বাবু যখন জানালায় নজর করিলেন, তখন আমার ডান হাতটা সবেমাত্র বাহির হওয়ার কাজ শেষ করিতেছে এবং বাঁ হাতটা ঢুকিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। পোস্টমাস্টার বাবু আমার হাত বদলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সরলভাবে সত্য বলিলাম। তিনি বাম হাতেই পোস্টকার্ড ধরিয়া ছিলেন। তৎক্ষণাৎ হাত বদলাইলেন। ফলে আমাকে আবার ঘুরাইয়া বাম হাতের বদলে ডান হাত ঢুকাইতে হইল। পোস্টমাস্টার বাবু প্রৌঢ় লোক। তিমি মুচকি হাসিলেন।

৫. প্রথম মিলাদ শরিফ

মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে আমার ছাত্রজীবন মোটামুটি ভালই কাটিতে লাগিল। অধিকাংশ শিক্ষকের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলাম। বন্ধুর সংখ্যাও বাড়িল। এইভাবে আট-নয় মাস গেল।

এই সময় হিন্দু ছেলেরা ধুমধাম করিয়া সরস্বতী পূজা করিল। আমার সহপাঠীদের একজনের নাম ছিল আবদুর রহমান। তার বাড়ি ছিল নেত্রকোনা মহকুমার সেকান্দর নগর গ্রামে। আচার-ব্যবহার আদব-কায়দা ও চেহারা ছবিতে দেখিতে তাকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি তার প্রতি মুগ্ধ হই। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। এই আবদুর রহমান আমাকে একদিন বলে, আমাদের মিলাদ শরিফ করিতে হইবে। আমি মোহাম্মদী জমাতের লোক। মিলাদ পড়া আমাদের মধ্যে নিষেধ। কিন্তু বন্ধুকে সে কথা না বলিয়া হিন্দুদের স্কুলে মিলাদ পড়িবার অনুমতি দিবে না, এই কথা বলিলাম। জবাবে আবদুর রহমান বলিল : স্কুলের সেক্রেটারি হেডমাস্টার হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এখানে আমরা তিন শর বেশি মুসলমান ছাত্র আছি। ইহাদের ধর্মকাজে অনুমতি না দিয়া পারিবেন না। হিন্দুদের সরস্বতী পূজার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মুসলমান ছাত্রদের একটা কিছু ধর্মকাজ করা নিতান্ত উচিৎ। আবদুর রহমানের এই সব যুক্তিতে আমি আকৃষ্ট হইলাম। দুই বন্ধুতে মিলিয়া আমরা স্কুলের তৎকালীন মুসলমান ছাত্রদের নেতা দশম শ্রেণীর শরফুদ্দিন আহমদ (পরবর্তীকালে খান বাহাদুর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পাবলিক প্রসিকিউটর ও আইন পরিষদের মেম্বর) সাহেবের কাছে পরামর্শের জন্য গেলাম। তিনি আমাদের নিরাশ করিলেন। বলিলেন, স্কুলে মিলাদ পড়াইবার চেষ্টা তারা বহুদিন

ধরিয়া বহুবার করিয়াছেন। লিখিত দরখাস্ত দিয়াছেন। হেডমাস্টার বাবু চিন্তাহরণ মজুমদার ও সেক্রেটারি বাবু অঘোর বন্ধু গুহের সহিত দেখা করিয়াছেন। কোনও ফল হয় নাই। স্কুলে মুসলমানদের ধর্মকাজ করিলে হিন্দু ছাত্রদের ধর্ম-প্রাণে আঘাত লাগিবে, এই যুক্তিতে কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধই অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শরফুদ্দিন সাহেবের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিলাম বটে, কিন্তু আমরা নিরুৎসাহ হইলাম না। ক্লাসের ও স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের সাথে সলাপরামর্শ চালাইয়া গেলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। প্রথমে আবদুর রহমান ও পরে অন্যদের কাছে ফন্দিটা ভাঙ্গিয়া বলিলাম। বেশ কিছু সমর্থক জুটিবার পর আমরা স্কুল ছুটির পর একদিন এক সভা করিলাম। তাতে প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম যে মূর্তিপূজা দেখা মুসলমানদের জন্য শেরিকি গোনা। অতএব স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ করিতে হইবে। অন্যথায় মুসলমান ছাত্ররা স্কুলে আগামী বকরিদে গরু কোরবানি করিবে। স্কুলে হৈচৈ পড়িয়া গেল। প্রথমে আমাদের জনপ্রিয় ইংরাজি টিচার বাবু যতীন্দ্র চন্দ্র সরকারের সাথে এবং পরে তার মধ্যস্থতায় হেডমাস্টার বাবু চিন্তাহরণ মজুমদারের সাথে। আমাদের বেশ কয়দিন দেন-দরবার হইল। অবশেষে স্কুল বিল্ডিংয়ে মিলাদ শরিফ অনুষ্ঠানের অনুমতির বদলে আমরা সরস্বতী পূজা বিরোধী দাবি প্রত্যাহার করিলাম।

মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিপুল আনন্দ-উল্লাস ফাটিয়া পড়িল। আমাদের নিতান্ত ন্যায়সংগত ধর্মীয় দাবি গ্রহণ করিবার জন্য সভা করিয়া স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলাম। আমারও নাম ফাটিয়া গেল। আমরা পরম উৎসাহে চাদা আদায়ে লাগিয়া গেলাম। হিন্দু-চালিত স্কুল ত দূরের কথা এমন যে সরকারি জিলা স্কুল সেখানেও স্কুল প্রাঙ্গণে মিলাদ হয় নাই। জিলা স্কুলের মিলাদ আঞ্জুমান মুসলিম হোস্টেলে হইত। অথচ আমরা হিন্দু-প্রধান মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে মিলাদ শরিফ করিতেছি। এটা এ শহরে নূতন ঘটনা। কাজেই মুসলমান ছাত্ররা পরম উৎসাহে চাদা দিল। আমরা ক্লাস সেভেনের ছাত্ররা এ কাজে উদ্যোগী হইয়াছিলাম বটে কিন্তু উপরের ক্লাসের ছাত্ররাও আমাদের কাজে পূর্ণ সহায়তা করিলেন।

মিলাদ করিবার চেষ্টা আশাতিরিক্তরূপে সফল হইতেছে দেখিয়া আমার মনে এটা প্রেরণা জাগিল। মিলাদের বিরুদ্ধে শরিয়ত-ঘটিত আপত্তি ছাড়াও আমার একটা বিশেষ আপত্তি ছিল। উর্দু-ফারসিতে ওটা পড়া হয় বলিয়া হাযেরানে-মজলিসের অধিকাংশ লোক তা বুঝেন না। সে জন্য আমি হানাফি বন্ধুদের সাথে তর্ক করিতে গিয়া বলিতাম যদি মিলাদ পড়িতেই হয় তবে বাংলাতেই তা পড়া উচিৎ; তাতে পয়গম্বর সাহেবের পুণ্য জীবন কথা হইতে জনসাধারণ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। বন্ধুরা, এমনকি অনেক সময় হানাফি দুই-একজন আলেমও বলিতেন, ও-কথা বলিয়া আমি প্রকারান্তরে বাংলায় নামাজ পড়ার কথা বলিতেছি। নামাজের সাথে মিলাদের তুলনা চলে না, এটাই আমার দৃঢ় মত। কাজেই এই মিলাদ মহফিলে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পড়িব বলিয়া মনে মনে ঠিক করিলাম। অনেক রাত জাগিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করিলাম।

এর আগেও আমি অনেকবার স্কুলের সভায় রচনা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু সে সবই ছিল পাড়াগাঁয়ে। এবারই জীবনের প্রথমে শহরে উচ্চশিক্ষিত বড় বড় লোকের সামনে রচনা পড়িতে হইবে। আমি শহরে মিলাদের সভা এর আগে আর দেখি নাই। কিন্তু মসজিদের জমাত দেখিয়াছি। হিন্দু ও ব্রাহ্মদের ধর্মসভা দেখিয়াছি। কাজেই কল্পনায় টিচার-প্রফেসার উকিল-মোখতার জজ ম্যাজিস্ট্রেট

আলেম-ফাজেলের বিরাট সমাবেশ দেখিলাম এবং তাঁদেরে সামনে রাখিয়াই প্রবন্ধ রচনা করিলাম। খাঁটিলামও সেই পরিমাণে। পড়িয়া দেখিলাম। নিজের কাছে ভাল লাগিল। মনে জোর পাইলাম।

এত বড় সভায় কি পোশাকে দাঁড়াইব? অনেক চিন্তা করিলাম। বন্ধুবান্ধবে উপদেশ চাহিলাম। এক-এক জন এক-এক পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত নিজের বুদ্ধিই সম্বল করিলাম। কিছুদিন আগে ডার্কগ্রিন রঙের একটা টার্কিশ কোট ও কালো জমিনের উপর গ্রিন ডুরি-দেওয়া আলপাকার একটা আচকান তৈয়ার করিয়াছিলাম। আমি ঘোর কালো রঙের লোক। এই কালো চেহারায় ঐ দুইটা রঙের একটাও মানায় না। তবু ঐ রঙের দুইটা দামি কাপড় কেন বানাইয়াছিলাম, আজও আমি তা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। উকিলদের কালো পোশাক পরিতে হয় বলিয়া আমি আজও কালো গাউনের সাথে কালো শেরওয়ানি পরিয়া থাকি। তাতে মানাইল কি না এ বয়সে সে কথা বড় একটা ভাবি না। কিন্তু ষোল বছরের বালকের মনে নিশ্চয়ই চেহারার প্রতি এমন ঔদাসীন্য ছিল না। তবু কালো রঙের প্রতি অমন টান কোন খেয়ালে আমার হইয়াছিল, আজও তা রহস্যময় থাকিয়া গিয়াছে।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আচকানটাই ঠিক করিলাম। তার উপর খয়েরি লাল তুর্কি টুপিটা ত আছেই। এই বেশে মিলাদের মজলিসে গেলাম। উদ্যোক্তাদের একজন বলিয়া আমি বেশ আগেই গেলাম। মেহমানদের অভ্যর্থনায় প্রধান অংশগ্রহণ করিলাম। কাজেই কারা-কারা সভায় আসিলেন, স্বচক্ষে দেখিলাম। অন্যান্য স্কুলের টিচার, কলেজের প্রফেসার, উকিল, মোখতার ও জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরা আসিলেন। আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি উকিল শ্রীযুক্ত অঘোর বন্ধু গুহও আসিলেন। এঁদের শুভাগমনে প্রতিবার আমার বুক নূতন করিয়া দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। না জানি রচনা পাঠের সময় কোনো শরম পাইয়া বসি। শেষ পর্যন্ত হল ভর্তি হইয়া গেল। চার-পাঁচটা ক্লাসের কাঠের পার্টিশন সরাইয়া বিশাল লম্বা হল করা হইয়াছিল। সবটুকু জায়গা ভরিয়া গেল। ময়মনসিংহ শহরের জীবনের প্রথমে হিন্দুর স্কুলে মিলাদ হইতেছে বলিয়া শহরের গণ্যমান্য মুসলমান কেউই বাদ যান নাই।

### ৬. বাংলায় মিলাদ

যথারীতি মিলাদ পড়া হইলে সভার কাজ শুরু হইল। অমুসলমান অতিথিদের সকলে এবং মুসলমানদেরও অনেকে এতক্ষণ বারান্দা ও আঙিনায় গল্প। গোজারি করিতেছিলেন। এইবার সকলে সভায় জমিয়া বসিলেন। প্রথমে আমাদের জনপ্রিয় হেডমাস্টার শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মজুমদার মহাশয় সমাগত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাঁর প্রিয় ছাত্ররা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় তিনি তাদের উদ্যমের প্রশংসা করিলেন। উপসংহারে ছাত্রদের এই প্রথম প্রয়াসের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। ছাত্রদের তরফ হইতে আমি দুই-চার কথা বলিব বলিয়া হেডমাস্টার বাবু আসন গ্রহণ করিলেন।

আমি দাঁড়াইলাম। আমার চেহারাও ভাল নয়। পোশাকও নিশ্চয়ই সুরুচির পরিচায়ক ছিল না। কাজেই সমবেত দ্রমণ্ডলী বোধ হয় নিরাশ হইলেন। আমি তাদের চোখে-মুখে কোনও উৎসাহ-সূচক হাসি দেখিলাম না। আমি সংক্ষেপে সমবেত অতিথিগণকে এবং বিশেষ করিয়া মুসলমান ছাত্রদের আবদার রাখার জন্য স্কুলের সেক্রেটারি ও হেডমাস্টার বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াই পকেট হইতে প্রবন্ধটি বাহির করিলাম। এতক্ষণে শ্রোতাগণের মধ্যে উৎসাহ বা কৌতূহল একটা কিছু দেখিতে পাইলাম।

দুই-তিন মিনিট পড়ার পরই সভা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইল। দশ-বার মিনিটেই 'মারহাবা' ও 'হিয়ার হিয়ার' শুনিতে লাগিলাম। ওজস্বিনী ভাষা ও পড়ার ভঙ্গির জন্য এর আগেও আমি শিক্ষকদের প্রশংসা পাইয়াছিলাম। সুতরাং ঐ দুইটা ভালই হইয়াছিল। তার উপর আমি বাগদাদ-দামেস্ক হইতে দিল্লি-আগ্রা ও গ্রানাডা-কর্ডোভা যুগের মুসলমান গৌরবের কাহিনী বর্ণনা করিয়া তার তুলনায় বর্তমানের দারিদ্র্য দুরবস্থার কথাই ঐ প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। ওসব কথাই অবশ্য বই-পুস্তক ও মাসিক-সাপ্তাহিক কাগজের প্রবন্ধ হইতে ধার-করা। কিন্তু ভাষা ও পঠন-ভঙ্গি ছিল আমার নিজস্ব। তাতে সাধারণ লোক ত দূরের কথা, ঐ সব বই-পুস্তকের নিয়মিত পাঠকদের পক্ষেও সে নকল ধরা সহজ ছিল না। সুতরাং শ্রোতৃমণ্ডলী আমার লেখা ও পড়ায় যেমন আকৃষ্ট হইলেন আমি নিজেও তেমনি নিজের খেলা পড়ায় একদম মাতিয়া উঠিলাম। বর্তমান অধঃপতনের বর্ণনা করিতে গিয়া আমি এমন কথাও বলিলাম যে আমরা শুধু নিজেদের ধর্ম-সভ্যতাই ত্যাগ করি নাই, নিজেদের জাতীয় পোশাকও বর্জন করিয়াছি। জাতীয় পোশাক বর্জনের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া কোট, প্যান্ট পরাকে কঠোর ব্যঙ্গ করিলাম। শ্বেতাঙ্গদের ঐ পোশাকে কালা আদমিদেরে যে কলিকাতার গড়ের মাঠের কালো পাথরের মূর্তির মত দেখায়, তেমন রসিকতাও করিলাম। উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে কয়েকজন কোট-প্যান্ট পরা অফিসার ও উকিল ছিলেন। এই রসিকতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়িল ও 'হিয়ার হিয়ার' ধ্বনি উঠিল; তাতে ঐ কয়জন ভদ্রলোক বেশ বিব্রত হইলেন। বলা দরকার ঐ রসিকতাটিও ছিল ধার করা। কারণ তখনও আমি কলিকাতা যাই নাই; গড়ের মাঠ ও তার পাথরের মূর্তিগুলিও দেখি নাই। কিন্তু সে খোঁজ রাখে কে?

এই 'হিয়ার হিয়ার' ও 'মারহাবার' মধ্যে আমি যখন আসল কথায় আসিলাম তখন হঠাৎ সমস্ত সভা গম্ভীর হইয়া উঠিল। এটা যে হইবে, তা আমি জানিতাম। সেই কারণেই বুদ্ধি করিয়া ঐ কথাটা আমি প্রবন্ধের সর্বশেষে লিখিয়াছিলাম। শ্রোতৃমণ্ডলীর গম্ভীর মুখের দিকে না চাহিয়া আমি প্রবন্ধ পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। দুর্বোধ্য আরবি-ফারসি-উর্দুতে মিলাদ শরিফ পড়া উচিৎ নয়। কারণ তাতে মুসলমানদের কোনও লাভ হয় না। হযরতের জীবনী আলোচনার দ্বারা শিক্ষা লাভ করাই মৌলুদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। বাংলা ভাষায় তা না করিয়া আমরা মৌলুদের এই মহৎ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া দিতেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ষোল বছরের বালকের মুখ হইতে এমন জটিল বিষয়ে উপদেশ নিবার জন্য কেহ প্রস্তুত ছিলেন না। তা ছাড়া আমি হয়তো শিশুসুলভ অতি উৎসাহে আরবি-উর্দুতে মিলাদ পড়িবার প্রথার বিরুদ্ধে এমন সব কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, যার অর্থ শ্রোতারা বুঝিয়াছিলেন আমি আরবি-উর্দু ভাষা ও মিলাদ শরিফ পড়ার বিরুদ্ধেই কথা বলিতেছি। যা হোক সভায় আমার কথায় কেউ প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু সভা শেষে দুইজন মুরুব্বি কেসেমের সুন্দর চেহারার লোক হলের বারান্দায় আমাকে বলিলেন : ওহে অ্যাডভোকেট অব বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ, ধর্মের বিষয়ে কথা বলিবার বয়স তোমার এখনও হয় নাই। আর কিছু না বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁরা চলিয়া গেলেন। পরে জানিয়াছিলাম তিনি আমাকে এ কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন এ জিলার শ্রেষ্ঠ নেতা ও পাবলিক প্রসিকিউটর মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব ও তার সাথী বিখ্যাত উকিল মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব। আমি তখন অ্যাডভোকেট শব্দটার মানে জানিতাম না। তবু ওঁরা যে আমাকে ভাল বলিলেন না, সেটা বুঝিলাম। মনটা খারাপ হইয়া গেল। রচনা পাঠ করিয়া এত প্রশংসা ও আনন্দ যে

পাইয়াছিলাম, সে সবই মন হইতে ধুইয়া-মুছিয়া গেল। মেসের সুপারিনটেনডেন্ট স্কুলের হেড মৌলবী সাহেবও মুখ বেজার করিয়া রাখিলেন। সারা রাত দুর্ভাবনায় কাটাইলাম।

কিন্তু পরের দিন এর পুরস্কার পাইলাম। সেদিন জিলা স্কুলের মিলাদ। স্থান আঞ্জুমান মুসলিম হোস্টেল প্রাঙ্গণ। পরের স্কুলের অনুষ্ঠান বলিয়া একটু বিলম্বে মহফিলে পৌঁছিলাম। সভায় ঢুকিবার আগেই কয়েকজন বন্ধু হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া বলিল : আজ তোমারই দিন। তারপর বন্ধুরা সবিস্তারে যা বলিল তার সারমর্ম এই : মওলানা ফয়যুর রহমান বাংলায় মৌলুদ পড়িবার পক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন। তার বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বলিয়াছেন : গতকাল মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের মিলাদ মহফিলে যাইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি দুঃখিত। তিনি জানিতে পারিয়াছেন, সে মহফিলে একটি ছাত্র বাংলায় মিলাদ পড়িবার পক্ষে রচনা পাঠ করিয়াছে। তাতে কেউ-কেউ নাকি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু মওলানা সাহেবের মত এই যে ঐ ছেলে সত্য কথাই বলিয়াছে। সকলেরই বাংলায় মৌলুদ পড়া উচিৎ। বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় মৌলুদ পড়িলে মৌলুদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়। বন্ধুরা বলিলেন, আমিও নিজ চক্ষে দেখিলাম, মওলানা সাহেব তখনও বক্তৃতা করিতেছেন। মওলানা সাহেবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। আমি সভার এক কোণে বসিয়া পড়িলাম। তিনি প্রাঞ্জল অথচ ওজস্বিনী বাংলা ভাষায় পয়গম্বর সাহেবের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির শিক্ষা ও তাৎপর্য বুঝাইতেছেন। উর্দু ভাষায় সাধারণ মিলাদের কিতাবে পয়গম্বর সাহেবের পয়দায়েশ সম্বন্ধে যে সব অনৈসর্গিক আজাব কাহিনী লেখা হয়, মওলানা সাহেব তার দীর্ঘ বক্তৃতায় তার একটিও উল্লেখ করিলেন না। বরঞ্চ প্রকারান্তরে ওসবের নিন্দা করিলেন।

মওলানা ফয়যুর রহমান সাহেব আনন্দ মোহন কলেজের আরবি-ফারসির। প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু সেটাই তার বড় পরিচয় নয়। তিনি সাধু সচ্চরিত্র স্পষ্টবাদী ও সুপণ্ডিত আলেম বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। হক পরস্তিতে তিনি খাতির-নাদার লোক ছিলেন। এমন লোকের সমর্থন পাইয়া আমার সম্মান বাড়িয়া গেল। আমি অতঃপর বুক ফুলাইয়া চলিতে লাগিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই মওলানা সাহেবের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁর দোওয়া নিয়াছিলাম। যদিও আনন্দ মোহন কলেজে, সুতরাং মওলানা সাহেবের খেদমতে, লেখাপড়া শিক্ষার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, তবু মওলানা সাহেবকে শেষ পর্যন্ত উস্তাদের মতই ভক্তি করিতাম। তিনিও আমাকে নিজের ছাত্রের মতই স্নেহ করিতেন।

৭. ঢাকা দর্শন

এই সময় আমি অল্প দিন পর পর চাচাজীর সাথে দুইবার ঢাকা শহরে যাই। ঢাকা শহরকে তৎকালে আমি ও আমার মত অনেকেই কিসসা-কাহিনীর যাদুর শহর মনে করিতাম। পাড়াগাঁয়ে এই শহরকে বাউন্ন-বাজার-তিপান্ন গলির শহর' বলা হইত। ঢাকার নবাবের বালাখানায় এবং শহরের রাস্তা ঘাট ও দোকান-পাটে ইসলামি জৌলুশ ফাটিয়া পড়িতেছে বলিয়া শুনিতাম। ঐ সব কথা শুনিয়া আলেফ-লায়লার বাগদাদ শহরই আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত। কাজেই চাচাজী এই শহরে যাইতেছেন শুনিয়া আমিও তাঁর সাথে যাইব জিদ ধরিলাম। একবার উপলক্ষ ছিল ঢাকা 'মকফাইট' দেখা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে বৃটিশ সরকারের সামরিক শক্তি প্রদর্শনই এই মকফাইটের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঐ বয়সে আমি অতশত বুঝিতাম না। একটা লড়াই হইবে, 'নকল লড়াই' আবার কী? এটাই বুঝিতাম। লড়াইয়ের নাম শুনিয়াই আমার রোমাঞ্চ হইত। মোহররমের কাড়া নাকাড়ার

বাদ্যে আমার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি হইত। লাকড়ি খেলায় কুর্দিয়া পরিবার বাসনা অতি কষ্টে দমন করিতাম। সুতরাং মকফাইট’ দেখিতে যাইবই। কারো নিষেধ মানিব না। দাদাজী অনুমতি দিলেন। চাচাজীও বাধা দিলেন না।

দ্বিতীয় বারে আমার যাওয়ার কোনও যুক্তি ছিল না। কারণ সেটা ছিল কী একটা মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স। দেশের আলেম-ওলামা ও মাতব্বরদের দাওয়াত দেওয়া হইয়াছিল। আহসান মনজিল অর্থাৎ নবাববাড়ি হইতেই ওটা ডাকা হইয়াছিল। সমাগত ডেলিগেটদেরে আহসান। মনজিলে থাকা-খাওয়ার দাওয়াত করা হইয়াছিল। চাচাজীও দাওয়াত পাইয়াছিলেন। এবারও আমি তাঁর সঙ্গী হইলাম। আমার সঙ্গে আমার বড় ভাইও ঢাকায় যাওয়ার জিদ ধরিলেন। চাচাজী মুশকিলে পড়িলেন। ডেলিগেট ছাড়া আর কেউ আহসান মনজিলে থাকিতে পারিবেন না, আমাদের মত ছোট ছেলেদের ডেলিগেটও করা যাইবে না। কাজেই আমাদেরে লইয়া চাচাজীকে নিজের খরচে হোটেলে থাকিতে হইবে। তবু আমরা দুই ভাই চাচাজীর সঙ্গী হইলাম। খরচের ব্যাপার বলিয়া দাদাজীর অনুমতি লাগিল। বলা বাহুল্য, মকফাইট দেখার সময়েও আমরা দুই ভাই চাচাজীর সাথী হইয়াছিলাম। রমনা ময়দানে সৈন্যদের পায়তারা দেখিলাম। কামান-বন্দুকের আওয়াজ শুনিলাম। আসমানে ধোঁয়া উড়িতে দেখিলাম; আর, আর কী কী দেখিলাম সব মনে নাই। কিন্তু যাই দেখিয়া থাকি, তাতে লড়াই ছিল না। শহীদে-কারবালা, আমির হামযা ও জঙ্গনামা পড়িয়া লড়াই সম্পর্কে আমার যে ধারণা হইয়াছিল, তার কিছুই এখানে দেখিলাম না। নিরাশ হইয়াই বাড়ি ফিরিলাম।

এডুকেশন কনফারেন্সে আসিবার সময় ময়মনসিংহ হইতে আর যেসব ডেলিগেট একসঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাকে চাচাজীর সঙ্গে খুব খাতির হইতে দেখিয়াছিলাম তিনি ছিলেন মওলানা খোন্দকার আহমদ আলী। আকালুবী। তার নাম বই-পুস্তকে ও খবরের কাগজে আগেই পড়িয়াছিলাম। এইবার নিজ চক্ষে তাঁকে সশরীরে দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। তিনি ছিলেন গৌরবর্ণের সুপুরুষ। গলার আওয়াজ বুলন্দ অথচ অতি মিষ্টি। আমি ট্রেনেই তার সঙ্গে খাতির জমাইবার বালকসুলভ চেষ্টা করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে আদর করিয়াছিলেন। পরে ইনি আমাদের কৃষক-খাতক আন্দোলনের অন্যতম নেতা হন। আরো পরে তিনি আমার শ্বশুর হন।

ইহার অল্প কিছুদিন পরে আমার অতি প্রিয় দাদাজী ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে আমাদের সংসারে অভাব-অনটন দেখা দেয়। কারণ দাদাজীর ইন্তেকালের পরে-পরেই চাচাজী ও বাপজী এই সময় পৃথক হইয়া যান এবং সমস্ত সম্পত্তি আপসে বাটোয়ারা হইয়া যায়। চাচাজীর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। মাত্র দুই মেয়ে। আর আমরা ছিলাম চার ভাই, এক বোন। সব আত্মীয়স্বজন ও আলেম-ওলামা মেহমানরা বড় ভাই বাপজীরই মেহমান হইতেন। ফলে পরিবারের বেশির ভাগ খরচের দায়িত্ব বাপজীর ঘাড়েই পড়িয়াছিল। তা ছাড়া বাপজীর উপর ছিল আমাদের চার ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ। ফলে অল্প দিনেই বাপজীর সংসারে অভাব দেখা দিল। কিন্তু বাপজী আমাদের গায় সে অভাব-অনটনের আঁচড়ও লাগিতে দেন নাই। নির্বিবাদে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের চার বছরের পড়া শেষ করিলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম। এটা ছিল ১৯১৭ সাল। দুই-দুইবার প্রশ্নপত্র লিক আউট হওয়ায় আমাদের তিন-তিনবার পরীক্ষা দিতে হইল। পাঁচ টাকার একটি মোহসিন স্কলারশিপসহ আমি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করিলাম।

## ৮. নাম-নামা

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার সময় আমি অদ্ভুত ও নূতন একটা কাজ করিলাম। আমার নামের ঘরে লিখিলাম শুধু আহমদ। টিচারদের অনেকে এবং হেডমাস্টার বাবু স্বয়ং এই এক শব্দের নামে আপত্তি করিলেন। কিন্তু। আমার মত বদলাইতে পারেন নাই।

এই স্কুলের কাগজপত্রে এবং পূর্বেকার দুই স্কুলের কাগজপত্রেই আমার নাম আহমদ আলী ফরাযী। আমার পৈতৃক নামই আহমদ আলী। আমরা চার ভাই সকলেই 'আলী। আমাদের নামে 'আলী' আসিল কোথা হইতে, তার জবাব দিয়াছিলেন দাদাজী। আগের কালে বাপ-মা মুরুব্বিরা আলেম ওলামাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ছেলেমেয়ের নাম রাখিতেন। মোজাহেদ আলেমদের মধ্যে এনায়েত আলী, বিলায়েত আলী, মাহমুদ আলী ও চেরাগ আলী এই চারটি নাম দাদাজীর খুব প্রিয় ছিল। ওদের নামের 'আলী' হইতেই তিনি আমাদের চার ভাইয়ের নামে 'আলী' আনিয়াছিলেন। দাদাজীরা তিন ভাই ছিলেন। সবাই উল্লা। বড় ভাই গাজী সাহেব ছিলেন আশেক উল্লা, মেজ আর উল্লা ও ছোট ভাই, আমার দাদা, আরমান উল্লা। আর উল্লা অবিবাহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। বাপজীরা ছিলেন তিন ভাই। বড় ভাই আমার পিতা আবদুর রহিম, দ্বিতীয় জমিরুদ্দিন ও তৃতীয় ছমিরুদ্দিন। দাদাজীর ইচ্ছা ছিল নিজের ছেলেদের নাম তার পিতা আছরদ্দিন ফরাযীর নাম। অনুসারে উদ্দিন রাখিবেন। কিন্তু তার শ্বশুর মানে বাপজীর নানা আবদুল আখন্দ সাহেব প্রথম নাতির নাম নিজের নামের আবদুল দিয়া রাখিবার আবদার করিলেন। দাদিও তার বাবার সমর্থন করিলেন। কাজেই বাপজীর নাম আবদুর রহিম হইল। কিন্তু পরবর্তী দুই ছেলের নাম দাদাজীর ইচ্ছামত উদ্দিন' দিয়াই রাখা হইল। দ্বিতীয় পুত্র জমিরুদ্দিন অবিবাহিত মারা যান।

নাম-কাম লইয়া মানুষের জীবন। আমার কামটা এলা যেমন-তেমন, মানটার কিন্তু একটা সংগ্রামী ইতিহাস আছে। সে সংগ্রামেও জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন, সহজ ভাষায় বাড়তি-কমতি আছে। সে সংগ্রামটা ঘটিয়াছিল আমার শৈশবে। সেদিন হইতে এটাকে এক শিশুর জীবনের 'জঙ্গনামা' 'শাহনামা'ও বলা যাইতে পারে। তাই এই উপ-অধ্যায়ের নামকরণ করিলাম : 'নাম-নামা'। সংগ্রামটি এইরূপ :

আমাদের চার সহোদরের মধ্যে বড় ভাই মোহাম্মদ মকিম আলী, মেজ ভাই মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী, সেজ আমি আহমদ আলী ও ছোট ভাই মোহাম্মদ মোবারক আলী। চাচাজী আমাদের অপর তিনজনের সকলের নামের আগেই মোহাম্মদ লিখিতেন। শুধু আমার নামে আগে মোহাম্মদ লিখিতেন না। আমি এতে বেজার হইতাম। চাচাজী আমাকে তসল্লি দিতেন। তিনি বুঝাইতেন একই অর্থবাচক শব্দ বলিয়া আহমদের আগে মোহাম্মদ হয় না। চাচাজীর এ কথা আমি মানিতাম না। মনে মনে রাগ করিয়া আমি নিজেই পরে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলাম। আমার আর তিন ভাই মোহাম্মদ লিখিতেন এবং আজও লেখেন। কিন্তু আমি শুধু আহমদ আলী লিখিতাম। ভাইদের মধ্যে আমি একাই উচ্চশিক্ষা পাইয়াছি। বড় ভাই ম্যাট্রিক পড়িয়া মাস্টারি করিতেন। মেজ ভাই হাফেজে কোরআন হইয়া মসজিদে-মকতবে পড়াইতেন। ছোট ভাই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করিতেন। এই বই ছাপা হওয়ার সময় তারা কেউ আর বাঁচিয়া নাই।

নিজের নাম সম্পর্কে আমার মাথায় চিন্তা জাগে মাইনর স্কুলে। সেটা ১৯১০ কি ১৯১১ সাল। মি. স্টেপলটন ডিভিশনাল ইনসপেক্টর। তিনি আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি কোট-প্যান্ট-পরা ছয় ফুটের বেশি লম্বা সাদা সাহেব। তাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম বটে কিন্তু খুশি হইলাম তার সাথে যে আলেমটি আসিলেন তাকে দেখিয়া। মাথায় পাগড়ি, মুখে দাড়ি, পরনে সাদা আচকান ও সাদা কলিদার পায়জামা। খৃষ্টান সাহেব অথচ সঙ্গে আলেম রাখেন। মনে মনে তিনি নিশ্চয়ই মুসলমান। সাহেবের উপরও খুশি হইলাম। কিন্তু সেকেন্ড পণ্ডিত খিদির উদ্দিন সাহেব আমাকে বলেন, ঐ লোকটা কোনও আলেম নয়, সে সাহেবের চাপরাশি। পণ্ডিত সাহেব ব্যাপারটা আমাকে বুঝাইবার জন্য চাপরাশির তকমা ও পেটি ও পাগড়ির মধ্যে একপ্রস্থ রঙিন কাপড় দেখাইয়া দিলেন।

এতে আমি স্টেপলটন সাহেবের উপর ব্যক্তিগতভাবে এবং ইংরাজ জাতির উপর সাধারণভাবে চটিয়া যাই। বেটা ইংরাজরা আমাদের বাদশাহি নিয়াও ছাড়ে নাই; আমাদের আরো অপমান করার মতলবেই আমাদের বাদশাহি পোশাক পাগড়ি-আচকান-পায়জামাকে ওরা চাপরাশির পোশাক বানাইয়াছে। ইহার প্রতিশোধ নিতেই হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করিয়া ফেলিলাম, আমি বড় অফিসার হইয়া আচকান-পায়জামা-পাগড়ি পরিব এবং আমার চাপরাশিকে কোট-প্যান্ট পরাইব। চুপে-চুপে খোঁজখবর লইয়া জানিলাম, সরকারি কর্মচারী না হইলে চাপরাশি পাওয়া যায় না। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে আবার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটই সবের উপরের অফিসার। অতএব আমি ঠিক করিলাম আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইব। এটা আমি মানিয়া লইলাম যে ইংরাজের আমলে আমাকে খুব বড় জিলায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট করিবে না। কাজেই খুব ছোট জিলা লইয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের ক্লাসের পাঠ্য ভূগোল পাঠে পড়িয়াছি, বঙ্গ দেশে বগুড়া জিলাই সবচেয়ে ছোট জিলা। অতএব আমি বগুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইতে মনকে রাজি করিলাম। ক্লাসের একসারসাই বুকের শেষ পৃষ্ঠা (তখন পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা এই যে স্কুলের লেখার কাজে খাতার শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লাগে না) নিজের নাম দস্তখত করিয়া দেখিলাম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরূপে আমার নামটা মানায় কিনা। হেডমাস্টার বসন্ত বাবুর অনুকরণে খুব টানা ভাঙ্গা ইংরাজি হরফে লিখিলাম : আহমদ আলী ফরাযী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বানান ভুল না হয়, সে জন্য ডিকশনারি সামনে লইয়াই লিখিলাম। ইংরাজি অ্যাটলাস হইতে বগুড়া লিখার বানান জোগাড় করিয়াই বোগরা লিখিলাম। একবার লিখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম না। স্কুলের সব মাস্টারদের হাতের লেখার অনুকরণে পৃথক পৃথক দস্তখত করিলাম। আশেপাশে কেউ নাই জানিয়া জোরে জোরে শব্দ কয়টা উচ্চারণ করিলাম।

ভাল শুনাইল না। নামটা কেমন ঢিলা-ঢিলা লাগিল। লেখাটাও দেখিতে সাহেব-সুবার দস্তখতের মত দেখাইল না। ভাবনায় পড়িলাম। শুধু নামটার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটগিরি আটকাইয়া থাকিবে, এটা কিছুতেই সহ্য হইল না। কী করা যায়, ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল অল্পদিন আগে খবরের কাগজে কী উপলক্ষে খান বাহাদুর মৌলবী আহম্মদ নামে একজন ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ছাপা হইয়াছিল সেটা কয়েক বার উচ্চারণ করিয়া বুঝিলাম নামটা জোরদার। বেশ ভারী ভারী। এই ভার ও জোরটা কোন শব্দটার জন্য? খান বাহাদুর, না আহমদ? যে শব্দের জন্যই হোক, ঐ ভদ্রলোক ছিলেন ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইলে আমি নিশ্চয়ই খান বাহাদুর হইব। তাতে আমার নাম আরো জোরদার, আরো ভারী হইবে। উচ্চারণ করিয়া দেখিলাম। হাঁ ভারী ত বটেই জোরদারও

বটে। সুতরাং আমার নাম নূতন করিয়া লিখিলাম : খান বাহাদুর মৌলবী আহমদ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বোগরা। এইবার উচ্চারণে জোর পাইলাম। নামটার মধ্যে একটা সাহেবি ভাব যেন ফুটিয়া উঠিল। বুক টান করিয়া চারদিক তাকাইলাম। মনটা তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু নাম হইতে আলী ও ফরাযী একদম ছাঁটিয়া ফেলায় প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইল, কিন্তু ক্রমে সে ভাব দূর হইল। যতই উচ্চারণ করিতে লাগিলাম ততই জোরদার, মধুর ও ভারী-ভারিক্কি লাগিতে লাগিল। অতএব স্থির হইয়া গেল, খান বাহাদুর মৌলবী আহমদ নামেই আমি বগুড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইব এবং আমার চাপরাশিকে কোট-প্যান্ট-হ্যাট পরাইয়া স্টেপলটন সাহেব ও সমস্ত ইংরাজ জাতিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিব।

১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ করার দিন হইতে সেটা পাঁচ-ছয় বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে আমার ইংরাজ-বিদ্বেষ আরো বাড়িয়াছে। সেই সঙ্গে ইংরাজের চাকরির প্রতিও ঘৃণা জন্মিয়াছে। সুতরাং ইংরাজের গোলামির তকমা খান বাহাদুর খেতাব লইবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। খান বাহাদুর ছাড়া শুধু আহমদ নামে সেই জোর-ভার থাকে কি না, সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ জাগিল। দ্বিধায় পড়িলাম। কিন্তু এই সময় আমাদের ফারসি টিচার হেডমৌলবী মওলানা মুসা সাহেব কয়েক মাসের ছুটি নেওয়ায় তাঁর ছোট ভাই অ্যাক্টিং নিযুক্ত হন। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তার নাম মওলানা আহমদ। আহমদ নামের গরিমাটা আমার অন্তরে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে আগুন নিভাইতে না নিভাইতেই আমাদের ষান্মাসিক পরীক্ষা আসিল। এই পরীক্ষায় নূতন মওলানা সাহেব ফারসি পেপারে আমাকে মোট একশ নম্বরের মধ্যে একশ পাঁচ দিলেন। হেডমাস্টার বাবু মওলানা সাহেবকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নিরুদ্বেগে জবাব দিলেন : ছেলে সব প্রশ্নের ঠিক জবাব দেওয়ায় পুরা একশ দিয়াছি। সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারায় খুশি হইয়া আমি পাঁচ নম্বর তাঁকে বখশিশ দিয়াছি।

মওলানা সাহেব হেডমাস্টার বাবুর মস্তক জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার হৃদয় জয় করিতে পারিলেন। আমি নিজের নাম শুধু আহমদ লিখিতে পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইলাম। কিন্তু অসুবিধা হইল যথেষ্ট। ইতিমধ্যে আমি কিছুটা সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছি। ঐ সঙ্গে আমার নাম স্কুলের বাহিরে দিঘে-পাশে বাড়িয়া আবুল মনসুর আহমদ আলী জামী হইয়া গিয়াছে। কারণটা এই : তকালীন বিখ্যাত বক্তা মৌলবী ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের লেখা আদব-কায়দা শিক্ষা নামে একখানা বই আমার খুব পছন্দ হইয়াছিল। এই পুস্তকে তিনি নিজের ‘সিরাজী তাখালুসের অনুকরণে সকল কবি সাহিত্যিককে নামের শেষে একটা তাখালুস ও নামের আগে একটা কুনিয়াত বসাইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এই সময় মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলবী আবুল কাসেম ফজলুল হক খুব নামকরা লোক ছিলেন। সিরাজী সাহেবের উপদেশে এবং এই সব মহাপুরুষের অনুকরণে আমি আবুল মনসুর ও শামসুদ্দিন আবুল কালাম কুনিয়াত গ্রহণ করা স্থির করিলাম। এমনি একদিন কবি ছাবেদ আলী নসিরাবাদী নামক মওলানা খোন্দকার আহমদ আলী আকালুবী টাঙ্গাইলবাসী এক শাগরিদ তাঁর ‘ললনা বান্ধব’ নামে কবিতার বই ছাপিতে ময়মনসিংহ শহরে আসেন এবং ঘটনাচক্রে আমাদের মেহমান হন। ইনি শামসুদ্দিনের চেহারা সুন্দর বলিয়া তাঁকে নূরী (আলোকোজ্জ্বল) ও আমাকে খুব রসিকতা করিতে দেখিয়া জামী (রসাবতের পিয়াশাল) তাখালুস দান করেন। এই কুনিয়াত ও তাখালুসের পাখা মেলিয়া আমার বন্ধুমহলে ও মাসিক কাগজে যাহির

হইলাম। আমার কয়েকটা প্রবন্ধ আল-ইসলাম নামক মাসিক কাগজে এই আবুল মনসুর আহমদ জামী নামে ছাপা হইয়া গেল।

সুতরাং ম্যাট্রিক ফরম পূরণ করিবার সময় একদিকে শুধু আহমদ নামের প্রতি নাড়ির টান ও অপর দিকে কুনিয়াত ও তাখালুসে টান আমাকে বেশ কিছু দিন টানা-হেঁচড়া করিল। শেষ পর্যন্ত মনে মনে একটা আপস করিয়া ফেলিলাম। বিদ্যালয়ের খাতায় আমি শুধু আহমদ হইয়া গেলাম। সাহিত্যের খাতায় থাকিলাম আবুল মনসুর আহমদ আলী জামী। ব্যাঙ বড় হইলে লেজ আপনি খসিয়া পড়ে। আমারও 'আলী জামী'র লেজও কিছুদিন পরে খসিয়া পড়িল।

# ০৬. উচ্চশিক্ষা-ঢাকা শহরে

## অধ্যায় ছয় – উচ্চশিক্ষা-ঢাকা শহরে

### ১. জগন্নাথ কলেজে

১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াই কলেজে পড়িবার জন্য ঢাকা আসিলাম। ইচ্ছা ছিল ঢাকা কলেজে পড়িব। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইল। ময়মনসিংহ আসিয়া যেমন জিলা স্কুলে সিট না পাইয়া মৃত্যুঞ্জয়ে ভর্তি হইয়াছিলাম, ঢাকায় আসিয়া তেমনি ঢাকা কলেজে সিট না পাইয়া জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হইলাম। তৎকালে প্রথম বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগের কোনও মারামারি ছিল না। যে আগে আসিত, সেই ভর্তি হইতে পারিত। ময়মনসিংহের মত ঢাকা আসার সময়েও আমার দেরি হইয়া গিয়াছিল। কাজেই আমার বরাতে জুটিল জগন্নাথ কলেজ।

ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়া মৃত্যুঞ্জয় স্কুল যেমন ছিল জিলা স্কুলের পাঁচ গুণ বড়, জগন্নাথ কলেজও তেমনি ঢাকা কলেজের তুলনায় পাঁচ না হইলেও তিন গুণ বড়। অধ্যাপকের দিক দিয়াও তৎকালে ঢাকা কলেজের তুলনায় জগন্নাথ কলেজ হীন ছিল না। ঢাকা কলেজে যদিও তৎকালে মি. টার্নারের মত ইংরাজ প্রিন্সিপাল ছিলেন তবু জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপালও কম ছিলেন না। প্রফেসর ললিত কুমার চ্যাটার্জির মত দেশবিখ্যাত শিক্ষাবিদ জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল। ইনি আবার স্যার আশুতোষের জামাই। এটাও জগন্নাথ কলেজের একটা গৌরবের বিষয়। তৎকালে স্যার আশুতোষ মুখার্জি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। আমি জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হইবার কয়েক মাস পরেই স্যাডলার কমিশন (মানে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিশন) ঢাকায় আসে। এই কমিশনের অন্যতম মেম্বর ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি। তিনি কমিশনের মেম্বর হিসাবে জগন্নাথ কলেজ পরিদর্শন করিলেন। আমাদের ক্লাসে গেলেন। জামাইর বাসায় খাওয়া-দাওয়া ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। এই সুযোগে আমরা স্যার আশুতোষের মত দেশবিখ্যাত বড়লোককে কাছে দাঁড়াইয়া দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। তা ছাড়া স্যার আশুতোষের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমাদের সঙ্গে একই সময়ে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভগিনীর বাড়িতে বেড়াইতে আসেন এবং কয়েক দিন থাকেন। এই উপলক্ষে তিনি তার ভাগিনা মনোরঞ্জন চ্যাটার্জির সাথে আমাদের কলেজে মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসিতেন। প্রিন্সিপাল ললিত চ্যাটার্জির ছেলে মনোরঞ্জন চ্যাটার্জিও আমাদের ক্লাসের নামকরা ছাত্র ছিলেন। তার দৌলতে আমরা এই সময় শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করি। আমাদের প্রিন্সিপালের শালা আর আশুতোষ মুখার্জির পুত্র এবং ম্যাট্রিকে ফার্স্ট স্ট্যান্ড করা ছাত্র শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তার সাথে মুখোমুখি আলাপ করা তৎকালে পরম। সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। ঢাকা কলেজের আমার যেসব বন্ধু তাদের কলেজের। তুলনায় জগন্নাথ কলেজকে হেয়প্রতিপন্ন করিতে চাহিত, তাদেরে এই সব দৃষ্টান্ত দিয়া জব্দ করিতাম। তা ছাড়া জগন্নাথ কলেজে ভাল ভাল প্রফেসারও পাইয়াছিলাম। তাঁদের মধ্যে ইংরাজির অধ্যাপক বাবু সতীশ চন্দ্র সরকার ও দর্শনের অধ্যাপক বাবু উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য আমার জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। যথাস্থানে তাদের কথা বলিব।

## ২. যায়গীর-হাকিম সাহেবের বাড়িতে

আগেই বলিয়াছি কিছুদিন আগে হইতেই আমাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ। হইয়া যায়। পনের-বিশ টাকা স্কলারশিপ পাইয়া আইএ পড়িব বলিয়া যে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম পাঁচ টাকা স্কলারশিপ পাওয়ায় সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কাজেই হোস্টেলে থাকিয়া লেখাপড়ার আশা ত্যাগ করিলাম। শামসুদ্দিনের পিতা জনাব সাহেদুল্লাহ মণ্ডল সাহেব ও গাঁয়ের অন্যতম প্রধান মাতব্বর জনাব ওসমান আলী সরকার সাহেবের মধ্যস্থতায় ঢাকা চকবাজার চুড়িহাট্টার হাকিম আরশাদ আলী সাহেবের বাড়িতে আমার যায়গীরের ব্যবস্থা হইল। হাকিম সাহেবের বাড়িতে আমার থাকিবার মত অতিরিক্ত ঘর ছিল না। কাজেই হাকিম সাহেবের বাড়ির কাছের চুড়িহাট্টা মসজিদের ইমাম সাহেবের হুজরা-সংলগ্ন রুমে আমার থাকার ব্যবস্থা হইল। তিনজনকে আমি পড়াইতাম। তিনটি ছেলেই অতিশয় ভদ্র, বিনয়ী ও ভাল ছাত্র ছিল। তাদেরে পড়াইতে আমার বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। আমার নিজের পড়ারও কোনো অসুবিধা হইত না। ছেলেমেয়েরা আমার অতিশয় যত্ন নিত। বিবি সাহেব যদিও পর্দা করিতেন এবং কখনও আমার সামনে আসিতেন না, তথাপি আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সর্বদাই খবর নিতেন। ছেলেমেয়েরা না থাকিলে পর্দার আড়াল হইতে কথা বলিয়া আমার খোঁজখবর করিতেন। পরের বাড়িতে যায়গীর থাকার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম এবং এই শেষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বৃদ্ধ বয়সে ওদের কথা মনে পড়ে। খবর লইয়া জানিয়াছি, হাকিম সাহেব ও তাঁর বিবি সাহেবা এন্তেকাল করিয়াছেন। ছেলেদের একজন হাকিমি পাশ করিয়া হাকিম সাহেবের দাওয়াখানা চালাইতেছে। অন্যান্য ছেলেরা অন্য ব্যবসায় করে। অনেক ইচ্ছা সত্ত্বেও, ঢাকা থাকিয়াও, তাদের সাথে দেখা করিতে পারি নাই। সে জন্য মনে একটা ক্ষোভ আছে।

হাকিম সাহেবের বাড়ি চুড়িহাট্টা হইতে, আমি চকবাজার, মোগলটুলী, ইমামগঞ্জ, বাবুর বাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী হইয়া কলেজে যাতায়াত করিতাম। রোজ এতটা পথ হাঁটিতে আমার মোটেই কষ্ট হইত না। কারণ এর চেয়ে অনেক লম্বা রাস্তা, এর চেয়ে হাজার গুণে খারাপ পথে, এর চেয়ে অনেক কম বয়সে হাঁটিয়া স্কুল করিবার অভ্যাস আমার ছিল দরিরামপুর স্কুলে পড়িবার সময়। তা ছাড়া শহরের রাস্তায় চলা আরো সোজা। বিভিন্ন রকমের নিত্য-নূতন দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে কখন যে পথ ফুরাইয়া যাইত, তা টেরও পাইতাম না।

এই রাস্তায় কলেজে যাতায়াত করিবার সময় একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি কলেজ হইতে ফিরিবার পথে রাস্তায় একটি কাপড়ের টুকরার (ঠিক রুমাল নয়)। ছোট পুঁটলি পাইলাম। পুঁটলিটি তুলিয়া হাতে লইয়া পথ চলিতে-চলিতেই তার গিরো খুলিলাম। যে জায়গায় পুঁটলিটি পাইয়াছিলাম তা ইমামগঞ্জ-মৌলবী বাজারের মোড়ের কাছাকাছি হইবে। কিন্তু ওর গিরো খুলিতে খুলিতে আমি মোগলটুলী ছাড়াইয়া প্রায় চকে পৌঁছিলাম। দশ টাকার একটি, পাঁচ টাকার দুইটি ও দুই টাকার একটি নোটে মোট বাইশটি টাকা। যুদ্ধ মুদ্দতের জন্য ঐ সময় দুই টাকার নোট বাহির হইয়াছিল। তৎকালে ঐ বাইশ টাকার দাম আজকালকার দুই শ টাকারও বেশি। কারণ ঐ সময় দশ-বার টাকায় কলেজ হোস্টেলে স্বচ্ছন্দে থাকা চলিত। এক টাকা সিটরেন্ট, পাঁচ টাকা খোরাকি, এক টাকা টিফিন ও চার টাকা কলেজের বেতন, এই এগার টাকায় রাজপুত্রের হালে কলেজ হোস্টেলে অনেকেই থাকিত। আর আমার মত যায়গীর থাকা গরীব ছাত্রের জন্য বাইশ টাকা ছিল আলী বাবার মোহরের খনি। কাজেই টাকা গনিবার সময় আমার হাত কাপিতেছিল। এই টাকার কী

করা যায়? যে ধরনের নেকড়ায় যেভাবে টাকাগুলি বাঁধা তাতে বুঝা যায়, মফস্বলের কোনও লোক কোনও জিনিস কিনিতেই শহরে আসিয়াছিল। ঐ টাকা হারাইয়া নিশ্চয়ই বেচারার খুবই ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু করা যায় কী? শহরে ঢোল-শহরত করিয়া দিলে ঐ লোকের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। পয়সা খরচ করিয়া ঢোল-শহরত করিলে এই টাকা হইতেই কিছু টাকা খরচ হইয়া যাইবে। সুতরাং কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ঠিক করিলাম থানায় এই টাকাটা জমা দিলে দারোগা বাবু সরকারি খরচেই ঢোল পিটাইয়া ঐ লোকের সন্ধান করিবেন। সামনেই চকবাজার থানা। তাতে ঢুকিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওসি আছেন কিনা? একজন বিহারি পুলিশ দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল : কুই নাহি হ্যায়।'

বাহির হইয়া আসিলাম। হঠাৎ একটু রিলিফ বোধ করিলাম। বুকের উপর হইতে একটা পাথর নামিয়া গেল। দারোগা বেটাদের যে বদনাম শুনি তাতে ওদের হাতে এ টাকাটা পড়িলে নির্ঘাত খাইয়া ফেলিবে। দারোগারা যে কেউ থানায় ছিলেন না এটা আল্লারই ইচ্ছা। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। আল্লার এই মেহেরবানির কথা ভাবিয়া আসমানের দিকে চাইতেই দেখিলাম, সামনেই চকবাজার পোস্টাফিসের সাইনবোর্ড। আল্লার ইশারা এতক্ষণে বুঝিলাম। পোস্টাফিসে টাকাটা জমা দিয়া ঢোল-শহরতের কিম্বা ছাপা বিজ্ঞাপনের একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাইবে। অতএব পোস্টাফিসে ঢুকিলাম। একটি কাউন্টার, বিকাল বেলা তাতেও খুব ভিড়। পোস্টাফিসে এ যাবকালে শুধু কার্ড ও স্ট্যাম্প কিনিয়াছি। টাকা জমাও দেই নাই, মনি অর্ডারও করি নাই। তবু এটা যে মনি অর্ডার হইবে না, তা বুঝিলাম। পোস্টাফিসের সেভিং ব্যাংকের নাম শুনিয়াছি। কিন্তু কীভাবে টাকা জমা দিতে হয়, তা জানি না। ভিড়ের পিছনে দাঁড়াইয়া এসব কথাই ভাবিতে লাগিলাম। যতক্ষণে সামনের ভিড় কমিল, ততক্ষণে আমার সন্দেহের উদ্রেক হইয়া গিয়াছে। পোস্টাফিসে টাকা জমা দিলে সেটাও থানার মতই গায়েব হইয়া যাইবে কিনা? একটু ভাবিয়া-চিন্তিয়া বন্ধু-বান্ধবের সাথে পরামর্শ করিয়াই কাজ করা উচিৎ। অতগুলি টাকা। আবার পরের টাকা। কাজেই সামনের ভিড় শূন্য হইয়া যাওয়ার পরও যখন আমি দাঁড়াইয়াই আছি, কিছু চাইতেছি না, তখন কাউন্টারের কর্মচারীই আমাকে বলিলেন: আপনি কি চান? আমি থতমত খাইলাম। তাড়াতাড়ি মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল : একটা পোস্টকার্ড দেন।

সে সময় আমার পোস্টকার্ডের দরকার ছিল না। কিন্তু ওটা এমন জিনিস যার দরকার একদিন হইবেই। কাজেই ওটাকে অপব্যয় মনে না করিয়াই বাসায় ফিরিলাম। হাত-মুখ ধুইয়া নাশতা করিয়া ঢাকা কলেজের মুসলিম হোস্টেলে গেলাম। এটা আমার রোজকার অভ্যাস। বর্তমানে যেখানে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এটাই তখন ঢাকা কলেজের মুসলিম হোস্টেল। এর নাম ছিল তখন সেক্রেটারিয়েট মুসলিম হোস্টেল, সংক্ষেপে এসএম হোস্টেল। পূর্বপরিচিতদের মধ্যে শুধু শামসুদ্দিনই এই হোস্টেলে থাকিত। প্রথম-প্রথম তারই খাতিরে যাইতাম। কিছু দিনে অনেক বন্ধু জুটিয়া গেল। তাতে সেখানে যাওয়া আমার একটা বৈকালিক নেশা হইয়া গিয়াছিল।

### ৩. পথে-পাওয়া টাকার সদ্ব্যবহার

আমি হোস্টেলে পৌঁছিয়া দেখিলাম আমার বন্ধুরা সাজিয়া-গুঁজিয়া বাজারে যাইবার জন্য প্রস্তুত। অন্যদিন তাদেরে টেনিস বা ব্যাডমিন্টন খেলায় পাই। আমিও ওদের র‍্যাকেটে, ওদের বলে ও শাটলককে দুই-এক হাত খেলিতাম। কিন্তু সেই দিন ওরা বাজারে যাইবে বলিয়া অনেক আগেই

খেলা ছাড়িয়া দিয়াছিল। সকলকে একত্রে পাইয়া খুশিই হইলাম। আমার টাকা পাওয়া, থানা-পোস্টাফিসে যাওয়া সব কথা বিস্তারিত বলিয়া তাদের উপদেশ চাইলাম। আমার কথা শুনিয়া সকলে একসঙ্গে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল : তুমি বিলাইর কাছে গোশতের পাহারাদারি দিতে চাইছিলা। যাক আল্লার মাল আল্লাই বাঁচাইছেন। আমিও মনে-মনে আল্লাকে ধন্যবাদ দিলাম। পরের টাকা লইয়া কী আহাম্মকিই না করিতে যাইতেছিলাম। নিজের এই গাধামির জন্য লজ্জা-ভারী চোখ তুলিয়া বলিলাম: এখন তবে করি কী?

এক বন্ধু হাত বাড়াইয়া বলিলেন : এমন আহাম্মক কি আর গাছে ধরে? ঐ টাকা যথাস্থানে পৌঁছানো ত সোজা ব্যাপার। দাও আমার কাছে টাকাটা।

আমি বন্ধুর কাছে টাকা দিলাম। একটা বড় বোঝা ঘাড় হইতে নামিয়া গেল। আরাম পাইলাম। বন্ধুদের সাথে হাসি-খুশিতে বাজারে গেলাম। গেলাম একদম পাটুয়াটুলীতে। প্রথমেই কালাচাঁদ গন্ধবণিকের দোকানে ঢুকিয়া বন্ধু এক টাকার মিঠাইর অর্ডার দিলেন। তৎকালে এক টাকার মিঠাইয়ে দশজনের পেট ভরিত। আমরা পাঁচ বন্ধুতে সে মিঠাই খাইয়া গলা পর্যন্ত ভরিলাম। ঢেকুর তুলিয়া কালাচাঁদের দোকান হইতে বাহির হইলাম এবং পান-সিগারেট খাইলাম। তারপর আমরা গেলাম মজিদ চশমাওয়ালার দোকানে। সেখানে আমাদের নেতা বন্ধু এগার টাকায় একটি সোনার ফ্রেমের জিরো পাওয়ারের চশমা কিনিলেন। সেখানে হইতে বাহির হইয়া লতিফ খলিফার দোকানে প্রবেশ করিয়া সেখানে এক বন্ধুর গায়ের ছয় টাকা দামের একটা কোটের মাপ দিয়া পুরা টাকা আগাম দিয়া দিলেন।

লতিফ খলিফার দোকান হইতে বাহির হইয়া বন্ধুরা আমার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন : দেখলা এইবার পাওয়া-টাকার সদ্ব্যবহার কেমনে করতে হয়?

সকলে প্রাণ খুলিয়া গলা ফাটাইয়া হাসিলেন। হাসি থামিলে আরেক বন্ধু বলিলেন : কিন্তু যে বেচারা টাকাটা পাইল, তারে ত কিছু দিলা না।

যে বন্ধুর পকেটে টাকা, তিনি বলিলেন : তার কথা আমার মনে আছে। তার কথা ভুইলা যাবার মত অবিবেচক আমি নই। চারটা টাকা এখনও রাইখা দিছি।

আমি এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিলাম। বন্ধুরা ঐ পথে-পাওয়া টাকা দিয়াই আমাদেরে মিঠাই খাওয়াইয়াছেন এবং চশমা-কোট কিনিয়াছেন! বন্ধুরা কেন এটা করিলেন? হাওলাত স্বরূপই টাকা খরচ করিতেছেন, পরে ভরিয়া দিবেন। নিশ্চয়ই। কিন্তু ও-টাকা খরচ করিয়া কাজটা কি তারা ভাল করিলেন, বুঝিলাম না। তবে এটা বুঝিলাম যে টাকাটা খরচ হইয়া যাইতেছে। ভাবনা-চিন্তা শেষ হইবার আগেই দেখিলাম, আমরা এক রেডিমেড কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়াছি। বন্ধুরা সকলে পছন্দ করিয়া চার টাকা দিয়া আমার জন্য খয়েরি হলুদ রঙের তসরেটের একটা কোট কিনিলেন। সব টাকা খরচ হইয়া যাওয়ার চেয়ে চার টাকা বাঁচা ভাল, বোধ হয় এই নীতিতে আমি ঐ কোট নিলাম। বন্ধুরা চকবাজার পর্যন্ত আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া সেন্ট্রাল জেলের সামনে দিয়া নিজেদের হোস্টেল মুখে রওয়ানা হইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন : তোমার মত বোকারামের এ চার টাকাও পাওয়া উচিৎ ছিল না।

## ৪. কেতাবি সাধুতা বনাম বিষয়ী সাধুতা

এতক্ষণে পাঠকেরা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, কেন আমি বন্ধুদের নাম উল্লেখ করিলাম না। ঐ বন্ধুদের দুইজন ছাড়া আর সবাই বাঁচিয়া আছেন। তারা সকলেই আজ সম্মানিত ব্যক্তি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত উচ্চপদস্থ ছিলেন। স্বভাব-চরিত্রে তারা সে সম্মানের যোগ্যও ছিলেন। নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদার সুযোগ লইয়া এঁরা কেউ কখনও অন্যায়-অসৎ উপায়ে অন্যের সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা হস্তগত করিয়াছেন, এমন বদনাম এঁদের একজনেরও নাই। এঁরাই যৌবনে ঐ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। নিজের সাধুতার ফুটানি করিবার উদ্দেশ্যে অথবা বন্ধুদের নীতি-বোধকে হেয় করিবার মতলবেও এ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি না। ঘটনা যেরূপ ঘটিয়াছে, অবিকল তাই বলিতেছি। বরঞ্চ সাধুতার ফুটানি করিবার মুখ আর আমার নিজেরই নাই। যখন এটা লিখিতেছি তখন আমার ঐ বন্ধুদের সকলেরই সুনাম অক্ষুণ্ণ ও চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রহিয়াছে। আমি কয়েক মাস মন্ত্রিত্ব করিয়াই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ও নিম্ন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলাম। মাত্র উচ্চ আদালত হইতেই খালাস পাইয়াছিলাম। এ অবস্থায় নীতিবোধে আমি বন্ধুদের থনে শ্রেষ্ঠ, এ কথা বলিবার আমার অধিকারও নাই। বলিলে কেউ বিশ্বাসও করিবেন না। তবু এই ঘটনার উল্লেখের যদি কোনও মতলব ধরা যায় তবে সেটা সাধুতার ফুটানি করিবার জন্য নয়, বরং তেমন ফুটানির নিন্দা করিবার জন্যই।

পথে টাকা-পয়সা বা কোনও মূল্যবান চিজ পড়িয়া পাইলে এ ব্যাপারে আমাদের নাগরিক দায়িত্ব কী? পড়িয়া-পাওয়া টাকার পরিমাণ বা জিনিসের মূল্যভেদ, প্রাপকের অবস্থা বিশেষ, হারানো বস্তুর মালিকের আনুমানিক অবস্থা ইত্যাদিতে আমাদের নাগরিক কর্তব্যের ইতর-বিশেষ হইবে কিনা, এসব প্রশ্নের বিচার নিশ্চয়ই খুব সোজা নয়। অবস্থাভেদে ব্যক্তির ত বটেই, সমাজেরও নীতিবোধের প্রখরতার বেশ-কম হইতে পারে। ইউরোপ আমেরিকান দেশসমূহের লোকদের এদিককার নাগরিকতা-বোধ নাকি খুবই তীব্র। আমি শুনিয়াছি, সেখানে রাস্তার মোড়ে খবরের কাগজের স্তূপ ও একটা পাত্র পড়িয়া থাকে। বিক্রেতা থাকে না। খরিদ্দাররাই যার-তার ইচ্ছামত কাগজ নিয়া তার দাম ঐ পাত্রে ফেলিয়া যায়। কেউ এক পয়সা হেরফের করে না। দোকানেও নাকি জিনিসপত্রের গায় দাম লেখা থাকে। দরজায় বাক্স থাকে। খরিদ্দাররা ঐ বাক্সে দাম ফেলিয়া পছন্দমত জিনিস লইয়া যায়। কলেজজীবনে এক অধ্যাপকের মুখে শুনিয়াছিলাম, দ্রুতগামী চলন্ত বাসে জানালায় মুখ বাহির করায় তাঁর মাথার হ্যাট রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিল। মোটরসাইকেলওয়ালা পুলিশ দশ মাইল মোটর চালাইয়া পরবর্তী স্টেশনে সেই বাস ধরিয়াছিল এবং তার হ্যাট দিয়া গিয়াছিল। মন্ত্রিত্ব করিবার কালে এক রাষ্ট্রদূত বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, এক বিমানবন্দরে তিনি রুমাল ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনটা দেশ ও দশটা বিমানবন্দর বাহিয়া হাওয়াই জাহাজে জাহাজে তাঁর রুমাল তার হাতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এটা ছবির একদিক মাত্র। ঐ দেশের অমন নাগরিক কর্তব্য-চেতন লোকেরাই আবার আফ্রো-এশিয়ান দেশসমূহের লোকদের ইনসানি হক ও মুখের বুলি কাড়িয়া লইতেছে। বাধা দিলে গুলির মুখে তাদের খুলি উড়াইয়া দিতেছে। মানুষের নীতিবোধ এত বিচিত্র।

আমাদের দেশের ও সমাজের অবস্থা তা নয়, এটাই বড় কথা নয়। আমার নিজেরই মধ্যে নৈতিক কাপুরুষতা ও দ্বিধা-সন্দেহ আছে। আমি আজ তা বেশ বুঝিতেছি। কলেজজীবনে এক হোস্টেল-মেট

একবার আমার কাছ থনে পাঁচটা টাকা ধার নেন। কথা থাকে বাড়ি থনে মনি অর্ডার আসিলেই শোধ করিবেন। কতবার তার মনি অর্ডার আসিল। আমার টাকা শোধ করিলেন। যথেষ্ট তাগাদা করিলাম। বন্ধু-বান্ধব সালিস-সুপারিশ করিলেন। তবুও। বছর-দুই বছর কাটিয়া গেল। টাকা পাওয়ার আশা ছাড়িয়া দিলাম। এমন সময় একদিন দল বাঁধিয়া মার্কেটে যাইতেছি। আমার ঐ দেনাদার বন্ধুর পকেট থনে দশ টাকার একখানা নোট তার ও সকলের অজ্ঞাতে মেঝেয় পড়িয়া গেল। আমি সকলের অজ্ঞাতে আলগোছে তা তুলিয়া নিলাম। ভাবিলাম আল্লাহ্ সুদসহ আমার টাকা পাওয়াইয়া দিলেন। বাজারে গিয়া জিনিস পছন্দ করিয়া দাম দিতে গিয়া পকেটে হাত দিয়া বন্ধু বুঝিলেন তাঁর টাকা হারাইয়াছে। কত হায়-আফসোস করিলেন। আমি অন্যদের সাথে প্রচুর সহানুভূতি জানাইলাম। কিন্তু আসল কথা বলিলাম না।

ফাইনাল পরীক্ষার পর যেদিন সমপাঠীরা সকলে হোস্টেল হইতে বিদায় লইতেছিলাম, সেদিন ঐ বন্ধু পাঁচটা টাকা আমার হাতে জিয়া দিলেন এবং এতদিন দেনা শোধ না করার জন্য মাফ চাহিলেন। আমার হাত কাঁপিতেছিল। বুক ধড়ফড় করিতেছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সত্য কথা বলিতে এবং সে টাকা ফেরত দিতে সাহস পাইলাম না। বরং পরে মনকে প্রবোধ দিবার জন্য দুই বছরের অধিককাল আমাকে জ্বালাইবার প্রতিশোধের কথা এমনকি ইনসাফের মালিক আল্লাহর সুবিচারের কথাও ভাবিয়াছিলাম।

কেতাবি সাধুতা ও রাস্তার সাধুতায় সে পার্থক্য আছে এঁরা তার প্রমাণ। অথচ সাধারণ লোক এটা বুঝিতে পারে না। সাধুতার ভন্ডামি বা ফুটানিরিয়াকারীই যে আসল সাধুতা নয়, বিষয়ী সাধু লোকদের ধারণা তাই। এঁরা আসলে খারাপ লোক নন। সমাজের অবাঞ্ছিত অঙ্গ ও রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত নাগরিকও এঁরা নন। বরঞ্চ শুধু এই শ্রেণীর বিষয়ী ও বাস্তববাদী সাধু লোক যারা সাধুতাকে শুধু পলিসি মনে করেন, তাদের লইয়াই একটা দেশ একটা সমাজ সুখী-সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে। পক্ষান্তরে পান হইতে চুন খসিয়া পড়িলেই যাঁরা হায়-হায় করিয়া উঠেন, কেতাবি সাধুতার সেই ভণ্ড ও রিয়াকারদেরে লইয়া একটা সমাজ বা দেশ সুখী হইতে পারে না। আজ পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও আমি মনে করি, আমি ঐদিন আহাম্মকি করি নাই। কিন্তু যেসব বন্ধু ঐদিন আমাকে আহাম্মক বলিয়াছিলেন তাঁরা অসাধু, এ কথাও আমি বলিতে পারি না। বিশেষত এ কথাও আমি ভুলিতে পারি না যে বাইশ টাকা হজম করিতে আমার বিবেকে বাধিয়াছিল বটে কিন্তু ঐ টাকার ভগ্নাবশেষ চার টাকা হজম করিতে আমার আপত্তি হয় নাই। কিন্তু জনমত ব্যক্তির মতের বা যুক্তির তোয়াক্কা করে না। জনগণ ব্যক্তিগত সাধুতার খুব কমই মূল্য দিয়া থাকে। জনগণের বিশ্বাস, সুযোগ পাইলেই মানুষ চোর হয় 'এভরিওয়ান হ্যাঁজ হিজ ভ্যালু, টাকা দিয়া সবাইকে কেনা যায়। জনগণের এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাদের কথা : তৃণ হরণ করে না ব্রহ্মচারী; টাকা চুরি করে লক্ষ চারি। সারা জীবন যে লোকটা সাধুতার জন্য চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিল, সেও যদি মওকামত ভাল সুযোগ পায় তবে টাকা মারিতে দ্বিধা করিবে না। যে সময়ে এ টাকাটা আমি রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম ঠিক সেই সময়ে কলেজের বকেয়া পাওনার জন্য আমার নাম কাটা যাওয়া আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তবু এ টাকা দিয়া কলেজের বকেয়া বেতন শোধ করার কল্পনার একটা উঁকিতেই আমার বিবেক তার দিকে বাঘা কুত্তার মত ঘেউ-ঘেউ করিয়া উঠিয়াছিল। অথচ দুই ঘণ্টা পরে আমার বন্ধুরা যখন ঐ টাকার সব শেষ করিয়া বাকি চার টাকা দিয়া আমাকে একটা রেডিমেড কোট কিনিয়া দিলেন, তখন আমার সেই বিবেকই ক্লান্তি-অবসাদে অন্ধকার কোণে ঘুমাইতেছিল।

## ৫. হোস্টেল-জীবন বনাম যায়গীর-জীবন

হোস্টেল-জীবনের কথা শুরু করিবার আগে যায়গীর-জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই দেড় বছরের যায়গীর-জীবন একাধিক কারণে একাধিক দিক হইতে আমার নয়া অভিজ্ঞতার উৎস হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে সে অভিজ্ঞতা খুবই কাজে লাগিয়াছিল। প্রথম ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে শিক্ষালাভ করি, তা ছিল ছাত্র হিসাবে আভিজাত্য-বোধের অবসান। স্কুলজীবনের চার বছর হোস্টেলে কাটাইবার সময় নিজের অজ্ঞাতেই যায়গীরবাসী ও হোস্টেলবাসী ছাত্রদের মধ্যে একটা আভিজাত্যের সীমারেখা টানিতে শিখিয়াছিলাম। হোস্টেলবাসী ছাত্ররা সুপিরিয়র ও যায়গীরবাসী ছাত্ররা ইনফেরিয়র। হোস্টেলবাসীরা নিজের টাকায় খায় আর যায়গীরবাসীরা পরের খায়। এই কারণে হোস্টেলবাসীরা ধনী বাপের ছেলে আর যায়গীরবাসীরা গরীব বাপের ছেলে; পার্থক্যটা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ শহরতলী ও অদূরবর্তী পাড়াগাঁয়ে যেসব ছাত্র নিজের বাড়ি হইতে স্কুলে পড়িতে আসিত, আমরা হোস্টেলবাসীরা তাদেরেও কিছুটা অবজ্ঞা চোখে দেখিতাম। আমরা হোস্টেলবাসী ছাত্ররা অন্য সব ছাত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, কিছুটা অভিজাত শ্রেণীর মনে করিতাম। আজকালকার ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা যেমন সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের থনে নিজেদেরে কিছুটা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে, এমনি একটা মনোভাব আর কি?

আমার যায়গীর-জীবনে এই অহমিকা ভাঙ্গে। ভাঙ্গা কথাটা ব্যবহার করিলাম এই জন্য যে হোস্টেল-জীবন হইতে যায়গীর-জীবনে আমার এই পরিবর্তনটা প্রথম-প্রথম আমার মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল। এটাকে একটা পতন মনে হইয়াছিল। বাপের দারিদ্র্যের ফলেই আমার এই পতন ঘটিয়াছিল। সুতরাং আমি আর অভিজাত শ্রেণীর ছাত্র নই। এটাই ছিল আমার মনঃপীড়ার কারণ।

এই মনঃপীড়ার যখন অবসান হইল, তখন নিজের দুর্ভাগ্যের সহিত আপস করার মত নিগেটিভ মনোভাব এটা ছিল না। যায়গীর-জীবনের একাধিক উপকারী দিকের সন্ধান লাভের মত পজিটিভ দিকও আমার চোখে উদ্ভাসিত হইল। প্রথমত, যায়গীর-জীবনে ছাত্ররা জনগণের মধ্যে বাস করিয়াই শিক্ষা লাভ করে; হোস্টেলবাসীর মত গণ-সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন তারা হয় না। এই দিক হইতে যায়গীরবাসী ছাত্র হোস্টেলবাসীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়ত যায়গীরবাসী ছাত্র পরের ভাত খায় এটাও ঠিক না। যায়গীর বাড়ির দু-চারজন ছেলেমেয়েকে তাদের পড়াইতে হয় বলিয়া তারা নিজের রোযগারী খানাই খায়। এই দিক হইতে শিক্ষাজীবনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক নীতি আর্ন হোয়াইল ইউ লার্ন', প্রয়োগ করিয়া থাকে এরাই। তৃতীয়ত, গণ সমাজ-জীবনে বাস করিয়া এরা শিক্ষা লাভ করে বলিয়া এরা সমাজের আচার-আচরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং মানবজীবনের সহিত ব্যাপকতর ক্ষেত্রে পরিচিত হয়। হোস্টেলবাসীর চেয়ে এদের শিক্ষা অধিকতর বাস্তববাদী, অতএব পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। হোস্টেলবাসীর মত অসামাজিক অবাস্তব ও অপূর্ণ থাকে না। চতুর্থত, যায়গীরবাসী ছাত্র হোস্টেলবাসীর চেয়ে আত্মবিশ্বাসী, স্বনির্ভর মিতব্যয়ী ও বিষয়জ্ঞানী হইতে শিখে। পরিস্থিতি ও পরিবেশই এমন হইতে তাদেরে শিক্ষা দেয়। পরবর্তী জীবনের জন্য এ সবই অত্যাবশ্যক গুণ।

## ৬. ঢাকার মহল্লা-জীবন

এটা ত গেল শিক্ষা-সুযোগের সাধারণ উপকারিতার দিক। দেড় বছরের যায়গীর-জীবনে চুড়িহাট্টা মহল্লা সাধারণভাবে এবং হাকিম সাহেব ও তার পরিবার-পরিজন হইতেও আমি ব্যক্তিগতভাবে যে জ্ঞান ও উপকার পাইয়াছি, তারও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

চুড়িহাট্টা মহল্লাটি সে সময়ে ছিল একটি নিম্নমধ্যবিত্তের মহল্লা। ঢাকা শহরের অধিকাংশ গলিকুচার মহল্লাগুলি তখন এমনি ছিল। বাসেন্দাদের বেশির ভাগ ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাদের অধিকাংশের বিশেষত তাদের মধ্যেকার আদি ঢাকাবাসীদের ভাষা ছিল ঢাকাইয়া উর্দু। এরা প্রায় সবাই ছিল স্বভাব-রসিক। সে রসিকতায় উপমা, শব্দবিন্যাস, বাক-রীতি, প্রকাশ ভঙ্গি ছিল অপূর্ব, মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক। ঘটনা ও পরিস্থিতি যতই আকস্মিক ও অভাবনীয় হউক, তার উপযোগী মওকা-মাফিক অদ্ভুত কল্পনাপ্রসূত রসিকতা যেন তাদের ঠোঁটের আগায় সদা প্রস্তুত থাকিত। ঘটনার আকস্মিকতার মতই তাদের রসিকতার আকস্মিকতাও দর্শক ও শ্রোতাকে তাক লাগাইয়া দিত।

চুড়িহাট্টা মহল্লার জনসাধারণও ছিল এমন ঢাকাবাসীর এক অংশ। অন্যান্য মহল্লার মতই চুড়িহাট্টাতেও বাদ-মগরেব বিভিন্ন বাড়ির সেহানে আচ্ছা বসিত। এইসব আড্ডার রসে-ভরপুর বিতর্ক-আলোচনা ছিল বিচিত্র। আগে-আগে হাকিম সাহেবের সেহানেও ছিল আড্ডাখানা। কিন্তু হাকিম সাহেবের ছেলেমেয়েদের পড়ার ব্যাঘাত হয় বলিয়া ঐ আড্ডা ক্রমশ কমিয়া যায়। এবং আমি ছেলেমেয়েদের মাস্টার হওয়ার পর আজ্ঞা একদম উঠিয়া যায়। অবশ্য কিছু দূরের বাড়ি-সমূহের সেহানে আড্ডা চলিতে থাকে। আমার দরুন আড্ডা ভাঙ্গায় আড্ডাবাযরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ভাবিয়া তাদেরে খুশি করিবার আশায় আমি মাঝে মাঝে তাঁদের আড্ডায় যাইতাম। কিন্তু লক্ষ্য করিতাম আমার উপস্থিতিতে আড্ডার স্বাভাবিক স্ফূর্তি বিঘ্নিত হইত। মন খুলিয়া তাঁরা হাসি-তামাশা করিতে পারিতেন না। 'মাস্টার সাব' বলিয়া তাঁরা আমাকে সম্বোধন করিতেন এবং উপযুক্ত সম্মান করিতেন বলিয়াই বোধ হয় এরূপ হইত। তাই আমিও আস্তে আস্তে তাঁদের আড্ডায় যাওয়া ছাড়িয়া দিলাম।

হাকিম সাহেব নিজে ছিলেন একজন স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি আরবি-ফারসিতে বেশ লিয়াকত রাখিতেন। নিজের বিদ্যার বড়াই তিনি কখনও করিতেন না। কিন্তু আমি অল্প দিনেই তাঁর পরিচয় পাইলাম। ফারসি আমার দ্বিতীয় ভাষা ছিল। আমি হাকিম সাহেবের ছেলেমেয়েদের পড়াইবার সময় সঙ্গে সঙ্গে নিজের পাঠ্যবইও পড়িতাম। আমি ফারসি টেক্সট বই পড়ার সময় হাকিম সাহেব দাওয়াখানা হইতে ফিরিয়া আসিলে প্রায়ই সাদী, হাফেয, রুমী, ফেরদৌসী ও জামী লইয়া আমার সহিত আলোচনায় বসিতেন। কবিদের সম্বন্ধে আমার অজানা অনেক তথ্য বর্ণনা করিতেন এবং আমার পাঠ্যবইয়ের বাইরের অনেক কবিতা আবৃত্তি করিতেন।

হাকিম সাহেব মোটামুটি খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ছিলেন। মৌলবী বাজারে তার দাওয়াখানা ছিল। বন্ধুবান্ধবসহ বাজারে সওদা করিতে বা বেড়াইতে গেলে হাকিম সাহেবের দোকানের সামনে দিয়া যাইতে হইত। সুযোগ পাইলেই দাওয়াখানায় ঢুকিতাম। দেখিতাম তার রোগী সংখ্যা অনেক। আমাদেরে দেখিলে তিনি বসিতে বলিতেন। সুবিধা হইলে বসিতামও। অবসর পাইলে তিনিও

আমাদেরে আগের দিনের এবং হিন্দুস্থানে (মানে দিল্লি-লাখনৌসহ উত্তর-ভারতে) বর্তমানেও হাকিমি বিদ্যার আদর ও মর্যাদা বর্ণনা করিতেন। আমি তাতে এ বিষয়ে বেশ কিছু জ্ঞান লাভও করিয়াছিলাম।

হাকিম সাহেবের নিকট আমি উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতাও শিখিয়াছিলাম। তিনি অনেকবার আমাদের গ্রামে গিয়াছেন। কাজেই জানিতেন আমরা গোড়া মোহাম্মদী। গোর-পীর পূজার আমরা ভয়ানক বিরোধী। মহল্লার লোকেরা এবং সহপাঠী ছাত্ররা প্রায় সবাই ছিলেন হানাফী। এই লইয়া সহপাঠীদের সাথে আমার যে তর্ক ও বাদ-বিতণ্ডা হইত, তাতে অনেক সময় অপ্রিয়তারও সৃষ্টি হইত। এই ধরনের ঘটনায় হাকিম সাহেব প্রকাশ্যে আমার পক্ষ লইতেন, গোপনে আমাকে উদার হইতে উপদেশ দিতেন। এমন একটি ঘটনার কথাই বইয়ের অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।

প্রায় দেড় বছর হাকিম সাহেবের বাড়িতে যায়গীর থাকিয়া আইএ ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বাদামতলী ঘাটের এক মেসে যাই। এটা ছিল ছাত্র ও অফিসারদের একটি মিশ্রিত মেস।

এই মেসে আমি মাত্র মাস কয়েক ছিলাম। এখান হইতেই আইএ ফাইনাল দেই। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করি। কিন্তু কোনও স্কলারশিপ পাই না। এই মেসে আমিন সাহেব নামে একজন কেরানি থাকিতেন। তিনি খুব ভাল ফ্লুট বাজাইতেন। আমার পরীক্ষার পড়ায় ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তিনি বেশি রাত্রে মেসের খোলা সেহানে বসিয়া বাঁশি বাজাইতেন। বাঁশির সে মিঠা আওয়াজে আমার ও মেসের আরো অনেকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমরা আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিতাম না। সেহানে আসিয়া আমি তার পা ঘেঁষিয়া বসিতাম। এই আমিন সাহেবের নিকট আমি ফ্লুট বাজানো শিখিয়াছিলাম এবং পরবর্তী ছাত্রজীবনে বাঁশিবাদক হিসাবে নাম করিয়াছিলাম।

দুই বছরের জগন্নাথ কলেজ-জীবন আমার মোটামুটি সুখেই কাটিয়াছিল। ভাল-ভাল প্রফেসারের কাছে পড়িবার আনন্দ পাওয়া ছাড়াও জগন্নাথ কলেজে আমার একটা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হয়। স্কুল-কলেজের এত বড় লাইব্রেরি থাকিতে পারে, জগন্নাথ কলেজেই প্রথম এই জ্ঞান লাভ করি। লাইব্রেরির বিশালতায়, বইয়ের সংখ্যায় ও নাম না-শোনা ও চোখে না-দেখা বহু বড় বড় আকারের বই দেখিয়া আমি লাইব্রেরিটার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ি। ক্লাসে পড়া না থাকিলে অথবা অন্যভাবে অবসর পাইলেই আমি লাইব্রেরিতে ঢুকিতাম। অল্পক্ষণেই লাইব্রেরিতে ডুবিয়া পড়িতাম। সবচেয়ে বেশি ডুবিতাম ইতিহাসের বইয়ে। ইতিহাস মানে আরব জাতি ও মুসলিম দুনিয়ার ইতিহাস। খলিফা ওমরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিটি পোড়াইবার গল্পটি যে সম্পূর্ণ বানোয়াট, ঐতিহাসিক বাটলারের বই হইতে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধসহ কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখি এই সময়ে। এগুলি আল-ইসলাম-এ ছাপা হয়। এইভাবে ইতিহাসের আউট বুকে এতটা মাতিয়া উঠি যে ইতিহাসের টেক্সট বুকগুলির প্রতি অবহেলা করি। ফলে অন্যান্য বিষয়ে ৮০-এর উপর নম্বর পাইয়াও ইতিহাসে মাত্র ৩৬ নম্বর পাইয়া কোনও মতে ফার্স্ট ডিভিশনে আইএ পাশ করি।

খেলাধুলায় শখ ছিল ছেলেবেলা হইতেই। কিন্তু জগন্নাথ কলেজের দুই বছর ফুটবল-ক্রিকেট হইতে বঞ্চিত থাকি। জগন্নাথ কলেজের নিজস্ব কোনও খেলার মাঠ ছিল না। কলেজের পিছন দিকে যে খানিকটা খোলা জায়গা ছিল, তাতে ফুটবল-ক্রিকেট খেলা চলিত না। তবু তার মধ্যে আমরা কোনো রকমে খেলা চালাইতাম। বল ক্যাচিং-এ অর্থাৎ গায়ের জোরে খুব উঁচায় ক্রিকেট বল ছুড়িয়া তা

ধরায়, এই সময়ে আমার নাম ছিল। এমনি খেলায় একবার বল ধরিতে গিয়া আমি আহত হই। অসমান মাঠে উপর দিকে চাহিয়া দৌড়াইতে গিয়া হোঁচট খাইয়াছিলাম। ফলে বল পড়ার সম্ভাব্য স্থান হইতে বেশি আগাইয়া গিয়াছিলাম। তাই পিছন দিকে কাত হইয়া হাত বাড়াইয়া বল ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বল হাত হইতে পিছল-ফসকিয়া চোখের নিচ দিকে গালে পড়ে। মুহূর্তে গাল-চোখ ফুলিয়া বাম চোখ একদম বন্ধ হইয়া যায়। এটা ছিল একটা অ্যানুয়েল স্পোর্টসের দিন। অধ্যাপকেরাও অনেকে দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের ও বন্ধুদের সমবেত উদ্যমে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে প্রিন্সিপাল ললিত চ্যাটার্জি মহাশয় ছাড়াও আরো নামকরা অনেক অধ্যাপক ছিলেন। দর্শনের অধ্যাপক উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ইতিহাসের অধ্যাপক মি. পি গুপ্ত, ইংরাজির অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র সরকার, অধ্যাপক ফণীন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতি অনেকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের অধ্যাপক মি. পি গুপ্ত অধ্যাপনায় ত ভাল ছিলেনই, চেহারা-ছবি ও পোশাকেও তিনি ছিলেন একেবারে ইংরাজ। বিশেষত, তিনি ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপিকা তটিনী গুপ্তার স্বামী। তৎকালে সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও মিসেস তটিনী গুপ্তা ছিলেন জ্ঞানে প্রতিভায় বিস্ময় ও শ্রদ্ধার পাত্রী। অধ্যাপকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সরকার ছিলেন শুধু জগন্নাথ কলেজের নয়, সকল কলেজ-স্কুলের ছাত্রদের এবং ঢাকাবাসী সকলের ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইনি ন্যাশনাল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল স্থাপন করেন। কলেজটি চলে নাই। কিন্তু মেডিকেল স্কুলটি আজও আছে।

৭. ঢাকা কলেজ-এস এম হোস্টেল

১৯১৯ সালে আইএ পাশ করিয়া আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। বিশ্বযুদ্ধের দরুন পাটের দাম কিছুটা বাড়িয়া যাওয়ায় সব পাটচাষির মতই আমার বাপের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। এই সুযোগে আমি এস এম হোস্টেলেই উঠি। পরবর্তী জীবনে বড় হইয়াছিলেন এমন অনেক ভাল-ভাল ছাত্রের সাথে পরিচিত হই এই হোস্টেলে। এই হোস্টেলে তখন আসাম সরকারের অন্যতম মন্ত্রী কাছাড় হাইলাকান্দিবাসী মি. আবদুল মোত্তালেব মজুমদার, ডা. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক যহুরুল ইসলাম, হাইকোর্টের বিচারপতি মি. মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মি. মিজানুর রহমান, আইন পরিষদের ডি. স্পিকার মরহুম মোহাম্মদ শাহেদ আলী, আইজিআর মি. সাদেক খা, এককালীন গভর্নর রাষ্ট্রদূত মি. সুলতান উদ্দিন আহমদ, পুলিশের আইজি মি. শামসুদদোহা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মি. আফতাঁবুদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ হাসান আলী, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার আবদুল আজীজ ডি. ম্যা. মি. আবদুল মজিদ মোল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজাদ সম্পাদক মি. আবুল কালাম শামসুদ্দিনও এই হোস্টেলের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি কলিকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হইয়া কারমাইকেল হোস্টেলের বাসিন্দা হন।

আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হইবার অল্পদিন পরেই জগন্নাথ কলেজের দর্শনের অধ্যাপক বিখ্যাত দার্শনিক, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ঢাকা কলেজের দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি জগন্নাথ কলেজে আমাদিগকে তর্কশাস্ত্র পড়াইতেন। তর্কশাস্ত্রে আমার কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া বিএতে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইবার জন্য তিনি আমাকে তখনই উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁর উপদেশমতই আমি দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়াছিলাম। তিনি ঢাকা কলেজে যোগ দিয়া আমাকে

দর্শনের অনার্স ক্লাসে দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হন। ঢাকা কলেজের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন তখন অধ্যাপক ল্যাংলি। তিনি পরবর্তীকলে দর্শনে পিএইচডি পাইয়াছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ল্যাংলি ও অধ্যাপক উমেশ ভট্টাচার্য আমাদের দর্শনের অনার্স ক্লাস লইতেন। আমি জগন্নাথ কলেজ হইতেই উমেশবাবুর প্রিয় পাত্র ছিলাম। ক্লাসে ও পরীক্ষায় ভাল করিয়া আমি ল্যাংলি সাহেবের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলাম।

৮. খেলাধুলা

জগন্নাথ কলেজে দুই বছর ধরিয়া খেলাধুলায় যে উপাস করিয়াছিলাম, ঢাকা কলেজে সে ক্ষুধা পুরাপুরি মিটাইলাম। খেলাধুলায় আমার বরাবরই খুব বেশি ঝোঁক ছিল। ঢাকা কলেজে ও হোস্টেলে খেলার সরঞ্জাম ও মাঠের সুবিধা প্রচুর পাওয়ায় খেলার ঝোঁকও আমার বাড়িল। ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন সব রকমের খেলাতেই অংশগ্রহণ করিতাম স্কুলজীবনেই। ঢাকা কলেজে আসিয়া টেনিস ও হকি খেলার সুযোগ পাইলাম। ফুটবল, ক্রিকেটে মোটামুটি ভাল খেলোয়াড় ছিলাম বটে, কিন্তু কলেজের এগার জনের একজন কখনো ছিলাম না। কিন্তু হোস্টেলে-হোস্টেলে কম্পিটিশনের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলাম।

এই সব খেলায় মধ্যম শ্রেণীর খেলোয়াড় হইলেও লাফালাফি দৌড়াদৌড়িতে কিন্তু প্রধানদের মধ্যে একজন ছিলাম। বস্তুত, কলেজের বার্ষিক স্পোর্টসে লং জাম্প এবং হাই জাম্পে একবার প্রথম ও আরেকবার দ্বিতীয় হইয়াছিলাম। কাজী মোতাহার হোসেন, মি. আবদুল মোত্তালেব ও আমি এই তিনজনই ছিলাম এই লাফালাফিতে শ্রেষ্ঠ। লং জাম্পে আমার ও মোত্তালেব সাহেবের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইত, আর হাই জাম্পে কাজী। সাহেব ও আমার মধ্যে প্রতিযোগিতা হইত। আমি যে বছর লং জাম্পে প্রথম হইয়াছিলাম সেইবার আমার লাফের দৈর্ঘ্য ছিল উনিশ ফুট দুই ইঞ্চি। পরে শুনিয়াছি আমার লাফের ঐ দৈর্ঘ্য বেশ কিছুকাল রেকর্ড ছিল। লম্বা লাফে আমার এই সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে বন্ধুরা বলিতেন যে আমি লাফ দিয়া শূন্যে উঠিয়া দুই হাতে কাক-চিলের মত ডানা মারিয়া উড়িয়া যাইতাম। কথাটা ঠিক কিনা আমি জানিতাম না। কিন্তু আমি নিজে যেটা বুঝিতাম সেটা এই যে আমি জাম্পিং গ্রাউন্ড হইতে হাওয়ায় উড়িয়া ফলিং গ্রাউন্ডে পড়িয়া যাইতাম না। শূন্যে উঠিয়া হাত-পা ও কোমরের জোরে অন্তত দুইটা ঢেক্কর মারিতাম। আমি বুঝিতাম ঐ ঢেক্করে কমসে কম দুই ফুট জায়গা আমি আগাইয়া যাইতাম।

দ্বিতীয় বছর আমার লাফের দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় ফুট কমিয়া যায়। মোত্তালেব সাহেব সেইবার ফার্স্ট হন। আমার অধঃপতনের কারণ এই যে আমি সেইবার ফুটবল খেলিতে গিয়া হাঁটু মচকাইয়া ছিলাম। সে মচকানটা এত সাংঘাতিক হইয়াছিল যে আমাকে দুই-দুইবার হাসপাতালে ভর্তি হইতে হইয়াছিল। জীবনে আর তা সারে নাই। এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই মচকানো হাঁটু নিয়া কষ্ট পাইতেছি।

৯. গলা সাধনা

বর্তমানে তরুণ বন্ধুরা শুনিয়া তাজ্জব হইবেন যে হোস্টেলের আনন্দমেলায় আমি শুধু ফুট বাজাইতাম না, গানও গাইতাম। ছেলেবেলা হইতেই আমার গলা ভাল ছিল। খোশ কুফী ও মিসরি ইলহানে আমি ছেলেবেলা যখন কোরআন তেলাওয়াত করিতাম, তখন অনেক কারী-মৌলবীও কান পাতিয়া

শুনিতেন। আমি চাচাজীর নিকট এই ইলহান শিখিয়াছিলাম। আমার খোশ ইলহান শুনিয়া দরিরামপুর মাদ্রাসার কয়েক বন্ধু আমাকে গজল শিখান। জগন্নাথ কলেজে পড়িবার সময় আমি আমিন সাহেবের নিকট বাঁশি শিখি এবং হারমোনিয়ামে সারেগামা সাধি। আমিন সাহেব অবশ্য আমাকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিলেন যে, গানের গলা রাখিতে গেলে আমাকে বাঁশি ছাড়িতে হইবে। আমি তা ছাড়ি নাই। ফুট, বাঁশি ও আড়বাঁশি বাজানো আমার একটা নেশা হইয়া গিয়াছিল। তাতে খুব দ্রুতগতিতে আমার গলা পড়িয়া যায়। বর্তমানে আমার গলা শুধু বেসুরা বা হোর্স হইয়াই যায় নাই; উদারার সপ্তগ্রামের প্রথম দুইটা ঘাট সা এবং রে একদম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে বক্তৃতায়, এমনকি সাধারণ বৈঠকি আলাপেও নিম্ন গ্রামে আমার কথা মিলাইয়া বা ফেড আউট করিয়া যায়। ফলে জোর দিয়া কথা বাহির করিতে হয়। এক বন্ধুর এবং অনেকের ধারণা আমি চিল্লাইয়া কথা বলি। যারা জানেন না, তাঁরা ভাবেন আমি রাগ করিয়াছি।

### ১০. মধ্যম রকমের ভাল ছাত্র

ছাত্র হিসাবে আমি মধ্যম শ্রেণীর ভাল ছাত্র ছিলাম। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাধর ছিলাম না। ইউনিভার্সিটিতে নাম করিবার মত কিছু ছিল না। তবু যতটুকু পারিতাম সাহিত্য ও রাজনীতি আমাকে তা-ও করিতে দেয় নাই। আমি দিবারাত্র আউট বই লইয়া থাকিতাম। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রদের অনেকেই আউট বই পড়িয়াও পরীক্ষায় নাম করিয়াছেন। কাজেই শুধু আউট বই পড়াকেই আমার পরীক্ষার ভাল না করার জন্য দোষী করা যায় না। কিন্তু আমি ছিলাম একদম 'হোল-হগার ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড' যাকে বলে একরুখা। যখন যেটা ধরিতাম, সেটার শেষ না দেখিয়া ছাড়িতাম না। অনার্স নিয়াছি দর্শনে, কলেজ লাইব্রেরিতে রিসার্চ শুরু করিলাম ইতিহাসে। এক বই-এ আরেক বইয়ের রেফারেন্স পাইয়া সেই বই ধরিতাম। সেটা হইতে আরেকটা। এইভাবে দিনের পর দিন ও সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাইয়া দিতাম। দর্শনে অনার্সের ছাত্রকে যদি রিসার্চ করিতে হয় তবে দর্শনেই করা দরকার। এ উপদেশ কেউ যদি দিতেন এবং সেটা যদি আমি পালন করিতে যাইতাম তবে সে পথেও শেষ দেখিতে চাইতাম। আমাদের পাঠ্যবইয়ে কান্ট, হেগেল, কোতে, ডেকার্টে, স্পিনোজা, মিলের কোটেশনে সন্তুষ্ট থাকিতাম না। তাদের মূল বই দেখিতে চাইতাম। এবং একটা খুলিয়া দশটায় জড়াইয়া পড়িতাম। ফলে আমি বোধ হয় পরীক্ষার পাশের দিক হইতে চিনিখোরের জায়গায় চিনির বলদ হইয়া গেলাম। সহপাঠীর নজরে পণ্ডিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু শিক্ষক ও পরীক্ষকদের কাছে মূর্খই রহিলাম।

### ১১. ল্যাংলি সাহেবের শেষ উপদেশ

এর উপর বিএ পরীক্ষার কয়েস মাস আগে হইতেই খিলাফত ও নন্‌কো আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলাম। ইব্রাহিম সাহেব এই আন্দোলনে আমাদের নেতা। তার এবং বরিশালে আবুল কাসেম নামে এক সহপাঠীর প্রেরণায় খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিলাম। এবং বিএ পরীক্ষা দিব না বলিয়া হোস্টেল ছাড়িয়া বাড়ি চলিয়া গেলাম। ল্যাংলি সাহেব আমাকে সত্যই স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে তার সাথে দেখা করিবার জন্য বাড়ির ঠিকানায় পত্র দিলেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করিলাম। তার সাথে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে পরীক্ষাটা দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি প্রস্তুতির অভাবের অজুহাত দিলাম। তিনি আমার সব কথা শুনিয়া বলিলেন : 'পরীক্ষাটা তুমি দাও। অনার্স

যদি নাও পাও পরীক্ষায় তুমি ফেল করিবে না। গ্র্যাজুয়েটটা ত হইয়া থাক, স্বরাজ হইলেও ওটা কাজে লাগিবে।’

আমি পরীক্ষা দিলাম। অনার্স পাইলাম না। পাশ করিলাম। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর আবার ল্যাংলি সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখা করিলাম। অনার্স না পাওয়ায় তিনি আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, অনার্স না পাওয়ার সম্ভাবনার কথা তিনি বলিয়াছিলেন বটে কিন্তু সত্য-সত্যই তাই ঘটিবে এটা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। আমি অনার্স না পাওয়ায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন। এই বদনাম লইয়া আমার কলেজ ছাড়া উচিৎ হইবে না। আমার এমএ ক্লাসে ভর্তি হওয়া উচিৎ।

তখন নয়া ঢাকা ইউনিভার্সিটির কাজ শুরু হইয়াছে। নয়া ইউনিভার্সিটিতে অনেক সুবিধা পাওয়া যাইবে বলিয়াও ল্যাংলি সাহেব আমাকে অনেক আশা ভরসা দিলেন। আলীগড় হইতে কয়েকজন ভাল ছাত্র আসিয়া এখানে ভর্তি হইয়াছেন বলিয়া তিনি তাদের সাথে আমাকে দেখা করিতেও বলিলেন।

আমি এতদিনে কংগ্রেস-খিলাফত আন্দোলনে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছি। মহাত্মাজীর এক বছরে স্বরাজ পাওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাসী। সুতরাং এই কয় মাসের জন্য ইংরাজের গোলামখানায় ঢুকিতে আমি রাজি হইলাম না।

কিন্তু হোস্টেলে গেলাম। দেখিলাম আমার যেসব বন্ধু কলেজ ছাড়িয়া খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁদের অনেকেই হোস্টেলে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নূতন নামকরা এমএ ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে মি. আলতাফ হোসেনকে (পরে ডন-এর এডিটর), মি. যাকির হোসেন (পরে আইজি ও গভর্নর), মো. সিরাজুল ইসলাম (পরে জুডিশিয়াল সার্ভিস ও খান বাহাদুর) প্রভৃতি অনেকের সাথে পরিচিত হইলাম। এঁরাও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল রহিলাম।

‘গ্র্যাজুয়েট হইয়া থাক, স্বরাজ হইলেও ওটা কাজে লাগিবে’, ল্যাংলি সাহেবের এই কথাটা কাজে লাগিবার জন্য স্বরাজপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় নাই। মাত্র পাঁচ বছর পরেই কাজে লাগিয়াছিল। গান্ধীজির প্রতিশ্রুতিমত এক বছরে স্বরাজ না হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে আন্দোলনে ভাটা পড়ায়, অধিকন্তু হিন্দু-মুসলিম বিরোধ জটিল হইয়া উঠায় স্বরাজের সম্ভাবনা আরো দূরে চলিয়া যায়। আমি **১৯২৬** সালে রিপন ল কলেজে ভর্তি হইলাম। **১৯২৯** সালে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়া ফাইনাল পাশ করিলাম।

## ১২. সমকালীন শিক্ষা কারিকুলাম

আমাদের ছাত্রজীবনে উচ্চশিক্ষা মাত্র দুই প্রকারের ছিল : আর্ট ও সায়েন্স। ডিগ্রিও ছিল দুই প্রকারের : ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ), ব্যাচেলার অব সায়েন্স (বিএসসি) ও মাস্টার অব আর্টস (এমএ), মাস্টার অব সায়েন্স (এমএসসি)। আজকাল আর্টস’-এর বদলে বলা হয় হিম্যানিটিস’। আর উচ্চশিক্ষার শ্রেণীও দুইটার স্থলে তিনটা করা হইয়াছে, বাণিজ্য যোগ করা হইয়াছে। তার উপর মেয়েদের জন্য ‘হোম ইকনমিকস’ যোগ করিয়া চারটা করা হইয়াছে। মেয়েদের হোম

ইকনমিকসের মত পুরুষদের জন্য ডিগ্রি ইন এগ্রিকালচারও যোগ করা হইয়াছে। এগ্রিকালচারের কলেজ অবশ্য আগেও ছিল। কিন্তু গোটা উপমহাদেশে ছিল মাত্র একটা। এখন বাংলাদেশেই একটা এগ্রিকালচারের ইউনিভার্সিটি করা হইয়াছে।

এসব সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ঠিকই হইয়াছে। যেসব দেশ শিক্ষা সভ্যতায় আমাদের দেশের চেয়ে অগ্রগামী, তাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই এসব হইয়াছে এবং আমরা তাদের অনুসরণ করিয়াছি মাত্র। ধরুন, আর্টসের জায়গায় হিউম্যানিটিসের প্রবর্তন। আগেরটাও যেমন ঠিক ছিল না, পরেরটাও তেমনি ঠিক নয়। আর্ট'-কেও যেমন আমরা শিল্প, কারিগরি বা দক্ষতা ইত্যাদি রূপে বাংলায় তর্জমা করিতে পারিতাম না, এখনকারটাকেও আমার মানবিকতায় তর্জমা করিতে পারি না। তবু আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে যেমন আগেরটা ব্যবহার করিয়াছি, এখনকারটাও তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তেই ব্যবহার করিতেছি। ব্যাচেলার কথাটাকে 'অবিবাহিত পুরুষ' তর্জমা করিতে পারি নাই। আজও পারি না। তবু ডিগ্রিটার নাম 'ব্যাচেলার আগেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি। বলিতেছি এইজন্য যে আসলে এসব শব্দের দ্বারা আমরা কী বুঝাইতে চাই, তা যতই আর্বিট্রারি বা অযৌক্তিক হউক, সকলে একই রকম বুঝিয়া থাকি। ব্যস, তাতেই কাজ হইল। উন্নততর, মানে অধিকতর স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক, শব্দের অনুসন্ধান করিতে গেলে অধিকতর জটিলতার সম্মুখীন হইব বলিয়াই আমরা অনুকরণযোগ্য ভদ্রলোকদের অনুকরণ করি। কিন্তু বিষয়-বস্তুর পরিবর্ধন বিস্তৃতিকরণ এবং তদনুসারে ডিগ্রির সংখ্যা বৃদ্ধিটা তেমন অযৌক্তিক বা অনাবশ্যক নয়। আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এলাকা, আয়তনক্ষেত্র, অঞ্চল ও পরিমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও জ্ঞান যতই অধিক ও ব্যাপক হইতেছে, উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি সংখ্যাও ততই বাড়িবে এটা খুবই স্বাভাবিক। একই শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পরিমণ্ডলের সব জ্ঞানের বোঝা একই সঙ্গে একই মস্তকে বহন করা কঠিন বলিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক এক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যটাও সাধু ও বাস্তবধর্মী। সুখের বিষয় বর্তমানের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ক্রমে শিক্ষানীতি ও কারিকুলামে এই বাঞ্ছিত পরিবর্তন প্রবর্তন করিতেছেন।

## ১৩. শিক্ষাজীবনের শেষ নাই

এইভাবে প্রথমে ১৯২১ সালে এবং দ্বিতীয় বারে ১৯২৯ সালে আমার ছাত্রজীবন শেষ হয়। কিন্তু আমার শিক্ষাজীবনও কি ঐ সঙ্গে শেষ হইয়াছিল? এই অধ্যায়ের শিরোনাম, আমার শিক্ষাজীবন। কাজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় : কলেজ-ভার্সিটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি মানুষের শিক্ষাজীবন শেষ হয়? এটা বড় প্রশ্ন। শাশ্বত সনাতন প্রশ্ন। যুগে যুগে এ প্রশ্ন উঠিয়াছে। শিক্ষাবিদেরাও বলিয়াছেন, মানুষের শিক্ষাজীবন কখনও শেষ হয় না। কথাটা কি সত্য? সত্য হইলেও কত জনের জন্য, কার কার জন্য সত্য? কীভাবে সত্য? আমরা প্রায়শ দেখি, দর্শনশাস্ত্রে এমএ পাশ করিয়া আমাদের কত তরুণ ব্যাংকের কেরানি বা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরি চাকরি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁদের কি শিক্ষাজীবনের নিরবচ্ছিন্নতা বা ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ব্যাংকের কেরানি প্রৌঢ় বয়সে যখন ম্যানেজার হইয়া সাব-ইন্সপেক্টর যখন ডিএসপি হইয়া রিটায়ার করেন, তখন তাদের দর্শনশাস্ত্রে না হউক, আর কোন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি বাড়িয়াছে? বয়সের অভিজ্ঞতা লাভ তাঁরা করিয়াছেন নিশ্চয়ই এবং সেটা হইয়াও থাকিতে পারে বিপুল উভয়ের বেলাতেই। কিন্তু অধ্যয়নের শিক্ষাও হইয়াছে কি? ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, তা হয় নাই। সত্য কথা এই যে কলেজজীবন শেষ করিয়া

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর শিক্ষাজীবনের নিরবচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ঘটিয়া থাকে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খুব কম লোকের ভাগ্যেই। বরঞ্চ উল্টাটাই সত্য সংসার-জীবনে ঢুকিয়া কলেজে-ভার্সিটিতে অর্জিত বিদ্যা ভুলিয়া যাওয়াই আমাদের দেশের সাধারণ নিয়ম। জ্ঞান অর্জনের জন্য বই-পুস্তক পড়া ত দূরের কথা, আনন্দের জন্য বই পড়ার অভ্যাসও এদেশে খুবই কম।

সুখের বিষয় এর ব্যতিক্রম আছে। আমি গৌরবের সাথে ঘোষণা করিতেছি যে এই ব্যতিক্রমের মধ্যে আমিও একজন। পড়িবার আগ্রহ আমার ছেলেবেলার মতই তীব্র রহিয়াছে। শুধু তা-ই নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে খিদা যেন আরো বাড়িয়াছে। ছাত্রজীবনের পনের-ষোল বছরে যত বই-পুস্তক পড়িয়াছি, পরবর্তী ষাট বছরে তার চার গুণেরও অনেক বেশি পড়িয়াছি। কাজেই আমি দাবি করিতে পারি যে আমার শিক্ষাজীবন। নিরবচ্ছিন্নভাবে আজও চলিতেছে। আমি আজও ছাত্র। গুরুতর অসুখ ছাড়া অন্য কোনও কারণেই আমার এই ছাত্রজীবনে ছেদ পড়ে নাই। এমনকি কঠিন অসুখেও রোগ মুক্তির পর স্বাস্থ্য লাভের মুদ্দতে বিছানায় শুইয়া বসিয়া কাটাইবার সময়টাও আমি বই-পুস্তক পড়িয়াই কাটাইয়াছি। জেল খাঁটিতে গিয়াও আমার অধ্যয়ন বন্ধ হয় নাই। বরঞ্চ এ সময় আরো বেশি পড়িয়াছি। আমার অধ্যয়নের এলাকা খুবই বিস্তৃত, এমনকি দেওয়ালহীন ছিল বটে এবং আমি সকল শ্রেণীর বই পড়িতাম সত্য, আমার পাঠ্য তালিকায় নাটক, নভেল, কাব্য-কবিতা, মিস্ট্রি-ডিটেকটিভ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল এমনকি স্কুল-কলেজের আধুনিক পাঠ্যপুস্তকও ছিল বটে, সব রকমের বই ছিল ঠিক, কিন্তু ফিলসফি, মেটাফিজিকস, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ধর্মালোচনা (বিশেষত কোরআন, গীতা, বাইবেল সম্বন্ধে) প্রবন্ধই আমি বেশি পড়িয়াছি। ইতিহাসের প্রতিও আমার আকর্ষণ স্কুল-কলেজজীবন হইতেই ছিল। আজও আছে। টয়েনবি, রাসেল ও শ'র বহু বই পড়িয়াছি। কার্ল মার্ক্সের ক্যাপিটাল আমি একাধিকবার পড়িবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। লেনিন ও মাও-এরও অনেকগুলি বই পড়িয়াছি। এসবের বেশির ভাগ পড়িয়াছি স্কুল কলেজজীবনের অবসানের পরে; পারিবারিক জীবনের ঝামেলার মধ্যে; রাজনৈতিক জীবনের হট্টগোলের মধ্যেও।

এসবই পড়িয়াছি জ্ঞান লাভের, মানে শিক্ষিত হইবার আশায়। জ্ঞান লাভও যথেষ্ট করিয়াছি। যথেষ্ট করিয়াছি বলিতেছি এইজন্য যে আমি নিজেই বুঝিতেছি প্রতিদিনই আমি কিছু না-কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছি, নূতন সত্যের সন্ধান পাইতেছি। কাল যা জানিতাম না, আজ তা জানিয়াছি। এর যেন শেষ নাই। জ্ঞান লাভের যেন বিরতি বা বাউন্ডারি নাই। এমনকি নিছক আনন্দের জন্য শুধু সময় কাটাইবার জন্য যেসব মিস্ট্রি ও ডিটেকটিভ গল্প পড়িয়াছি, তাতেও প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এসব বিষয়ে ইংলন্ড, আমেরিকার জনপ্রিয় যেসব গল্পকারের বই ও রুশ, ফরাসি যেসব বইয়ের ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়াছি, তারও কোনও হিসাব নাই। সত্য-সত্যই অসংখ্য হইবে। অশ্লীল বলিয়া নিন্দিত যৌন-বিজ্ঞানের বই এবং সত্য-সত্যই নিন্দার যোগ্য এ সম্পর্কিত অবৈজ্ঞানিক বইও কম পড়ি নাই। কিন্তু শিক্ষা লাভ করিয়াছি আমি সবগুলি থনেই।

বই-পুস্তক কিনিয়াছি আমি অনেক। এ বিষয়ে সাধ্যানুসারে পয়সা খরচ। করিয়াছি ত নিশ্চয়ই। সাধ্যের অতীতও অনেক খরচ করিয়াছি। কিন্তু আমার মত রাক্ষস পাঠকের বই নিজে কিনিয়া পড়িবার সাধ্য খুব কম লোকেরই থাকে। আমার ত কোনও দিনই ছিল না। সেজন্য পরিচিত

বন্ধুবান্ধবের নিকট ধার করিয়া অথবা কোনো লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িতে হইয়াছে। বই পড়িয়া জ্ঞান লাভের একটা তৃপ্তি ত আছেই। তা ছাড়া বইয়ের মালিক হওয়ার আনন্দও কম নয়। কলিকাতা থাকিতে আমি ইমপেরিয়াল (বর্তমান ন্যাশনাল) লাইব্রেরিতে বসিয়া অনেক বই পড়িয়াছি। বর্তমানে ইউএসআইএসও বৃটিশ কাউন্সিল হইতে আনাইয়া অনেক বই পড়িয়াছি। বইয়ের মালিক হওয়ার জন্য কলিকাতায় প্রায় ত্রিশ বছরের জীবনে কলেজ স্কোয়ারের সেকেন্ড হ্যান্ড। পুস্তকের দোকানদার ও ফুটপাতের পুরান পুস্তক বিক্রেতাদেরও কম ঘাটাই নাই। বস্তুত আমার খরিদা পুস্তকগুলির মধ্যে অর্ধেকের বেশিই সেকেন্ড। হ্যান্ড। আমার ছেলেরা ও বউয়েরা সবাই পুস্তক কিনিয়া টাকা খরচ করিয়া থাকে। তারা অবশ্য নূতন পুস্তকই কিনিয়া থাকে। এদের কিনা বইয়ের রেঞ্জও খুব বিস্তৃত। বর্তমানে এদের কিনা বই-ই আমি বেশি পড়িয়া থাকি। আমার নিজের বই কিনার সামর্থও নাই, দরকারও পড়ে না।

কলিকাতায় কিনা বইগুলির অধিকাংশই ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল। তবু ছেলে ও বউদের বই-পুস্তক লইয়া আমার বাড়ির লাইব্রেরি মোটামুটি বেশ বড়। অবশ্য আমার সংগ্রহের মধ্যে আইন পুস্তকই বেশি।

আমার ছেলে-বউদের কিনা বই প্রায়ই অবশ্য তাদের নিজ নিজ সাবজেক্টের বই : কেউ ইকনমিকস, কেউ সাইকলযি, কেউ ফিলসফি, কেউ থিওলজি, আর কেউ বাংলা। সব বিষয়েই তারা ডিগ্রি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐ সাবজেক্টের টেক্সট বুক ছাড়াও অনেকগুলি ইংরাজি নাটক, নভেল ও মিস্ত্রি বই তারা কিনিয়াছে ও কিনিয়া থাকে। ও সবই এখন আমার এই অবসরজীবনের প্রধান খোরাকি।

কেউ কেউ আছেন যারা বই পড়েন, কিন্তু কিনেন না। আবার কেউ কেউ আছেন বই কিনেন, পড়েন না। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা পরের বই একবার হাতাইতে পারিলে আর ফেরত দেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বৈঠকখানা সাজাইবার জন্য বুক কেস করেন। এই উভয় শ্রেণীর লোকই মন্দের ভাল। পরের বই নিয়া যদি পড়েন এবং পড়ার পরে যদি ফেরত নাও দেন তবু ভাল। পড়িলেন ত। দেশের জন্য এটাই লাভ আর যারা বই কিনিয়া লাইব্রেরি সাজান, পড়েন না, তাঁরাও ভাল যদি তারা অপরকে সে বই পড়িতে দেন। আগের দিন জমিদাররা বই কিনিয়া বড় বড় লাইব্রেরি সাজাইতেন, নিজেরা খুব কমই পড়িতেন। কিন্তু অপরকে তাঁরা পড়িতে দিতেন। ময়মনসিংহ জিলার জমিদারদের অনেকেরই ভাল ভাল লাইব্রেরি ছিল। সেখান হইতে আমি অনেক বই পড়িতে পাইয়াছি।

এতএব বই পড়ার সাধ, মানে জ্ঞান লাভের খিদা, আমার আজও মিটে নাই। কাজেই এই পঁচাত্তর বছর বয়সেও আমার শিক্ষাজীবন শেষ হয় নাই। ফলে আমার আত্মকথার এই অধ্যায় অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

# ০৭. গোঁড়ামির পরিবেশ

# তৃতীয় খণ্ড – ধর্ম-জীবন

## অধ্যায় সাত – গোঁড়ামির পরিবেশ

### ১. নফলিয়াতের পাবন্দি

ফরাযী পরিবারের আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার পরিবেশে আমার জন্ম। বুদ্ধি হওয়ার সাথে সাথেই দেখিয়াছি নামাজ-রোযার ধুম। সুরুজ উঠার দুই ঘণ্টা আগেই দাদাজী খোশ ইলহানে বুলন্দ আওয়াজে আযান দিতেন। তাঁর আযান আশেপাশের দু-চার গ্রামের লোক শুনিতে পাইত। লোকেরা বলাবলি করিত : ফরাযী সাবের আযানই আমাগর ঘড়ি। দাদাজীর আযানে আমাদের বাড়ির সকলেই জাগিয়া উঠিতেন। পুরুষরা সকলে বাহির বাড়ির মসজিদে (তকালে কাঁচা ভিটি টিনের ঘর) জমাতে নামাজ পড়িতেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা সকালে উঠিতেন, তাঁরাও এই জমাতে শামিল হইতেন। আমাদের চাকরদের মধ্যে যারা রাত্রে আমাদের বাড়িতে থাকিত তারাও নামাজ পড়িতে বাধ্য ছিল এবং ফযরের নামাজে জমাতে শামিল হইত। মোট কথা আল্লার ভয়ে না হউক, দাদাজীর ভয়ে আমাদের বাড়ির সবাই নামাজি ছিলেন।

বাড়ির ভিতরের মেয়েরা সকলে পাক্কা নামাজি ছিলেন। মেয়েলোক অর্থে দাদি, ফুফু, মা ও চাচি। এ ছাড়া গুলের মা নাম্নী এক চাকরানি ও তার মেয়ে গুলজান। এরাও সকলেই আওয়াল-ওয়াকতে ফযরের নামাজ পড়িত।

এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে আমার পূর্বপুরুষেরাই সকলের আগে শিরা কবুল' করিয়াছিলেন, এ কথা আমি এই পুস্তকের পয়লা অধ্যায়েই বলিয়াছি। 'পয়লা শরা কবুল করার মধ্যে যেমন একটা গৌরব বোধ আছে, তেমনি একটা দায়িত্ববোধও আছে। আমি ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, আমার মুরুব্বিদের মধ্যে এই গৌরববোধটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল; কিন্তু দায়িত্ব বোধটা প্রতিবেশীরা এবং বাইরের লোকেরা স্মরণ করাইয়া দিতেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যারা রোযা-নামাজে নিজেরা গাফেল ছিলেন, তাঁরাও ফরাযী পরিবারের লোকদের নামাজ-রোযার গাফলতি সহ্য করিতেন না। যেসব আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা, যাত্রাপার্টি ও পূজা-মেলায় আমার সহপাঠী ও সমবয়সীরা অবাধে যাইত, সে সবে আমি ও আমার ভাইয়েরা গেলে তারাই আপত্তি করিত। এমনকি ঐ সব গান-বাজনার আয়োজনকারী হিন্দুরা ও আমাদের শিক্ষকেরাও আর সকলকে বাদ দিয়া শুধু আমাদেরে বলিতেন : "তোমরা ফরাযী বাড়ির লোক। তোমাদের এসবে আসা উচিৎ নয়।

এই পরিবেশে আমাদের মুরুব্বিদের বাড়ির বাহিরের পুরুষদের, অন্দরের মেয়েলোকদের এবং আমরা মকতব-পাঠশালার পড়ুয়াদের কারো পক্ষে নামাজ-রোযায় ও শরিয়তের অপরাপর আইকাম-আরকানে গাফলতি করার উপায় ছিল না। এ অবস্থায় আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমরা বাধ্য হইয়াই মুসল্লি-মুত্তাকি অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধার্মিকরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিলাম।

কাজেই জ্ঞান হইয়াছে অবধি আমি আমাদের বাড়িতে নামাজের ধুম দেখিতেছি। আর রোযা? পুরুষরা সবাই বছরে একবার রমযানের এক মাস মাত্র রোযা রাখিতেন। এ ছাড়া দাদাজীকে মাঝে মাঝে কোনও বিশেষ উপলক্ষে রোযা রাখিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বাড়ির মেয়েদের যেন রোযার আর শেষ নাই। রমযানের পরে শওয়ালের ছয়টি সাক্ষী রোযা' মাসে মাসে আইয়াম-বাজের রোযা, আশুরার রোযা, শবে বরাত ও শবে মেরাযের রোযা ইত্যাদি কত কী? মেয়েদের মধ্যে আবার মা সকলকে ছাড়াইয়া যাইতেন। বরকত ও ফজিলতের যতগুলি নফল রোযা আছে সেগুলি ত তিনি রাখিতেনই, তার উপর তিনি প্রায় সারা বছরই সদুকার রোযা ও কাফুরার রোযা রাখিতেন। শ্বশুর-শাশুড়ি, বাপ-মা, স্বামী-পুত্র, ভাই-ভগিনী অথবা নিকট আত্মীয় কারো অসুখ-বিসুখ হইলে, অমনি মা তার রোগমুক্তির জন্য তিনটা রোযা, সদকা মানিয়া বসিতেন। খোদার ফজলে মার উপরোক্ত শ্রেণীর লোকের অভাব ছিল না তাদের কারো না কারো অসুখ-বিসুখ একটু-না-একটু হইতই। সুতরাং মার সদকার রোযা যোগাড় করিতে হইত না। যদি সৌভাগ্যবশত কোনো বছর এতগুলি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কারোই কোনও অসুখ-বিসুখ না হইত এবং তার ফলে মার সদকার রোযার অভাব হইত, তবু তাঁকে রোযা রাখা হইতে মহরুম করিবার উপায় ছিল না। সে অবস্থায় তিনি কাফফারার রোযা রাখিতেন। আমি খুব ত্যক্ত-বিরক্ত হইতাম। কারণ দিনের বেলা মাকে খাইতে দেখা এবং তাঁর হাতের 'লুকমা' বা 'নওলা' খাওয়া আমার ভারি শখের জিনিস ছিল। তাই মাকে প্রশ্ন করিতাম : এটা আবার কিসের রোযা? তিনি বলিতেন, আমরা দিন-রাত অজানাভাবে কত আয়েব কসুর গোনা-খাতা করিতেছি, তার হিসাব নাই। আমাদের বরাতে যে বালা মুসিবত হইয়া থাকে, তা এইসব গোনা-খাতার জন্যই হইয়া থাকে। তিনি রোযা করিয়া সেইসব গোনা-খাতা আল্লার দরগায় মাফ নিতেছেন এবং ঐ সব বালা-মুসিবতের রাস্তা বন্ধ করিতেছেন। মোট কথা রোযা রাখা মার একটা নেশা ছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওটা তার স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। দিনের বেলা কিছু খাওয়া তার সহ্য হইত না। জীবনের শেষ পনের-বিশ বছর তিনি বছরের নিষিদ্ধ ছয় দিন বাদে সারা বছরই রোযা রাখিতেন।

যা হোক রোযা-নামাজের এই ধুম ছাড়া বাহির বাড়ির আটচালা টিনের ঘরে চাচাজীর মাদ্রাসা বসিত। তাতে সকাল-সন্ধ্যায় আরবি-ফারসি পড়া হইত। তাছাড়া বার মাসই মুনশী-মৌলবী, আত্মীয়-স্বজন এবং বিদেশি আলেম-মুসাফিরের সমাগম থাকিত। এঁরা প্রায় সব সময় মসলা-মসায়েলের আলোচনা ও বাহাস-মুবাহেসা করিতেন। প্রায় মাসে মাসেই বাহির বাড়ির উঠানে ওয়াযের মজলিস বসিত।

## ২. শৈশবের বাড়াবাড়ি

এই পরিবেশে অন্য সহোদরদের সাথে আমিও খুব মুসল্লি-মোত্তাকি হইয়া উঠিলাম। বরঞ্চ আমি সকলের চেয়ে বেশিই হইলাম। পাঁচ বছর বয়সে মতন কোরআন শরিফ খতম করিলাম। ঐ বয়সেই পাঁচ ওয়াকত নামাজ নিয়মিত পড়িতে লাগিলাম। এ ছাড়া মার জায়নামাজে তার পাশে বসিয়া তার দেখাদেখি এবাদত করিতাম। কী এবাদত করিতাম, তা নিজেই জানিতাম না। কখনও মার তসবিহ ছড়া নাড়িয়া, কখনও ডান হাতের আঙুল টিপিয়া এবং কখনো সিন্দা করিয়া মার অনুকরণ করিতাম। এতে মা অসন্তুষ্ট হইতেন না। বরঞ্চ দোওয়া তসবিহ শিখাইবার চেষ্টা করিতেন।

সাত বছর বয়সে সর্বপ্রথম পুরা ত্রিশটা রমযানের রোযা রাখিলাম। নয় বছর বয়সে বাড়ির মাদ্রাসায় জমাতে নহম ও পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণী পাশ করিয়া ফেলিলাম। তাতে উর্দু ফেকায়ে-মোহাম্মদী, রাহে-নাজাত, মেফতাহুল জান্নাত ও বাংলা নিয়ামতে-দুনিয়া ও আখেরাত এবং নক্‌শে-সুলেমানী পড়িয়া একরূপ মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। এইসব কেতাবের উপদেশসমূহের শিশুসুলভ আজগুবি অর্থ করিয়া সেসব উপদেশ গোপনে আমল করিতে লাগিলাম। এই সব আমলের দুই-একটা এইরূপ : প্রতি রেকাতে একবার সুরা ফাতেহার পর তিনবার সুরা কওসর অথবা সুরা এখলাস পড়িয়া একশ রেকাত নামাজ পড়িতাম। প্রতি দুই রেকাত অন্তর সালাম ফিরাইতাম এবং একশ বার সোবহানাল্লা পড়িতাম। প্রায় প্রতি রাত্রেই এই নামাজ শুরু করিতাম বটে কিন্তু খুব কম রাত্রেই পুরা করিতে পারিতাম। দশা বিশ রেকাত পড়িতেই মা বা বাপজী জাগিয়া উঠিতেন। আমিও নামাজ বন্ধ করিতাম। কিন্তু তারা কোনো দিন আমাকে তম্বিহ করিতেন না। বরঞ্চ মা এটা পছন্দই করিতেন। পড়ার জন্য বাড়ি ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি বাবা-মার সঙ্গেই থাকিতাম। তাঁদেরে গোপন করিতে গিয়া আমাকে বেশি রাত্রে এ নামাজ পড়িতে হইত। আমি তাদের আগেই শুইয়া পড়িতাম এবং ঘুমের ভঙ্গিতে পড়িয়া থাকিতাম। তারা দুজনে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেই আমি চট করিয়া উঠিয়া পড়িতাম। অযুর দরকার হইত না; কারণ অযু করিয়াই বিছানায় আসিতাম। মার জায়নামাজটা বিছাইয়া এবাদতে লাগিয়া যাইতাম। অন্ধকারেই এটা করিতাম। কারণ বাতি জ্বালাইলে বাবা-মা টের পাইবেন, ভয় ছিল। নফল নামাজে কেরাত জোরে পড়িতে হয় না। কাজেই সেদিকে কোনও চিন্তার কারণ ছিল না।

কিন্তু আসল কথা এই যে বাবা-মা উভয়েই আমার এই গোপন এবাদতের নেশার কথা জানিতেন। যদিও আমি মনে করিতাম, তারা ঘুমাইয়া আছেন। আসলে কিন্তু তারা সজাগই থাকিতেন এবং অন্ধকারে আমার এবাদত লক্ষ করিতেন। প্রথম প্রথম উভয়েই কৌতুক বোধ করিতেন। মা পছন্দ করিতেন। কিন্তু আমার কতকগুলি জটিল রোগ দেখা দেওয়ায় তারা চিন্তিত হইলেন। শরীর আমার কোনও দিনই পুষ্ট ছিল না। এইসব রোগে আমি শুকাইয়া একেবারে কঙ্কাল হইয়া গেলাম। আমার এই এবাদতের সঙ্গে আমার রোগের সম্পর্ক আছে বলিয়া বাবা-মারও সন্দেহ হইয়াছিল। কাজেই দাদাজীর কাছে এবং আমার চিকিৎসকদের কাছে তারা আমার এই গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেন।

এর পর শুধু বাবা-মা নন, সমস্ত মুরুব্বিরা মিলিয়া আমাকে বুঝাইতে লাগেন, এই অল্প বয়সে নফল এবাদতের দরকার নাই। চাচাজী এক ধাপ আগাইয়া গিয়া বলিলেন : এ অবস্থায় এই বয়সে নফল এবাদতে কোনও সওয়াব ত হইবেই না, বরঞ্চ গোনা হইবে।

কিন্তু এসব কথায় আমি টলিলাম না। মুরুব্বিরা ত শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। কোনও প্রকার যবরদস্তি করিলেন না। আমার গোপন এবাদত এখন হইতে প্রকাশ্যভাবে চলিতে থাকিল।

আমার এই নফল এবাদতের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হযরত পয়গম্বর। সাহেবকে খাবে দেখা। অন্তত খাজে-খেযেরের সাক্ষাৎ পাওয়া আমার নফল এবাদতের অপর প্রধান মকসুদ ছিল। পয়গম্বর সাহেবকে খাবে দেখার জন্য নশে-সুলেমানী' ও 'নিয়ামতে-দুনিয়া ও আখেরাতে যতগুলি তরকিব

বাতলান হইয়াছিল একটা-একটা করিয়া তার সবগুলি আমি এস্তেমাল করিতাম। কাগজের ছোট টুকরায় আরবি হরফে একশ একবার আল্লাহ লিখিয়া সেই টুকরা বালিশের নিচে লইয়া শুইতাম। যাফরানের কালিতে শাহাদত আঙুলে আরবি হরফে মোহাম্মদ লিখিয়া শুইতাম। ঘুম আসিবার আগ পর্যন্ত মনে মনে ইয়া রাহিম' জপিতাম। এত করিয়াও কিন্তু পয়গম্বর সাহেবকে কখনো খাবে দেখিতে পাই নাই। ঐ আমলের ফলে খাজে-খেযেরের মোলাকাত পাইবার আশায় নদীর পাড় বা অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কিন্তু খাজে খেযেরের সাক্ষাৎ পাইলাম না। তবে খাবে খাজে-খেযেরের আনুমানিক চেহারার অর্থাৎ সাদা দাড়ি, সফেদ পোশাকের গৌরবর্ণ একজন সুফি-দরবেশকে পুনঃপুন স্বপ্নে দেখিতাম। তিনি স্বপ্নে আমাকে আরবি মুখরেজ ও তালায় শিখাইয়াছিলেন। এসব কথা আমি অন্য অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি।

৩. টুপি নিষ্ঠা

এবাদত-বন্দেগিতে আমার এই ধার্মিকতা আমার পোশাক-পাতিতে প্রকট হয়। টুপি ছাড়া আমি কোথাও যাইতাম না, স্কুলে-মকতবে ত নয়ই। ক্লাসে কখনও মাথা হইতে টুপি নামাইতাম না। আমার টুপিটা ছিল লাল তুর্কি টুপি। ঐ ধরনের টুপিতে মাথায় বাতাস যাতায়াতের কোনো রাস্তা ছিল না। গরমের দিনে ঘামে মাথা ভিজিয়া যাইত। কপাল, গাল, চিপ ও ঘাড় বাইয়া ঘাম পড়িত। তবু টুপি খুলিতাম না। গ্রামের পাঠশালায় পড়িবার সময় আমাদের শিক্ষক জগদীশ বাবু কোনও দিন টুপি খুলিতে বলেন নাই। আলিমুদ্দিন মাস্টার সাহেব ত এ জন্য দস্তুরমত আমাদের দুই ভাইয়ের তারিফই করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দরিরামপুর স্কুলে ও আরো পরে শহরে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে পড়িবার সময় হিন্দু শিক্ষক ও সহপাঠীরা অন্তত গরমের সময় টুপিটা খুলিয়া রাখিতে। পরামর্শ দিতেন। কিন্তু আমি তাদের কথা রাখিতাম না। শুধু হাসিয়া বলিতাম: 'আমার কোনও অসুবিধা হইতেছে না। দরিরামপুর স্কুলে পড়িবার সময় স্কুলসংলগ্ন মাদ্রাসার ছাত্রদের অনেকে সর্বদা টুপি পরিত না। তা দেখাইয়া অনেক শিক্ষক ও সহপাঠী টুপি খুলিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিতে উপদেশ দিতেন। তাদেরও আমি বলিতাম : আমার মাথা বেশ ঠাণ্ডাই আছে। আমিও আসলে ঠাণ্ডা। টুপির জন্য আমি কখনও মাথায় গরম বোধ করিতাম না।

৪. মযহাবী-বিরোধ

আমার এই ধর্মপ্রীতি অনেকবার আমাকে খুব বিপদেও ফেলিয়াছে। আমাদের পরিবার খুব গোঁড়া মোহাম্মদী। আমাদের ধনীখোলা গ্রামের বেশির ভাগ লোকই তাই। ছাত্ররাও। কিন্তু আমি ছাড়া আমাদের অঞ্চলের ছাত্রদের কোনও অসুবিধা বা বিপদ ছিল না। কারণ এরা কেউ নিজেদের মোহাম্মদীগিরি প্রদর্শন করিত না। নামাজের আহকাম-আরকানে হানাফী ও মোহাম্মদীদের মধ্যে যেসব প্রভেদ আছে, তার মধ্যে মোহাম্মদীদের বুকের উপর তহরিমা বান্ধা ও রুকুতে-রুকুতে রফাদায়েন করাই প্রধান কারণ এই দুইটাই সহনামাজিদের এবং বাহিরের দর্শকদের চোখে পড়ে। অন্যসব প্রভেদ সাধারণ। দর্শকের চোখে পড়ে না। আরেকটি বড় তফাত যা চোখে পড়ে না কানে লাগে, সেটি হইল জোরে 'আমিন' বলা। কেরাত জোরে না পড়িলে জোরে আমি বলিত হয় না। সুতরাং জুম্মা ও রাতের নামাজ ছাড়া এ পার্থক্য ধরা পড়ে না। আমাদের জিলায় এবং পরে জানিতে পারি, সারা দেশেই, হানাফীর অনুপাতে মোহাম্মদীর সংখ্যা অনেক কম। আমাদের ছাত্রজীবনেই আমি হানাফী মোহাম্মদীতে অনেক বাহাস-মুবাহেসা ও ঝগড়া-বিবাদ দেখিয়াছি। সুতরাং উভয়

সম্প্রদায়ে বিরোধ ছিল প্রচুর। এমন বিরোধ থাকিলে ছোট দলের লোক সাধারণত একটু আত্মগোপন করিয়া চলে। বড় জমাতে বা যেখানে-সেখানে তারা ধরা দেয় না। ধরা না দেওয়ার উপায়ও খুব কঠিন ছিল না। তহরিমা বাধার সময় হাত দুইটা ঠেলিয়া একেবারে বুকের উপর না তুলিয়া সামান্য নামাইয়া বাঁধিলেই গোলমাল চুকিয়া যায়। হানাফীদের নিয়ম দুই হাত নাভির নিচে বাঁধা। কিন্তু নাভির নিচে কি উপরে, সেটা কেউ আঙুলে মাপিয়া দেখে না। কাজেই পেটের উপর বা ভুড়িতে হাত দুইটা ফেলিয়া রাখিলেই হানাফী মতে তহরিমা বাধা হইল। আর রফাদায়েনটা হাতের কবজি ভাঙ্গিয়া ইশারায় করিলে অথবা একদম না করিলেই বা কী হইল? শান্তিপ্রিয় মোহাম্মদীদের তাই করা উচিৎ। সেকালে অনেকেই তা করিত। আমি নিজে অনেক মোহাম্মদীকে হানাফীদের জমাতে ঐভাবে আত্মগোপন করিতে দেখিয়াছি। ওরা যে শুধু আমার বয়সী শিশু ছিল, তা নয়। আমাদের জমাতের দুই-একজন মুনশী মৌলবীকেও ঐভাবে আত্মগোপন করিতে দেখিয়াছি। তারা যে উদার ছিলেন, তারা যে উভয় প্রকারের আহকাম-আরকানকে জায়েজ মনে করিতেন, তা নয়। নিজেদের মধ্যে জুম্মায় বা ঈদের জমাতে এবং সভা-সমিতিতে তাদের কেউ কেউ হানাফীদিগকে হিন্দু-সে বদতর' বলিয়া গালিও দিতেন। এরাই যখন হানাফীদের মধ্যে পড়িয়া হানাফী মতে নামাজ পড়িয়া আত্মগোপন করিতেন, তখন আমার শিশুমনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। আমি বুঝিতাম, ইনারা ভয়ে আত্মগোপন করিতেছেন। এটাকে আমি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিতাম। এই ধরনের কোনও আলেমকে যখন আমাদের বাড়িতে হানাফীদেরে নিন্দা করিতে শুনিতাম, তখন প্রকাশ্যভাবে মৌলবী সাহেবের কুকীর্তির কথা বলিয়া দিতাম।

### ৫. আমার একগুঁয়েমি

কাজেই কোনও অবস্থাতেই কোনো জায়গাতেই আমি নিজের মোহাম্মদীগিরি গোপন করিতাম না। বরঞ্চ ওটা যাহির করাকে আমি গৌরবের বিষয় মনে করিতাম। নামাজে বুকের উপর তহরিমা বাঁধা, তহরিমা বাঁধার আগে কান পর্যন্ত হাত না তুলিয়া কাঁধ পর্যন্ত তোলা, জোরে 'আমিন' কওয়া, রুকুতে যাইতে-উঠিতে রফাদায়েন করা, প্রথম রেকাত হইতে দ্বিতীয় রেকাতে উঠিবার সময় সিজদা হইতে সোজা না উঠিয়া বসিয়া উঠা, চতুর্থ বা শেষ রেকাতে আত্তাহিয়াত পড়িবার সময় বাম পা ডান পায়ের নিচে দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া, আত্তাহিয়াত পড়িবার সময় সারাক্ষণ শাহাদত আঙুল উঁচা করিয়া রাখা ইত্যাদি কোনও খুঁটিনাটিও বাদ দিতাম না। বরঞ্চ হানাফী সহনামাজিদেরে দেখাইবার জন্য তহরিমাটা অনাবশ্যকরূপে বুকের উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতাম। ভাবটা যেন এই : দেখ ও হানাফীগণ, আমি মোহাম্মদী, তোমাদেরে আমি ডরাই না। যা করিতে পার কর। নিজের বাড়ির জমাতে আমি যতটা জোরে 'আমিন' বলিতাম, হানাফীদের জমাতে তার থনে জোরে বলিতাম। উদ্দেশ্য যেন হানাফীদের কানতালি লাগাইয়া দেওয়া।

এমন যখন আমার মোহাম্মদী তেজ, ঠিক সেই সময় আমি দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হইলাম এবং দুই-একদিন বাদেই জুম্মার নামাজ পড়িতে মসজিদে গেলাম। ময়মনসিংহ ত্রিশালের পাকা রাস্তায় ত্রিশাল থানা বা দরিরামপুর হাই স্কুলে পৌঁছিবার একটু আগেই রাস্তার ডান দিকে যে পাকা এক গুম্বুজের মসজিদ দেখা যায় এইটিতেই তকালেও আমরা স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র জুম্মার নামাজ এমনকি অনেকে ওয়াকতিয়া নামাজও পড়িতাম। আসল মসজিদটি আকারে তেমন বড় না হইলেও সামনের সেহানটি খুবই কুশাদা। মসজিদের ভিতরে যত মুসল্লি ধরে, বারান্দায় ধরে তার

তিন ডবল। স্কুলের হেডমৌলবী জনাব জহুরুল হক ও অন্যান্য শিক্ষক-মুদাররেসদের পিছনে পিছনে আমরা অনেক ছাত্র দল বাঁধিয়া মসজিদে আসিলাম। সামনের পুকুরে অযু করিয়া ছাত্ররা সকলে বারান্দায় দাঁড়াইলাম। শুধু মৌলবী সাহেবরা মসজিদের ভিতরে গেলেন। আর আর সাথীরা কে কোথায় দাঁড়াইল মনে নাই। কিন্তু আমরা দুই ভাই একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইলাম।

৬. প্রথম সংঘর্ষ

আমরা দুই ভাই পাক্কা মোহাম্মদী। সুতরাং বুকের উপর রাখিয়া তহরিমা বাঁধিয়াছি। এক-আধ রেকাত দাখিলুল-মসজিদ বা কাবলুল-জুম্মা বোধ হয় পড়িয়াও ফেলিয়াছি। এমন সময় একজন মোটা গলায় চিৎকার করিয়া বলিলেন : "এই বাচ্চারা, তোমরা কেমনে নামাজ পড়তেছ? তোমরা লা-মাযহাবী নাকি?' কাকে কে এ কথা বলিতেছে, তা ভাবিবার সময় পাইলাম না। একটা লোক আসিয়া আমাদের দুই ভাইয়ের বুকে বাঁধা হাত টানিয়া নাভির নিচে নামাইয়া দিলেন। নামাজে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে নাই। কাজেই আমরা কিছু বলিলাম না। কিন্তু লোকটি আমাদের হাত ছাড়িয়া দেওয়া মাত্র আমাদের দুই জোড়া হাত স্প্রিংয়ের মত পূর্বস্থানে বুকের উপরে উঠিয়া আসিল। লোকটি আবার আমাদের হাত নামাইয়া দিলেন। আবার আমাদের হাত উঠিয়া পড়িল।

শুনিলাম অপর দুই-একজন বলিল : 'আহা, আপনে এটা কি করতেছেন? আমাদের আক্রমণকারী ভদ্রলোক বলিলেন : এরা লা-মযহাবী যে।

প্রতিবাদকারী বলিলেন : হোক না। ওদেরে দাখিলী সুন্নতটা শেষ করতে দেন। তারপর যা হয় বলেন।

আমরা বিনা বাধায় সুন্নত শেষ করিতে পারিলাম। কিন্তু সালাম ফেরান মাত্র লোকটি আমাদের সামনে আবার কুঁদিয়া আসিলেন। মনে হইল তিনি আমাদের দুই রেকাত দাখিলী নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ওত পাতিয়া পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। চিল্লাইয়া আমাদের মুখের সামনে মুষ্টিবদ্ধ হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন : তোমরা লা-মাযহাবী। তোমরা খারেজি। আমাদের মসজিদে ঢুকিয়া মসজিদ নাপাক করিয়াছ।

আমরা ভড়কাইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আশেপাশের কিছু লোক আমাদের পক্ষে থাকিলেন। পক্ষে থাকিলেন মানে আমাদেরে সমর্থন করিলেন, তা নয়। ঐ লোকটি যাতে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত আমাদের গায়ে বসাইয়া দিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তারা আমাদের ঘিরিয়া রাখিলেন। হৈ-চৈয়ে নামাজের কাতার ভাঙ্গিয়া নামাজের জমাত জনতায় পরিণত হইল। মসজিদের ভিতর হইতে স্কুলের হেডমৌলবী ও মাদ্রাসার মুদাররেসরাও বাহির হইয়া আসিলেন। জনতার মধ্যেও আলেমে-আলেমে অনেক কথা কাটাকাটি হইল। আমাদের পরিচয় জানাজানি হইয়া গেল। দাদাজীর নাম অনেকেই জানিতেন। হেডমৌলবী সাহেবের মধ্যস্থতায় আমাদের বিনা বাধায় নামাজ পড়িতে দেওয়া হইল। আক্রমণকারী ভদ্রলোক ও তার সমর্থকেরা গোঁ গোঁৎ করিতে লাগিলেন। নামাজ শেষে হেডমৌলবী সাহেব ও অন্য মৌলবী সাহেবেরা আমাদেরে সাহস দিলেন এবং বরাবর নির্ভয়ে এই মসজিদে নামাজ পড়িতে আসিতে বলিলেন। আমরাও নির্ভয়েই সেখানে জুম্মার নামাজ পড়িতে লাগিলাম।

এর পরেও আরো দুই-একবার আমাদেরে আক্রমণ করা হইয়াছে কিন্তু প্রতিবারই আক্রমণকারী ছিলেন নবাগত।

৭. মযহাবী-বিরোধের তকালীন রূপ

যে যুগের কথা আমি বলিতেছি, সে যুগে এমন ব্যবহার অন্যায়ও ছিল না। ব্যতিক্রম ছিল না। বরঞ্চ ঐটাই ছিল নিয়ম। তৎকালে হানাফী মোহাম্মদীর বিরোধ, বাহাসের সভা, সভা শেষে মারামারি এবং পরিণামে মামলা মোকদ্দমা ও জেল-জরিমানা ছিল সাধারণ ব্যাপার। আমার আয়না পুস্তকের 'মোজাহিদিন' গল্পটা নেহাত কাল্পনিক গল্প নয়। ঐ ধরনের বহু সভায় আমি নিজে গিয়াছি। চাচাজী এরই ধরনের বাহাসের নামে নাচিয়া উঠিতেন। উদ্যোগ-আয়োজন করিতেন। বাহাসের সভায় গিয়া আগের কাতারে বসিতেন। হানাফীদিগকে তর্কে হারাইবার উদ্দেশ্যে তিনি এ সম্পর্কে বেশ কিছু পুস্তকাদি কিনিয়াছিলেন। তার মধ্যে মওলানা আব্বাছ আলীর ফেফায়ে মোহাম্মদী ও মৌলবী এলাহী বখশের রদ্দে মোকাল্লেদিন ও দুরারায়ে মোহাম্মদী ইত্যাদির নাম আজও আমার মনে আছে। পক্ষান্তরে হানাফীদের বক্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হইবার জন্য মওলানা রুহুল আমিন ও মৌলবী নঈমউদ্দিন সাহেবের রদ্দে গায়ের মোকাল্লেদিন ও রদ্দে লা-মযহাবী নামক পুস্তকও তিনি কিনিয়াছিলেন। তিনি হানাফীদের উপর এত বিরূপ ছিলেন যে তাঁদেরে বুঝাইতে গিয়া রাগের চোটে উর্দু বলিয়া ফেলিতেন। তিনি বলিতেন 'হানাফীরা হিন্দো-সে বদতর হ্যায়। আমার মোজাহেদিন' গল্পে উভয় পক্ষের যে সব তথাকথিত যুক্তির অবতারণা করিয়াছি, ও-সবই ঐ সময়কার বাহাসে দুই পক্ষের দেওয়া যুক্তি। যুক্তিগুলি খুবই লজিক্যাল এবং আমার এখনও মনে হয় উভয় পক্ষের কথার মধ্যেই আন্তরিকতা ছিল।

কাজেই দরিরামপুর মসজিদের কতিপয় মাতব্বর-মুসল্লি যে আমাকে হামলা করিয়াছিলেন এতে বিস্ময়েরও কিছু নাই, অন্যায়ও তারা করেন নাই। আমার মত লা-মযহাবীরা ঐ মসজিদে ঢুকিয়া উহা নাপাক করিয়াছি, এ কথা তারা ঈমানদার সাচ্চা হানাফী মুসলমান হিসাবেই বলিয়া ছিলেন। তাদের বিচারে হানাফীরাই একমাত্র খাঁটি মুসলমান। অ-হানাফীরা মুসলমানই নয়। হানাফী আলেমরা অবশ্য বলিতেন, চার মযহাবই বরহক, চারটার একটা মানিলেই সে মুসলমান হইল। কিন্তু হানাফী জনসাধারণ অতশত সূক্ষ্ম বিচারে যাইত না। অন্যতম মযহাবী দল শাফীরাও নামাজের খুঁটিনাটি আরকানে অবিকল মোহাম্মদীদের মত চলিলেও জনসাধারণ সে কথা বিচার করে না। মোট কথা, লা-মযহাবীদের নামাজ পড়া না-পড়া সমান। শুধু তা-ই নয় চাচাজীর বিচারে হানাফীরা হিন্দুদের আগেই দুযখে যাইবে। অনেক হানাফীর চোখে মোহাম্মদীদের কপালেও তাই আছে। অতএব নামাজ না পড়ো তাও ভাল, তবু অপর দলের মত পড়িও না। এ কথাটাও আমার কাল্পনিক কথা নয়। এমন ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের মুখে শোনা গল্পটাই এখন নজিরস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। গল্পটা এই :

৮. করটিয়ার কাহিনী

বাংলার হাতেমতায়ী করটিয়ার স্বনামধন্য জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (চান মিয়া) সাহেবের পিতা হাফেয মোহাম্মদ আলী সাহেব খুব কট্টর হানাফী ছিলেন। একদা তিনি খবর পাইলেন, তাঁর প্রজাদের মধ্যে একজন লা মহাবী আছেন। তাঁর নাম ইসমাইল মুনশী। তাঁর জমিদারির পুণ্য ভূমিতে

লা-মযহাবী! অমনি ইসমাইল মুনশীর তলব হইল। ইসমাইল মুনশী আসিলেন। নকিব ফুকারিল : আসামি ইসমাইল মুনশী হাজির। মুনশী সাহেব দরবারে হাজির হইয়া কুর্নিশ করিলেন। হাফেয সাহেব সিংহাসন হইতে গর্জিয়া উঠিলেন : তোমার নাম ইসমাইল?

মুনশী সাহেব আরেকটা কুর্নিশ করিয়া বলিলেন : হাঁ হুযুর।

হফেয সাহেব : তুমি আমার প্রজা?

মুনশী : জি, হুযুর।

হাফেয সাহেব : তুমি নাকি লা-মাযহাবী?

মুনশী সাহেব চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন : লা-মযহাবী, ওটা কি চিজ, হুযুর?

হাফেয সাহেব লোকটার অজ্ঞতায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন : লা-মযহাবী কারে কয় তাও জান না? আরে এই যে যারগো কয় মোহাম্মদী, তুমি কি মোহাম্মদী?

মুনশী সাহেব আরো বেআক্কেল বনিয়া গেলেন। বলিলেন : মোহাম্মদী কারে কয়, তা ত জানি না হুযুর।

হাফেয সাহেব এত বড় মূর্খকে লইয়া বিপদে পড়িলেন। বলিলেন : মোহাম্মদীও জান না? আহা এই যে যারগগা রফাদানী কওয়া হয়। তুমি কি রফাদানী?

মুনশী সাহেব কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন: রফাদানী? সে আবার কে? আমি জীবনে এর নামও ত শুনছি না, হুযুর।

হাফেয সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বিরক্ত হইয়া শেষ চেষ্টা করিলেন। বলিলেন : রফাদানী চিন না? অই যে নামাজের মধ্যে দুই হাত এমন এমন কৈরা যারা মশা খেদায়।

হাফেয সাহেব নিজের দুহাত কাঁধ পর্যন্ত ঘন ঘন উঠাইয়া-নামাইয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন : তুমি নামাজের মধ্যে এমন কৈরা হাত উঠাও নামাও?

মুনশী সাহেব যেন এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিলেন। তিনি বলিলেন : নামাজের কথা কইতেছেন হুযুর। আমার চৌদ্দপুরুষে নামাজই পড়ি না হাত উঠামু কি?

হাফেয সাহেবের গম্ভীর রাগত মুখে এইবার হাসি ফুটিল। তিনি হাসি মুখে বলিলেন : ও তুমি নামাজই পড় না? ঠিক ত? কোনো দিন নামাজ পড় নাই?

মুনশী সাহেব মুখ পুছিয়া বলিলেন : না, হুযুর। হাফেয সাহেব : যাও, তুমি, খালাস।

কাহিনীটার কতখানি সত্য, আর কতখানি রং-ঢং লাগানো, তা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মোটামুটি সত্য এই যে হানাফী-মোহাম্মদী বিরোধ তৎকালে ঐ রকমই ছিল।

দরিরামপুরে ঐ ঘটনা ঘটার পর আমি সাবধান ত হইলামই না, বরঞ্চ আমার জিদ আরো বাড়িয়া গেল। মোহাম্মদী মতে নামাজ পড়া সহী হাদিস সেহা-সেত্তার হুকুম। সহী হাদিস মানেই পয়গম্বর সাহেবের কথা। সুতরাং ওটাই আল্লার কথা। মানুষের ডরে আল্লা-রসুলের হুকুম অমান্য করিব? আল্লাকে না ডরাইয়া মানুষকে ডরাইব? কিছুতেই না। এই মনোভাব লইয়া নিরাপদে দরিরামপুর ছাত্রজীবন কাটাইয়া দিলাম। কারণ গোড়াতে বাপ দাদার পরিচয় এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জনপ্রিয়তা ছিল সেখানে আমার জোর। ঐ অঞ্চলের মাতব্বররা ও স্কুল কমিটির মেম্বররা সকলেই আমাকে পুত্রের স্নেহাদর দিয়াছিলেন। আমিও ওঁদের নিজের লোক হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু ময়মনসিংহ শহরে সে সুবিধা ছিল না।

## ৯. ময়মনসিংহ শহরে সংঘর্ষ

১৯১৩ সালে ময়মনসিংহে আসিয়া আবার সেই বিপদে পড়িলাম। মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের আশেপাশে কোনো মসজিদ ছিল না। কাঁচারি মসজিদ এখনও হয় নাই। কাজেই ওয়াকতিয়া নামাজ পড়িতাম আমরা কাঁচারির শানবান্ধা ঘাটে। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল রোড যেখানে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে পড়িয়াছে ঠিক এইখানে নদীতে একটা বিশাল বাধান ঘাট ছিল। পাশে যেমন বড়; গভীরও তেমনি। একেবারে নদীর তলায় চলিয়া গিয়াছিল। ঘাটলাটি ছিল দুতলা। অর্থাৎ রাস্তা হইতে সাত-আট ধাপ নিচে নামিয়া সিঁড়ি অপেক্ষা পাশে ডবল বিশাল পাকা চত্বরে আসিতে হইত। এই চত্বরের দুই পাশে পুরাটা এবং অপর দুই পাশে সিঁড়ি বাদে বাকিটা পোড়াপিট ছিল। ঠিক যেন হেলানিয়া বেঞ্চি। এই চত্বর হইতে মূল ঘাট শুরু। অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ পানির ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ঘাটের উপরেই একটা বিশাল বটগাছ। এই গাছটা ঘাটলা ঢাকা দিয়া বেশির ভাগই ছায়া-শীতল রাখিত। আজ সে ঘাটও নাই, বটগাছও নাই। যা হোক কাঁচারির লোকজন এ মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের নামাজি ছাত্ররা এখানেই যোহরের নামাজ পড়িতাম। কিন্তু জুম্মার নামাজ পড়িতে যাইতাম জিলা স্কুল মসজিদে। পরিচয়ের সুবিধার জন্য একে ঐ নামে ডাকা হইলেও জিলা স্কুলের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নাই। জনগণের অর্থ সাহায্যে আজ এখানে তিন গুম্বুজের মসজিদ উঠিয়াছে বটে কিন্তু আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন এটি ছিল একটি ছোট্ট টিনের ঘর।

এই মসজিদে জুম্মা পড়িতে গিয়া প্রথম দিনই আমি বিপদে পড়িলাম। দাখিলুল মসজিদের দুই রেকাত নামাজও শেষ করিতে পারিলাম না। হৈ হৈ করিয়া দুই-তিন জন লোক আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া একদম হেঁচকা টানে আমার তহরিমা বান্ধা হাত নামাইয়া দিল। চিল্লাইয়া বলিল : তুমি লা মাযহাবী? তোমার বাড়ি কই? কই থাক?

চার বছর আগের দরিরামপুরের ঘটনা মনে পড়িল। কিন্তু দুই-এর মধ্যে কত তফাত। সেটা ছিল বাড়ির কাছে। দুই ভাই ছিলাম। মৌলবী যহুরুল হক ছিলেন, আর বাপ-দাদাকে ওরা চিনিতেন। আর আজ? আমি একা বিদেশ বিভুই। চিনা-জানা কেউ নাই। ঘাবড়াইলাম। আল্লাকে ডাকিতে লাগিলাম।

আল্লাহ সাড়া দিলেন। একদল ছাত্রসহ একজন মাস্টার গোছের লোক ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার কিছু বলিতে হইল না। ওদের মুখের কথা শুনিয়াই লোকগুলিকে তিনি তম্বিহ করিতে লাগিলেন। ওদের মত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের লোকই মযহাবী বিবাদ

বাধাইয়া মুসলমানদের ঐক্য নষ্ট করিতেছে; আসলে সব মযহাবই ঠিক ইত্যাদি বক্তৃতা করিলেন। কাতার ভাঙ্গিয়া মুসল্লিরা জনতায় পরিণত হইল। ভিতর হইতে মৌলবী গোছের অনেকে বাহির হইয়া আসিলেন। দেখিলাম, এই ভদ্রলোককে সবাই চিনেন। সবাই খাতির করেন। তাঁর কথায় প্রায় সবাই সায় দিলেন। আমার আততায়ী তিনজনকে এতক্ষণ যাঁরা সমর্থন করিতেছিলেন, তাঁরাও ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। সবাই মিলিয়া ওদেরে বকিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকের কত প্রভাব! এক মুহূর্তে সব ওলট-পালট করিয়া দিলেন।

এতক্ষণে ভদ্রলোক আমার দিকে স্নেহ-ভরা দৃষ্টিতে চাহিলেন। হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে নিজের পাশে দাঁড় করাইলেন। নিজের নামাজ শুরু করিলেন। তার নিরাপদ পাশে দাঁড়াইয়া আমি নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে নামাজ পড়িলাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনে মনে সারাক্ষণ আমি আল্লার চেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা জানাইলাম এই ভদ্রলোককে।

নামাজ শেষে ভদ্রলোক আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি পরম বিনয়ের সাথে পরিচয় দিলাম। তারও পরিচয় পাইলাম। তিনি জিলা স্কুলের শিক্ষক মৌ. শেখ আবদুল মজিদ। তার নাম আমি আগে হইতেই জানিতাম। তিনি সাহিত্যিক। শিক্ষা প্রচার বা এই গোছের নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন তিনি। সারা শহরের মুসলিম ছাত্রদের তিনি ছিলেন প্রিয় ‘মজিদ সার’। মুসল্লিদের উপর প্রভাবের কারণও বুঝিলাম। সারা জিলার মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা উকিল পাবলিক প্রসিকিউটর (পরে খান বাহাদুর) মৌ. মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের প্রিয় সহচর ছিলেন এই মজিদ স্যার। যে স্কুলেরই ছাত্র হউক, মুসলমান ছেলেরা তাঁকে এক ডাকে চিনিত। সবাই তাকে মান্য করিত এবং ভালবাসিত।

অল্পদিন মধ্যেই আমিও তার একজন ভক্ত অনুচর হইলাম। সাহিত্য সেবায় তাঁর প্রেরণা পাইয়াছিলাম অনেকখানি ত বটেই মযহাবী উদারতাও শিখিয়াছিলাম নিশ্চয়ই। কারণ কিছুদিন মধ্যেই আমি বুঝিতে পারিলাম মজিদ সারের উদারতা ও মহানুভবতার খাতিরেই বোধ হয় তহরিমা বাঁধিবার সময় হাত দুইটা বুকের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় ঠেলিয়া উঁচায় তুলিতে গিয়া কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকিত। মজিদ সারের উদার হাসিমাখা মুখ আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত। হাত দুইটা যেন অবশ হইয়া বুক হইতে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামিয়া আসিত।

### ১০. দাদাজীর উদারতা

এর পরেও মজিদ সারের উদারতা ও তার কথাগুলি আমার বুকে খোঁচাইয়া চলিল। এই মযহাবী কলহ মুসলমানদের আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এটাতে মুসলমানরা দুর্বল হইতেছে; মজিদ সারের এই কথাটা কি সত্য নয়? চিন্তা করিতে লাগিলাম। এত দিনে মনে পড়িল দাদাজীর মুখেও যেন এই ধরনের কথা শুনিয়াছি। দাদাজী উম্মী মানুষ, লেখা-পড়া জানিতেন না। কিন্তু তিনি জ্ঞানী ছিলেন। অনেক আলেম-ওলামা ও শিক্ষিত লোকও দাদাজীর জ্ঞান বুদ্ধির তারিফ করিতেন এবং জটিল-জটিল প্রশ্নে দাদাজীর উপদেশ মানিয়া চলিতেন। মজিদ সারের মত শিক্ষিতের ভাষায় ঐ সব কথা তিনি নিশ্চিয়ই বলেন নাই। কিন্তু তিনি যা বলিতেন মজিদ সারের কথার সাথে অর্থের দিক দিয়া তার আশ্চর্য মিল আছে। কথা ছাড়াও কাজে-কর্মে দাদাজী আশ্চর্য রকম উদার ছিলেন। দাদাজীও পাক্কা মোহাম্মদী ছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে হানাফী মযহাবের বড় কোনও আলেম

আসিলে তাকে জুম্মার বা ঈদের নামাজে এমামতি করিতে দিতেন। চাচাজী এতে ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু দাদাজী তাঁর মত অগ্রাহ্য করিতেন। শুধু শর্ত করিতেন, হানাফী মওলানা সাহেবকে কয়েকটি ব্যাপারে মোহাম্মদী মতে নামাজ পড়াইতে হইবে শুধু মুকতাদীদের সুবিধার জন্য। যথা : সুরা ফাতেহার শেষে কেরাত শুরু করিবার আগে মুকতাদীদেরে 'আমিন' বলিবার সময় দিয়া অল্প দম নিতে হইবে। প্রথম রেকাত হইতে দ্বিতীয় রেকাতে উঠিবার সময় বসিয়া লইতে হইবে। ঈদের জমাতে মোহাম্মদীদের মত সাত ও পাঁচ তকবির পড়িতে হইবে। ব্যস আর কিছু না। দাদাজী স্পষ্টই বলিতেন, ঐরূপ না করিলে মুকতাদীরা অসুবিধায় পড়িবে। মুকতাদীদের অসুবিধা না হয় এমনভাবে উক্ত হানাফী মওলানা সাহেব সব আরকান হানাফী মতেই পালন করিতে পারেন। যথা : বুকের উপর হাত না বাধিয়া নাভির নিচে বাঁধা এবং রফাদায়েন না করা। এমাম এটা করিলেন কিনা, তাতে মুকতাদীদের কিছু আসে যায় না।

দাদাজীর এই উদারতার জন্য হানাফী আলেমরাও দেশে-বিদেশে দাদাজীর নাম করিতেন। অবশ্য গোঁড়া মোহাম্মদীদের কেউ কেউ বলিতেন যে দাদাজী তাঁর এক হানাফী ভাগিনা মৌলবী লোকমান আলী সাহেবের খাতিরে ও প্রভাবে এইরূপ উদারতা দেখাইতেন।

সেটা ঠিক কিনা বলা যায় না। কিন্তু মৌলবী লোকমান আলী সাহেবও, যখন আমাদের জুম্মার এমামতি করিতেন, তখন মোহাম্মদী আরকানই মানিয়া চলিতেন। এমনকি, কট্টর হানাফী হইয়াও মৌ. লোকমান আলী আমাদের ঈদের মাঠে এমামতি করিতে গিয়া বার তকবিরে নামাজ পড়াইতেন।

১১. গোঁড়ামি ও আদব-লেহায

আরেকটা ব্যাপারে দাদাজীর উদারতা দেখিয়া ছেলেবেলা রাগ করিতাম, একটু বড় হইয়া গৌরব করিতাম ও অনুসরণ করিতাম। ভিন গাঁয়ে একদিন হানাফী আত্মীয় বাড়িতে আমাদের বাড়ির সকলেই দাওয়াত খাইতে গিয়াছিলাম। যিয়াফতটা বোধ হয় লিল্লার যিয়াফত ছিল। বোধ হয় সেই জন্যই খাওয়ার আগে মিলাদের মহফিল হইল। যথারীতি মিলাদ পড়া হইল। যথাসময়ে সকলে কেয়ামে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কেয়াম করাকে মোহাম্মদীরা কবিরা গোনাহ, অনেক শেরক মনে করিয়া থাকেন। প্রধানত এই কেয়ামের জন্যই মোহাম্মদীরা মিলাদের বিরোধী। অথচ দাদাজী সকলের সাথে সাথে কেয়ামে দাঁড়াইলেন এবং পাশে বসা আমাকেও হাত ধরিয়া টানিয়া খাড়া করিলেন। অদূরে বসা চাচাজী নিরুদ্বেগে বসিয়া রহিলেন।

যিয়াফত হইতে ফিরিবার পথে এই লইয়া দাদাজী ও চাচাজীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল। তার সব কথা আমার মনে নাই। কিন্তু দাদাজীর একটা কথা আজও আমার কানে বাজিতেছে। দাদাজী বলিয়াছিলেন : অন্য কারণে না হউক, আদবের খাতিরে দাঁড়ান উচিৎ। কোনও মজলিসে সবাই যখন দাঁড়াইল তখন এক-আধজনের বসিয়া থাকা বেয়াদবি।

দাদাজীর এই ধরনের উদারতার অর্থ মজিদ সারের সাথে মিশিবার পর আমার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি দ্বিধা-সন্দেহের মাঝে কাল কাটাইতে লাগিলাম। মজিদ সারের সংসর্গ ও আমাদের হোস্টেলের পরিবেশ আমাকে ক্রমে উদার করিয়া তুলিল। আমাদের হোস্টেলে সুপার

ছিলেন তৎসময়ের জিলা স্কুলের হেডমৌলবী মৌ. আলী নেওয়াজ সাহেব। তিনি মযহাবী কলহের বিরোধী ছিলেন। তা ছাড়া আঞ্জুমনে ওলামায়ে বাঙ্গলার দুইজন খ্যাতনামা আলেম আমাদের হোস্টেলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। একজন মওলানা খোন্দকার আহমদ আলী আকালুবী, অপরজন মওলানা মযাফফর উদ্দিন আহমদ। মওলানা মাফর উদ্দিনের বাড়ি ছিল ঢাকায়। তিনি আঞ্জুমনের প্রচার উপলক্ষে ময়মনসিংহ আসিলে আমাদের হোস্টেলে মেহমান হইতেন। আর মওলানা আকালুবী সাহেব ময়মনসিংহ জিলার লোক। তার সাতটি শ্যালক এক সঙ্গে এই হোস্টেলে থাকিতেন। তার মধ্যে একজন পরবর্তীকালে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন জাসটিস বদিউজ্জামান। যা হোক সাত শালার খাতিরেই হউক আর আঞ্জুমনের প্রচার উপলক্ষেই হউক তিনি প্রায়ই আমাদের হোস্টেলে আসিতেন। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মওলানা মো. আকরম খাঁ প্রভৃতি যারা আঞ্জুমনে ওলামার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, মওলানা আকালুবী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হানাফী-মোহাম্মদী মযহাবী কলহ দূর করা ছিল এই আঞ্জুমনের অন্যতম উদ্দেশ্য। মওলানা আকালুবী সাহেবের নাম আমরা অনেকেই আগে হইতে জানিতাম। তাঁর শুভ জাগরণ নামক কাব্যগ্রন্থ রাজদ্রোহ অপরাধে বাযেয়াফত হওয়ায় ইতিমধ্যেই তার নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুবক্তা হিসাবেও তাঁর খুবই খ্যাতি ছিল। তাকে চোখে দেখিয়া আরো খুশি হইলাম। দুধে আলতা গৌরবর্ণ সুডৌল চেহারা মুখ ভরা বিরাট চাপ দাড়ি, হাসি-মুখ, মিষ্ট ভাষা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করিল। তিনি ইসলামের সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে মযহাবী বিরোধের অযৌক্তিকতা আমাদেরে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি নিজে মোহাম্মদী। কিন্তু তার শ্যালকরা হানাফী এই খাতিরে তিনি উদারতা প্রচার করিতেছেন বলিয়া আড়ালে সিনিয়র ছাত্ররা হাসি-তামাশা করিলেও তার যুক্তিগুলির অকাট্যতা সকলেই স্বীকার করিতেন। ফলে আমাদের হোস্টেলের ভিতরে হানাফী-মোহাম্মদী মত-বিরোধটা আস্তে আস্তে নিভিয়া গেল। তার ফলে আমার মনেও উদারতা দেখা দিল। না দিলে চলে না। কারণ সবাই উদার। আমি একা অনুদার থাকিলে কেমন দেখায়?

### ১২. মযহাবী সংকীর্ণতা মরিয়াও মরে না

আমাদের জিলায় এই মযহাবী সংকীর্ণতা কতটা কায়েমী মোকররারী হইয়াছিল, তার প্রমাণ পাইয়াছিলাম উপরোক্ত ঘটনার পঁচিশ বছর পরে ১৯৩৭ সালে। তখন কৃষক-প্রজা আন্দোলন খুব জনপ্রিয়। ময়মনসিংহ জিলা কৃষক-প্রজা সমিতি সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। আমি এই সমিতির সেক্রেটারি। জিলার প্রজা আন্দোলনের আমি নেতা। বাংলা আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ মার্টির বিরুদ্ধে নির্বাচন যুদ্ধ করিতেছি। খান বাহাদুর শরফুদ্দীন, খান বাহাদুর নূরুল আমিন প্রভৃতি বড় বড় নেতা আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ। গরীব কৃষক প্রজা-কর্মী লইয়া এই সব ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি। আমি জিলার কৃষক প্রজা পার্টির নেতা বলিয়া লীগ পার্টির সোজাসুজি আক্রমণটা আমারই বিরুদ্ধে। আমার আয়নার অনেক কপি লীগ পার্টি হইতে ক্রয় করিয়া মুসলমানদের মধ্যে বিশেষত আলেম ও পীরদের মধ্যে বিতরণ করিয়া আমাকে মুসলমান ভোটারদের কাছে অপ্রিয় করা এবং তাতে পরোক্ষভাবে কৃষক প্রজা পার্টিকে দুর্বল করাই উদ্দেশ্য। কৃষক প্রজা পার্টির কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে বহু আলেম-ওলামা ছিলেন। তাহারা স্বভাবত আমার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এটা করিতে গিয়া আমাকে তারা পাক্কা মুসলমান বলিয়া চিত্রিত করিতেন এবং আয়নার লেখাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া নির্দোষ প্রমাণ করিতেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা লা-জবাব হইতেন। আমি তখন ঘোরতর বেনামাজি ছিলাম। ঘোরতর বেনামাজি

মানে আমি সভা সমিতিতেও নামাজ পড়িতাম না। বাড়িতে নামাজ পড় আর না পড় সভা সমিতিতে বিশেষত ইলেকশনী সভায় পলিটিক্যাল নামাজ পড়া পলিটিশিয়ানদের চিরদিনের নীতি। অন্তত এই কাজ করিতে আলেম বন্ধুরা অনেক দিন আমাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। আল্লার ডরেই যখন পড়ি না, তখন মানুষের ডরে পড়িব? এই বলিয়া অনেকবার মৌলবী সাহেবদেরে নিরস্ত করিলাম।

কিন্তু নান্দাইল থানার এক সভায় তা পারিলাম না। এখানে সংগ্রাম বড় কঠিন। মুসলিম লীগ প্রার্থী ডিবি চেয়ারম্যান খান বাহাদুর নূরুল আমিন। আর তার মোকাবিলায় আমাদের প্রার্থী গরীব প্রাইমারী মকতবের শিক্ষক আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী। সেদিনকার মিটিংটা হইবে নূরুল আমিন সাহেবের হোম থানা নান্দাইলের আলেম-প্রধান জায়গা শাহগঞ্জে। এই অঞ্চলের কৃষক প্রজা আন্দোলনের প্রধান নেতা মওলানা বোরহান উদ্দিন কামালপুরী আমাকে আগেই জানাইয়াছিলেন, এই একটি গ্রামেই ত্রিশজনের বেশি মাদ্রাসা-পাশ ও দেওবন্দ-পাশ মওলানা আছেন। এঁরা যেদিক সমর্থন করিবেন, নির্বাচনে তাদের জিত অবধারিত। এই মিটিংয়ের উদ্যোক্তারাও সকলেই মৌলবী-মওলানা। কাজেই এঁরা আগেই আমাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখানকার সভায় আমাকে নামাজ পড়িতেই হইবে। নইলে নির্বাচনে আমাদের চান্স অন্ধকার।

উদ্যোক্তা মওলানা সাহেবরা আমার সম্মতির অপেক্ষা করা নিরাপদ মনে করেন নাই। আমার শাসনভার তাঁরা নিজেদের হাতেই নিয়াছিলেন। সভাস্থলে আসরের আওয়াল ওয়াকতে পৌঁছিলাম। গিয়াই দেখিলাম সভামঞ্চের অদূরে আমার অযুর জন্য এক বদনা পানি, একটা জলচৌকি ও একখানা তোয়ালিয়া রাখা হইয়াছে। প্রধান উদ্যোক্তা মওলানা সাহেবের দিকে চাহিলাম। তিনিও হাসিলেন, আমিও হাসিলাম। চোখ ইশারায় জানাজানি হইয়া গেল, আজ আর ছাড়াছাড়ি নাই। কোনও অজুহাতেরই সম্ভাবনা বা ঘেঁদা রাখা হয় নাই। তখন মোটামুটি জনতা বেশ বড় হইয়াছে। কজন আযান দিতে লাগিলেন। তিনজন মওলানা আমাকে অযু করিতে বলিয়া ঘাড়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলেন যেন আমি ফাঁক পাইলেই পালাইব। আমি মোহাম্মদী কায়দায় ধীরে ধীরে অযু করিতে লাগিলাম। তাতে বেশ দেরি হইতে লাগিল। ওদিকে নামাজের কাতার খাড়া হইয়া গেল। ঐ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্যেষ্ঠ আলেম এমামরূপে দাঁড়াইয়া গেলেন। আমার পাহারা-বন্ধুদের তিন-চারটা তাগাদায় আমি অবশেষে যখন অযু শেষ করিলাম, তখন নামাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলের পিছনের কাতারে দাঁড়াইলাম। মওলানা বন্ধুরা আমার দুই পাশে দাঁড়াইলেন আমি যাতে কাতার হইতে ভাগিয়া না যাই। আমি পাক্কা মোহাম্মদী কায়দায় দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইলাম। দুই হাত চিৎ করিয়া কাঁধ পর্যন্ত তুলিলাম এবং সিনা টান। করিয়া বুকের উপর তহরিমা বাধিলাম। আর কথা নাই! দুই পাশের দুই আলেম বন্ধু নিজেরা নিয়ত ছাড়িয়া দিলেন। আমার তহরিমা বাঁধা হাত দুইটা সজোরে টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং আমাকে টানিয়া পার্শ্ববর্তী ঝোঁপের একটা গাছতলায় নিয়া আসিলেন। হাঁপাইতে-হপাইতে বলিলেন : আপনে যে ও জিনিস, তা জানিতাম না। আপনার আর নামাজ পড়িবার দরকার নাই। এইখানে বসিয়া আপনি বিড়ি খাইতে থাকেন। আমরা একটা অজুহাত দিয়া দিব।

তাঁরা নিশ্চয়ই ভাল অজুহাত দিয়াছিলেন। কেউ আমার নামাজ না পড়ার খোঁজও করিলেন না। খুব ভাল ও সফল মিটিং হইল। আমার বক্তৃতা খুব জমিল। মগরেবের পরেও অনেকক্ষণ বক্তৃতা করিলাম। মগরেবের নামাজও আমার পড়িতে হইল না।

## ১৩. আমার জবাব

সভা তুখার জমিয়াছিল। আমার বক্তৃতাও খুব জোরদার হইয়াছিল। প্রমাণ, নির্বাচনে ঐ অঞ্চলে ভোট অনেক বেশি পাইয়াছিলাম। যা হোক, সভা শেষে মওলানা সাহেবরা আমাকে স্টেশন পর্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিলেন এবং আমার টিকেটসহ নিজেদেরও টিকেট কাটিলেন। ময়মনসিংহ শহরে আমার বাসা পর্যন্ত আসিলেন। সারা রাস্তায় একটা কথাও বলিলেন না।

অত রাত্রে চারজন মেহমানের খানা বাসায় ছিল না। কাজেই বিবি সাহেব আমাদেরে চা দিয়া রান্নায় লাগিলেন। চা খাওয়া শেষ হইল। আমি হুঁক্কা টানিতে লাগিলাম। মওলানা সাহেবরা যেন কত বড় গোপন কথা বলিতেছেন, এমনিভাবে অত রাত্রেও একবার দরজার দিকে একবার জানালার দিকে চাহিলেন। তারপর একাধিকবার গলা কাশিয়া একজন বলিলেন : উকিল সাহেব, আমাদের বে-আদবি মাফ করিবেন, কিছু মনে করিবেন না। আপনার মত এক বড় জ্ঞানী-গুণী, এত বড় সাহিত্যিক, জনসাধারণের এত বড় নেতা লা-মযহাবী, এটা যে আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

আমি এক-এক করিয়া সকলের মুখের দিকেই তাকাইলাম। সত্যই ভদ্রলোকদের মুখে বিষাদের ছায়া। কত বড় ব্যথাই না তাঁরা পাইয়াছেন। আমিও তাদের বিষাদের অনুকরণে মুখ বিষণ্ন করিয়া বলিলাম : আপনাদের চোখকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। আমি সত্যই লা-মযহাবী। এতে কি আমার প্রতি আপনাদের আস্থা কমিয়া গেল? আমার কথা বাদ দেন, কৃষক-প্রজা আন্দোলনের প্রতি আপনাদের দরদ এর পরেও থাকিবে ত? আমার অপরাধে আপনারা কৃষক প্রজা পার্টি ছাড়িবেন না ত?

ভদ্রলোকেরা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না। প্রায় মিনিটখানেক পরে তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় জন খুব গোছাইয়া মিষ্টি ভাষায় বলিলেন : আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না। আমরা অতটা ফ্যানাটিক নই। কিন্তু এটা জানাজানি হইয়া গেলে ত আর রক্ষা থাকিবে না।

আমিও সমান উদ্বেগ দেখাইয়া বলিলাম : এখন উপায় কী?

ভদ্রলোকেরা কোনও জবাব দিলেন না। একদৃষ্টে করুণ চোখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অগত্যা আমি বলিলাম : এর মাত্র দুইটা উপায় আছে। একটা, আমার মোহাম্মদী মযহাব ছাড়িয়া হানাফী মাযহাব এখতিয়ার করা। এটা আমি পারি না। কারণ আমি বিশ্বাস করি, পৈতৃক ধর্মই মানুষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ধর্মের খুঁটি। এটাকে নৌকার নঙ্গর বলিতে পারেন। ইংরাজিতে এটাকে মুরিং বলা হয়। এই খুঁটি একবার ফসকাইলে কোনও ধর্মের ঘাটেই আপনি স্থায়ী হইতে পারিবেন না। যে পৈতৃক হানাফী মত ছাড়িয়া মোহাম্মদী বা মোহাম্মদী মত ছাড়িয়া হানাফী হইতে পারে সে ইসলাম ছাড়িয়া খৃষ্টধর্ম, খৃষ্টধর্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধধর্ম এবং সব ধর্ম ছাড়িয়া মানবধর্মও গ্রহণ করিতে পারেন। তার চেয়ে বরঞ্চ আল্লা আপনারে যে ধর্মে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ধর্মে থাকিয়াই ধর্ম সাধনা করুন না। আল্লা আপনাকে খারাপ জায়গায় পয়দা করিয়াছেন, আল্লার প্রতি এই অবিশ্বাস কেন হইবে আপনার? তিনি কি ভুল করিতে পারেন? তিনি যে আলেম-উল-গায়েব, তিনি যে অন্তর্যামী। তিনি যে দেশে যে ধর্মে আপনারে পয়দা করিয়াছেন, সেখানেই আপনার কর্তব্যও রাখিয়াছেন। এটা

আমি বিশ্বাস করি। কাজেই ভাই সাহেবান, আপনারা বুঝতেছেন, আমার পক্ষে বাপের মযহাব ছাড়া সম্ভব নয়। কাজেই আমি দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছি। এই জিলার পঞ্চাশ লক্ষ মুসলমান কৃষক-প্রজার মধ্যে চল্লিশ লক্ষই হানাফী। আপনারা বলিয়াছেন, কৃষক-প্রজা আন্দোলনের নেতা লা-মযহাবী, এটা জানাজানি হইয়া গেলে আর রক্ষা থাকিবে না। তাই আল্লার সাথে আমার একটা ফয়সলা হইয়া গিয়াছে। আমি নামাজ পড়িলে কৃষক-প্রজা আন্দোলনের, তার মানে এ জিলার পঞ্চাশ লক্ষ, তথা বাংলার চার কোটি কৃষক-প্রজার মুক্তির আন্দোলনে ব্যাঘাত হইবে। অতএব আল্লার অনুমতি লইয়া আমি ঠিক করছি আমি নামাজ না পড়িয়া দুখেই যাব। নিজের একার বেহেশতের জন্য কোটি কোটি লোকের অনিষ্ট হইতে দিব না।

মওলানা সাহেবদের সবারই চোখ পানিতে ছলছল করিয়া উঠিল, আমারও। একজন চেয়ার ছাড়িয়া আমার দিকে আগাইলেন। আমার পায়ের দিকে হাত বাড়াইলেন। আমি পা সরাইয়া নিলাম। তিনি কদমবুছির ভঙ্গিতে নিজের মুখে বুকে হাত লাগাইয়া বলিলেন : আপনে পীর-মুর্শেদ, আপনের বাতেনি নামাজ আল্লার দরবারে কবুল হইয়া গিয়াছে। যাহেরি নামাজের আপনের দরকার নাই।

আমি সবিনয়ে বলিলাম : আমার সম্বন্ধে মুবালেগা করিয়া আমারে আরো বেশি গোনাগার করিবেন না। শুধু দোওয়া করিবেন, আল্লাহ যেন আমার ঈমান শক্ত রাখেন।

মওলানা সাহেবরা সত্য-সত্যই হাত উঠাইয়া দোওয়া করিলেন।

## ০৮. গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া

## অধ্যায় আট - গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়া

### ১. উদারতার ক্রমপ্রসার

আগের অধ্যায়ের শেষ দিকে যেসব ঘটনার কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি ছাত্রজীবনের পরে কর্মজীবনের কথা। এখন ছাত্রজীবনেই আবার ফিরিয়া যাই। মজিদ সারের সংশ্রব আমার গোঁড়ামির বরফে উদারতার উত্তাপ লাগাইয়া দিল। আমার গোঁড়ামি প্রথমে আস্তে আস্তে ও পরে দ্রুত গলিতে লাগিল। অবশেষে গোঁড়ামির জায়গা উদারতা দখল করিল।

উদারতার বুক প্রশস্ত ও বাহু লম্বা। সে বুকে একজনকে নিতে পারিলে আরেকজনকেও নিতে হয়। সে বাহু একজনকে জড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকে না। দশজনকে ধরিতে চায়। মজিদ সারের উদারতার ছোঁয়াচে আমার মন যখন আমার এতদিনের দুশমন হানাফীকে ভালবাসিতে পারিল, তখন উদারতা ও ভালবাসার পরিধি আর একটু বাড়িয়া অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়কেও ভালবাসিতে পারিবেন না কেন?

আমার মনও তা পারিল। প্রথমে ব্রাহ্ম, তারপর খৃষ্টান ও তারও পরে হিন্দুকে সে উদারতার পরিধির মধ্যে জায়গা দিল। উক্ত ক্রমে পরিধি বাড়িল কেন, সে কথাই এখন বলিতেছি। ব্রাহ্মরা এক খোদা মানে, লোকমুখে এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদের সভায় বক্তৃতা শুনিতে যাইতে লাগিলাম। ময়মনসিংহ স্টেশন রোডে গাঙ্গিনার পাড়ে এখন ব্রাহ্মমন্দির নামে যে দালানটি আছে এবং যাতে বর্তমানে ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল চলিতেছে, এটি তখনও ছিল এবং সত্যই ব্রাহ্মমন্দির ছিল। সেখানে প্রতি সপ্তাহেই সভা হইত। বিশেষ করিয়া মহোৎসবের সময় কলিকাতা হইতে বড় বড় নামকরা বক্তা আসিতেন। এঁদের বক্তৃতা কখনও আমি বাদ দিতাম না। এঁদের মধ্যে সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা আমার মনে আছে। কৃষ্ণকুমার বাবুর বক্তৃতা আমার খুব পছন্দ হইয়াছিল। বোধ হয় এই সময়েই কৃষ্ণকুমার বাবুর মোহাম্মদ চরিত পড়িয়াছিলাম।

### ২. ডা. বিপিন বিহারী সেন

ডা. বিপিন বিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ব্যানার্জী তখন ব্রাহ্ম সমাজের দুই প্রধান ছিলেন। ক্লাস সেভেনে পড়িবার সময় যখন সেহড়া কাঁঠাল লজে' থাকিতাম তখন এই দুই ভদ্রলোকের সাথে প্রায়ই দেখা হইত। তাঁদের বাড়ির সামনে দিয়াই আমাদের স্কুলে যাতায়াতের পথ ছিল। ডা. বিপিন সেন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। মনোরঞ্জন বাবু সিটি স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিলেন। ডাক্তার বাবুর বাগানওয়ালা বিরাট বাড়ি ছিল। সেই বাগানে ডা. সেন ও মিসেস সেনকে প্রায়ই দেখিতাম। রাস্তার পাশের ডুয়ার্ক ওয়ালের উপর দিয়া তাঁদেরে দেখা যাইত। বাগানে দাঁড়াইয়া ডাক্তার বাবু স্কুলে-গমনরত আমাদের কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁর মুখ সব সময় হাসি-হাসি থাকিত। কাজেই রোজ দেখা হইলেই আদাব দিতাম। তিনি ত আদাব লইতেনই। মিসেস সেনও আমাদের আদাব লইতেন। প্রথম প্রথম অবশ্য আমি ডাক্তার বাবুকে উদ্দেশ্যে করিয়াই

আদাব দিতাম। বেগানা আওরতকে আদাব দেওয়া বা তার দিকে চোখ তুলিয়া চাওয়া আমাদের কল্পনার বাহিরে ছিল। বিশেষত ঐ সময়ে মিসেস সেন ছাড়া আর কোনও মেয়েলোককে বাহিরে দেখি নাই। কাজেই মিসেস সেনের দিকে চোখ তুলিয়া চাইতে শরম লাগিত। কিন্তু ডাক্তার সেনকে আদাব দেওয়ার সময় তিনিও যেভাবে আমাদের আদাব নিতেন, তাতে আস্তে আস্তে আমার লজ্জা কাটিয়া গেল। তখন মিসেস সেনকে একা দেখিলেও আদাব দিতাম। তিনি হাসি মুখে হাত তুলিয়া আদাব নিতেন। কিন্তু কথা বলিতেন না। সে সময় ব্রাহ্ম মেয়েরাও ব্রাহ্মমন্দিরের সভায় যাইতেন। মিসেস সেনও যাইতেন। মেয়েদের বসিবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। মিসেস সেনও সেখানে বসিতেন। তবু গেটে বা রাস্তায় মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা হইয়া গেলে, সেখানেও তাঁকে আদাব দিতাম। এইটুকু পরিচয়েই মহিলাকে আমার এত ভাল লাগিয়া ছিল যে, এর পর মাত্র কয়েক মাস পরে যখন মিসেস সেনের মৃত্যুসংবাদ পাইলাম, তখন নিজের অজ্ঞাতে আমার চোখে পানি আসিয়া পড়িয়াছিল। ডা. ও মিসেস সেনের প্রতি শ্রদ্ধাহেতুই হউক, আর কৃষ্ণবাবুর বক্তৃতা শুনিয়াই হউক, অথবা কৃষ্ণবাবুর মোহাম্মদ চরিত পড়িয়াই হউক, আমি ব্রাহ্মদের প্রতি বেশ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। এই সময় গিরিশ সেনের বঙ্গানুবাদ কোরআন ও অপসমালা পড়িয়া সে আকর্ষণ আরো বাড়িল। হোস্টেলেও স্কুলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তর্ক করিতে গিয়া আমি ব্রাহ্মগণকে মুসলমান বলিয়া দাবি করিতাম। নিজের মতে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য চাচাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। চাচাজী হানাফীদের প্রতি নিষ্ঠুর হইলেও অমুসলমানদের প্রতি খুবই উদার ছিলেন। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিলেন : শুধু ব্রাহ্ম বৈলা নয়, যেকোনো লোক আল্লার ওয়াহাদানিয়াত (একত্ব) স্বীকার করে, সেই মুসলমান। চাচাজীর মত পাইয়া আমি এ বিষয়ে আরো শক্তিশালী হইলাম।

৩. খৃষ্টান

হযরত ঈসা পয়গাম্বরের উম্মত বলিয়া এই সময় খৃষ্টানদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ে। ময়মনসিংহ রেলস্টেশনের গেটের পাশে এখনও যে 'গসপেল হল' আছে সেখানে প্রতি রবিবার প্রার্থনা ও বক্তৃতা হইত। প্রতি সন্ধ্যায় হলের সামনে টুলের উপর দাঁড়াইয়া মিশনারীরা বক্তৃতা করিতেন। রোজ এঁদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য আসিতাম কিন্তু এঁদের বক্তৃতা ভাল লাগিত না বলিয়া বেশিক্ষণ থাকিতাম না। কিন্তু যেদিন ইংরাজ পাদরি বক্তৃতা করিতেন, সেদিন বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতাম। বক্তৃতা ভাল লাগিত বলিয়া নয়। ইংরাজ সাহেব বাংলায় বক্তৃতা করিতেছেন, তাই শুনিবার জন্য। ওদের মুখে বাংলা কথা আমার বড় ভাল লাগিত।

কিন্তু একবার এক খৃষ্টান পাদরির বক্তৃতা সত্যই ভাল লাগিয়াছিল। ইনি ছিলেন রেভারেন্ড ফাদার এ ডি খা। ইনার বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল টাউন হলে। এই উপলক্ষে টাউন হল বিশেষভাবে সাজান হইয়াছিল। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, জিলা জজ ও পুলিশ সাহেব প্রভৃতি সমস্ত ইংরাজ কর্মচারী এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। তা ছাড়া শহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোকও উপস্থিত ছিলেন। রেভারেন্ড ফাদার এ ডি খা টাঙ্গাইল মহকুমার এক মুসলমান ভদ্র পরিবারের লোক। তাঁর নাম আলাউদ্দিন খাঁ। তিনি ছেলেবেলায় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় প্রতিভা বলে খৃষ্টান ধর্মযাজক সমাজে এত উন্নতি করেন। গসপেল হল হইতে বিজ্ঞাপন আকারে আগেই এ সব খবর প্রচার করা হইয়াছিল বলিয়া আমি প্রবল আগ্রহে এই সভায় যোগদান করি। হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। ছাত্রদের দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতে হইল। আমিও দাঁড়াইয়াই শুনিলাম। তিনি অবশ্য বেশিক্ষণ বক্তৃতা করিলেন

ইংরাজিতে। ইংরাজি বক্তৃতা আমি তেমন ভাল বুঝিলাম না। কিন্তু বাংলায় তিনি যতটুকু বলিলেন, তা আমার খুব ভাল লাগিল। তিনি অন্যান্য মিশনারীর মত অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়াই শুধু খৃষ্টান ধর্মের গুণাবলি বয়ান করিলেন।

এই সব নাম করা লোকের বক্তৃতা শুনিয়া শুনিয়া আমার ক্রমেই মনে হইতে লাগিল সব ধর্মের মধ্যেই অল্প-বিস্তর সত্য ও সৌন্দর্য রহিয়াছে। এই ধারণা পল্লবিত হইয়া শেষ পর্যন্ত আমার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী মত দেখা দিল। সব ধর্মের সত্য আছে, সব ধর্মই মানুষের কল্যাণ চায়। তবু কেন এক ধর্ম আরেক ধর্মের নিন্দা করে? তবু কেন এক ধর্ম আরেক ধর্মকে মিথ্যা বলে? ধর্মে ধর্মে কেন এই বিরোধ? মানুষের কল্যাণ করার মত পবিত্র কাজ করিতে গিয়াও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন? এটা ত নিতান্ত ব্যবসাদারের মত কাজ।

৪. নামাজ-রোযার শিথিলতা

যখন আমার মনে ধর্ম সম্পর্কে এই আলোড়ন চলিল, তখন নামাজ-বন্দেগিতে আমার আর উৎসাহ থাকিল না। আস্তে আস্তে নামাজ-রোযা ছাড়িয়া দিলাম। টুপি ফেলিয়া দিলাম। যাত্রা-থিয়েটার দেখিতে লাগিলাম। গান-বাজনা শুনিতে থাকিলাম। এই পরিবর্তন আমার মধ্যে এত তাড়াতাড়ি হইয়া গেল যে, আমার সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধবরা অবাক হইয়া গেল। কিন্তু বাড়িতে মুরুব্বিরা। আমার এই পরিবর্তন টের পাইলেন না। দাদাজী তখন এন্তেকাল করিয়াছেন। সুতরাং তাঁর ভয় নাই। বাপজীও দাদাজীর মতই উদার, তাঁকেও ভয় নাই। শুধু চাচাজীকেই সবচেয়ে ভয় পাইতাম। কিন্তু ভয়ে নয়, মুরুব্বিদের প্রতি বিশেষত বাপ-মার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমি বাড়িতে আমার মুসল্লী মুত্তাকিগিরি পুরামাত্রায় বজায় রাখিলাম। বাপজী-মার, বিশেষ করিয়া মার মনে কষ্ট দেওয়া আমার কল্পনারও বাহিরে ছিল। আমি এটা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারিতাম না। তারা মনে কষ্ট পাইবেন, শুধু এ ভয়েই আমি বাড়িতে এসব করিতাম। শহরে যে আমি নামাজ-রোযা করিতাম না, এ খবর যাতে বাপজী ও মার কানে না যায়, সেদিকে সতর্ক থাকিতাম। গ্রীষ্ম ও পূজার লম্বা ছুটিতে সহপাঠী ও অন্যান্য বন্ধুদের বাড়িতে দল বাঁধিয়া বেড়ান তৎকালে ছাত্রদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল। এই উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে যেসব ছাত্র বন্ধু বেড়াইতে আসিত তাদেরে আগে হইতে আমি সাবধান করিয়া দিতাম।

এইভাবে কিছুকাল চলিবার পর আমি যখন আইএ পড়িবার জন্য ঢাকায়। আসিলাম, তখন আমি পুরামাত্রায় বে-নামাজি হইয়া গিয়াছি। আইএ পড়াকালে আমি যখন হাকিম আরশাদ সাহেবের বাড়িতে যায়গীর থাকিতাম, তখন রাতে শুইতাম চুড়িহাট্টা মসজিদে। মসজিদের একটি কামরায় আমার বিছানাপত্র ও বাক্স-আদি থাকিত। বই-পুস্তক যদিও থাকিত হাকিম সাহেবের বাড়িতে, কিন্তু কার্যত আমি মসজিদেরই একজন বাসিন্দা। তবু আমি এক ফযর ছাড়া অন্য ওয়াকতের নামাজ পড়িতাম না। ফযরটা না পড়িয়া উপায় ছিল না।

জগন্নাথ কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন বাবু উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি আইএতে আমাদের লজিক পড়াইতেন। তাঁর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোনা মহকুমায়। এই খাতিরে আমি তার কাছে ভিড়িয়া পড়িলাম। তাঁর ক্লাসে ভাল করিলাম। তিনি সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর লেখা দার্শনিক প্রবন্ধটি মাসিক কাগজে ছাপা হইতে আগেই দেখিয়াছি। আমার কয়েকটা লেখা ইতিপূর্বেই

মাসিক কাগজে বাহির হইয়াছে। আমি কলেজে শুধু 'আহমদ' বলিয়া উমেশ বাবু অবশ্য সে খবর রাখিতেন না। আমি নিজেই একদিন তাঁকে জানাইয়াছিলাম। এই সব কারণে উমেশ বাবু আমাকে একটু বিশেষ খাতির করিতেন। আমি লজিকের পাঠ্যবই ডিঙ্গাইয়া দর্শনের বই পড়িতে শুরু করি। জন স্টুয়ার্ট মিল, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন দত্ত, ব্রজেন শীল, এ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি দার্শনিক লেখকের লেখা এই সময় আমি খুব পড়িতাম এবং মাঝে মাঝে উমেশবাবুর কাছে বুঝিতে যাইতাম। এইভাবে উমেশ বাবু আমার মধ্যে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ করেন এবং আমার মনকে সংস্কারমুক্ত করিয়া তুলেন।

৫. কবর-পূজা

'নামাজ পড় আর না পড়, পীর মানিতেই হইবে' এই ধরনের মতবাদ তখন হানাফী সম্প্রদায়ের এক অংশে খুবই চালু ছিল। আমরা মোহাম্মদীরা এমনিতেই পীর মানি না, তার উপর আমি সম্প্রতি ধর্মের সত্যতায়ই সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি। কাজেই এই সময়কার আমার মতবাদ হানাফী জনসাধারণের, এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও সহ্য করিবার কথা নয়। আমার এই মতবাদ কাজেই একবার আমাকে বিপদে ফেলিয়াছিল। আমি হাকিম আরশাদ সাহেবের বাড়িতে যায়গীর থাকাকালে আলিমুদ্দীন সাহেব নামক জনৈক শিক্ষকের নেতৃত্বে একবার নৌকাভ্রমণে যাই। ছাত্র-বন্ধুদের মধ্যে মি. রেজাই করিম তার এক ভাই আবদুল করিম, মি. ইউসুফ সালাহউদ্দিন তার ভাই সালেহউদ্দিন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৌকাভ্রমণ উপলক্ষে নদীর ধারে অবস্থিত মিরপুরে পীরের দরগা যিয়ারত করা হয়। আমি যিয়ারত করি। যিয়ারত শেষ করিয়া নৌকায় ফিরিয়া বন্ধুরা পীর সাহেবের কাছে কে কী মুকসেদ চাহিয়াছেন, তার খবর-পুরসি শুরু করেন। সকলেই যার-তার মুকসেদের কথা বলেন। কিন্তু আমি কিছু বলি না। কাজেই আমাকে সবাই ধরেন, আমি কি চাহিয়াছি বলিতে হইবে। সকলের পীড়াপীড়িতে আমি বলিলাম : 'পীর সাহেবের গোনা-খাতা মাফ করবার লাগি আল্লাহর দরগায় মুনাজাত করছি। আমার এই কথা শুনিয়া সকলে ত আমাকে মারে আর কি? পীর সাহেবের শানে এত বড় কথা! তাঁর গোনা-খাতা? সকলেই ভদ্র বংশের ভদ্রলোকের ছেলেপিলে। কাজেই সত্য-সত্যই আমাকে মারপিট করিলেন না। কিন্তু ঐ বেতমি কথা প্রত্যাহার করিবার জন্য জিদ করিলেন। আমি প্রত্যাহার করিলাম না। বরঞ্চ নিজের উক্তির সমর্থনে বলিলাম : এই যে আপনারা আল্লার কাছে মকসুদ চাইয়া পীর সাহেবের নিকট চাইলেন, এই যে পীর সাহেবের মাজারে মাথা কুটিয়া দৈনিক হাজার লোক শেরক করিতেছে, এই যে পীর সাহেবের কবর যিয়ারতের ওসিলায় হররোজ আল্লার হুকুমের বরখেলাফ করিতেছে, তাতে লোকেরার ত গোনাহ হইতেছেই, পীর সাহেবেরও হইতেছে। যার কবরে এমন শেরেকি হয়, আল্লার দরগায়ে তিনিও নিশ্চয়ই গোনাগার। তাই আমি পীর সাহেবের মাগফেরাত চাহিয়া মোনাজাত করিয়াছি।

আমার জবাবে বন্ধুরা স্তম্ভিত হইলেন। মেহেরবানি করিয়া তাঁরা আমাকে নৌকা হইতে ফেলিয়া দিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া নৌকা ফিরাইতে মাল্লাকে আদেশ দিলেন। আমার সাহচর্যে তারা যেন আর এক মুহূর্ত থাকিতে রাজি ছিলেন না। বাকি পথ তারা আমার সাথে কোনও কথা বলিলেন না। হাকিম সাহেবের কাছে আমার এই ধর্মবিরোধী বতমিজির খবর পৌঁছিল। আমার যায়গীর উঠাইয়া দিবার চাপ তার উপর পড়িল।

কিন্তু হাকিম সাহেব জানিতেন আমরা মোহাম্মদী। তিনি বহুদিন আগে হইতেই আমাদের গ্রামে যাতায়াত করিতেন। আমাদের গ্রামের অনেকেরই তিনি চিকিৎসা করিয়াছেন। গ্রামের বিভিন্ন মাতব্বরের বাড়িতে তিনি। একনাগাড়ে সপ্তাহের বেশি সময় থাকিয়াছেন। কাজেই তার কাছে এটা জানাই ছিল যে আমি ও আমার আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী সকলেই গোড়া মোহাম্মদী এবং আমরা পীর-পূজা, গোর-পূজার ভয়ানক বিরোধী। কাজেই হাকিম সাহেব ঐ চাপে টলিলেন না। তিনি শুধু গোপনে আমাকে উপদেশ দিলেন একটু সাবধানে কথাবার্তা বলিতে।

৬. পীর-পূজা

একশ্রেণীর মুসলমানের পীরভক্তি এই সময় এমন চরম সীমায় উঠিয়া ছিল যে, উহা স্পষ্টতই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিরোধী। এই শ্রেণীর মুসলমানের কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে আল্লার পানা না চাহিয়া পীর সাহেবদের পানা চাহিতেন। যেমন তারা 'ইনশাহ আল্লাহ এই কাজ করিব', 'খোদার ফযলে ভালই আছি', 'আল্লার মর্জিতে এটা হইয়াছে, ইত্যাদি না বলিয়া হুযুর পাকের ইচ্ছা হইলে এ কাজ করিব', 'হুযুর কেবলার মেহেরবানিতে ভালই আছি', 'খাজাবাবার দোওয়াতে এটা হইয়াছে' ইত্যাদি বলিতেন। মোট কথা, এঁরা যার-তার পীর সাহেবদেরে দিয়া আল্লার জায়গা দখল করাইয়াছিলেন। এই পীর-পূজার চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম, এস এম হোস্টেলে থাকিবার সময়। আমার পাশের রুমেই চাঁদপুরের একজন ছাত্র থাকিতেন। আইএ সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। বয়স আঠার-উনিশ। চেহারা-ছবিতে এবং চাল-চলনে ভদ্র পরিবারের ছেলে। রোজ সকালে তার খোশ-ইলহানের কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গিত। কোনও কারণেই তার এই কোরআন তেলাওয়াত কামাই হইত না। অথচ এই ভদ্রলোক নামাজ পড়িতেন না। নামাজ আমিও পড়িতাম না। আলসামি করিয়া পড়িতাম না, তা নয়। নামাজ পড়ার আমি বিরোধীই ছিলাম। ছাত্র-বন্ধুদের মধ্যে নামাজের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতাম। সে জন্য কলেজের আরবির প্রফেসার এবং হোস্টেল সুপার অধ্যাপক এ এম আসাদ সাহেবের কাছে কয়েকবার ধমক খাইয়াছি। কিন্তু নামাজবিরোধী প্রচার বন্ধ করি নাই। কাজেই কথিত ভদ্রলোকের নামাজ না পড়ায় আমার খুশি হইবার কথা। কিন্তু খুশি হওয়ার বদলে আমি দুঃখিত হইলাম। যিনি কোরআন তেলাওয়াত করিবেন, তিনি নামাজ পড়িবেন না কেন? রোজ নিয়মিতভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার মত দৃঢ় ধর্ম-বিশ্বাস যার, আলসামি করিয়া তিনি নামাজ তরক করিবেন, এটা আমার বরদাশত হইল না। আলসামিকে আমি দুচক্ষে দেখিতে পারিতাম না।

কাজেই আমি তাঁকে তাঁর এই আলস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। এবং তাঁর জবাবের অপেক্ষা না করিয়া আলসামির নৈতিক ও দৈহিক কুফল বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা শুরু করিয়া দিলাম। বক্তা, সাহিত্যিক উপরের ক্লাসের ছাত্র বলিয়া ভদ্রলোক আমাকে সম্মান করিতেন। কাজেই আমার কথায় তিনি চোখে-মুখে বাধা দিলেন না। আমি আমার কথার মাঝে একটু দম নিতেই তিনি বলিলেন : কিন্তু আমি ত আলসামি কইরা নামাজ তরক করি না। নামাজ আমার লাগি ফরযই হৈছে না।

আমার কানকে আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। এই আঠার-উনিশ বছরের যুবকের জন্য নামাজ ফরয হয় নাই? আমি কি ভুল শুনিলাম? সন্দেহ নিরসনের জন্য আবার বলিলাম : কী কইলেন?' যুবক তার কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। আমি বলিলাম, সাত বছর বয়স হোতেই যে নামাজ ফরয হয়।

যুবক কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিলেন : জি হাঁ সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার নামাজ যে আল্লার দরগায় কবুল হৈব না।

আমি আরো বিস্মিত হইয়া বলিলাম : কেন? আপনার অপরাধ?

যুবক বিনা-সংকোচে বলিলেন : আমি যে আজও পীরের মুরিদ হৈতে পারি নাই।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। মুরিদ না হইতে পারার কারণ সম্বন্ধেও যুবক আরো কিছু বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে সব কথা আমার কানে ঢুকিল না। আমি নিজের কাজে চলিয়া গেলাম। অনেক দিন আমার মন হইতে এই চিন্তা দূর হইল না। হায়, পুতুল-ভাঙ্গা ইসলামের এই দুর্দশা মুসলমানেরই হাতে?

৭. ধর্ম-মত বনাম চরিত্র

কিছুদিন আগে হইতেই আল-ইসলাম নামক বাংলা মাসিক ও ইসলামিক রিভিউ ও রিভিউ-অব-রিলিজিয়ন নামক ইংরাজি মাসিক কাগজ নিয়মিত পড়িতে শুরু করিয়াছি। এই সব কাগজে বড় বড় পণ্ডিত ও আলেম লেখকের লেখার মধ্যে একটি কথা আমার খুব পছন্দ হইয়াছিল। সেটা এই যে সব ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই ইসলামের আসল শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। মুসলমানদের কাজকর্ম, চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র যে আমাদের ভাল লাগে না, তার জন্য ইসলাম দায়ী নয়, দায়ী আমাদের ভুল ব্যাখ্যা।

কিন্তু বেশিদিন এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলাম না। প্রথমত সব ধর্মের পক্ষ হইতেই এ ধরনের কথা বলা হইতেছে। দ্বিতীয়ত ভয়ানক ধার্মিক, ভয়ানক শরিয়তের পা-বন্ধ, সাংঘাতিক নামাজি লোককেও আদর্শ চরিত্রবান, সত্যবাদী ও পরোপকারী হইতে দেখি না কেন? তৃতীয়ত হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানদের মধ্যে এমন আদর্শ চরিত্রবান সত্যবাদী ও স্বার্থত্যাগী লোক দেখিয়াই শুধু মুসলমান নন বলিয়াই তারা বেহেশতের বদলে দোযখে যাইবেন, এই কথাটা কিছুতেই আমার মন মানিত না। ময়মনসিংহের ডা. বিপিন সেনের মত ত্যাগী ও পরোপকারী ব্রাহ্ম, আমার অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত হিন্দু ও আমার অধ্যাপক মি. ল্যাংলির মত খৃষ্টান দোযখে যাইবেন। আর আমার চিনা-জানা দু-একজন মওলানা-মৌলবী সাহেবের মত মিথ্যাবাদী, মামলাবাজ ও নাবালক ভাতিজাদের সম্পত্তি অপহারক মুসলমান বেহেশতে যাইবে, এটা আমার বিবেকে বাধিত। চতুর্থত, সব ধর্মই যার-তার মতে মানুষের কল্যাণের জন্য একযোগে চেষ্টা না করিয়া যার-তার শ্রেষ্ঠত্ব, যাহির করিবার জন্য এত চেষ্টা-তদবির, এত প্রচার-প্রচারণা, এত অর্থ ব্যয় করিতেছে কেন? ইসলামিক রিভিউ ও আল-ইসলাম-এর পাশে পাশে এই সময় আমি খৃষ্টান মিশনারীদের প্রকাশিত এপিফেনি নামক কাগজ পড়িতাম এবং সদরঘাটে অবস্থিত ব্যাপটিস্ট মিশন হলে বক্তৃতা শুনিতে ও বই সংগ্রহ করিতে যাইতাম। সময়ের মধ্যেই ম্যাট্রিক পাশ করিবার সময় একবার ও আইএ পাশ করিবার সময় আরেকবার চামড়ার বাধানো সুন্দর কাগজে ছাপা দুইখানা বাইবেল এই মিশন হইতে উপহার পাইয়াছিলাম। এই প্রচারণার সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে ব্যবসাদারি বলিয়া মনে হইল। এই সময় হাকিমী চিকিৎসা ভাল কি কবিরাজী চিকিৎসা ভাল, এই বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও হ্যান্ডবিলে খুব বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছিল। 'জিস্তান', 'সুশীল মালতী' প্রভৃতি সুগন্ধি পানের মসল্লা

চা’র ছোট ছোট প্যাকেটও এই সময় বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইত। ধর্মপ্রচার ও এই সব ঔষধপত্রের প্রচারের মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য দেখিতে পাইলাম না।

৮. সব ধর্ম সত্য, না সব ধর্ম মিথ্যা?

দুই-তিন বছর আগে ভাবিতাম, সব ধর্মই সত্য হইতে পারে। এখন ভাবিতে শুরু করিলাম সব ধর্মই মিথ্যাও হইতে পারে। সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বেশি দিন লাগিল না। দর্শনের অনার্স ক্লাসে বড় বড় দার্শনিকের নাম শুনিয়া কলেজ লাইব্রেরিতে তাঁদের বই-পুস্তক পড়িতে লাগিলাম। গভীর অধ্যয়নের সময়ও ছিল না, সম্ভবও ছিল না। ভাসা-ভাসা পড়িয়াই বড় দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে নিজস্ব অর্থ করিয়া বসিলাম। লৌকিক ধর্ম ও আসল ধর্মের পার্থক্য আমার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম আল্লার গুণাবলির অনুকরণে সদগুণের অধিকারী হওয়ার নামই ধর্ম। সেটা করিতে গিয়া কোনও লৌকিক ধর্মের নিয়মাবলি মানিয়া চলার দরকার নাই। মানুষ নীতিমান হইলেই ধার্মিক হইল। যেসব লৌকিক ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে, এগুলি ব্যবসাদারী ডগমা মাত্র। খোদাকে মূলধন করিয়া এরা এক-একটা ব্যবসা ফাঁদিয়াছে মাত্র। সৃষ্টিকর্তার নিজের মুখের বাক্য বলিয়াও যে সব কিতাব চালু আছে, সেগুলির মধ্যে যুগোপযোগী ভাল-মন্দ কথা আছে বটে কিন্তু ওগুলি আসলে খোদার মুখের কথাও নয় এবং সে কারণেই ওগুলি চিরকালের উপযোগীও নয়। সৃষ্টিকর্তার অবতার পুত্র বন্ধু বলিয়া যেসব ধর্ম প্রবর্তক দাবি করিতেছেন, তাদের দাবি ঠিক নয়। এই সব সিদ্ধান্ত করিয়া সমস্ত লৌকিক ধর্মের বিরুদ্ধে পাইকারি হারে কঠোর কঠোর উক্তি করিতে লাগিলাম। সহপাঠী ও বন্ধুরা আমার কথা শুনিয়া কেউ কানে আঙুল দিল, কেউ শিহরিয়া উঠিল, কেউ মারমুখী হইল। মারিল না কেউ। কিন্তু সবাই আমারে নাস্তিক আখ্যা দিল। হিতৈষীরা আমার আখেরাতের চিন্তায় আকুল হইল। বক ধার্মিকেরা আমাকে হোস্টেল হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য সুপার আসাদ সাহেবকে চাপ দিতে লাগিল। আসাদ সাহেব কি ভাবিয়া আমাকে তাড়াইলেন না, প্রিন্সিপালের কাছে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন না। কিন্তু মিলাদ প্রভৃতি বার্ষিক অনুষ্ঠান হইতে আমাকে বাদ দিলেন।

৯. খোদা-বিশ্বাস বনাম ধর্ম-বিশ্বাস

কিন্তু আসল কথা এই যে আমি তখনও নাস্তিক হই নাই। ধর্মবিরোধী অর্থাৎ লৌকিক ধর্মবিরোধী হইয়াছি মাত্র। তৎকালে ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলিলেই লোকেরা তাকে নাস্তিক বলিত। ধর্ম ও আল্লাকে তারা একই বস্তু মনে করিত। সুতরাং যে ধর্ম মানে না, সে আল্লাকেও মানে না। এই ছিল সাধারণ জনমত। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, ধর্ম মানে এখানে তারা শুধু নিজেদের ধর্ম মনে করিত। আল্লা ও ধর্ম যে এক, সেটা অন্য কারো ধর্ম নয়, আমাদের ধর্ম। কাজেই মুসলমান যদি হিন্দু ও খৃষ্টানের, হিন্দু যদি মুসলমান খৃষ্টানের অথবা খৃষ্টান যদি হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের নিন্দা করে, তবে সেটা নাস্তিকতা হইবে না। এ কথার সোজা অর্থ এই যে আমার ধর্ম ছাড়া আর গুলি আসলে ধর্মই নয়। কাজেই ওগুলিতে অবিশ্বাস করিলে বা ওদের নিন্দা করিলে তাতে সৃষ্টিকর্তা অসন্তুষ্ট হইবেন না। বরঞ্চ উল্টা ঐগুলিকে নিন্দা না করিলেই তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন। তার মানে আমারটাই আল্লার একমাত্র ধর্ম। আর গুলি সব জাল। ধার্মিকেরা একবার ভুলক্রমেও বলেন না, নাস্তিকের চেয়ে খোদা-বিশ্বাসী ভাল, অতএব আমার ধর্মে বিশ্বাস না হয়, অন্য ধর্মে বিশ্বাস কর; তবু সৃষ্টিকর্তার প্রতি ঈমান আন। না, না, এ কথা বলা চলিবে না। বরঞ্চ নাস্তিক থাক তা-ও ভাল। তবু আমার ধর্ম ছাড়া অপরের ধর্মে বিশ্বাস করিও না। ছেলেবেলা চাচাজীর কাছে যা শুনিয়াছিলাম

তা আজও সত্য। তিনি বলিতেন: হানাফীরা হিন্দুর চেয়ে বদতর। হানাফীরা যে আল্লা, রসুল, নামাজ, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ইসলামের সবগুলি মূলনীতিতে বিশ্বাসী তাতেও চাচাজী সন্তুষ্ট নন। তাঁরা যে বুকের উপর তহরিমা বাধিয়া জোরে 'আমিন' কয় না, এতেই তারা প্রতীক পূজক বহু ঈশ্বরবাদী হিন্দুর চেয়ে বদতর হইয়া গেল। চাচাজীর কথা : 'যদি মুসলমান হইতে চাও তবে আমাদের মত মোহাম্মদী হও; যদি মোহাম্মদী না হও তবে তোমার মুসলমান হওয়ার কোনো সার্থকতা নাই; তুমি বরঞ্চ হিন্দুই থাক।' এটা করটিয়ার জমিদার হাফেয মোহাম্মদ আলী সাহেবেরও কথা। অবশ্য প্রচলিত গল্পটি যদি সত্য হইয়া থাকে।

ঠিক তেমনি ধার্মিকেরা বলে, আমার ধর্মে যারা বিশ্বাস করে না, তারা। 'নাস্তিকোঁসে বদ্‌তর হ্যায়'। চাচাজীর কথা অনুসরণ করিয়াই তারা বলে : যদি ধর্মবিশ্বাসী অর্থাৎ খোদা-বিশ্বাসী হইতে চাও, তবে আমার ধর্মে ঈমান আন। যদি তা নাই পার, তবে নাস্তিকই থাক।

১০. নাস্তিকতা

ধার্মিকদের চিন্তায় ও কথায় এই স্ববিরোধিতা দেখিয়া আমি নিজের মনেই হাসিতাম। স্বল্প বুদ্ধিতার জন্য ওদের উপর কৃপা হইত। কিন্তু তাদের কথা সত্য হইতে বেশি দিন লাগিল না। ধর্মে অবিশ্বাসী হইয়া আমি বেশি দিন। খোদার উপর ঈমান রাখিতে পারিলাম না। তখন দর্শনের ক্লাসে পড়া দেকার্তে, স্পিনোযা, মিল, বেনথাম, কোতে, লক, হিউম, কেন্ট, হেগেল আমার মাথায় গজগজ করিতেছে। আমি প্রথমে পার্সিমনি-অব-লজিক বা ন্যায়শাস্ত্রের বখিলির সূত্র দিয়া আল্লার সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমানত্ব ও সর্বব্যাপিতা খণ্ডন করিতে লাগিলাম। তর্কশাস্ত্রের বখিলি ব্যাপারটা এই যে আপনি কোনও কিছুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু অনুমান করিতে পারিবেন না। ধরুন লংক্লথের একটা পায়জামার দাম আপনি আজকালের বাজারেও দশ টাকার বেশি অনুমান করিতে পারেন না। সে জায়গায় আপনার পরনের পাজামাটি দেখিয়া যদি আমি বলি : আমি অনুমান করি, এটা বানাইতে দশ হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছে; কিম্বা যদি বলি : আমার মনে হয় কলিকাতার মাস্টার টেইলার বরকতুল্লা এই পাজামাটা সিলাই করিয়াছে তবে এই দুইটা কথাই পার্সিমনি-অব-লজিক-এর খেলাফ হইবে। কারণ ঐ পাজামা বানাইতে প্রথম শ্রেণীর লংক্লথেও দশ টাকার বেশি খরচ পড়িতে পারে না; এবং ইসলামপুর-নবাবপুরের যে কোনও সাধারণ দর্জি এই পায়জামা সেলাই করিতে পারে। তেমনি, একটি কাঁচা-ভিটির বাঁশ ছনে দুচালা ঘর দেখিয়া যদি আমি বলি : তাজমহলের কারিকর বিশ্ববিখ্যাত স্থপতি ইসমাইল খাই নিশ্চয় এই ঘরটি বানাইয়াছে, তবে এটাও পার্সিমনি অব-লজিক সূত্রের খেলাফ হইবে।

চিন্তার এই সূত্র ধরিয়া ধর্ম বিরোধ হইতে অতি সহজেই খোদা বিরোধে পৌঁছিলাম। মুসলমান হিসাবে এক আল্লা-বিশ্বাসী। সে আল্লা-বিশ্বাসী, সে আল্লা নিরাকার, নিরঞ্জন, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। এমন সর্বব্যাপী এক আল্লা হইতে প্রথমে সুফিবাদের দিকে মন ধাবিত হইল। মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' (আমি'ই হক), উপনিষদের 'অহংব্রহ্ম' খুবই আকর্ষণীয় মনে হইল। স্পিনোযা ও লাইবনিজের নিয়ম (অদ্বৈতবাদ) ও প্যাথিযম (সর্বেশ্বরবাদ, মায়াবাদ) আমার চোখে খুব উঁচুদরের তত্ত্বদর্শন ছিল। এর সঙ্গে সুফীবাদ, অদ্বৈতবাদের মিল দেখিয়া আমি খুবই চমৎকৃত হইলাম। এইভাবে নিরাকার সৃষ্টিকর্তা হইতে 'আনাল এক'-এ 'অহংব্রহ্মবাদের ভিতর দিয়া প্রথম

মায়াবাদ বা প্যান্থিযম ও পরে মনিযম এবং আরো পরে নিরীশ্বরবাদের দুর্নিবার যুক্তির খাদে পড়িতে আমার বেশি সময় লাগিল না।

সূত্রের এই দৃষ্টান্ত হইতে আমি বলিতে লাগিলাম : রোগ, শোক, ঝড়, ভুইকাপ, বন্যা, মহামারি ও দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ অসুন্দর এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তারূপে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও কল্যাণময় একজন আল্লা-ভগবান অনুমান করা যুক্তিসহ ও ন্যায়সম্মত নয়। আমি বন্ধুদেরে চোখে আঙ্গুল দিয়া কলেজ প্রাঙ্গণের আমগাছগুলি দেখাইয়া দিতাম। দেখ, দেখ, ফাযুন মাসে এইসব গাছ বউলে ঝুঁকিয়া পড়ে, মনে হয় লক্ষ কোটি আম হইবে। কিন্তু চৈত্র-বৈশাখে সেইসব বউল ঝরিয়া পড়ে, থাকে মাত্র এক কুড়ি আম। পাড়াগাঁয়ের খালে-বিলে-পুকুরে গিয়া দেখ একটা মাছ কমসে কম লক্ষ পোনা ছাড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাচ্চা মাছ থাকে মাত্র কুড়ি-পঁচিশ, বড় বড় হয় মাত্র দশ-পনেরটা। এসব কাজ দক্ষ নিপুণ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কাজ হইতে পারে? একটা পাকা মালি এক সাজি ফুল দিয়া কুড়ি মালা গাঁথিবে। কোনও আনাড়ির হাতে পড়িলে একটি মালা গাঁথিতেই সাজির ফুল খতম। প্রকৃতির এই অপব্যয় অনিয়ম ও অশৃঙ্খলা কদাচ সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী আল্লার অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। জ্ঞানের দিক দিয়া যা, শক্তির দিকেও তাই। আল্লার সর্বশক্তিমানত্ব চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে লাগিলাম : খোদা কি এক সঙ্গে এই দরজাটা খোলা ও বন্ধ রাখিতে পারেন।

### ১১. মি. ল্যাংলির সহনশীলতা

এ সব কথা অধ্যাপকদের সামনেই বলিতাম। তাদের সঙ্গেও তর্ক করিতাম। অনার্স ক্লাসে অধ্যাপক ল্যাংলি ও ভট্টাচার্যের সঙ্গেই হইত বেশি। ল্যাংলি সাহেব খুব বড় ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কিন্তু সহনশীল দার্শনিক মনোভাবও তার ছিল যথেষ্ট। তিনি প্রথম প্রথম আমাকে বুঝাইবার খুব চেষ্টা করিতেন। আমার যুক্তির দুর্বলতা কোথায়, দেখাইয়া দিতেন। কখনও চটিতেন না। কখনও কড়া কথা বলিতেন না। ছাত্রদের নির্বুদ্ধিতার জন্য কস্মিনকালেও তাদেরে মনে কষ্ট দিয়া কথা বলিতেন না। তারা যে নির্বোধ, তাদের মাথায় যে ঘিলু নাই, এমন ধরনের কথা যেত তার মুখ দিয়া আসিতই না। তার প্রশ্নের হাজার ভুল উত্তর দিলেও তিনি বলিতেন না : 'তোমার উত্তর ঠিক হয় নাই। বরঞ্চ তিনি বলিতেন : 'তোমার উত্তর যথাস্থানে ঠিকই আছে : কিন্তু আমার প্রশ্ন ওটা ছিল না। ল্যাংলি সাহেবের এই ভদ্রতার নজিররূপে আমরার ছাত্রদের মধ্যে যে উপমাটি প্রচলিত ছিল সেইটিই নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি। ধরুন, তিনি কোনও ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'বলো ত একটা মুরগির কতটা পা আছে? জবাবে ছাত্রটি বলিল : একটা ঘোড়ার চারটা পা আছে, স্যার'। ছাত্রদের এই নিরেট মূর্খের মত জবাবে যে কোনও শিক্ষক চটিয়া যাইতেন। কিন্তু ল্যাংলি সাহেব চটিতেন না। তবে কী করিতেন? তিনি বলিতেন : 'ঘোড়ার পা সম্পর্কে তুমি ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু আমার প্রশ্ন ছিল মুরগির কয়টা পা।

এমন শরিফ ভদ্রলোকের সাথে গরম তর্ক করার উপায় ছিল না। তমিযে লেহাযে তাঁর মত ভদ্র, যবানে তাঁর মত মিষ্টভাষী না হইলে তার সাথে স্বভাবতই তর্ক জমান যাইত না। কিন্তু ল্যাংলি সাহেব শুধু আমাদের দর্শনের শিক্ষক ছিলেন না, ভদ্রতা ও তমিয-লেহাযেরও শিক্ষক ছিলেন। আমার নাস্তিক্য যতই বেপরওয়া ও বেলাগাম হইতে লাগিল, ল্যাংলি সাহেবের স্নেহ আমার প্রতি তত যেন বাড়িতে লাগিল। ডা. মার্টিনোর স্টাডি-অব-রিলিজিয়ন নামে একটা বড় দামি পুস্তক আমাদের অনার্সের পাঠ্য ছিল। এই পুস্তকের পঠিতব্য অংশ ছাড়াও সবটা বই পড়িয়া ফেলিতে তিনি আমাকে

উপদেশ দিতেন এবং সত্য-সত্যই পড়িয়াছি কিনা, নানা রকম প্রশ্ন করিয়া তা পরীক্ষা করিতেন। ডা. মার্টিনোকে মি. ল্যাংলি পীরের মত মান্য করিতেন। এটা জানিয়াও আমি ল্যাংলি সাহেবের এক প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলাম : ডা. মার্টিনো দার্শনিক নন, তিনি আসলে খৃষ্টান পাদরি। এতে ল্যাংলি সাহেব নিশ্চয়ই মনে খুব ব্যথা পাইয়াছিলেন। যিনি জীবনে কাকেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও কড়া কথা বলেন নাই তিনিই আমাকে শুনাইয়া একদিন বলিলেন : 'বেকন ঠিকই বলিয়াছেন লিটল লার্নিং ইজ ড্যানজারাস অ্যান্ড লিটল ফিলসফি লিডস টু এথিযম' অর্থাৎ অল্পবিদ্যা বিপজ্জনক, অল্পদর্শন নাস্তিক্য-জনক।' কথাটায় আমি মনে কষ্ট পাইব আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় উহার ধার মারিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিলেন : 'ডোন্ট ওয়ারি অল অ্যাকটিভ মাইন্ডস মাস্ট অব নেসেসিটি পাশ থু দ্যাট স্কেপটিসিযম ইন দেয়ার ইয়ুথ' অর্থাৎ এর জন্য চিন্তা করিও না। সক্রিয় তরুণ মনে অমন সন্দেহবাদ একবার আসিয়াই থাকে।

যেন নাস্তিক্য একটা রোগ। এই রোগাক্রান্ত হইয়া আমি যেন বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছি। তিনি যেন বড় ডাক্তাররূপে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন : কোনও চিন্তা করিও না। তোমার রোগ সারিয়া যাইবে। বছরের এই ঋতুতে সবারই এই রোগ হইয়া থাকে।

কিন্তু ল্যাংলি সাহেবের চিকিৎসায় আমি ভাল হইলাম না। ডা. মার্টিনোর স্টাডি-অব-রিলিজিয়ন পড়িয়া ধর্মের প্রতি আমার বিরূপ ভাব কমিল না। আল্লার প্রতি আমার মতিগতি বদলাইল না। নাস্তিক্যের প্রতি আমার ঈমান এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইল না। বরঞ্চ ডা. মার্টিনোর কোনও কোনও যুক্তি আমাকে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে আরো শক্ত করিয়া তুলিল।

১২. অধ্যাপক ভট্টাচার্য

ল্যাংলি সাহেব যা পারিলেন না; অধ্যাপক উমেশ ভট্টাচার্য তা পারিলেন। তিনি সক্রেটিসের ডায়লেকটিক ম্যাথডে আমার সঙ্গে তর্ক করিয়া অর্থাৎ আমার প্রায় সব কথার সমর্থন করিতে করিতে এক বেকায়দা জায়গায় আনিয়া ফেলিলেন। উমেশ বাবু ডগমা রিলিজিয়ন, এমনকি খোদার সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমানত্বের প্রশ্নেও আমার সহিত একমত হইবার পর অবশেষে অত্যন্ত অকস্মাৎ তিনি বলিয়া বসিলেন : খোদা আছেন এটারও যেমন কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ নাই, খোদা যে নাই তারও কোনও প্রমাণ নাই, কি বল?

আমি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। তাই ত। কিসের জোরে আমি খোদা নাই বলিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছি? আমার পকেটে টাকা বা সিগারেট নাই; ঘরে খাবার নাই, টেবিলে পুস্তক নাই, এসব কথা যেমন নিজের জ্ঞানে বলিতে পারি। সৌরজগতে আল্লাহ নাই, এ কথা কি তেমনি নিজের জ্ঞানে বলিতে পারি? আমাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া উমেশ বাবু হাসিলেন। তিনি কান্টের বই হইতে খানিকটা পড়িয়া শুনাইলেন। ওতে লেখা ছিল : আল্লাহ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বাহিরে ও উর্ধ্বে বলিয়া কেউ তাঁকে জানেও নাই, জানিতে পারিবেও না। কান্টের উক্তি শেষ করিয়া উমেশ বাবু বলিলেন : তবু কান্ট খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সব খোদা-বিশ্বাসীরাই না জানিয়া খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তোমার মত এই না জানিয়া 'খোদা আছেন' বলার দরুন এঁদের মতকে যদি যুক্তিহীন ডগমা বলিতে চাও, তবে তুমি যে না জানিয়া 'খোদা নাই' বলিতেছ, এটা ত সেই কারণেই যুক্তিহীন ডগমা।

## ১৩. এ্যাগনস্‌টিক

উমেশ বাবুর ঐদিনকার কথায় আমার চিন্তা-স্রোতের মোড় ঘুরিয়া গেল। আমি বুঝিলাম নাস্তিক্যবাদের পক্ষে আমি এতদিন যত কথা বলিয়াছি, যত যুক্তি দিয়াছি, সব ভুল। তার একটারও ভিত্তি নাই। তা যদি না থাকে তবে কী? আল্লাহ আছেন কি নাই, তা আমরা জানি না। জানিতে পারিও না। এই মতে, মানে সন্দেহে, যখন দৃঢ় হইলাম, তখন নূতন চিন্তার সম্মুখীন হইলাম। আচ্ছা না হয়, আল্লাহ আছেন কি নাই, তা লইয়া মাথা ঘামাইলাম না; কারণ মাথা ঘামাইয়া কোনও লাভ হইবে না, বুঝিলাম। কিন্তু চিন্তা যে এখানে আসিয়াই থামিয়া যায় না। আল্লাহ থাকিলেও যখন দূরে আছেন, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে যখন তাঁকে পাইতেছি না, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় যখন তাঁর সাক্ষাৎ পাইতেছি না, কাজেই তার কথা না হয় নাই ভাবিলাম। যদিও চিন্তক মন এই নৈরাশ্যবাদকে মানিয়া লইতে চায় না; কোনও একটা বিষয় চিরকাল মানবমনের অগোচরে থাকিয়া যাইবে যদিও মন এটা মানিয়া নিতে চায় না; তবু না হয় ধরিয়া নিলাম, খোদার চিন্তা নাই করিলাম মনকে এ ব্যাপারে চোখ বুজিয়া থাকিতে রাজি করিলাম। কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া ত পারি না। আল্লাহ নাই না হয় মানিলাম, কিন্তু আমার মন ও আত্মা নাই, এ কথাটা অত সহজে মানিয়া লওয়া যায় না। হিউমের বইয়ে পড়িয়াছি, মন বা আত্মা বলিয়া আমাদের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। ডেকার্তে বলিয়াছেন, আমাদের মন ও দেহ দুইটা স্বতন্ত্র বস্তু। দুইটার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই আমাদের জীবন। এই মত লইয়া কোনও রকমে বাঁচা যাইত। কিন্তু হিউম আসিয়া স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, মন বা আত্মা বলিয়া আমাদের স্বতন্ত্র কোনও অঙ্গ নাই। আমাদের দেহে যে সব ইন্দ্রিয় বা প্রত্যঙ্গ আছে, তাদের অভিজ্ঞতার সমষ্টিকেই আমরা মন বলিয়া জানি। ডেকার্তে বলিয়াছেন : কজিটো আরগো সাম আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি। হিউম বলিলেন : আমি বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই; আমি নামক দেহটির মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, হাত-পা, নাসিকা, জিভ ও চামড়ার বোধ বা অভিজ্ঞতার যোগফলকেই আমরা আমার সত্তা, আমার মন বা আমার আত্মা বলিয়া ভান করিতেছি। আমার দেহের ঐ সব অঙ্গ একটা একটা করিয়া হাঁটিয়া ফেলিলেই বুঝিতে পারিব যে ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের বাইরে মন বা আত্মা বলিয়া কোনও বস্তু নাই।

এটা বড় সাংঘাতিক কথা। আমার প্রেম-হিংসা, স্নেহ-ক্রোধ, মহত্ত্ব নীচতা, দয়া-প্রতিশোধ, সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য সবই কি তবে ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতামাত্র। ধর্ম না থাকায় আমি বুদ্ধির মুক্তি লাভ করিয়াছিলাম, ভালই হইয়াছিল। আল্লাহ না থাকায় আমার বিশেষ কিছু আসে যায় নাই। কিন্তু এখন যে সব গেল! আমার মন, অন্তর, আত্মা, কিছু যদি না থাকিল, তবে আমার জীবনের সার্থকতা কি? আমার জ্ঞান-বিদ্যা-চর্চ্চার অর্থাৎ আমাদের শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? এক কথায় মানুষের জীবনই ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া যায়। মানুষও এক প্রকার জন্তু বটে। কিন্তু তাই বলিয়া তারা কি গরু-বকরির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়? মন-অন্তর-আত্মাই যদি মানুষের না থাকিল তবে সে শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

ইম্যানুয়েল কান্টের মত হইতে সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, মানুষের মন ও আত্মা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আল্লাহকে যেমন আমরা জানিতে পারি না, পারিবও না, তেমনি আমাদের মন ও আত্মাকে আমরা জানিতে পারি না।

ফলে চারি বছরের ঘোরতর নাস্তিক আমি চারি মাসের মধ্যে নাস্তিক্যকে যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন ডগমা বলিয়া বর্জন করিলাম। ফলে আস্তিকও থাকিলাম না। নাস্তিকও থাকিলাম না। যা হইলাম তাকে ইংরাজিতে বলা যায় এ্যাগনস্টিক। বাংলাতে তাকে অজ্ঞেয়বাদী বলা যাইতে পারে। ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় চিন্তারাজ্যের ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

## ০৯. প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া

## অধ্যায় নয় – প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া

### ১. খিলাফত ও স্বরাজ আন্দোলন

কিন্তু চিন্তারাজ্যের এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা আমার বেশি দিন বরদাশত হইল না। জানি না' এবং জানা সম্ভব নয় এই ধরনের কথাই আমার ধাতে সহিত না। শৈশবে যখন মুরুব্বিদের কাছে কোনও ব্যাপারে এই ধরনের কথা শুনিতাম, তখন আমি। মনে মনে উহা অগ্রাহ্য করিতাম। তমিয-লেহাযের খাতিরে মুখে মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে জিদ করিতাম, ওটা আমাকে জানিতেই হইবে।

কাজেই আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এবং আমাদের উভয়ের গুরু ইম্যানুয়েল কান্টের অজ্ঞেয়বাদ শেষ পর্যন্ত আমার প্রাণে অশান্তি ও অস্বস্তির আগুন জ্বালাইয়া দিল। আমার চিন্তারাজ্যে অবর্ণনীয় ঝড়-তুফান ও ওলট-পালট চলিতে থাকিল।

এই সময় দেশ খিলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনের বন্যায় ভাসিয়া গেল। আমিও ভাসিলাম। এই আন্দোলনের ইনটেলেকচুয়াল দিকটা সহজেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আমি মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইন্ডিয়ার গ্রাহক হইলাম। শুরু হইতে উহার লেখা পড়িবার জন্য ব্যাক নাম্বারের কপিগুলির একত্রে বাঁধন কপি কিনিয়া ফেলিলাম। মহাত্মাজীর লেখার মধ্যে আমি খিলাফত স্বরাজ আন্দোলনের আধ্যাত্মিক দিকের সন্ধান পাইলাম। মহাত্মাজীর লেখা ছাড়া এই সময় আমি স্বামী বিবেকানন্দের ও রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি লেখা পড়িয়া একদম আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম।

শেষ পর্যন্ত আমি যখন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করি, তখন আমি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানুষ। এই পরিবর্তন দেহ-মন উভয় দিক থনেই হইয়াছিল। মনের দিককার কথা পরে বলিতেছি। আগে দেহের। কথাটাই বলিয়া নেই।

আমি পোশাকের বাবুগিরি একদম বর্জন করিলাম। খদ্দরের তহবন্দ ও কল্লিদার লম্বা কোর্তা (পাঞ্জাবির চেয়ে বেশি লম্বা বটে, কিন্তু মৌলবী সাহেবদের কোর্তার চেয়ে কম লম্বা) পরিলাম। মাথায় গান্ধী টুপি বসাইলাম। শেভ করা ছাড়িয়া দিলাম। ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই চাপদাড়িতে গাল ভরিয়া উঠিল। মোহাম্মদী আলেমদের মধ্যে সুন্নতি বাবরি চুল রাখার রেওয়াজ আছে। আমিও সুন্নতি বাবরি রাখিলাম। সুন্নতি বাবরি মানে ঘাড়ের সমান কাটা বাবরি। হিন্দু-সন্ন্যাসী, মুসলমান শাহ ফকির বা শিখেরা মেয়ে লোকের মত লম্বা চুল রাখিয়া যে ধরনের বাবরি রাখে সুন্নতি বাবরি তেমন নয়। পয়গম্বর সাহেবের সুন্নত বলিয়া কাঁধ সমান উঁচা একটা বাঁশের লাঠিও লইলাম। গান্ধীজির অনুকরণে জুতা ছাড়িয়া প্রথমে খালি পায়ে এবং কিছুদিন খড়ম পায়েই আন্দোলন শুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু খড়ম পায়ে বেশি দূর চলাফেরা করা যায় না। অথচ পুরাতন ডার্বি অক্সফোর্ডেও ফিরিয়া যাওয়া যায় না। কাজেই আগাগোড়া সুন্নতি লেবাছের সাথে খাপ খাওয়াইয়া বিহারিদের মত দেলওয়ারী' জুতা পরিলাম। দেলওয়ারী মানে নাগরা বা সেলিমশাহী নয়। দেলওয়ারী জুতার মাথা চোখাই হউক আর ভোতাই হউক, ওটা লাল চামড়ার হইবে এবং সবুজ চামড়ার মেইন বর্ডার

থাকিতে হইবে। আজকাল এ ধরনের জুতা আমার নজরে পড়ে না বলিয়াই এই কথা কয়টা বলা দরকার বোধ করিলাম। এই ভাবে আমি পুরা সুরতি বা পোশাকি মুসলমান হইয়া গেলাম।

## ২. পুনরায় ধর্মে মতি

এইবার দেখা যাক সিরাতে বা চরিত্রে কতটুকু মুসলমান হইলাম। নামাজ রোযা পুরা মাত্রায় শুরু করিলাম ঠিক; কিন্তু এবার নামাজ-রোযাকেই আমি একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ এবাদত বলিয়া মনে মনে মানিয়া লইলাম না। নিয়মিত নামাজ-রোযা ধরিলাম নিজের কথা ও কাজে সংগতি রাখিবার জন্য। কংগ্রেস ও খেলাফতের বড় বড় জনসভায় কোরআন-হাদিস হইতে মূল আরবি আয়াত (অবশ্য ছোট ছোট) আবৃত্তি করিয়া বক্তৃতা করিতাম। ছেলেবেলা হইতেই খোশ-ইলহানে দরায় গলায় কোরআনের কেরাত আবৃত্তি করা আমার অভ্যাস ছিল। মাঝখানে চার বছর নামাজ পড়ি নাই, কেরাতও আবৃত্তি করি নাই। অবিশ্রান্ত ফুট ও বাঁশি বাজাইয়া গলা নষ্ট করিয়াছি। কিন্তু স্বরাজ খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়া বিলাসিতার বস্তু হিসাবে ফুট-বাঁশি বর্জন করিয়াছি এবং নিয়মিত নামাজও ধরিয়াছি। এতে আশ্চর্য রকম অল্পদিনে আমার কেরাতি গলা ফিরিয়া আসিল। দুই-এক সভায় মগরেবের নামাজের এমামতি করিয়া নিজের খোশ-ইলহানকে আবার মশহুর করিয়াছিলাম। কাজেই এমামতিতে আমার ডাক পড়িয়া গেল। কিন্তু বুঝিলাম ইলহানই শুধু আসিল, খোশ আর আসিল না। গলা আসিল কিন্তু দায় আসিল না। মুখরেজ-তালাফুযে আমার কাবেলিয়াত আমাদের অঞ্চলের আলেম-ওলামাদেরও জানা ছিল। কাজেই খুব উচা দরজার মওলানা-মৌলবী উপস্থিত না থাকিলে আলেমরাও আমাকেই এমামতি করিতে ঠেলিয়া আগাইয়া দিতেন। অনেক সময় মুকতাদিদের দাবিতেই আলেমরা এই ত্যাগ স্বীকার করিতেন।

স্বরাজ-খেলাফতের বক্তৃতা করিতে করিতে আমি সহবক্তা আলেমদের মত কিছু কিছু ওয়ায-নসিহত করিতাম। এই ওয়াযে আমি আলেমদের মামুলি বক্তৃতার অনুকরণে রোযা-নামাজের কথা বলিতাম না। ছেলেবেলা হইতে আলেম-ফাযেলদের ওয়াযের নিয়মিত শ্রোতা হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, আলেমরা যে তাদের ওয়াযে শুধুই নামাজ-রোযা, হজ যাকাতের কথা বলেন, সাধারণ শ্রোতাদের এটা পছন্দ হয় না। একই কথা। একই ধরনে শুনিতে শুনিতে শ্রোতারা ঐ সব ওয়াযে কোনও রস পায় না। ওয়ায শুনিলে সওয়াব হয়, আলেমরা তাদের প্রত্যেক বক্তৃতায়ই কোরআন হাদিস দ্বারা তা প্রমাণ করিয়া থাকেন। শ্রোতারা এসব কথা বিশ্বাস করে। তাই শুধু সওয়াবের আশাতেই শ্রোতারা ওয়াযের মজলিসে বসিয়া থাকে। একটু জ্ঞান হইয়াছে অবধি আমি এই ধরনের ওয়ায না-পছন্দ করিতাম। ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান বক্তাদের বক্তৃতার মধ্যে শ্রোতাদের শিখিবার মত অনেক কথা থাকে, এ অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে। শুধু সওয়াবের আশায় নহে, কিছু শিখিবার জন্যও মুসলমান শ্রোতারা ওয়ায শুনুক, এ কথা আমার মনে। আগে হইতেই জাগরূক হইয়াছিল। অনেক আলেম বন্ধুকে আমার মনের কথা বলিয়াছি। শুধু নামাজ-রোযা, হজ-যাকাত ও হায়েয-নেফাসের মসলা মসায়েল না বলিয়া চরিত্র গঠন, সত্য কথন, স্বাস্থ্য পালন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, পরোপকার, নাগরিক কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, ব্যবসা বাণিজ্য, হক-হালাল রুজি-রোযগার ইত্যাদি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে বক্তৃতা করিবার জন্য আমি অনেক মৌলবী বন্ধুকে উপদেশ দিয়াছি। যে কোনও কারণেই হউক, তাঁরা কেউ আমার কথায় কান দেন নাই।

৩. ওয়াযে নূতনত্ব

কাজেই খিলাফত স্বরাজের সভা-সমিতিতে আমি নিজেই যখন স্বরাজ স্বাধীনতার কথার সাথে ওয়ায-নসিহত শুরু করিলাম, তখন নিজের বহুদিনের পোষা অভিমতকে নিজেই কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিলাম। আমার বক্তৃতায়। শরিয়ত ও মসলা-মসায়েলের কথা খুব কমই থাকিত। ঐ সব ব্যাপারে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়াই আমি শ্রোতাদের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্যের কথা বলিতে শুরু করিতাম ও চাষবাসের কাজে ব্যাঘাত না ঘটাইয়াও কীভাবে সকল ছেলেমেয়েকেই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়, তার সহজ ফন্দি-ফিকির বাতলাইতাম। সকল অবস্থার চাষি ভাইরাই যে কাপড়ের খরচা এক পয়সা না বাড়াইয়াও যার-তার বাড়ির মেয়েদেরে কোর্তা পরাইতে পারেন, কাপড়ের গজ ইঞ্চি সিলাইর খরচা হিসাব করিয়া তা বুঝাইয়া দিতাম। বনে-জঙ্গলে ও বাড়ির পিছাড়িতে যেখানে সেখানে পেশাব-পায়খানা না করিয়া সামান্য খরচে কীভাবে পুরুষ ও মেয়েদের জন্য বাড়ির ভিতরে ও বাইরে দুইটি স্বতন্ত্র পায়খানা নিজ হাতে তৈয়ার করা যায়, কাঠ-বাঁশের হিসাব করিয়া তার সহজ সাধ্যতা এবং উপকারিতা বুঝাইতাম। বাড়ির আশেপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করা, পুষ্করিণী, কুয়া-ইন্দারা সাফ রাখা, গোহাল পরিচ্ছন্ন রাখা, বাড়ির ভিতর বাহির উঠান ঝাড়ু দেওয়া, বাড়ির সামনে দু-চারটা ফুলের গাছ ও বাড়ির পিছনে শাক-সবজির গাছ লাগাইবার সহজ উপায় ও উপকারিতা বর্ণনা করিতাম।

সদা সত্য বলায়, পরোপকার করায়, এমনকি রোযা-নামাজেও যে গরীব জনসাধারণের বাস্তব অসুবিধা আছে সে কথা সরলভাবে উল্লেখ। করিতাম। কেউ যে ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা বলে না, পরের অনিষ্ট করে না, নামাজ-রোযা তরক করে না, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই যে করিয়া থাকে, দরদের সাথে এই সব কথা বলিয়া শ্রোতাদের মন জয় করিয়া ফেলিতাম। তাঁরা মনে করিত, তাদের অভাব-অসুবিধা আমি বুঝি এবং দরদ দিয়াই তাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া থাকি। আমি বহুবার লক্ষ করিয়াছি, এসব কথা বলিবার সময় শ্রোতারা গলা বাড়াইয়া, কান খাড়া করিয়া, হা করিয়া আমার কথা শুনিয়াছে। এই সব কথার মধ্যে দুইটা কথার জন্য আমার খুব নাম পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া কথা দুইটা আজও আমার মনে আছে। আমি অনেক বক্তৃতায় এই ধরনের বক্তৃতা করিতাম : আমাদেরে সদা সত্য কথা বলিতে উপদেশ দেওয়া হয়। সেটা যে উচিৎ তাও আমরা বুঝি। কিন্তু তা। সম্ভব না। ঘর-সংসার করিতে গেলে, দেনা-পাওনার মধ্যে অভাবের সংসার চালাইতে গেলে, ঝগড়া-ঝাটি না করিয়া কায়-কারবার ও বেচা-কেনা করিতে গেলে, অনেক সময় দু-চারটা ছোটখাটো মিছা কথা বলিতেই হয়। পরোপকার করা বিশেষত প্রতিবেশীর উপকার করা সওয়াবের কাজ, এটাও আমরা বুঝি। কিন্তু নিজের দুঃখ-ধান্ধা লইয়াই আমরা এত ব্যস্ত যে, দম ফেলিবার ফুরসত পাই না। পরের উপকার করিব কখন? সে জন্য আমার উপদেশ এই যে সদা সত্য কথা বলার চেষ্টা বাদ দিয়া আপনারা যার-তার সুবিধামত সপ্তাহের একটি দিন ঠিক করেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, ঐ দিনটিতে আপনি মিছা কথা বলিবেন না; অন্ততপক্ষে একটি লোকের একটি উপকার করিবেন। সে উপকার যতই ছোট হউক। কাজে না হউক মুখের কথায় হউক, তাতে কিছু মনে করিবেন না, বড় উপকারও উপকার, ছোট উপকারও উপকার। কাজ দিয়া উপকারও উপকার, কথা দিয়া উপকারও উপকার। উপকার কথাটা শুনিয়াই আমরা ঘাবড়াইয়া যাই। মনে করি, টাকা-পয়সা খরচ দরকার। ওটা ভুল। একজনের গরুতে আরেকজনের ক্ষেত খাইতেছে, আপনি ইচ্ছা করিলেই ঐ গরুটা খেদাইয়া খেতওয়ালার উপকার করিতে পারেন। একজনের আইলের পল্লাটা

ভাঙ্গিয়া ক্ষেতের পানি সরিয়া যাইতেছে। হউক না ক্ষেতওয়ালা আপনার অনাত্মীয় বা শত্রু। আপনি যদি এক টুকরা মাটি ফেলিয়া পল্লাটা বন্ধ করিয়া দেন, তবে ক্ষেতওয়ালার যে উপকার হইবে, সে তা জানিবে না সত্য, কিন্তু সকলের উপরের যিনি দেখনেওয়ালা তিনি দেখিবেন। উপকৃতের অজ্ঞাতে উপকারের যে কী সওয়াব আল্লা দিবেন না আপনারা কল্পনা করিতে পারিবেন না।

৪. পীরগিরির উপক্রম

এমনি দৃষ্টান্ত হাজার দিতাম। সবই পল্লিজীবনের ঘটনা। এই ধরনের ওয়ায পাড়া-গাঁয়ে একদম নূতন। শুধু এই নূতনত্বের জন্যই আমার বক্তৃতা জনপ্রিয় হইল। চারদিক হইতে আমার ডাক পড়িতে লাগিল। কারো কাজ বা চাল-চলন ভাল লাগিলেই আমাদের জনসাধারণ তাকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া বসে এবং প্রাপ্যাধিক মর্যাদা দিয়া থাকে। এখানে আমার কথাগুলি নূতন; আমি বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা ইংরাজিওয়ালা লোক; কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি নামাজ-রোযা করিতাম না বলিয়াও জনসাধারণ কানাঘুষা করিয়াছে! সেই লোকটার মুখে এমন সব নূতন কথা! এটা ত সাধারণ ব্যাপার নয়। নিশ্চয়ই লোকটা কোনও বুযুর্গের সহবত অথবা দোওয়া পাইয়াছে। খুবই সম্ভব। এদের বংশে ত এই ধরনের লোক আগেও হইয়াছে।

বস্, আর যায় কোথায়? দোওয়া-তাবিজ ও পানিপড়া, সজ-পড়ার জন্য লোকজন আমার কাছে আসিতে লাগিল। এসব ব্যাপারে 'না' করাও যায় না। আমি কিছু জানি না বলিলেও কেউ বিশ্বাস করিবে না। বরঞ্চ তাতে বুযুর্গি আরো বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং তাবিজ-কবচ, পানি-পড়া, সজ-পড়া, মাটি পড়া দিতে লাগিলাম। নক্‌শে-সোলেমানী' চার খণ্ড আমাদের বাড়িতেই ছিল। উহা দেখিয়া তাবিজ দিতে লাগিলাম। কখনও কোরআনের এক-আধটা আয়াত পড়িয়া কখনও 'আল্লা এই রোগীকে ভাল করিয়া দাও, মনে মনে বাংলায় এইটুকু বলিয়াও পড়া দিয়াছি। মনে করিয়াছি, যে একবার যাইবে সে আর আসিবে না। কিন্তু তা হয় নাই। অনেকেই উপকার পাইয়াছে। আমার তাবিজে বা পানি-পড়ায় রোগী সঙ্গে সঙ্গে ভাল হইয়া গিয়াছে। কাজেই আর দুইটা নূতন রোগীর জন্য পানি-পড়া নিতে আসিয়াছে। এই সব রোগী বা তাদের আত্মীয়স্বজন প্রথমে ডালিম, আনারস, তার পর মুর্গী, খাসি এবং পরে টাকাপয়সা নজর লইয়াও আসিয়াছে।

আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছি, এমনি ঝরে বক মরার সুযোগ লইয়া অনেক শাহ্ ফকির তাঁদের কেরামত বাড়াইয়াছেন এবং প্রচুর রোযগার করিতেছেন। এমনি ব্যবসা আরো অনেক শ্রেণীর লোকেরাই অবশ্য করিতেছে। জ্যোতিষী বা হস্ত-রেখা পরীক্ষা করিয়া যারা রোযগার করিতেছেন, তাদের কাজও প্রায় এই রূপ। যতই আন্দাযি ভবিষ্যদ্বাণী করুন, দু-চারটা মিলিয়া যাইবেই। ভাল চিকিৎসাবিজ্ঞানীর মুখে শুনিয়াছি, শতকরা পঞ্চাশের বেশি রোগ এমনি ভাল হইয়া যায়। প্রকৃতি নিজেই রোগের সঙ্গে লড়াই করিয়া জয়লাভ করে। কাজেই বিনা চিকিৎসায়ও ঐসব রোগী ভাল হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে দেশের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের হাতেও রোগী মারা যায়। এই কারণে সাধারণ ডাক্তারের কাজ কতকটা ঐ গণকদের মতই। দোওয়া-তাবিজ, পানি-পড়াও তাই। কাজেই গণক বা ডাক্তারদের ব্যবসা দোষের না হইলে তাবিজ-পানি পড়াওয়ালাদের ব্যবসাটাই দোষের হইবে কেন?

কিন্তু তাবিজ-পানি-পড়াওয়ালাদের ব্যবসা নিছক চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ থাকে না। আরোগ্যের জন্য তাবিজ দিতে দিতে এঁরা শেষ পর্যন্ত আখেরাতের জন্যও তাবিজ দিতে শুরু করেন। স্বাস্থ্য বিক্রয়ের

ব্যবসা হইতে প্রমোশন পাইয়া এরা ক্রমে বেহেশত বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এঁরা নিজেরা বদমায়েশি বুদ্ধি হইতেই যে এই ব্যবসা শুরু করেন, তা নয়। বিশ্বাসপ্রবণ জনসাধারণই এঁদের পীর-ফকির বানাইয়া থাকে। ঘুষখোরদের সম্বন্ধে কথা আছে যে গোড়াতে এরা ভাল মানুষ ছিল। পাবলিকই প্রথমে এটা-ওটা শেষে টাকাপয়সা দিয়া এদেরে খারাপ করিয়াছে। প্রথমে পয়সা সাধিলে প্রথম প্রথম যারা চটিয়া যাইত, পরে তারাই পয়সা দাবি করিয়াছে। না দিলে কাজ করে নাই। কোনও কোনও পীর সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। সাধারণ একটা প্রক্রিয়া বা মুষ্টিযোগে দুই-একজন লোক রোগমুক্ত হওয়ার পর হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে লোকটা গায়েবি ঔষধ বা দোওয়া পাইয়াছে। লোকের ভিড় হইয়াছে। সে লোক শাহ-সাব হইয়া গিয়াছে। মানুষ ত মানুষ, গাছ-বৃক্ষ ও নদী পুকুরের পানি পর্যন্ত বুযুর্গি হাসিল করিয়া ফেলিয়াছে। পা-ভাঙ্গা একটা গরু গড়াইয়া এক পুকুরে পড়িয়াছিল। গরুটা যখন সাঁতরাইয়া পাড়ে উঠিল তখন দেখা গেল গরুটার পা ভাল হইয়া গিয়াছে। আর যায় কোথায়? ঐ পুকুরের পানি নিবার জন্য লোকের ভিড় হইল। মেলা বসিল। পুকুরের পানি কাদা হইয়া গেল। তবু বুযুর্গি কমিল না।

কাজেই আমার দোওয়া-তাবিজের বরকত ঐ 'ঝড়ে বক মরার থনে একটুকুও বেশি ছিল না। তবু আমার কেরামত বাড়িল। দুই-একজন শুধু তাবিজ, পানি-পড়া নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিল না। আমার মুরিদ হইতে চাহিল। পীরগিরি শুরু করিতে উৎসাহ দিল। আমি আঁতকাইয়া উঠিলাম। নিজের জনপ্রিয়তাকে আমি ডরাইলাম। পীরগিরিকে আমি ভণ্ডামি বলি। পীরদেরে আমি ঘৃণা করি। সেই আমিই পীরগিরি করিব? ঘটনাচক্রে এই সময় আমি নিজের গ্রাম ও জিলা ছাড়িয়া কলিকাতা গেলাম। একটা আসন্ন আত্মিক পতনের হাত হইতে বাঁচিয়া গেলাম।

### ৫. নূতন পরিবেশ

কলিকাতা গিয়া দেখিলাম শুধু আমি একার নয়, মুসলিম তরুণ মাত্রেরই মধ্যে একটা চিন্তার বিপ্লব চলিতেছে। যাদের চিন্তার সাথে নিজের চিন্তার ঐক্য দেখিলাম, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করিয়া ইয়াকুব আলী চৌধুরী, ডা. লুত্যর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মি. এস ওয়াজেদ আলী, আব্দুল মতিন চৌধুরী, মি. আয়েনূল হক খাঁ প্রভৃতির নাম না করিয়া পারিতেছি না। আমার বাল্যবন্ধু শামসুদ্দীন ত ছিলই। মুসলমান সমাজে নবজাগরণ আনা সকলেরই উদ্দেশ্য। কিন্তু তা করা যায় কেমন করিয়া? এককালে বিশ্ব-শাসক মুসলমান কেন আজ অধঃপতিত? জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, কৃষ্টি-সভ্যতায়, শিল্পে-বাণিজ্যে মুসলমানেরা আজ দুনিয়ার সবার পিছনে পড়িয়া কেন? কেন দুনিয়ার চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি মুসলমানের মধ্যে একটি শিল্পী, একটি বিজ্ঞানী, একটি আবিষ্কারক নাই? কেন মুসলমানরা সকল ব্যাপারে এমনকি তাদের মাথার টুপি ও জায়নামাজ তৈরির ব্যাপারেও অমুসলমানের উপর নির্ভরশীল? বস্তুত দরিদ্র মেসের ভাঙ্গা চৌকির ময়লা-ছেঁড়া বিছানায় শুইয়া-বসিয়া এমনি ভাবে দুনিয়ার মুসলমানদের ভাগ্য আলোচনা করিতাম। সে আলোচনায় সিদ্ধান্ত এই হইল যে মুসলমানদের বুদ্ধি আড়ষ্ট ও চিন্তা অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইসলামের ভাল আদর্শ ত্যাগ করিয়া মুসলমানরা শুধু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই ধর্ম সাধনাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। নামাজ-রোযাকেই তারা একমাত্র ধর্মকার্য মনে করে। ফলে তারা জ্ঞান লাভের চেয়ে সওয়াব হাসিলের দিকে মন দিয়াছে বেশি। স্কুল-কলেজ স্থাপনের চেয়ে মসজিদ নির্মাণকেই বেশি দরকারি কাজ মনে করিতেছে।

মুসলমানদের এই সার্বিক অধঃপতনের জন্য দায়ী মোল্লারা। তারাই ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমান জনসাধারণকে অজ্ঞান ও দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। দুনিয়ার ধন-দৌলত কাফেরদের জন্য মুসলমানদের জন্য বেহেশতে বালাখানা ও হুর গিলমান অপেক্ষা করিতেছে, ইত্যাদি কু-প্রচারণা করিয়াই মুসলমানদেরে বিপথগামী করিয়াছে। ও সব ব্যাপারে আমরা প্রায় সবাই একমত ছিলাম। কাজেই সবাই মোগ্লাবিরোধী লেখা চালাইতাম। ডা. লুৎফর রহমান, এস ওয়াজেদ আলী, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও আমি চুটাইয়া মোল্লাবিরোধী অভিযান শুরু করিলাম। এটাই আমার আয়নার যুগ। সওগাত-এর সম্পাদক মৌ, নাসির উদ্দীন আমাদের পুরা সমর্থক ছিলেন। অতএব সওগাতকে কেন্দ্র করিয়া আমরা একটি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন শুরু করিলাম। আমাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকিলেও ঢাকা হইতে একই সময়ে অধ্যাপক আবুল হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদের নেতৃত্বে শিখা সম্প্রদায় একই আন্দোলন শুরু করিলেন।

আমি কিন্তু শুধু লেখাতেই এই সংস্কার প্রয়াস সীমাবদ্ধ রাখিলাম না। পোশাক-পাতিতে, চালে-চলনেও এই সংস্কার প্রবর্তন করিলাম। দাঁড়িয়ে কেঁচি লাগাইলাম। কোর্তা খাট করিয়া পাঞ্জাবি বানাইলাম। তহবন্দ ফেলিয়া। পায়জামা ধরিলাম। বাবরি কাটিয়া আলবার্ট ফ্যাশন করিলাম।

৬. মোল্লাকি-বিরোধী লীগ

কিন্তু তাতেও তৃপ্ত হইলাম না। কতিপয় বন্ধুতে মিলিয়া 'এন্টি মোল্লা লীগ' গঠনের সংকল্প করিলাম। এই সময়ে আমি আমার রাজনৈতিক ও সাংবাদিক গুরু মৌ, মুজিবর রহমান সাহেবের দি মুসলমান-এর সহকারী সম্পাদক। স্বনামধন্য মৌ, আবুল কাসেমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌ, আবুল হায়াত, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন তখন আমার সহকর্মী। আমরা সকলে মিলিয়া ঐ সংকল্প করিয়া মৌ. মুজিবর রহমান সাহেবকে উহার সভাপতি হইবার অনুরোধ জানাইলাম। আমাদের আদর্শ ও কর্মপন্থার সমর্থন করিয়াও প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত নামে আপত্তি করিলেন। তিনি তখন নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী কংগ্রেসী। কাজে ও চিন্তায় তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী। তিনি আমাদেরে বুঝাইলেন, ঐ নামে হিংসা আছে। মোল্লারা ব্যক্তিগতভাবে সমাজের শত্রু নয়; তাদের মোল্লাকিটাই সমাজের শত্রু। যেমন বৃটিশ জাতি আমাদের শত্রু নয়, তাদের সাম্রাজ্যবাদই আমাদের শত্রু। আমরা ইংরাজ জাতকে খতম করিতে চাই না, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকেই খতম করিতে চাই। তেমনি আমরা মোল্লাদেরে খতম করিতে চাই না। মোল্লাকি খতম করিতে চাই। আমরা মৌলবী সাহেবের যুক্তির কাছে হার মানিলাম। তাঁর কথামত প্রতিষ্ঠানের নাম রাখিলাম : লীগ এগেনস্ট মোল্লাইযম'। তিনি সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। অতঃপর এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনী সভার আয়োজন করিলাম আলবার্ট হলে।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমরা মওলানা আজাদ সাহেবকে অনুরোধ করিলাম। মওলানা সাহেব ঐ সময় বিশেষ কাজে অনেকদিন দিল্লি থাকিবেন বলিয়া নিজে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না বলিলেন। কিন্তু তার প্রিয় সহচর ও প্রাইভেট সেক্রেটারি মওলানা আবদুর রাজ্জাক মলিহাবাদীকে সভাপতি করিতে উপদেশ দিলেন। মওলানা মলিহাবাদী মাত্র কিছুদিন আগে মিসরের জামেউল-আযহার হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে ফাইনাল ডিগ্রি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রশংসা দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই মওলানা আজাদকে না পাওয়ার নৈরাশ্য আমাদিগকে খুব বেশি ব্যথিত করিতে পারিল না।

৭. মওলানা মলিহাবাদী

আমরা মওলানা মলিহাবাদীর সাথে দেখা করিলাম। মওলানা আজাদ আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব তিনি আমাদের সভাপতিত্ব করিতে রাজি হইলেন। দেখিলাম, মওলানা মহিলাবাদী ফুটফুটে গৌরবর্ণ খুব-সুরত সুপুরুষ। মুখ ও বুকভরা লম্বা চাপদাড়ি। চোখ-মুখ হইতে প্রতিভা ও জ্ঞানের নূর ফাটিয়া পড়িতেছে। খুশি হইলাম। ভাবিলাম, হ! তারিফের চেহারা বটে। এমন সুরতি-সিরতি পাক্কা মুসলমান আলেম দিয়াই আমাদের মোল্লাবিরোধী জেহাদ ভালরূপ চলিবে।

সভায় বিপুল জনসমাগম হইল। মওলানা মলিহাবাদী মুদ্রিত উর্দু অভিভাষণ দিলেন। উহা যেমন সুলিখিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল, তেমনি জনপ্রিয় হইয়াছিল। তিনি সহী হাদিস ও কোরআন শরিফের বহু উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, মোল্লারা সকল ব্যাপারে ইসলামের কদর্থ করিয়া ইসলামের বদনাম ও বেইজজত করিয়াছে এবং মুসলমানদের অধঃপতন ঘটাইয়াছে। মওলানা সাহেবের অভিভাষণের যে অংশটি সভাস্থলে সবচেয়ে বেশি অভিনন্দিত হইয়াছিল, তা ছিল এই : তিনি সহী হাদিস হইতে পয়গম্বর সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, দাড়ি-মোচ মুড়ান। বর্তমানে মুসলমানদের জন্য সুন্নতে মোয়াক্কেদা। কারণ পোশাক-পাতি ও চেহারা-ছবিতে তৎকালীন সভ্য জাতি রোমানদের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতে গিয়াই পয়গম্বর সাহেব মুসলমানদিগকে দাড়ি রাখিতে এবং চৌগা পরিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। পোশাক-পাতিতে সর্বস্বীকৃত সভ্য জাতির অনুকরণ না করিলে অমুসলমানেরা মুসলমানদিগকে অসভ্য জাতি মনে করিবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াই আগে হইতে ইসলামের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিয়া বসিয়া থাকিবে। তারা বলিবে ঐ অসভ্য ও নোংরা আরবদের আবার একটা ধর্ম কী? ফলে ইসলাম প্রচারে ও প্রসারে বিঘ্ন হইবে। শুধু প্রচারকের পোশাকের দোষে ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সম্বন্ধে মানুষ অজ্ঞ থাকুক, এটা যাতে না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যেই পয়গম্বর সাহেব চেহারা ও পোশাকে তৎকালীন সভ্য জাতির অনুকরণে মুসলমানদেরে দাড়ি রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতএব, মওলানা মলিহাবাদীর যুক্তি এই : বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সর্বস্বীকৃত মতে শ্রেষ্ঠতম সভ্য জাতি, মুসলমানের পোশাকে-পাতিতে তাদেরে অনুকরণ না করিলে ইসলামের প্রতি বিশ্ববাসীর হেকারত-নফরত ডাকিয়া আনা হইবে। এই কারণে মুসলমানদেরও দাড়ি-মোচ মুড়াইয়া চেহারা-পোশাক আধুনিক হইতে হইবে।

মওলানা সাহেবের উদ্ধৃত হাদিসের প্রামাণ্যতা বিচারের কোনও অধিকার আমার তখনও ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু তার মুদ্রিত অভিভাষণের কোনও নির্ভরযোগ্য প্রতিবাদ আমার নজরে পড়ে নাই। উদ্ধৃত হাদিসসমূহকে বিশ্বাসযোগ্য ধরিয়া নিলে মওলানা মলিহাবাদীর যুক্তির সারবত্তা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মওলানা সাহেবের এই বিপ্লবাত্মক উক্তির সঙ্গে তিনি বিপ্লবী একটি কাজও করিয়াছেন। এই সম্মিলনী উপলক্ষে তিনি তাঁর সুন্দর লম্বা দাড়িটি শেভ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ঘটনার পরে আরো পঁচিশ বছর মওলানা সাহেবের সাথে দেখা-শোনা হইয়াছে। ঐ সময় পর্যন্ত তিনি আর দাড়ি রাখেন নাই। মওলানা আজাদের অনুসারী হইয়াও তিনি বাটোয়ার আগে পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেন নাই। বাটোয়ারার পরেও ভারতেই থাকিয়া যান। পরে তিনি

কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থক হন। মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন।

আমার বন্ধুবর আবুল হায়াত সাহেবকে প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি নির্বাচন করিয়াছিলাম। তিনি খুব উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে আমরা কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টি ও কয়েকটা সভা-সমিতিও করিয়াছিলাম। তৎকালে মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ এবং ছাত্র-সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই মতবাদের দিক দিয়া মোল্লাকি-বিরোধী হওয়ায় কোনও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান চালাইবার দরকার ছিল না বলিয়াই বোধ হয় আমাদের প্রতিষ্ঠান অল্পবয়সে মারা যায়।

৮. মোল্লা-বিরোধের প্রসারিত রূপ

কিন্তু আমার বিরোধিতা ক্রমেই প্রবল হইতে থাকিল। মোল্লা-বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত আমাকে ইসলামের তথা সমস্ত ধর্মেরই আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ-বিরোধী করিয়া তুলিল। আমি বুঝিলাম, খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়া আমি যে নামাজ বন্দেগি আবার ধরিয়াছিলাম, সেটা কতকটা রাজনৈতিক ঝোঁকের মাথায়, কতকটা তৎকালীন পরিবেশের সহিত সংগতি রাখার জন্য। আমি অল্পদিনেই আবার নামাজবিরোধী হইয়া উঠিলাম। নামাজবিরোধী যুক্তিগুলি অধিকতর প্রবলবেগে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। নামাজ আচারমাত্র। আচারনিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত মানুষকে আচার-সর্বস্ব করিয়া তোলে। ধর্মের স্পিরিট বর্জন করিয়া শুধু আচার-অনুষ্ঠান পালন করিলে মানুষ মনের দিক হইতে অধঃপতিত হইতে বাধ্য। আচার-অনুষ্ঠান নিতান্তই দৈহিক। মনের উপর তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। কাজেই যারা বেশি মাত্রায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, তারা আল্লা সম্পর্কে চিন্তা করিবার অবসরই পায় না। অথচ মুসলমানদের মধ্যেই নামাজ বন্দেগির বাড়াবাড়ি সবচেয়ে বেশি। একসময় আমি নিজেই দৈনিক পাঁচ ওয়াকত নামাজ, রাত্রে তাহাজ্জদ ও হরেক রকমের নফল নামাজের জন্য অমুসলমানদিগের নিকট গৌরব করিতাম। এখন আমার মনে হইতে লাগিল, অতিরিক্ত নামাজের বোঝাই মুসলমানদের বুদ্ধির ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে। বন্ধুবর আবুল হায়াত বলিতেন : মুসলমানরা সারাদিন নামাজ পড়িতেই ব্যস্ত, কাজ করিবে কখন? আমি তার উপর আরো এক ডিগ্রি চড়াইয়া বলিতাম : মুসলমানরা দিন-রাত নামাজ পড়াতেই ব্যস্ত, খোদাকে স্মরণ করিবে কখন? শ্রদ্ধেয় বন্ধু ইয়াকুব আলী চৌধুরী আমাদের কথায় ব্যথা পাইতেন। তিনি বলিতেন : মসজিদগুলির দিকে তাকাইয়া দেখ, শতকরা পঁচিশ জন মুসলমানও নামাজ পড়ে না। নামাজে যদি অনিষ্ট হইত, তবে শুধু এই পঁচিশ জনেরই হইত। বেনামাজি বাকি পঁচাত্তর জনের তবে উন্নতি হয় না কেন?

৯. আচার-সর্বস্বতার কুফল

চৌধুরী সাহেবের এই যুক্তি একা চৌধুরী সাহেবের নয়। অনেক মুসলমানেরই ধারণা তাই। কিন্তু যুক্তিটা ত্রুটিপূর্ণ। শতকরা কতজন মুসলমান নামাজ পড়িল, আর কতজন পড়িল না, প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্নটা হইল ঈমানের দিক হইতে প্রায় সব মুসলমানই নামাজকেই ধর্মকাজ মনে করিয়া থাকে। যারা পড়িল তারা পুণ্যবান, যারা পড়িল না তারা আত্মস্বীকৃত অপরাধী। নামাজি বেনামাজি কেউই নামাজ ছাড়া অন্য কাজকে বড় ধর্মকাজ ও পুণ্যের কাজ মনে করে না। কাজেই জ্ঞান ও কর্মে তাদের উৎসাহ নাই। নামাজ পড়িলে আর কোনও ভাল কাজ করার দরকার নাই, বরঞ্চ ঠিকমত নামাজ

পড়িয়া। আপনি একশ একটা পাপ করিতে পারেন। মোল্লারা হাদিস-কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া হাজার হাজার বই-পুস্তক প্রকাশ করিয়া মুসলমানদের মাথায় ঢুকাইয়াছে যে প্রতি ওয়াকত নামাজেই নামাজিদের আগিলা-পিছিলা সব গোনা-খাতা মাফ হইয়া যাইতেছে। বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ ধরনের নফল নামাজ পড়িলে আগিলা-পিছিলা সত্তর বছরের পাপ ধুইয়া-মুছিয়া যায়। হজ, পীরের কবর যিয়ারত, বিশেষ ধরনের তসবিহ তেলাওত, 'দোওয়া হাবিবী', 'দোয়া গাঞ্জুল আরশ' বলিয়া কথিত বিশেষ বিশেষ দোয়ার বরকত ও ফজিলত সম্বন্ধে মোল্লারা এত সব অদ্ভুত চিত্রাকর্ষক বর্ণনা দিয়া থাকেন যে, ওর যে কোনও একটা কাজ করিয়াই জীবনের সমস্ত অন্যায় ও পাপের শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়া ও বেহেশতের হকদার হওয়া যায়। সব ধর্মেই বোধ হয় কম-বেশি আচার-উপাসনার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মুসলমানদের তুলনায় নিশ্চয়ই আর সকলেরটা নিতান্ত নগণ্য।

কাজেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমার মন যত বেশি রুষ্ট হইতে লাগিল, মুসলমানদের প্রতি আমার দরদ-সহানুভূতি তত বাড়িতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, মোল্লা-মৌলবী, শরা-শরিয়ত, পীর পয়গম্বর ও কথিত লৌকিক ধর্ম হইতেছে যালেম, আর মুসলমানরা হইতেছে। মযলুম। যালেমের প্রতি ছেলেবেলা হইতেই আমার মন বিরূপ ছিল। মযলুমের প্রতি আমার মমত্ববোধ ছিল একেবারে ইনসুটিংকটিভ উৎপ্রেরণাজাত। জমিদার ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে যে কারণে আমি রুষ্ট ছিলাম, সেই কারণেই আমি আনুষ্ঠানিক ধর্ম বা শরিয়তের উপর রুষ্ট হইলাম। ভাবিলাম, জমিদারের যুলুম হইতে কৃষক-প্রজাদেরে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে ভারতবাসীকে মুক্ত করার মতই এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান সমাজকেও শরিয়তের যুলুম হইতে লিবারেট করিতে হইবে। মুসলমানদিগকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে দুনিয়ার অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ করিতে হইলে ঐটা করিতেই হইবে।

১০. ধর্মান্তর গ্রহণ অনাবশ্যক

মুসলমানদিগকে ইসলামের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে কি তাহাদিগকে একযোগে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করাইতে হইবে? এ নিয়াও আমি বহু চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু দুইটা কারণে আমি মন হইতে এই চিন্তাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। প্রথম কারণ, আমি এই সময় ছিলাম শরিয়তি ইসলামবিরোধী ঘোরতর মুসলমান। এই কথাটার ব্যাখ্যা আমি অন্যত্র দৃষ্টান্তসহ করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই হইবে যে আমি মুসলমান পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিতাম। দ্বিতীয় কারণ, ধর্মান্তর গ্রহণ করাকে আমি অনাবশ্যক ও আত্মসম্মানবিরোধী অপমানজনক লাঞ্ছনা-ব্যঞ্জক কাজ মনে করিতাম। এটা অনাবশ্যক এই জন্য যে, ধর্মত্যাগ না করিয়াও মানুষ তার ঈপ্সিত ভাল কাজ করিতে পারে। "আমার পৈতৃক ধর্মে এই দোষ বা অসুবিধা ছিল বলিয়া আমি ধর্মান্তর করিলাম"- এ কথা যে বলে সে হয় মূর্খ, না হয় ভণ্ড মতলববাজ। হামবাগ ত নিশ্চয়ই। কারণ পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ না করিয়াও ঐ ধর্মের দোষ সে ত্যাগ করিতে এবং নয়া ধর্মের গুণটুকু গ্রহণ করিতে পারিত। কোনও ধর্মেরই অখণ্ড একটা রূপ নাই। বিভিন্ন মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠান লইয়াই ধর্ম। এই মতবাদ ও আচার-অনুষ্ঠানের দুই-একটা তোমার না-পছন্দ হইলেই তুমি তোমার পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য, এটা ঠিক নয়। তেমনি অন্য ধর্মের দুই-একটা মতবাদ ও ক্রিয়াকলাপ পছন্দ হইলেই ঐ ধর্ম তোমার গ্রহণ করিতেই হইবে, এমনও কথা নয়। ময়লার জন্য কেউ কাপড় ফেলিয়া দেয় না, ধুইয়া

লয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দু ধর্মে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। তাই বলিয়া যে সব হিন্দু বিধবা-বিবাহের সমর্থক তারা কি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা খৃষ্টান হইবে? কোনও দরকার নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্মের এ বিধানটুকু বদলাইয়া খৃষ্টান ও মুসলমানদের বিধানটুকু গ্রহণ করিলেই এই কারণে ধর্ম ত্যাগ করার কোনও দরকার থাকে না। হিন্দুরা এখন তাই করিয়াছে। তাতে হিন্দুদের কোনও অপমান হয় নাই। হিন্দু ধর্মের কোনো অসম্মান হয় নাই। সেইরূপ, ইসলাম বলে, নারীর পর্দা করিতে হইবে; দাড়ি রাখিতে হইবে, মানুষের মূর্তি আঁকিতে পারিবে না। এখন আমি মুসলমান নারীর মুক্তির জন্য শেভ করিবার জন্য এবং ফটো তুলিবার জন্য ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিব? কোনও দরকার নাই। আমরা মুসলমান থাকিয়াই নিজেদের ফটো তুলিতেছি; ঘরে ঘরে কায়েদে আযমের ফটো লটকাইবার সরকারি নির্দেশ দিতেছি। ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য স্কুল-কলেজ খুলিতেছি। সিনেমা করিতেছি, নাচিতেছি, গাইতেছি, দাড়ি কামাইয়া কোট-পাতলন-নেকটাই ধরিয়াছি। তাতে মুসলমানদের অপমান হয় নাই। ইসলামেরও অমর্যাদা হয় নাই। এটা গেল ধর্ম ত্যাগের অনাবশ্যকতার দিক।

### ১১. ধর্মত্যাগ অসম্মানসূচক

ধর্মত্যাগ অপমানজনক ও আত্মমর্যাদাবিরোধী বটে। আমি যেমন ইচ্ছা করিলেই বাপ-মা বদলাইতে পারি না, তেমনি ইচ্ছা করিলেই ধর্মও বদলাইতে পারি না। পিতা-মাতা, দেশ ও ধর্ম আমার ইচ্ছাধীন নির্ধারিত জিনিস নয়। এটা অ্যাকসিডেন্ট-অব-বার্থ। যারা আল্লায় বিশ্বাস করে, তারা স্বীকার করিবে যে, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়ই এটা হইয়াছে। মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্তা জানিয়া-শুনিয়াই বিশেষ উদ্দেশ্যে সকলের মঙ্গলের জন্যই আমাকে এই। পিতা-মাতার ঘরে, এই দেশে, এই ধর্মে, এই সমাজে জন্ম দিয়াছেন। আমার বাপ-মার প্রতি যেমন আমার কর্তব্য আছে, আমার দেশ, সমাজ ও ধর্মের প্রতিও আমার তেমনি কর্তব্য আছে। আমার বাপ-মা যেমন লোকই হউন, তাঁদেরে ভক্তি করিতে, তাঁদেরে সেবা করিতে, তাঁদেরে প্রতিপালন করিতে হইবে। তারা যদি দরিদ্র হন, তাঁদের অভাব দূর করিতে হইবে; তাঁরা। যদি মূর্খ-জ্ঞানহীন হন তাঁদেরে জ্ঞান দান করিতে হইবে। তারা যদি দুষ্ট লোক হন, তাঁদেরে সৎপথে আনিতে হইবে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাঁদেরে ত্যাগ করা চলিবে না। সেটা হইবে চরম ঘৃণ্য স্বার্থপর অকৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য-জ্ঞানহীনতা। সমাজ, দেশ ও ধর্ম সম্বন্ধেও আমার কর্তব্য তাই। এ অবস্থায় ভাল ধর্মের সন্ধানে যদি পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিতে হয়, তবে ভাল সমাজের সন্ধানে আমার সমাজ, ভাল দেশের তালাশে আমার দেশ ও ভাল পিতা-মাতার তালাশে বর্তমান বাপ-মাও ত্যাগ করিতে হয়। এই যুক্তিতেই আমি ধর্ম প্রচার ও প্রসলিটাইজিং-এরও বিরোধী হইলাম। আমি বলিতাম : আমাকে আমার ধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমার ধর্ম গ্রহণ করার, দাওয়াত করার অর্থ আমার বাবাকে বাবা ডাকা ছাড়িয়া দিয়া তোমার বাবাকে বাবা বলার দাওয়াত করা। আমার এই যুক্তি শুনিয়া আমার বহু বন্ধু-বান্ধব হাসিত, অনেকে রাগ করিত। কিন্তু যুক্তি হিসাবে আমার কথা কেউ খণ্ডন করিতে পারিত না, অর্থাৎ আমি মনে করিতাম, পারিত না। কাজেই আমার মতে আমি দৃঢ় ছিলাম।

### ১২. ধর্মে-ধর্মে টলারেন্স

নিজে ঐ যুক্তির ফাঁদে পড়িয়াই এই সময় আমি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ও প্রচার করিতে লাগিলাম। যে ব্যক্তি নিজের বাপ-মাকে ভক্তি করে, সে অপরের বাপ-মাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিয়া

পারে না। যে ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালবাসে, সে ব্যক্তি অপরের দেশ-প্রেমকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না। ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি নিজের ধর্মকে ভালবাসে, সে অপরের স্বধর্মপ্রীতিকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখিয়া পারে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অপরের বাপ-মাকে গাল দেয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিজের বাবা-মাকেও গাল দেয়। যে ব্যক্তি অপরের দেশ-প্রেমকে অশ্রদ্ধা করে, তার নিজের দেশ-প্রেমটা নিশ্চয়ই ভণ্ডামিমাত্র। ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি অপরের ধর্মের নিন্দা করে, নিজের ধর্মের প্রতি তার কোনও শ্রদ্ধা নাই।

আমার এই মতবাদ ক্রমেই এতদূর গেল যে, আমি ধর্মে-ধর্মে টলারেন্স বা পরধর্ম-সহিষ্ণুতা ও খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করিতে লাগিলাম। আমি বলিতে লাগিলাম : এই টলারেন্স যে ধর্মের মধ্যে যত বেশি, সে ধর্ম তত বেশি মানব-কল্যাণমুখী। আমি এই সময় কোরআন শরিফের 'লা-ইকরাহফিদ্দিন, ধর্মের ব্যাপারে জোর-যবরদস্তি নাই', 'লাকুম দিনুকুম ওলিয়া দিন, তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার'; উদউ ইলাসসাবিল,... মিষ্ট ভাষায় ধর্মের দাওয়াত কর'-এই সব কথার উল্লেখ করিয়া ইসলামের কল্যাণমুখিতা প্রচার করিতাম। আমি বলিতাম, মুসলমানরা যদি কোথাও ইসলামের মূল শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিয়া থাকে, তা এইখানে। এই ব্যাপারে হিন্দু ধর্মের শিক্ষার দিকে আমি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। হিন্দুশাস্ত্রের শিক্ষা এবং সাধারণ হিন্দুরও বিশ্বাস এই : ভগবান মহাসাগর; বিভিন্ন ধর্মমত নদী-উপনদী মাত্র। সব নদীর পানিই যেমন শেষ পর্যন্ত মহাসাগরে গিয়া পড়ে, তেমনি সব ধর্মই মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে লইয়া যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেদিন দুনিয়ার সব ধর্ম-মতের লোকেরা এই মহাশিক্ষা গ্রহণ করিবে, সেদিন ধর্ম সত্য-সত্যই মানুষের কল্যাণ সাধন করিবে।

### ১৩. সর্বধর্ম-সমন্বয় বনাম সর্বধর্ম-পরিচয়

এই সময় ইউরোপের কোনও কোনও চিন্তানায়ক মানব-প্রেমিক দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের সার-নির্যাস লইয়া একটা কমন-ফেথ' প্রতিষ্ঠার কথা বলিতে শুরু করেন। এ ধরনের চেষ্টা এই ভারতবর্ষের আকবর বাদশাহ, গুরুনানক ও কবির করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টার ফলে এক একটা নূতন ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। এ সম্পর্কে লর্ড এভারবেরী, ডা. স্মাইলস ও আরো কোনও কোনও মনীষীর কথা এইরূপ : 'এভরি অ্যাটেম্পট অ্যাট ইউনিফিকেশন অব-রিলিজিয়নস হ্যাঁজ অনলি অ্যাডেড টু দেয়ার নাম্বার।' অর্থাৎ ধর্মসমূহকে এক করিবার প্রত্যেক চেষ্টাই ধর্মের সংখ্যা বাড়াইয়াছে মাত্র। কাজেই 'কমন-ফেথ' প্রতিষ্ঠার নয়া স্লোগানে আমি খুব বেশি উৎসাহ পাইতাম না। বরঞ্চ ধর্মে-ধর্মে টলারেন্স স্থাপন এবং সব ধর্মকেই বাস্তবপন্থী করার মধ্যেই মানবকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমি দৃঢ় মত পোষণ করিতাম।

প্রিন্সিপাল জে আর ব্যানার্জীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময় কলিকাতায় এবং বাংলায় অনেক জিলাতেই সর্বধর্ম-সমন্বয় সম্পর্কে বছরে বছরে একটি আলোচনা সভা হইত। তাতে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বক্তা নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেন। এই সভার উদ্যোক্তারা একবার আমাকে ঐ সভায় বক্তৃতা করিতে বলেন। আমি এই শর্তে বক্তৃতা করিতে রাজি হই যে, বক্তারা যার-তার ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা না করিয়া অপর যে কোনও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। আমি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে রাজি হই। সভায় সে রকম ব্যবস্থা হয়। আমি হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। হিন্দু ধর্ম পলিথিস্ট বা বহু ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক ধর্ম, আমার বক্তৃতায়।

আমি ঐ অভিযোগ খণ্ডন করি। হিন্দু ধর্মে এক খোদার বদলে তেত্রিশ কোটি খোদা মানা হয়, এটাকে উচ্চস্তরের দার্শনিক মতবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করি। আমি বলি : এই মতবাদের অর্থ এই যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকই তার খোদা। একজনের বিবেকের কাছে যা পাপ, অপরের বিবেকের কাছে তাই পুণ্য। দৃষ্টান্ত : মুসলমান ডাকাতেরা আল্লাহু আকবর' বলিয়া হিন্দু বাড়ি এবং হিন্দু ডাকাতেরা কালী মাই কি জয়' বলিয়া মুসলমানের বাড়ি লুট করে। গত মহাযুদ্ধে জার্মান কায়সর ও মিত্র পক্ষের উইলসন-লয়েড জর্জ উভয় পক্ষই যুদ্ধ জয়ের জন্য বাইবেল হাতে গির্জায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

## ১৪. 'ইসলাম-হিতৈষী' বনাম 'মুসলিম-হিতৈষী'

সুতরাং ইসলামের উপর আমি ঘোরতর খাফা হইলেও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য ইসলাম ত্যাগ করা প্রয়োজন মনে করিলাম না। আমার উদ্দেশ্য মুসলমানদের কল্যাণ করা। আল্লাহ যখন আমাকে মুসলমান সমাজে মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে পয়দা করিয়াছেন, তখন আমার পিতা-মাতা তথা সমাজের প্রতি একটা কর্তব্য দিয়াই আমাকে পয়দা করিয়াছেন। মুসলমানদের প্রতি এই কর্তব্য করিতে গিয়া ইসলাম ধর্মকে যদি আমি প্রতিবন্ধক মনে করি, এই প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য যদি মুসলমানদেরে একযোগে ইসলাম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার উপদেশ দেই, মুসলমানরা আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়া যদি একযোগে খৃষ্টান হইয়া যায় এবং তার ফলে তাদের যদি উন্নতি হয়, তবে সে উন্নতি মুসলমানদের হইল না, হইল খৃষ্টানদের। কারণ তখন তারা আর মুসলমান নাই, খৃষ্টান-ধর্মী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গোড়ায় আমার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের উন্নতি করা, খৃষ্টানদের উন্নতি করা নয়। তাদের প্রতি আমার জন্মগত কোনও দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল না।

অতএব মুসলমানদিগকে মুসলমান রাখিয়াই তাদের কল্যাণ করিতে হইবে। মুসলমান সমাজে, ইসলাম ধর্মে ও মুসলিম পিতা-মাতার ঘরে পয়দা করিয়া সৃষ্টিকর্তা আমার উপর এই কর্তব্য আরোপ করিয়াছেন। আমি যদি মুসলমান বাপ-মার ঘরে পয়দা না হইয়া হিন্দু বাপ-মার ঘরে জন্মাইতাম, তবে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রতি আমার অবিকল এই কর্তব্য হইত। এই কথাটাই আমি গোঁড়া মুসলমান বন্ধুদেরে উত্ত্যক্ত করিবার জন্য বারে বারে বলিতাম। তারা যখন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় মুখে খই ফুটাইত তখনই আমি বলিতাম : তুমি যদি হিন্দু বাপ-মার ঘরে পয়দা হইতে, তবে খুব গোঁড়া হিন্দু হইতে; হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় ও ইসলামের কুৎসায় তোমার মুখে এমনি খই ফুটিত।

# ১০. অনিসলামি মুসলমান

## অধ্যায় দশ – 'অনিসলামি মুসলমান'

### ১. স্পর্শকাতর মুসলমান

আগেই বলিয়াছি আমি যতই মোল্লা-বিরোধী, গোঁড়ামি-বিরোধী হইয়া উঠিতে লাগিলাম, মুসলমানদের প্রতি দরদ ও টান আমার ততই বাড়িতে লাগিল। বাড়িতে লাগিল বলিলাম এই জন্য যে মুসলমানি চেতনা আমার ছেলেবেলা হইতেই ছিল। আভাসে-ইঙ্গিতেও যদি কেউ মুসলমানের নিন্দাসূচক কথা বলিতেন, তবে আমি ক্ষেপিয়া উঠিতাম। আমি যখন ধানীখোলা পাঠশালার ছাত্র, সেই সময় বৈলরের জমিদারের ম্যানেজার বাবু কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী একবার আমাদের পাঠশালার বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কেশব বাবু দয়ালু উদার-হৃদয় অসাম্প্রদায়িক লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন কিন্তু সভাপতির অভিভাষণের এক জায়গায় তিনি বলিলেন : 'ভদ্রলোকদের দেখাদেখি আজকাল মুসলমানরাও বিদ্যাশিক্ষার দিকে মন দিয়াছে দেখিয়া আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি।' এতে মুসলমানদিগকে ভদ্রলোক বলা হইল না বলিয়া সাত-আট বছরের শিশু আমি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলাম এবং সভাশেষে ম্যানেজার বাবুর সাথে তর্ক করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের শিক্ষক ও মুরুব্বিরা আমাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তৎকালের শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক খবরের কাগজ বঙ্গবাসীতে একবার এক সভার খবর এই রূপে বাহির হইয়াছিল : সভায় কতিপয় ভদ্রলোক ও অনেক মুসলমান যোগ দিয়াছিলেন। আমি উক্ত সংবাদপত্রে ইহার প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলাম। ছাপা হয় নাই বলিয়া উক্ত পত্রিকার গ্রাহক আমার মুরুব্বিকে ঐ কাগজ না কিনিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। তিনি হাসিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে আর টাকা দিবেন না বলিয়া আমাকে শান্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান মাতব্বর প্রজাদেরেও জমিদারের কাঁচারিতে বসিতে দেওয়া হয় না বলিয়া আমি শৈশবেই জমিদারদের বিরুদ্ধে। মুরুব্বিদের উস্কাইতাম। ময়মনসিংহ শহরে পড়িতে আসিয়া যখন দেখিলাম, হিন্দু মিঠাইর দোকানে মুসলমান খরিদ্দারকে ঢুকিতে দেওয়া হয় না, তখন মিঠাই খাওয়ার লোভ অতি কষ্টে নিবারণ করিলাম। এসবই স্বাভাবিক ছিল। তখন আমি চালে-চলনে, মনে-মস্তিষ্কে পাক্কা মুসলমান।

কিন্তু আমি যখন মনের দিক দিয়া ঘোরতর নাস্তিক, পোশাকে-পরিচ্ছদে যখন আমাকে বাঙ্গালী হিন্দু যুবক হইতে আলাদা করিয়া চিনিবার কোনও উপায় ছিল না, তখন আমি কথাবার্তায় মুসলমান যবান যাহির করিয়া গৌরব বোধ করিতাম। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতিকে নিন্দা করিলে আমি সঙ্গে সঙ্গে নিন্দুকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দিতাম। আমি নিজের ঘরে বসিয়া ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতাম। কিন্তু কোনও অমুসলমান সে কাজ করিলে তার দিকে মুষ্টি উঁচাইয়া যাইতাম। আমি যখন ঘোরতর নাস্তিক সেই সময় যদি কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিতের বইয়ে ইসলাম ধর্ম ও পয়গম্বর সাহেবের নিন্দা করিতাম তবে ঐ পণ্ডিতকে মূর্খ আখ্যা দিয়া তার বই ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। এমনকি যদি কোনো দর্শনের বইয়ে ধর্ম প্রবর্তকদের নামের মধ্যে যিশুখৃষ্ট ও বুদ্ধের নামের পাশে মোহাম্মদের নাম অথবা বড়-বড় ধর্মের নামের মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু ও খৃষ্টধর্মের সাথে ইসলামের নাম না দেখিতাম, তবে ঐ দার্শনিকের প্রতি আমি এক মুহূর্তে

শ্রদ্ধা হারাইতাম। ঘোরতর নাস্তিক্যের অবস্থায়ও আমি বরাবরের অভ্যাস-মত উঠিতে-বসিতে, রাস্তায় বাহির হইতে, খাইবার সময় প্রথম নওলা মুখে দিতে, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়িতে 'বিসমিল্লাহ' বলিতাম। খানা শেষ করিয়া, কোনও আনন্দসংবাদ পাইয়া 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিতাম। কাকেও উৎসাহ দিতে গিয়া 'মাশা আল্লাহ' বলিতাম। কাছে বসিয়া কেউ হাঁচি মারিলে 'আরহামাকুমুল্লাহ', বিস্ময় প্রকাশে 'সোবহানাল্লাহ', ঘৃণা প্রকাশে নাউযুবিল্লাহ' বলিতাম। আমার এই পাক্কা মুসলমানি ব্যবহার দেখিয়া অনেক বন্ধু আমার নাস্তিক্য বা মুক্ত-বুদ্ধি অথবা র‍্যাশনালিযম সম্বন্ধে, এমনকি আমার অসাম্প্রদায়িক উদারতা সম্বন্ধেও সন্দিহান ছিল। অনেক বন্ধু আড়ালে আমার নিন্দা করিয়া বলিত : আরে, কে বলে আহমদ নাস্তিক? ও আসলে একটা মোল্লা। নিজেকে একজন ফ্রি-থিংকার প্রমাণ করার জন্যই সে নাস্তিক্যের ভণ্ডামি করিয়া থাকে।

২. চাল-চলনে গোঁড়ামি

আমার কংগ্রেসি জীবনে আমি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই হিন্দু বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে কাল কাটাইতাম। তাদের বাড়িতে চা-বিস্কুট-মিঠাই খাইতাম। হিন্দু মহিলাদের সাথে কথা বলিতাম। তাদের হাতেও খাইতাম। কিন্তু কদাচ তাঁদের কাছে 'জল' চাই নাই। বরাবর পানি' চাহিয়াছি। তাঁদের বাড়িতে আমি কদাচ 'ডিম' ও 'মাংস খাই নাই। বরাবর 'আন্ডা' ও 'গোশত খাইয়াছি। প্রথম-প্রথম অনেক হিন্দু বন্ধু বিশেষত মহিলা আমার এই ব্যবহারে মনে মনে চটিতেন। এটাকে আমার গোঁড়ামি মনে করিতেন। কিন্তু তাতে আমার ব্যবহার বদলায় নাই। বরঞ্চ উল্টা ফল হইয়াছে। ওরা আমার এই সব শব্দ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয় বুঝিয়া আমার মুসলমানি আদব-কায়দা আরো বাড়ায়াছিলাম। আমার নাস্তিক্যের ও ধর্মীয় উদারতার আমলে, বিশেষত কলিকাতার জীবনে, বন্ধুবর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, বন্ধুবর আয়নুল হক খ এবং আরো অনেক মুসলমান বন্ধুর প্রভাবে একসময় তহবন্দের বদলে ধুতি পরা শুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু তহবন্দ বা লুঙ্গি পরা নিয়াই হিন্দুরা মুসলমানদেরে অবজ্ঞা করে বুঝিয়া ধুতি ছাড়িয়া দিলাম। অতঃপর লুঙ্গি ছাড়া আর কিছু পরিতামই না। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াই যে দাড়ি রাখিয়াছিলাম, তার কারণ এই যে হিন্দু কংগ্রেসি বন্ধুরা দাড়ির নিন্দা করিত।

৩. মিঠাই বর্জন

মফস্বলে হিন্দু মিঠাইর দোকানে মিঠাই না খাওয়া তেমন বড় ত্যাগ ছিল না। কিন্তু কলিকাতায় এটা সত্যই খুব বড় রকমের ত্যাগ ছিল। বাগ বাজারের রসগোল্লা, কলেজ স্কোয়ারের পুটিরামের মিঠাই ও বৌবাজারের ভীম নাগের সন্দেশ যে না খাইয়াছে, তার কলিকাতা-জনম বৃথা। দাড়ি-মুখে লুঙ্গি পরিয়া এইসব দোকানে মুসলমান ঢুকিতে পারে না বলিয়া আমি এমন লোভনীয় মিষ্টান্ন হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিতাম। শ্রদ্ধেয় বন্ধু ইয়াকুব আলী চৌধুরী পাকা নামাজি-মোত্তাকী-পরহেযগার মুসলমান ছিলেন। তিনিও দাড়ি রাখিতেন। আচকান-পাজামা ও টুপি ছাড়া কদাচ রাস্তায় বাহির হইতেন না। তিনি পর্যন্ত ঐসব মিঠাই বর্জন করিতেন না। তিনি আমার এই আত্মসম্মানবোধের গালভরা প্রশংসা করিয়াও শেষ পর্যন্ত ঐ মিঠাই খাইতে জোর-যবরদস্তি করিতেন। তিনি বলিতেন : নিজে ঐসব দোকানে মিঠাই কিনিতে যাইও না; কিন্তু অপরে কিনিয়া আনিয়া দিলে বাড়িতে বসিয়া খাইও। অনেক দিন পরে চৌধুরী সাহেবের এই বাস্তববাদী যুক্তি গ্রহণ করিয়া তারই কিনা মিঠাই তাঁরই সিটে বসিয়া খাইয়াছিলাম।

## ৪. বেশ্যা-বর্জিত

আরেকটি মজার ব্যাপার এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনিতাম, কলিকাতার বেশ্যারাও মুসলমান খরিদ্দার গ্রহণ করে না। পরে এই কথার এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিলাম যে মুসলমান খরিদ্দারদিগকেও 'হিন্দু বেশে অর্থাৎ ধুতি পরিয়া বেশ্যাবাড়ি যাইতে হয়। প্রথমে হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষের গভীরতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। হিন্দুদের মুসলিম ঘৃণা বেশ্যাদের মধ্যে পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে? শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডা. লুৎফর রহমান এই সময় পতিতা উদ্ধারিনী সমিতি' চালাইতেছিলেন এবং এই উপলক্ষে বেশ্যাদের মধ্যে সভা করিয়া মূল্যবান সদুপদেশ দিতেছিলেন। তাঁর মুখে শুনিলাম, স্বয়ং বেশ্যাদের মধ্যেও অনেক মুসলমান মেয়ে আছে। কিন্তু তারা হিন্দু নামে ব্যবসা করিতেছে বলিয়া তাদেরে চিনিবার উপায় নাই। এর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম মুসলমান বেশ্যার বাড়িতে কোনও হিন্দু খরিদ্দার যাইবে না; এমনকি ভদ্রবেশ্যা পল্লিতে তারা বাড়ি পাইবে না। তাই তারা হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়া ব্যবসা করিতেছে। দিন-রাত পাপের মধ্যে ডুবিয়া আছে যে বেশ্যারা তারা পর্যন্ত মুসলমানকে ঘৃণা করে? কথাটা যে সত্যতার প্রমাণ নিজের চোখে দেখিতাম। যেসব মুসলমান বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত লোক কার্য বা চাকুরি উপলক্ষে দিনের বেলা কোট-প্যান্ট, পাজাম-পাঞ্জাবি পরিয়া থাকিতেন, তাঁদেরে দেখিতাম সন্ধ্যার সময়ে ফিনফিনা ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরিয়া অ্যাসেন্স লাগাইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেছেন। তাঁহার অনেকের মুখেই এই স্বীকারোক্তি পাইতাম যে, পাঞ্জাবি-পাজামা পরিয়া গেলে বেশ্যারা বসিতে দিবে না বলিয়াই তারা ঐ পোশাকে যাইতেছেন।

ঘৃণা-লজ্জায় আমার তালু-জিহ্বা লাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বেশ্যাদের চেয়ে আমার রাগ হইল এই সব আত্মসম্মানবোধহীন বেহায়া ও বেশরম মুসলমানদের উপরে। আমি এই সময় মেসে থাকিতাম। তার কয়েকটা ছিল খুবই বড় মেস। সেসব মেসে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন করিয়া নানা কাজের ও নানা বয়সের লোক থাকিতেন। তাঁদের মধ্যে বেশ্যাবাড়ি যাইবার অভ্যাস কারো কারো ছিল। তাঁরা অসংকোচে, অনেকে সগৌরবে, বেশ্যাবাড়ির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেন। নিজেদের মুসলমানি গোপন করিয়া বেশ্যাবাড়ি যাওয়ার সমর্থনে তারা বলিতেন : মুসলমান পুরুষরা যে মুসমানি বেশে বেশ্যাবাড়ি যায় না এবং মুসলমান মেয়েরা যে মুসলমানি নামে বেশ্যাবৃত্তি করে না, তাতে আমার দুঃখিত না হইয়া বরঞ্চ আনন্দিত হওয়া উচিৎ। কারণ দুনিয়ার লোক জানিতেছে, কলিকাতার হাজার হাজার বেশ্যার মধ্যে একজনও মুসলমান। মেয়ে নাই এবং লক্ষ-লক্ষ বেশ্যাগামীর মধ্যে একজন মুসলমান পুরুষও নাই। যতই চিন্তা করিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম বন্ধুদের যুক্তিটা একেবারে ফেলিয়া দিবার মত নয়। শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের ঐ যুক্তিতে আমি যথেষ্ট সান্ত্বনা পাইলাম। আস্তে আস্তে আমার রাগ কমিয়া গেল। কিন্তু ঐ ব্যাপার হইতে একটা শিক্ষা গ্রহণ করিলাম এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার পাইলাম। যত দিন। অবিবাহিত অবস্থায় কলিকাতা থাকিলাম, দাড়িও ফেলিলাম না, লুঙ্গিও ছাড়িলাম না। কলিকাতার মত অসংখ্য প্রলোভনের বিশাল নগরীতে লুঙ্গি ও দাড়ি আমার চরিত্রের রক্ষাকবচ হইয়া থাকিল। বেশ্যাদিগকে বেশ্যা হিসাবে আমি ঘৃণা করিতাম বটে, কিন্তু নারী হিসাবে আমি তাদেরে সম্মান করিতাম। ডা. লুত্যর রহমানের সংশ্রবে আসিয়াই যে আমি এই মত অবলম্বন করিয়াছিলাম, তা নয়। তার অনেক আগে হইতেই আমার এই মত ছিল। ১৯২২ সালের ঘটনা। তখন ময়মনসিংহ শহরে কংগ্রেস-খেলাফত নেতাদের। অখণ্ড প্রতাপ। আমরা তখন একদলে পনের-বিশজন নেতা দল বাঁধিয়া রাস্তায় টহল দিতাম। সকল শ্রেণীর পথচারীরা আমাদেরে পথ

ছাড়িয়া দিত। পথ চলিতে-চলিতেও আমরা তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনা করিতাম। এমনি একদিন তর্কের জোশে আমি বন্ধুদের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া-ফিরাইয়া পথ চলিতেছিলাম। অপর দিক হইতে দুই-তিন জন বেশ্যা আসিতেছিল। ওরা আমাদেরে রাস্তা ছাড়িয়া এক পাশ হওয়া সত্ত্বেও আমি বেখায়ালে উহাদের। একজনের পায়ে পাড়া মারি। উহ' শুনিয়া আমার হুঁশ হয়। আমি তার দিকে ফিরিয়া নিজের অপরাধ বুঝিতে পারি এবং মাফ করিবেন' বলিয়া আমি মাথা ফিরাইয়া জোড় হাতে হিন্দু-মতে নমস্কার করি। কারণ আমার ধারণা ছিল সব। বেশ্যাই হিন্দু। আমার সাথীরা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। একজন বলিলেন : 'ছি ছি, তুমি একটা বেশ্যাকে নমস্কার করিলে। বিনা-দ্বিধা সংকোচে চট করিয়া আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল : যারা বেশ্যাবাড়ি যায়, তাদের জন্যই ইনি বেশ্যা। আমার জন্য ইনি একজন মহিলা মাত্র।

মুহূর্তে সকলের হাসি বন্ধ হইয়া গেল। আর বেশ্যা বলিয়া কথিত মেয়েটির চোখ দুইটা ছলছল করিয়া উঠিল। পলকে আমাদের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া সঙ্গিনীদের সাথে চলিয়া গেল।

শুধু মুসলমানদের পোশাক-পাতি নয়, তাদের নাম লইয়াও যদি কেউ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিদ্রূপ করিত তবে আমি চটিয়া যাইতাম। নামে অশুদ্ধ উচ্চারণ বা বিকৃতিকরণকে আমি এইরূপ বিদ্রূপ মনে করিতাম। হিন্দু বন্ধুদের সাথে এই লইয়া আমার অসংখ্য ঝগড়াঝাটি হইয়াছে। এসব ক্ষেত্রেই আমি হিন্দু বন্ধুদিগকে টিট-ফর-ট্যাট বা ঢিলের বদলে পাটকেল মারিয়া প্রতিশোধ নিতাম। এখানে দুইটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব :

৫. ফ্যাসটিডিয়াস

ময়মনসিংহের কংগ্রেস-নেতা বাবু সূর্য কুমার সোম উদার অসাম্প্রদায়িক নেতা ছিলেন। তাকে আমি পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম। তিনিও আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি মওলানা শওকত আলীকে মৌলানা 'সৈকত আলী (ইংরাজি এস দিয়া) এবং আমাকে মশুর (ইংরাজি এস-এইচ দিয়া) উচ্চারণ করিতেন। এই নিয়া তার সঙ্গে প্রায়ই আমার কথা-কাটাকাটি হইত। তিনি নিজের নাম সূর্য কুমার (এস-এইচ দিয়া) ঠিকই উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু শওকতের উচ্চারণে তিনি শুধু এস দিয়া সৈ' উচ্চারণ করিতেন। অর্থাৎ মনসুরে' 'স'-এর স্থলে শ' এবং শওকতে' 'শ'-এর স্থলে 'স' উচ্চারণ করিতেন। আমার পুনঃপুন প্রতিবাদে তিনি উত্ত্যক্ত হইয়া আমাকে ধমক দিলেন। বলিলেন : নামের উচ্চারণ লইয়া আমার অমন ফ্যাসটিডিয়াস হওয়া উচিৎ নয়। আমি এটাকেও সূর্যবাবুর সাম্প্রদায়িক মুসলিম-অবজ্ঞা মনে করিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু বেআদবি না করিয়া টিট ফর-ট্যাট মারিবার সন্ধানে থাকিলাম।

সেকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈঠক শুধু কলিকাতায় না হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন জিলায় হইত। সেবারে ঐ বৈঠক ছিল ময়মনসিংহে। সেক্রেটারি সুভাষচন্দ্র বসু, সূর্যবাবুর মেহমান। তিনি বন্ধুবান্ধব লইয়া গল্প-গুযারি করিতেছেন। আমিও সেই বৈঠকে আছি। আলাপে আলাপে সুভাষবাবু আমার দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিলেন : সূর্যবাবু গেলেন। কোথায় মনসুর সাব? তাকে দেখি না কেন?

আমি আসন হইতে উঠিয়া বাড়ির ভিতরদিককার বারান্দায় দাঁড়াইয়া চিৎকার করিলাম : ‘সূর্যবাবু, ও সূর্যবাবু, সুভাষবাবু আপনারে ডাকতেছেন।’ ‘সূর্য’ ও ‘সুভাষ’ দুইটি শব্দই আমি এমন স্পষ্টভাবে ‘এস’ উচ্চারণ করিলাম, যাতে দুইটা শব্দই প্রায় ‘ছুর্য’ ও ‘ছুভাছ’ শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলাম, আমার ঔষধে ক্রিয়া করিয়াছে। সুভাষবাবু ও তাঁর সঙ্গীরা বিস্ময় বা বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকাইয়াছেন। বারান্দার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম, সূর্যবাবু প্রায় আমার কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং বলিতেছেন : তুমি আমার নাম লৈয়া ঠাট্টা করতেছ কেন?

সুভাষবাবু ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করিলেন। সভার মধ্যেই আমি সূর্যবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলাম। সূর্যবাবুও আমার বিরুদ্ধে বলিলেন। উচ্চ হাসিয়া সুভাষবাবু বিচার করিলেন। বিচারে সূর্যবাবু অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। আমি বেকসুর খালাস পাইলাম। সকলে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসাহাসি করিলেন।

আরেক দিনের ঘটনা। ময়মনসিংহ টাউন হলে এক কংগ্রেসি সভার সভাপতি রূপে আমি নাকি খুব ভাল বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এ জিলার প্রাচীনতম সংবাদপত্র চারু-মিহির এই প্রসঙ্গে আমার প্রশংসায় একটা সম্পাদকীয় লিখিয়া ফেলিল। তাতে আমাকে খ্যাতনামা সাহিত্যিক, জনপ্রিয় কংগ্রেস-নেতা, উদীয়মান উকিল মি. মনসুর আলী সাহেব’ বলিয়া উল্লেখ করা হইল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মি. মধুসূদন সরকার ময়মনসিংহ বারের প্রবীণ উকিল। কাগজ বাহির হইবার পর দিনই তাঁর সাথে আমার দেখা। সগর্বে তিনি আমাকে বলিলেন : পড়ছেন এবারের সম্পাদকীয়টা? কেমন লাগল?

আমি হাসিয়া বলিলাম : ধন্যবাদ। আমাকে ত বাঁশ দিয়া অনেক উঁচায় তুলছেন। কিন্তু সামান্য একটু ভুল হইছে।

মধুবাবু কিছুটা বিস্মিত এবং তার চেয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন : আমি ভুল করছি? কী ভুল?

আমি হাসিমুখে বলিলাম : আমার নাম আবুল মনসুর, মনসুর আলী নয়।

মধুবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিলেন : ও! এই কথা! এতে ভুলটা কী হইল? নামের মধ্যে ‘মনসুর’ ত আছে।

আমি বিরক্তি গোপন করিয়া বলিলাম : তা আছে বটে, তবে নামটা আমার আবুল মনসুর আহমদ, মনসুর আলী নয়।

মধুবাবু আমার বোকামিতে কৃপা প্রদর্শন করিয়া সান্ত্বনার সুরে বলিলেন : নাম সম্বন্ধে অত ফ্যাসটিডিয়াস হইবেন না। যাহা আবুল মনসুর তাহাই মনসুর আলী। আমি ত কোনও পার্থক্য দেখি না।

এই বলিয়া মধুবাবু আমাকে পাত্রাধার তৈল ও তৈলাধার পাত্র এবং ‘টুইডলডাম’ ও ‘টুইডলডি’র চুলচেরা হিসাবের অন্যাবশ্যকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন।

আমি আর কী করিতে পারি? অগত্যা নিরস্ত হইলাম এবং টিট-ফর ট্যাট’-এর সন্ধানে থাকিলাম। সৌভাগ্যবশত সুযোগের অপেক্ষায় আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল না।

সেই দিনই বিকালে কোর্ট-ফেরতা ডি বি বিল্ডিংয়ের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়া বাসায় ফিরিতেছিলাম। সেদিন ডি বির মিটিং ছিল। মিটিং শেষে চেয়ারম্যান শরফুদ্দিন সাহেব কতিপয় মেম্বর লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া বোধ হয় মিটিং-এরই কোনও আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া ডাকিলেন। আমিও তাদের আলাপে শামিল হইলাম। আলাপ করিতে-করিতে হঠাৎ চেয়ারম্যান সাহেব মাথা উঁচা করিয়া বলিলেন : ওটা চারু-মিহির-এর এডিটর মধুবাবু যাইতেছে না?

আমিও চেয়ারম্যান সাহেবের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, খানিক দূর দিয়া মধুবাবু যাইতেছেন। বলিলাম : মধুবাবুই বটে।

চেয়ারম্যান : আপনার সাথে ত মধুবাবুর খুব খাতির, একটু ডাকুন না। তার সাথে আমার কথা আছে।

আমি অমনি জোরে চিল্লাইয়া উঠিলাম : সূদনবাবু ও সূদনবাবু।

মধুবাবু একবার ঘাড় ফিরাইয়া এদিক-ওদিক তাকি-তুকি করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, চেয়ারম্যান সাহেব আমার ভুল সংশোধনের জন্য কী বলিতে যাইতেছেন। আমি তাকে কোনও কথা বলিতে না দিয়া গলার সুর আরো উঁচা করিয়া চিৎকার করিলাম : ও সূদনবাবু ও চারু মিহির, চেয়ারম্যান সাহেব আপনার সাথে একটা কথা কইতে চান।

এবার মধুবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। আমার পাশে চেয়ারম্যান সাহেবকে দাঁড়ান দেখিয়া আমাদের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি ঘন-ঘন পা ফেলিয়া আমাদের নিকটবর্তী হইয়াই আমার দিকে চোখ পাকাইয়া বলিলেন : মানুষের নাম নিয়া মশকরা করেন কেন?

আমি বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া বলিলাম : কী কইতেছেন? আপনি মুরুব্বি মানুষ। আপনার নাম নিয়া মশকরা করব আমি?

মধুবাবু জেংরা মারিয়া বলিলেন :বাকি রাখলেন আর কী? আমারে সূদনবাবু বইলা ডাকলেন কেন? আপনি ত জানেন আমার নাম শ্রী মধুসূদন সরকার।

আমি হাসিয়া বলিলাম : আপনার নামের মধ্যে সূদন’ ত আছে। তবে ভুলটা কী করলাম? যাহা মধু তাহা সূদন। নাম সম্বন্ধে আপনি অত ফ্যাসটিডিয়াস কেন? এ ত দেখতেছি ‘তৈলাধার পাত্র ও পাত্রাধার তৈল’ অথবা টুইডলডাম’ ‘টুইডলডি’র ব্যাপার।

এতক্ষণে মধুবাবুর চৈতন্য হইল। তিনি আমার কাঁধে একটা থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন : আপনে বড় বজ্জাত।

আমি তখন চেয়ারম্যান ও অন্যান্য মেম্বারদের ব্যাপারটা বলিলাম। সকলে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়া মধুবাবুকে একদম তুলাধুনা করিলেন।

আমি এইরূপে একদিকে মুসলমানদের চাল-চলন, কৃষ্টি-তমদুন ও পোশাক-পাতি লইয়া অমুসলমানদের, বিশেষত, প্রতিবেশী হিন্দুদের সাথে অহরহ ঝগড়া করিয়া বেড়াইতাম। অপরদিকে মুসলমান সমাজের, বিশেষত, বাংলার মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অনাচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দিন-রাত খিচ্-খি করিতাম।

মুসলমানদের এই সার্বিক অধঃপতনের জন্য আমি তাদের অহেতুক ধর্মীয় গোঁড়ামি, শরা-শরিয়তের নামে তাদের বাড়াবাড়ি ইত্যাদিকেই দায়ী করিতাম। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আত্মঘাতী মনে হইত মুসলমানদের পর্দা প্রথা ও ভিক্ষা-প্রথা।

৬. মুসলমানদের পর্দা-প্রথা

পর্দা-প্রথার কথাটাই আগে বলিতেছি। এই পর্দা-প্রথা মুসলমান সমাজকে পঙ্গু অথর্ব, অসভ্য ও কৃষ্টিহীন করিয়া রাখিয়াছে। নারী জাতির পর্দার কড়াকড়ির সমর্থনে দিন-রাত শত হাদিস-কোরআন আওড়ান হইতেছে। যেন একমাত্র পর্দা-প্রথার উপরই ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। অথচ কার্যত এই পর্দা-প্রথা শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চাষি-শ্রমিক, কুলি-মজুর ও ভিক্ষুক যারা মুসলমান সমাজের বিপুল মেজরিটি, তাদের মধ্যে। পর্দা-প্রথা নাই। এ সম্বন্ধে আলেম সম্প্রদায়ের মনোভাব অদ্ভুত। একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা অফিসারের চৌদ্দ বছরের মেয়েকে পায় হাঁটিয়া বা রিকশায় চড়িয়া খোলামুখে স্কুলে যাইতে দেখিলে এঁরা ইসলাম গেল' ইসলাম গেল' বলিয়া আসমান-জমিন কাঁপাইয়া তুলিবেন। কিন্তু জুম্মাবারে বা ঈদের দিনে রাস্তা-ঘাটে হাজার হাজার আধ-ল্যাংটা ভিখারিনী মেয়েকে হৈ-হল্লা করিতে দেখিয়াও ইসলামের বিপদ সম্পর্কে এঁরা টু-শব্দটি করেন না। এঁদের ভাব গতিকের সহজ অর্থ এই যে মুসলমান মেয়েরা লাখে-লাখে রাস্তার বাহির হইয়া ভিক্ষা করিলেও ইসলাম নষ্ট হইবে না; কিন্তু দু-দশ জন মেয়ে স্কুলে-কলেজে গেলেই ইসলাম ধ্বংস হইবে। ফল হইয়াছে এই যে ইসলামি পর্দা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর মধ্য সীমাবদ্ধ হইয়াছে। তা-ও আবার কিশোরী ও যুবতীদের মধ্যে। কেবলমাত্র এই শ্রেণীরই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার সংগতি আছে কৈশোর ও যৌবনই মধ্য ও উচ্চশিক্ষার সময়। কাজেই অবস্থাপন্ন মুসলমানরাও তাদের মেয়েদেরে লেখাপড়া শিখাইতে পারিতেছেন না। শিক্ষা ও অশিক্ষা দুইটাই জ্যামিতিক প্রগ্রেশনে বাড়িয়া যায়। মার শিক্ষাহীনতা এই নিয়মকে আরো জোরদার করিয়া থাকে। এই কারণে প্রতিবেশী সমাজের মোকাবিলা বাংলার মুসলমান সমাজ শিক্ষার দিকে, সুতরাং জীবনের সকল ক্ষেত্রে, জ্যামিতিক প্রগ্রেশনে তলাইয়া যাইতেছে। অথচ এত বড় সর্বনাশের হেতু যে পর্দা-প্রথা, সে পর্দার পর্দা তুলিয়া দেখা হইতেছে না ওটা কী বস্তু। পর্দা জারি করা হইতেছে যে হাদিসের নামে তাতে বয়স ও শ্রেণী-নির্বিশেষে সব নারীর কথাই লেখা হইতেছে। কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে, ওটা শুধু ধনী যুবতীর জন্য। পর্দার জন্য বাড়ির চারিদিকে উঁচা প্রাচীর তোলা হইতেছে হাজার টাকা খরচ করিয়া। কিন্তু পাঁচ সিকার কাপড় দিয়া এই পর্দানশীনকে একটি কোর্তা পরান হইতেছে না। এইরূপ যুক্তিহীন স্ববিরোধী পর্দাই মুসলমান সমাজের অর্ধেক মানুষকে পঙ্গু, অসহায় ও পুরুষের কাঁধের বোঝ করিয়া রাখিয়াছে। এর জন্য দায়ী মোল্লাদের বিকৃত ইসলাম।

## ৭. ভিক্ষা-বৃত্তি

পর্দা সম্বন্ধে যা, ভিক্ষা সম্বন্ধেও তাই। দান-খয়রাত-চ্যারিটি-দক্ষিণা সব দেশে সব জাতির মধ্যেই আছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে ঐ সব প্রথা ভিক্ষাবৃত্তি যে কুৎসিত কার্যের আত্মঘাতী রূপ ধারণ করিয়াছে, এমনটি দুনিয়ার আর কোথাও দেখা যাইবে না। এক পয়সা দান করিলে পরকালে সত্তর পয়সা পাওয়া যায়, 'সায়েলকে কদাচ না বলিও না', 'ভিক্ষুক ভিক্ষা চাওয়ামাত্র তোমার ধন-সম্পদ ক্রোক হইয়া গেল, তাকে কিছু দিয়া সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত ঐ ক্রোক ছুটিবে না : দিনরাত এই ধরনের ওয়াস-নসিহতই মুসলমান সমাজের এই দুর্গতি ঘটাইয়াছে। গোড়াতে মোল্লারা নিজেদের অর্জিত জীবিকা নিশ্চিত করিবার জন্যই ভিক্ষাদানের উপকারিতার এই চমৎকার ও মনোহারিণী রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁদের আশা ছিল, তারা একাই এর ফল ভোগ করিবেন। কিন্তু পরিণামে তাঁদের এত শরিক জুটিয়া গিয়াছে যে বিপুল ভিড়ে তারা দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। ফলে মুসলমান জাতির জন-বলের এক বিরাট অংশ নিষ্কর্মা, গলগ্রহ হইয়া গিয়াছে। এর জন্যও দায়ী মোল্লাদের বিকৃত ইসলাম।

এ অবস্থায় সকল বুদ্ধিমান মুসলমানই ইসলামকে এই সব আবর্জনা মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। এই শ্রেণীর লোককে ধর্ম সংস্কারক বলা হইয়া থাকে। খৃষ্টানদের মধ্যে মার্টিন লুথার, হিন্দুদের মধ্যে রামমোহন রায় ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ, মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, সৈয়দ আমির আলী ও মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উহাদের মোকাবিলা আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তি। সে কারণেই হউক, অথবা মত-বিভিন্নতার দরুনই হউক, আমার চিন্তা ওদিকে গেল না। আমার মন ও চিন্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া ইসলামের চেয়ে মুসলমানদের দিকেই বেশি ঝুঁকিয়া পড়িল। এর অর্থ শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াইল যে আমি মুসলমানদের পরকালের ভাবনার চেয়ে ইহকালের ভাবনাই বেশি ভাবিতে লাগিলাম।

## ৮. মুসলিম-হিত বনাম হিন্দু-অহিত

মুসলমানদের এই হিত-চিন্তা কার্যত আমাকে অমুসলমানদের অহিতকামী করিয়া তুলিতেছে কিনা, তার পরীক্ষা অল্পদিনের মধ্যেই শুরু হইল। রাজনীতিতে আমি কংগ্রেসি ছিলাম। কংগ্রেসি হিন্দু বন্ধুদের কাছে আমার জাতীয়তাবাদ স্বভাবতই সন্দেহের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। আমার রাজনীতিক মতামত ও তার ক্রমবিবর্তনের কথা আমি অন্যত্র বলিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে মুসলমান সমাজের এই চরম অধঃপতিত অবস্থা আমাকে এ ব্যাপারে অতিশয় স্পর্শকাতর করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে প্রায়ই আমি বলিতাম : মুসলমানের এটা হইল, মুসলমানের ওটা হইল না ইত্যাদি। এতে হিন্দু বন্ধুরা খুব সংগতভাবেই মনে করিতে পারিত এবং করিত যে আমি সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারও শুধু মুসলমানদের ভাল-মন্দের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিয়া থাকি। কাজেই আমি আসলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী, জাতীয়তাবাদী আমি নই। আমি হিন্দু বন্ধুদের এই সন্দেহের প্রতিবাদ করিতাম এবং আন্তরিকতার সাথেই করিতাম। হিন্দুর অহিত কামনা না করিয়াও মুসলমানের হিত কামনা করা যায়, সুতরাং নিজের সম্প্রদায়কে ভালবাসিয়াও জাতীয়তাবাদী হওয়া যায়, ইহাই ছিল আমার রাজনৈতিক মতবাদ। এ মতবাদ আমি জনাব মুজিবর রহমান সাহেবের নিকট শিখিয়াছিলাম। মৌলবী মুজিবর রহমান ও তার রাজনৈতিক মতবাদ

সম্পর্কে আমি অন্য অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার মুসলিম-প্রীতির সঙ্গে ইসলাম-প্রীতির কোনও সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত ইসলামের প্রতি আমার কোনও প্রীতিই ছিল না। কাজেই আমি হিন্দু ধর্মের প্রতি কোনও বিরূপ। ভাবও পোষণ করিতাম না। মানুষের দৈহিক ও মানসিক পরম কল্যাণই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। এই হিসাবে আমি ধর্মকে ঔষধের সাথে তুলনা করিতাম। মোটামুটি এখন পর্যন্ত আমার মত তাই। মাত্র চার-পাঁচ বছর আগেকার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিব।

## ৯. ইসলাম বনাম মুসলমান

ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে গভীর ও গুরুতর চিন্তা যারা করিয়া থাকেন। বন্ধুবর আবুল হাশিম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বলিষ্ঠ চিন্তা ও জোরাল প্রকাশ-ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁর চিন্তায় ও আমার চিন্তায় আশ্চর্য রকম মিল রহিয়াছে। এই কথার উল্লেখ করিয়া একদিন। আমি হাশিম সাহেবকে তর্কে-তর্কে বলিয়াছিলাম : আপনার সাথে চিন্তায় আমার পনের আনা মিল থাকা সত্ত্বেও ঐ এক আনার কোথাও এমন একটা বুনিয়াদি বিরোধ আছে, যার ফলে আপনি ও আমি এক সাথে চলিতে পারি না। সেটা কি বলিতে পারেন?

হাশিম সাহেব সরলভাবে বলিলেন : প্রশ্নটা আমারও মনে জাগিয়াছে। কিন্তু কোনও উত্তর পাই নাই।

আমি বলিলাম : আমার মনে একটা উত্তর জাগিয়াছে।

কৌতূহলের সুরে হাশিম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন : কী বলুন ত।

আমি বলিলাম : আপনি ইসলামকে ভালবাসেন আমি মুলমানকে ভালবাসি।

হাশিম সাহেব প্রথমে একটু হতভম্ব হইয়া গেলেন। খানিকক্ষণ পরে বলিলেন : আপনি আমাকে চিন্তায় ফেলিয়াছেন। আজ এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। পরে দিব, কিছুদিন পরে হাশিম সাহেব আমাকে বলেন : আপনার ঐ কথার জবাব দিবার জন্য আপনাকে কিছুদিন যাবৎ তালাশ করিতেছি। এইবার জবাবটা নিন।

আমি বলিলাম: দেন।

হাশিম সাহেব প্রতি কথায় জোর দিয়া বলিলেন : আমি যে শুধু মুসলমানদের ভালবাসি না তা নয়, আমি তাঁদেরে ঘৃণা করি।

আমি হাশিম সাহেবের উষ্ণতায় হাসিয়া বলিলাম : তা হইলে দাঁড়াইতেছে। এই যে, আপনি ঔষধটাকেই ভালবাসেন, রোগীকে আপনি ঘৃণা করেন।

হাশিম সাহেব অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতির লোক। তিনি আমার উপমা গ্রহণ করিয়া বলিলেন : যে রোগী ইসলামের মত এমন মূল্যবান ঔষধ নষ্ট করিয়াছে, তাকে ঘৃণা করিব না ত কী করিব?

আমি নিশ্চিত জয়ের আশায় বলিলাম : ঔষধ-মূল্যবান কি না, তার, পরিচয় রোগ নিরাময়ে।

কিছুমাত্র না দমিয়া হাশিম সাহেব বলিলেন : যে উন্মাদ রোগী ঔষধে ভেজাল দিয়া খায়, তার রোগ না সারিলে কি ঔষধের দোষ?

হাশিম সাহেবকে তর্কে হারান খুব শক্ত কাজ। কাজেই সেদিন আমিই হারিলাম।

### ১০. ধর্ম ও ঔষধ

কিন্তু হাশিম সাহেবের কথা ঠিক নয়। তাঁর ঐ কথা লা-জবাব নয়। কারণ রোগী যে ঔষধে ভেজাল মিশাইয়া ডাক্তারকে ফাঁকি দেয়, এটাও তার একটা রোগ। এ রোগও সারাইতে হইবে ঔষধ দিয়াই। রোগীর দোষ দিয়া ঔষধের তারিফ করিতে পারে কেবলমাত্র ঔষধ-ব্যবসায়ী। ঠিক তেমনি যে ধর্ম যত বেশি মানুষের যত বেশি কল্যাণ করিতে পারিল, আমার বিবেচনায় এবং নিরপেক্ষ সকলের বিবেচনায়, সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্ব বিচার আমার কাজ নয়। আমার একমাত্র চিন্তা আমার রোগী। আমার একমাত্র কামনা তার রোগ সারা। যে ঔষধ খাওয়াইলে আমার রোগী ভাল হয়, সেই ঔষধই খাওয়াইব। যদি ওভার মেডিক্যাটেড হইয়া যাওয়ার দরুন রোগ জটিল হইয়া থাকে, তবে ঔষধ খাওয়ান বন্ধ করিব। ঔষধের জন্য রোগী নয়, রোগীর জন্যই ঔষধ। ঠিক তেমনি, এ কথাও সর্বজনস্বীকৃত। যে ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই ধর্ম। যে ঔষধ রোগীর কাজে লাগিল না, তা যেমন বর্জনীয়; তেমনি, যে ধর্ম মানুষের কল্যাণ করিল না, তা বর্জনীয়।

### ১১. শাঁস ও খোসা

কিন্তু ঔষধের সঙ্গে ধর্মের তুলনা মাত্র একদিক হইতে সত্য। উপাদান ও অনুপান লইয়াই ঔষধ। ঐসব উপাদানের সবগুলিই ফাভামেন্টাল। তার কোনও একটা বাদ দিলে ঔষধ আর ঔষধ থাকিবে না। তেমনি বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্ম লইয়াই ধর্ম। কিন্তু সে বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্মের সবগুলি ফান্ডামেন্টাল নয়। একমাত্র সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসই ধর্মের ফান্ডামেন্টাল। বিশ্বাসের অবশিষ্ট অংশ এবং সমস্ত ক্রিয়া-কর্মই ধর্মের অনুষঙ্গ মাত্র। এগুলিকে ঔষধের অনুপানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। রোগী-ভেদে ও রোগীর দেশ-ভেদে এইসব অনুপান ইতর-বিশেষ করা যাইতে পারে এবং করা উচিতও। ঠিক তেমনি মানুষের দেশ ও অবস্থাভেদে ধর্মের এইসব নন ফান্ডামেন্টাল অনুপানগুলির ইতর-বিশেষ করা যাইতে পারে এবং করা উচিতও। এই দিক হইতে বিচার করিলে খোরাক, পোশাক, নাম-নিশানা, উপাসনা-প্রণালি, পার্সনাল 'ল', এ সমস্ত ধর্মের নন-ফান্ডামেন্টাল। ধর্মের মূল ঈমানের সাথে-সাথে এসব নন-ফান্ডামেন্টালকেও যদি সকল দেশের সকল যুগের সকল বিশ্বাসীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়, তবে সেটা হইবে অবাস্তব ও ইমপ্র্যাকটিক্যাল। তাতে অনাবশ্যকরূপে ঐ ধর্ম হইতে মানুষকে এবং মানুষ হইতে ধর্মকে দূরে রাখা হইবে; অনাবশ্যককে অত্যাবশ্যক ঘোষণা করিয়া ঐ ধর্মকেই লোক-চক্ষে হেয় করা হইবে। একটা ছোট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যদি বলা হয়, খোরমা না খাইলে বা দাড়ি না রাখিলে কেউ মুসলমান হইতে পারিবে না; অথবা যদি কেউ বলে, গলায় টাই না বাধিলে বা ক্রস না ঝুলাইলে কেউ খৃষ্টান হইতে পারিবে না; কিম্বা যদি বলা হয় টিকি না রাখিলে বা গলায় রুদ্রাক্ষের মালা না পরিলে কেউ হিন্দু হইবে না, তবে তাতে যথাক্রমে ইসলাম, খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম হইতে ঐ ঐ ধর্ম-বিশ্বাসীদেরে অনাবশ্যকরূপে দূরে ঠেলিয়া রাখা হইবে। এইসব পোশাক-পাতি ও আচার ব্যবহারের মতই উপাসনা-প্রণালিও ধর্মের নন-ফান্ডামেন্টাল। গির্জা, মন্দির মসজিদকে সৃষ্টিকর্তার একমাত্র

উপসনাস্থল মনে করাও তেমনি অনাবশ্যককে অত্যাবশ্যক গণ্য করা। এ সব যারা করেন, তাঁরা নিজের ধর্মের মান-মর্যাদা না বাড়াইয়া হীন করিয়াই থাকেন।

আমার মনে হয়, মুসলমানদের ধর্মীয় নেতারাই এই ধরনের ভুল করিয়াছেন সবচেয়ে বেশি। এঁরা নামাজ-রোযা, অযু-গোসল ও তসবিহ তেলাওয়াতকে ধর্মের ফাণ্ডামেন্টাল খাড়া করিয়া ঐ সব দিয়া মুসলমানদেরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এটা করিতে গিয়া তারা নিজেদের যুক্তির ফাঁদে নিজেরাই ধরা পড়িয়াছেন। যার ফলে নামাজে বুকের উপর ও নাভির নিচে তহরিমা বাঁধা লইয়া, যানাযার নামাজে মাইয়াতের বুক বরাবর বা শির বরাবর দাঁড়ান লইয়া, বার-তকবির ছয়-তকবির লইয়া, জোরে বা আস্তে আমিন বলা লইয়া মুসলমানে-মুসলমানে খুনাখুনি ঘটাইয়াছেন। এর প্রতিকার একমাত্র টলারেন্স। কিন্তু টলারেন্সকে এরা ভয় পান এই জন্য যে, তাতে ধর্ম থাকে বটে, কিন্তু ধর্মীয় দল থাকে না।

১২. ধর্ম বনাম ধর্মীয় দল

অতএব দেখা যাইতেছে, মুসলমানদের মধ্যে যে ধর্মীয় কড়াকড়ি সেটা ইসলামের খাতিরে নয়, মযহাব বা ধর্মীয় দলের খাতিরে। আমার চাচাজীর মত সব খাঁটি মুসলমানরাই মনে করেন, তাঁর নিজের মযহাব না টিকিলে ইসলাম টিকিবে না। ফলে সব মযহাবের মুসলমানরাই অন্য মযহাবের মুসলমানদের মোকাবিলায় নিজেদেরই ইসলামের একমাত্র রক্ষক মনে করিয়া থাকে।

ঠিক তেমনি বড় বড় সব ধর্মের উম্মতেরাই নিজেদেরে আল্লাহর বডিগার্ড মনে করিয়া থাকে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম এই চারটি ধর্মই বিশ্বের বড় ধর্ম। এই সব ধর্মের শাস্ত্রেই লেখা আছে : 'ধর্মে যবরদস্তি নাই; 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার। অথচ এই উচ্চস্তরের নৈতিক শিক্ষা সত্ত্বেও ধর্মে-ধর্মে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে। কিন্তু এটাই এদেরে বড় দুর্বলতা নয়। এর চেয়েও বড় ত্রুটি এদের মধ্যে রহিয়াছে। সে ত্রুটি এই যে, বহু ধর্মের বিশ্বাসীরা মনে করে এদের অন্তর্ভুক্ত যারা নয়, তারা সবাই অধার্মিক, কেবলমাত্র এরাই আল্লার রক্ষক। ভাবটা এই যে, এই সব ধর্ম না থাকিলে আল্লায় বিশ্বাসী আর কেউ থাকিবে না। বিশ্বাসী না থাকিলে কাজেই আল্লাও থাকিবে না।

১৩. ধর্ম বনাম আল্লাহ

কিন্তু এটা সত্য নয়। ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লা-বিশ্বাসের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। কোনও ধর্মে বিশ্বাস করিতে গেলে একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করিতে হয় সত্য, কিন্তু একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করিতে গেলেই একটি ধর্মে বিশ্বাস করিতেই হইবে, তার কোনও মানে নাই। ধর্ম ও আল্লার মধ্যে ফাণ্ডামেন্টাল পার্থক্য এই যে ধর্ম পরিবর্তনশীল, আল্লাহ শাশ্বত, তার কোনও পরিবর্তন নাই। সেজন্য ধর্ম অনেকগুলি, আল্লাহ এক। ধর্মকে রক্ষা করিতে হয় মানুষের, আল্লাহ নিজেকে নিজেই রক্ষা করেন। মানুষ ধ্বংস হইলে ধর্মের অবসান হইবে। কিন্তু আল্লাহ থাকিবেন। ধর্ম মনের জিনিস, আল্লাহ অন্তরের জিনিস। ধর্ম বুঝিতে হয় বুদ্ধি দিয়া, আল্লাহ অনুভব করিতে হয় অন্তর দিয়া। ধার্মিকরা যে মনে করেন, আল্লাহকে মানুষের মনে তাঁরাই জিয়াইয়া রাখিয়াছেন, এটা তাদের দেমাগ-তুকাব্বরি। এটা তাদের অহংকার। এ অহংকার নাস্তিকের অহংকারের চেয়ে কোনও অংশে কম দাম্ভিক নয়। আল্লার অস্তিত্ব এমনি একটা বস্তু যা সাধারণ মানুষ সব সময় দেখে না; শুধু

বিশেষ অবস্থায় দেখিতে পায়। একটা মামুলি দৃষ্টান্ত দেই। সাহসী মানুষ ভয় কাকে বলে জানে না। কিন্তু ভয় বলিয়া কোনও বস্তু নাই, এ কথা সেও বলিতে পারে না। অবস্থা-বিশেষে খুব সাহসী মানুষও ভয় পায়। সাধারণ মানুষও শুধু অবস্থা-বিশেষেই আল্লাহকে দেখিয়া থাকে। আল্লাহ অরূপ, নিরঞ্জন, নিরাকার। কাজেই এই রূপহীন আল্লাকে মানুষ যার-তার অন্তরের ব্যাপ্তি দিয়াই অনুভব করিবে। যার-তার অন্তরের ব্যাপ্তির পরিধির সাথে মিল রাখিয়াই সেই অরূপ রতন রূপবিশেষে ধরা দিবেন। সে রূপ আসলে আল্লার রূপ নয়, দর্শকের সসীম অন্তদৃষ্টির 'গোস্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ। আল্লাহ দার্শনিক জালালুদ্দিন রুমীর বিশাল অন্তরেও ধরা দিতে পারেন, তাঁর কল্পিত নাপিতের ছোট্ট অন্তরেও ধরা দিতে পারেন। এটাই আল্লার কুদরত, তার অপূর্ব মহিমা। এই মহিমার জোরেই তিনি সকল মানুষের মনে জাগ্রত আছেন। কোনো ধর্মের অনুগ্রহে বা প্রচার-বলে নয়।

কিন্তু সকল অবস্থায় মনে রাখিতে হইবে, ধর্মের সবচেয়ে বড় গুণ হইতে হইবে পরমতসহিষ্ণুতা। হইতে হইবে মানে ধর্ম-বিশ্বাসীদের আচার-ব্যবহারে প্রযুক্ত ও প্রকট হইতে হইবে। আমাদের কোরআন শরিফের দুইটি সুস্পষ্ট উক্তি: 'ধর্মে কোনও যবরদস্তি নাই' ও 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার এই বাঞ্ছিত পরমতসহিষ্ণুতার অমর বুনিয়াদ। উক্তিদ্বয়ের যে মর্মার্থই যিনি করুন না কেন, তার মধ্যেও এই পরমতসহিষ্ণুতার নীতিই বলবৎ থাকিবে। ধর্মের ব্যাপারে যে কথাটা শাশ্বত সত্য এবং যে সত্যটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হইয়াছে, তা এই যে পরমতসহিষ্ণুতাই ধর্মের শক্তি, অসহিষ্ণুতাই তার দুর্বলতা।

কাজেই আমার মন বলিল, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অথবা তার ক্রুটি সংশোধনের জন্য সময় ও শ্রম নষ্ট না করিয়া মুসলমানদেরে কেমন করিয়া সাধু, সৎ ও সুন্দর মানুষরূপে গড়িয়া তোলা যায়, সেদিকে মনোযোগ দেওয়াই সৎ মুসলমানের প্রধান কর্তব্য।

### ১৪. মানব বনাম মুসলমান

আমার এই মতবাদ কি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক নয়? শুধু মুসলমানদের কল্যাণ চিন্তা করার কারণ কী? অমুসলমানদের প্রতি কি আমার কোনও কর্তব্য নাই? কথাটা যে-কেউ বলিতে পারিতেন-কোনও অমুসলমান বন্ধু ত নিশ্চয়ই। কিন্তু এটা বলিলেন আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ এক মুসলমান বন্ধুই। তিনি আমাকে কোনও জবাব দিবার সুযোগ না দিয়াই বলিয়া গেলেন : দেখ, তুমি একজন সাহিত্যিক, তুমি চিন্তাবিদ, আজীবন কৃষক-প্রজা আন্দোলন করিয়াছ। মযলুমের পক্ষে যালিমের বিরুদ্ধে জিভ ও কলম চালাইয়াছ। এই দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই তুমি খাদেম, মানবতাই তোমার ধর্ম। কিন্তু আজ একটি কথা তোমার মুখে শুনিয়াতেছি?

কিন্তু আমার বন্ধু একা ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন তিনজন। তিনজনের দুইজনই ধর্মবিরোধী। মানবপ্রেমী। ধর্মবিরোধী কথাটা ঠিক নয়। দুইজনই মানব-ধর্মী। তাদের কাছে হিউম্যানিযমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। একজন বিপ্লবী মুসলমান।

অসুবিধা এই যে আমি বন্ধুদের নাম উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। তাঁরা যে পজিশন ও পরিবেশে আছেন, তাতে বোধ হয় এই ধরনের কথা সহকর্মীদের বলিতে পারেন না; বলিলে বোধ হয় তাঁদের

অনিষ্ট হইতে পারে। তাই বোধ হয় তাঁদের রুদ্ধগতি স্বাধীন চিন্তার স্রোত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমাকে ভাসাইয়া নিবার উপক্রম করিয়াছে।

আমি তর্কে না নামিয়া বলিলাম : মানবপ্রেম অতি বড় কথা। মানবসেবা অতি বড় কাজ। সে কাজ শুরু করিবার আগে মুসলমানদের সেবার হাত মশ করিতেছি মাত্র। আর মানবধর্ম কথাটা অর্থহীন হিউম্যানিযম একটি মেটাফিজিকস মাত্র।

এইবার বন্ধু স্বরূপে প্রকাশ পাইলেন। বলিলেন : ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা হইতেই তুমি এ কথা বলিতেছ। ইসলামের ভ্রাতৃত্ব মুসলিম-ভ্রাতৃত্ব নয়, ওটা মোমিন-ভ্রাতৃত্ব। মুসলমান সমাজের বাহিরেও মোমিন আছে এবং আমার অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি, অমুসলমান মোমিনের সংখ্যাই বেশি।

আমি হাসিয়া বলিলাম : আমিও তোমার পথেরই পথিক। তুমিও বিপ্লবী নও রিফর্মিস্ট, আমিও তাই। তোমার চিন্তার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ, আমারও তাই। তুমি ইসলামকে সংশোধন করিতে চাও, আমি মুসলমানকে সংশোধন করিতে চাই। ইসলামকে সংশোধন করিতে পারিলে তার পরে তুমি অন্য ধর্ম সংশোধনে হাত দিবা। মুসলমানকে সংশোধন করিতে পারিলে পরে আমিও অন্যান্য ধর্মের লোকদেরে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। কেতাব সংশোধনের চেয়ে মানুষ সংশোধন, মনের চিকিৎসার চেয়ে দেহের চিকিৎসাই অনেক ছোট ও সহজ কাজ বলিয়াই আমি এ কাজ করিতে চাই। বড় কাজকে সত্যই বড় কাজ মনে করি বলিয়াই প্রথম চোটেই তাতে হাত দিতে সাহস পাই না।

বন্ধুরা সমস্বরে বলিলেন : কিন্তু যত ছোট এলাকা লইয়াই তুমি সেবার কাজ শুরু কর না কেন, তোমার সেটা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিবে কেন?

আমি জবাব দিলাম : মুসলমানরাই সবার থনে বেশি নির্যাতিত, নিপীড়িত, দরিদ্র ও নিরক্ষর বলিয়া সেবার প্রয়োজন তারারই বেশি।

সকলে মাথা নাড়িয়া বলিলেন : অমুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, নির্যাতিত, নিরক্ষর লোক নাই বলিতে চাও?

আমি : নিশ্চয়ই আছে। নাই বলিব কেন? তবে তাদের মধ্যে সেবক ও সংস্কারকও আছেন অনেক। তাঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও প্রফুল্ল চন্দ্র আছেন অনেক। তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের জন্য দান করিবার মত দাতাও আছেন বেশ কিছু।

তাঁরা : আমাদের মধ্যেও ত ধনী আছেন, তাঁরাও ত দান-খয়রাত করেন?

আমি : আছেন। কিন্তু তারা তোমাদের মতই ইসলাম সংস্কার লইয়া ব্যস্ত। মুসলমানদের কল্যাণের কথা তারা ভাবেন না। তাঁরা মসজিদ নির্মাণে তাদের টাকা ব্যয় করেন যাতে মুসলমানরা বেহেশতে যাইতে পারেন। মুসলমানদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের জন্য তারা স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল দাওয়াখানার টাকা খরচ করেন না।

তাঁরা : কেন হাজী মোহাম্মদ মহসিন?

আমি: এবার তোমরা ঠিক কথা বলিয়াছ। যে কারণে হাজী সাহেব মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য সম্পত্তি ওয়াফ করিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই কারণে আমিও আমার নিজের কর্ম-শক্তিতে মুসলমানদের সেবায় লাগাইবার দায়িত্ববোধ করিতেছি। আমার এই মুসলিম-প্রীতির মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষ নাই, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাও নাই। প্রধানত মুসলমানদের সেবা করিতে গিয়া যদি দেখি তাতে হিন্দুরও সেবা হইয়া যাইতেছে, তবে তাতে সুখীই হইব। হাজী মহসিনের টাকায় হিন্দুদের 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমরা যখন কৃষক-প্রজা আন্দোলন শুরু করি, তখন আমাদের সামনে ছিল মুসলমান রায়তরাই। কিন্তু পরিণামে হিন্দুরাই তার ফল ভোগ করিয়াছে।

# ১১. হক্কুল এবাদ

## অধ্যায় এগার – হক্কুল এবাদ

### ১. বুদ্ধির মুক্তির সামাজিক দিক

মানব-মনের আযাদি, বুদ্ধির মুক্তি, স্বাধীন চিন্তা ইত্যাদি আজিকার তরুণ মনের স্বাভাবিক ক্ষুধা এবং সজীব সক্রিয় মনের লক্ষণ। কিন্তু এ সবেরই একটা ব্যক্তিগত ও একটা সামাজিক দিক আছে। পুরাকালের মুনি-ঋষি ও সুফি-দরবেশের আধ্যাত্মিক সাধনার মতই মানবমনের আযাদির একটা নিজস্ব মূল্য আজও আছে। কিন্তু সে মূল্য নিতান্তই ব্যক্তিগত যদি তা মানবসেবায় না লাগে। ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আধ্যাত্মিক উচ্চতা, বুদ্ধির পার্থক্য ও সাধারণ ধন-দৌলতের দাম একই। সমাজের কোনও কাজে লাগে না। আপনি যত মুক্তবুদ্ধির লোকই হউন, আপনার বুদ্ধি যদি সমাজের কাজে না লাগে, তবে সমাজের দিক হইতে আপনার বুদ্ধির দাম কানাকড়িও না। স্বার্থপর ধনী যেমন করিয়া নিজের বিলাসিতায় গড়াগড়ি করে, আপনিও তেমনি মুক্তবুদ্ধির বিলাসিতায় গড়াগড়ি পাড়েন। দুইটা একই জিনিস।

এই জন্যই মুক্ত-বুদ্ধিমান ও স্বাধীন চিন্তকরা পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে চিন্তা করিবেন ঠিকই, কিন্তু কথা বলিবেন খুব সাবধানে। কথা ও কাজের দ্বারা সুধী সমাজ যদি সমাজের 'গোলাকার ঘেঁদার জন্য চার কোনা পেরেক' হইয়া যান, তবে সমাজের কোনও কাজে তারা লাগিবেন না। কাজেই তাদের মুক্তবুদ্ধিকে জনগণের বুদ্ধির মুক্তির কাজে প্রয়োগ করিবার জন্যই তাঁদেরে সমাজের দেহে 'ফিট-ইন করিতে হইবে, খাপ খাওয়াইতে হইবে। এটা করিতে হইলে মুক্তবুদ্ধির লোককে দরদি হইতে হইবে। যতই পতিত, বুদ্ধিহীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হউক না কেন, জনগণকে ভালবাসিতে হইবে। নিজের মুক্তবুদ্ধির অহংকারে ফাটিয়া পড়িলে চলিবে না। আস্তে আস্তে জ্বলিয়াই বাতি আলো দিতে পারে। ফাৎ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে আলো দেয়ার পরিবর্তে ঘর পুড়িয়া ফেলিবে।

### ২. মুক্তবুদ্ধি বনাম চিন্তার অস্থিরতা

আমার ধর্মজীবন সম্বন্ধে এতক্ষণ যেসব কথা ও কাজের উল্লেখ করা হইল, তাতে পাঠকরা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে, বিপুল ওঠা-নামা, উত্থান-পতন ও ওলট-পালটের মধ্যে দিয়াই আমার চিন্তা-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। কোনও এক স্তরে বেশি দিন স্থির থাকে নাই। অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এটাকে আমার মানসিক অস্থিরতা, মেন্টাল ইনস্ট্যাবিলিটি বলিয়াছেন। কেউ বলিয়াছেন, এটা চিন্তার গভীরতার ও মতের স্থৈর্যের অভাব। কেউ সোজাসুজি এটাকে মতহীনতাও বলিয়াছেন।

আমি কিন্তু তাতে বিচলিত হই নাই। কারণ আমি জানিতাম, আমার চিন্তার গভীরতা আছে বলিয়াই তলার সন্ধান পাইতেছি না। যাদের চিন্তা অগভীর ও ভাসা-ভাসা তারাই প্রচলিত সত্যকে সত্য মানিয়া বসিয়া থাকেন। মনের দিক হইতে তাঁরা হয় অলস, নয় ত ভীরু। অলস এই জন্য যে তাঁরা মন ও মগজ খাটানোর শ্রমটুকু করিতে চান না। আর ভীরু এই জন্য যে চিন্তার জঙ্গলে প্রবেশ

করাকে তারা নিরাপদ মনে করেন না। সকলেই জানেন বিপদ-আপদের ভয়ে যারা জঙ্গলে ঢুকিতে বা সামনে আগ বাড়িতে ভয় পান, তাঁরা জ্ঞানের অনেক সম্পদ ও মণি-মুক্তা হইতেই বঞ্চিত থাকে।

মুনশী-মৌলবী-মুরুব্বিরার কাছে বিশেষত চাচাজী মুনশী ছমিরুদ্দিন সাহেবের কাছে দর্শন-বিজ্ঞানের কঠোর নিন্দা শুনিতাম। চাচাজী ওগুলিকে 'ফালসাফা' বলিতেন। 'ফালসাফা' (ফিলোসফি) শয়তানের এলেম, ও এলেমে ঈমান নষ্ট হয়, এসব কথা প্রায়ই তিনি বলিতেন। ফালসাফাঁকে তিনি নজুমির (জ্যোতিষীর) মতই কুফরি বুদ্ধি বলিতেন। কলেজে দর্শন পড়িয়া এবং বিজ্ঞানের ছাত্র সহপাঠীদের সাথে আলোচনা করিয়া চাচাজীর কথার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। সত্যই দর্শন-বিজ্ঞান আমাদের ঈমান নষ্ট, অন্তত শিথিল করিয়াছে। তখন হিন্দু মুরুব্বিদের অনেকের কথাও মনে পড়িয়াছে। তাদের মুখে প্রায়ই শুনিতাম : 'বিশ্বাসে লভয়ে হরি, তর্কে বহুদূর'। তর্কশাস্ত্রে সত্য-সত্যই তত দিনে আমাদেরে 'হরি' হইতে অনেক দূরে নিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু সে দূরত্ব বেশি দিন থাকে নাই। আস্তে-আস্তে ঢুকিবার, পানিতে নামিবার, অথবা তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদী পার হইবার সুফল আস্তে-আস্তে পাইতে লাগিলাম। স্তরে-স্তরে সেসব পরিবর্তনের কথা আগেই বলিয়াছি। শেষ বয়সে, এই আত্মকথা লিখিবার সময়ে, সেসব মানসিক চাঞ্চল্য আর নাই। চরম সত্য বা শেষ জ্ঞান লাভ করিয়া ফেলিয়াছি, নিশ্চয়ই এ কথা বলিতেছি না। জ্ঞানের শেষ নাই। চরম সত্য লাভও সম্ভব নয় মানবজীবনটাই জ্ঞানসাধনার একটা প্রসেসমাত্র। এটা অবশ্যই দার্শনিক দৃষ্টিকোণের কথা।

৩. বিজ্ঞান ধর্মবিরোধী নয়

দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি সবাই মিলিয়া ধর্মের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। এই কারণে আধুনিককালে একদিকে যেমন দর্শন বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া ধর্মকে সংস্কার বা আধুনিকীকরণের চেষ্টা চলিতেছে। অপরদিকে ধর্মকে দিয়া দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলিতেছে। এসব চেষ্টার ঐতিহাসিক কারণ আছে। ঐ কারণেই ন্যায়, নীতি, ইনসাফ সুবিচার, এথিকস, মরালিটি, জাসটিস ও ফেয়ারপ্লেকে একার্থবোধক একাঙ্গিকরণ করা হইয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিও, মিথ্যা বলিও না, 'পরের দ্রব্য হরণ করিও না', 'এতিমে হেফাযত কর', 'কারো উপর যুলুম করিও না,' এসব সকল ধর্মেরই উপদেশ। এই কারণেই ঐ সব উপদেশকে আমরা ধর্মের শিক্ষা বলিয়া মনে করি। ব্যাপক অর্থে এ সবই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে যেমন সব জ্ঞানই বিজ্ঞান। কিন্তু নির্দিষ্ট সীমিত অর্থে যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির স্বতন্ত্র ও নির্ধারিত এলাকা রহিয়াছে, তেমনি ন্যায়-নীতি, আচার-নীতি, বিচার-নীতি, এথিকস, মরালিটি, ধর্ম ও রিলিজিয়নের স্বতন্ত্র এলাকা আছে। এটা বুঝিতে জাতি-মানুষের যেমন সময় লাগিয়াছে, ব্যক্তি-মানুষেরও তেমনি সময় লাগে। মানবজাতি অনেক বয়সে, বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এই জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ব্যক্তি-মানুষেরও এ জ্ঞান লাভ হয় বেশি বয়সে। আমার নিজের জীবনের বিভিন্ন বয়সে, বিভিন্ন পরিবেশে, ধর্ম সম্বন্ধে এমনকি খোদ আল্লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে, বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী চিন্তা-ধারার মধ্য দিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, সজীব ও সক্রিয় মনের এটাই স্বাভাবিক ধর্ম। অমন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আঁকাবাকা সংকীর্ণ পথেই মানুষের। মন বিকশিত হয়। আমার মত নগণ্য ব্যক্তি ত বটেই, দুনিয়ার সব বড়-বড় চিন্তাবিদ, পণ্ডিতদের জীবনেও এমনটাই ঘটিয়াছে। এমন যে মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ,

হুজ্জতুল ইসলাম (আরগুমেন্ট-অব-ইসলাম) উপাধিতে ভূষিত ইমাম গাযযালীকেও এই আঁকাবাকা সংকীর্ণ অন্ধকার গলিপথেই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সুফি আলেম পিতার ঔরসে জন্মলাভ করিয়াও, ধর্মীয় পরিবেশে প্রতিপালিত হইয়াও, এবং শৈশব হইতে ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়াও যৌবনে তিনি নাস্তিক হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘদিনের সাধনা, চিন্তা, মেডিটেশন, অধ্যয়ন দ্বারাই তিনি এই নাস্তিক্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এটাই স্বাভাবিক। সজীব ও সক্রিয় মনের বিকাশের ধারাই এই। কৌতূহল হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা হইতে সন্দেহ, সন্দেহ হইতে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস হইতে অনুসন্ধান এবং সর্বশেষ অনুসন্ধান হইতে সত্য লাভ। বিশেষ সাধনা করিলে এটা মধ্যবয়সেও ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণত এটা অধিক বয়সেই ঘটিয়া থাকে।

৪. অন্ধভক্তি নয়, অর্জিত উপলব্ধি

ধর্ম সম্বন্ধে সারা জীবন চিন্তা-ভাবনা করিয়া মুক্তবুদ্ধির জোরে এদিক-ওদিক, ডাইনে-বামে, উপরে-নিচে, দশ দিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া, বলিতে গেলে একেবারে আকাশ-পাতাল বেড়াইয়া, বৃদ্ধ বয়সে একরূপ ক্লান্ত হইয়াই এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ধর্মে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। ধর্ম, আত্মা ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ধারণা তিনটি এতই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, যে একটিতে বিশ্বাস করিলে অপরটিতে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। আবার এই তিনটি বিশ্বাসই মানবতা-বিশ্বাস হইতেই উদ্ভূত। অথচ খোদা-ধর্ম ও আত্ম-অবিশ্বাসীরা দার্শনিক নাস্তিকই হউন, আর কমিউনিস্ট নাস্তিকই হউন, সবাই কিন্তু মানবতা-বিশ্বাসী। বস্তুত মানবতার খাতিরেই তারা বর্ণ, শ্রেণী ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থা চান। আনুষ্ঠানিক ও সংঘবদ্ধ ধর্ম তাঁদের অভীষ্ট লাভের প্রতিবন্ধক, এই অজুহাতেই তারা ধর্ম, খোদা ও আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু মানবতা একটা বিমূর্ত ধারণামাত্র নয়। ব্যক্তি মর্যাদার উপরই প্রকৃত মানবতা প্রতিষ্ঠিত। আত্মার ধারণা ব্যক্তি-মর্যাদারই প্রসারিত রূপ। ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তার অনিবার্যতাও এইখানেই। ধর্মের দাবির এটা রক বটম। একদম হাড়ডি বা স্কেলিটন বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্র, সমাজ, আইন-কানুন, শিল্প-বাণিজ্য আর্ট-সাহিত্য ধর্মের সনাতন এলাকার অনেকখানি দখল করিয়াছে। অভিজ্ঞ আত্মবিশ্বাসী মুরুব্বির মতই ধর্ম সে বেদখল মানিয়াও লইয়াছে। এখন ধর্মের এই সংকীর্ণ এলাকা এমন এক জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, যেখানে বিজ্ঞানকেও ধর্মের আধিপত্য ও একক এলাকা মানিয়া লইতে হইবেই। মৃত্যুতেই মানবজীবনের অবসান, এটা যারা বলেন বা বিশ্বাস করেন, তাঁরা মানবজাতিকে অন্য সব স্পেশিসের সমপর্যায়ে ফেলেন। তাঁরা সঙ্গে-সঙ্গে 'পাশবতার কথা না বলিয়া শুধু মানবতার কথা বলিতে পারেন না।

৫. শ্রেষ্ঠ মাবুদ

মহান সৃষ্টিকর্তা, পরকাল, আত্ম ও ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত মানবীয় মর্যাদা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটা ছাড়া অন্যটার কল্পনা করা যায় না। অবশ্য সৃষ্টিকর্তার ব্যক্তিত্বের, পরকালের পদার্থকতার ও ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার স্থূল ধারণার বাহিরে ও উর্ধ্বে ঐসব ধারণা থাকিতে হইবে। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির ফলে মানুষ যতই কুসংস্কারমুক্ত হইবে, ঐসব ধারণাও ততই পরিচ্ছন্ন হইবে। মুক্তবুদ্ধি হওয়া মানে, লজিকের বন্দী হওয়া নয়। লজিকের এলাকা ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের বাইরে কিছু নাই যারা মনে করেন, মানুষ হায়ওয়ান ছাড়া আর কিছু নয় যারা বলেন, মৃত্যুতেই মানব-জীবনের অবসান যারা বিশ্বাস করেন, তাঁদের জন্য ধর্ম, খোদা ও পরকালের অস্তিত্ব

সত্যই অবান্তর। ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম বাদে মানুষ সাধারণভাবে পরাশ্রয়ী। প্রকৃতিগতই হউক, আর শৈশবের পরিবেশের ফলে হউক, মানুষ নিরাপদ আশ্রয় চায়। সে আশ্রয়কে আশ্রয়প্রার্থীর চেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতাবান ও বুদ্ধিমান হইতে হয়। মানবসভ্যতার শৈশবে এই আশ্রয় ছিল পেটার ফ্যামিলিয়া, গোষ্ঠী-নেতা, রাজা-বাদশাহ। এখন তা রূপ নিয়াছে ডিক্টেটর বা ফাদার-ইমেজের গণতান্ত্রিক নেতার। ব্যক্তিপূজা বা পার্সনালিটি কাল্ট যাদের অভিমানে বাধে তারাই প্রবর্তন করিয়াছেন রাষ্ট্রপূজা। এক রূপে না এক রূপে পূজাই যখন করিতে হইবে, তখন শরীরী মাবুদের চেয়ে নিরঞ্জন মাবুদই কি মানুষের আত্মমর্যাদার দিক হইতে উন্নততর নয়?

## ৬. বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ আইনস্টাইন

কিন্তু অন্ধবিশ্বাস কখনই অর্জিত আস্থার স্থলবর্তী হইতে পারে না। আমাদের মুরুব্বিরা যে নাস্তিকের ভয়ে ‘ফালসাফা বা দর্শনশাস্ত্র পড়ার বিরোধী ছিলেন, আসলে সে ভীতি ছিল অমূলক। প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর কাছে দর্শন-বিজ্ঞান নাস্তিক্যের শিক্ষা-দাতা হইতে পারে না। তার প্রমাণ আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি বলিয়াছেন : ‘আবেগের সাথে যার পরিচয় নাই, যে বিস্ময় ও ভক্তির আবেশে স্তব্ধ হয় না, সে মৃত। তার চোখ অন্ধ। সচেতন জীবন নিজেকে কেমন করিয়া অনন্তের মধ্য দিয়া চিরস্থায়ী করিতেছে তা ধ্যান করিতে, দুনিয়া জাহানের দুর্বোধ্য-গঠন-কৌশল সম্বন্ধে ধারণা করিতে এবং প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত বুদ্ধিমত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাংশ বিনয়াবনত অবস্থায় অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে পারাই আমার জন্য যথেষ্ট।

রহস্যময়ের সামনে, গায়েবি কুদরতের কাছে, এমন বিনয়-নম্র ভক্তির স্তব্ধতা ও তাকওয়ার আত্মসমর্পণই জ্ঞানের পরিপক্ক পূর্ণতা। প্রকৃত জ্ঞান কখনও অহংকারী হইতে পারে না। বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীর এই বিনতিনম্রতা, এই আজিযী-এনকেসারিই প্রকৃত বিজ্ঞানীর আত্মোপলব্ধির প্রমাণ। আইনস্টাইনের এই অমূল্য উক্তিটি যদিও ১৯৩০ সালের ঘটনা, আমি কিন্তু ওটা পড়িয়াছিলাম তার বিশ-পঁচিশ বছর পরে। প্রবাদের ‘অল্পবিদ্যা। ভয়ংকরীর সত্যতা উপলব্ধি করিতে শুরু করি আমি তার বহু আগেই। ছাত্রজীবনে দর্শনশাস্ত্রে যখন ডারউইনের উদ্বর্তনবাদ বা থিওরি-অব ইভলিউশন পড়িলাম, তখন কোরআন-বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বের উপর আস্থা হারাইলাম। আদম-হাওয়ার কিস্সাকে সত্যই মাইথলজির কাহিনী মনে করিলাম। ধর্মে ও সৃষ্টিকর্তার সন্দেহ অবিশ্বাসে পরিণত হইল। নাস্তিক্যের ভিত্তি মযবুত হইল।

## ৭. ধর্মবোধের ভিত পাকা

কিন্তু বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধি সাথে সাথেই বুঝিতে শুরু করিলাম, ধর্মীয় সৃষ্টি তত্ত্ব ও থিওরি-অব-ইভলিউশন-এর পরস্পর-বিরোধিতা অত দৃঢ় ভিত্তিক নয়। ক্রমশ এই উপলব্ধি ঘটিল যে ইভলিউশন’ ক্রিয়েশন নয়; উদ্বর্তন সৃষ্টি নয়; পরিবর্তন মাত্র। পদার্থজগতে যেমন আমরা দেখিতে পাই কোনও বিজ্ঞানই সৃষ্টি করে না, রূপান্তর ঘটায়মাত্র, আদমের বেলা ডারউইনিযমও ঠিক তাই করিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞান বিজলি, অণু-পরমাণু ও বোমা সৃষ্টি করে না। রসায়নবিজ্ঞানও তেমনি পানি বা অষুধ সৃষ্টি করে না। বিদ্যমান। বস্তুসমূহের পরিবর্তন, বিয়োজন ও সংযোজন করিয়া তাদের রূপান্তর ঘটায়মাত্র। বিজ্ঞান যেমন প্রকৃতির রহস্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছে, উদ্বর্তনবাদও তেমনি আদম-সৃষ্টি-রহস্যের সামান্য অতি সামান্য অংশই বুঝাইতে সমর্থ

হইয়াছে। উদ্বর্তনবাদ মানুষের জীবন, আত্মা, মন, হৃদয়, ঘৃণা-ভালবাসা, বুদ্ধি-চেতনা কোনোটারই সৃষ্টির ব্যাখ্যা আজও দিতে পারে নাই।

বিজ্ঞান সম্পর্কে এই বিজ্ঞানী মনোভাবই পরিণামে ধর্মকে তথাকথিত বিজ্ঞানের হামলা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। দর্শন সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। সাধারণ দৃষ্টিতে বিজ্ঞান যে ধর্মবিরোধী, তার আসল রূপ এই যে, ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও সে সম্বন্ধে ধর্মানুসারীদের ধ্যান-ধারণাকেই বিজ্ঞান ভ্রান্ত, অসত্য ও মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছে। আসলে কোনও অনুষ্ঠানই ধর্মের প্রাণ-বস্তু নয়। ও-সব সামাজিকতা। পুরা ঈমান, পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসই ধর্ম, অন্ধ অনুষ্ঠান ধর্ম নয়। ধর্মের এই রূপকেই বলা হয় স্পিরিচুয়াল বা রুহানি দিক ও এথিক্যাল, আখলাকি বা চারিত্র্য-নীতিক দিন। ইসলাম ধর্মে এই দুই ভাগের একটিকে বলা হয় হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক এবং হক্কুল এবাদ' বা মানুষের হক। প্রথমটা সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের কর্তব্য, দ্বিতীয়টা মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য। আল্লার প্রতি কর্তব্য-বিচ্যুতির অপরাধে কারো বিচার করিবার অধিকার মানুষের নাই। সে বিচারের মালিক খোদ আল্লাহ। এই কথাটাই কোরআনে বলা হইয়াছে : ধর্মের ব্যাপারে কোনও যবরদস্তি নাই। ধর্ম এখানে হক্কুল্লাহ রুহানি বা স্পিরিচুয়াল ধর্ম। ধর্মের হক্কুল এবাদ অংশে ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারের বিচার মানুষ করিতে পারে, করা তার কর্তব্যও। এটা তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব। এই হল এবাদই ধর্মের সামাজিক রূপ।

৮. ধর্মের রুহানিয়াত অব্যয়

দৈহিক শৈশবের নফলিয়াত দিয়া আমার ধর্ম-জীবনের কাহিনী শুরু করিয়াছিলাম। আত্মিক শৈশবের রুহানিয়াত দিয়া তা শেষ করিতেছি। যেখান হইতে শুরু সেখানেই শেষ ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। কুল্লু শাইয়েন ইয়ারজুউ ইলা আসলেহি। আলিমুল-গায়েবের কাছে মানুষ সারা জীবনই শিশু। তরুণ শিশু ও বৃদ্ধ শিশু, এই যা পার্থক্য। সারা জীবন জ্ঞান আহরণ করিয়া এই জ্ঞান লাভ করিলাম যে এক পরমাণু জ্ঞানও লাভ করিতে পারি নাই। আইনস্টাইনের সাথে এই কথা বলিতে পারাই জ্ঞানীর লক্ষণ। এই জ্ঞানটুকুও আমরা লাভ করি সারা জীবনে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। জ্ঞানের যৌবনে আমরা পাঁচ ইন্দ্রিয় ছাড়া আর কারো সাক্ষ্য মানি না। বার্ধক্যে পৌঁছিয়া ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সত্তা উপলব্ধি করি। জ্ঞানের যৌবনে যারা মোরাকেবা, মোশাহেদা, তাসাওওয়াফ ও যোগাসনকে কুসংস্কার বলেন, জ্ঞানের বার্ধক্যে তারাই 'ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশন' ও 'এক্সট্রা-সেনসরি পারসেপশন'-কে বিজ্ঞান আখ্যা দেয়। ধ্যান ও নেসবতে বায়নান্নাসকে তারাই হিপনোটিযম ও অটোসাজেশন' নামে বৈজ্ঞানিক সত্য এবং হাইপারটেনশনের ঔষধ রূপে গ্রহণ করেন। এ সবই তিন মাথাওয়ালা জ্ঞান-বৃদ্ধের সামনে জ্ঞান-যুবকের দাম্ভিক শক্তিমত্তার নতি স্বীকার। জ্ঞান জ্ঞানের সম্মান করিবেই।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর চরম উৎকর্ষে মানুষ আজ মহাশূন্যে অগণিত গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে উড়িয়া বেড়াইতেছে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীবের সন্ধানে। এ উদ্যম সফল হইলে এই ক্ষুদ্রতম গ্রহের মানুষ আর আশরাফুল মখলুকাত থাকিবে না। ফলে সব ধর্মের বুনিয়াদ ধসিয়া পড়িবে। ধর্মবিরোধীরা সে আশায় খুশি হইতেছেন। কিন্তু জীব পাইলেই ত হইবে না রুহও পাইতে হইবে। যদি তা না পাওয়া যায়, তবে কী হইবে?

## ১২. প্রচলিত পথে অগ্রসর

## **চতুর্থ খণ্ড**

## সাহিত্যিক জীবন (মামুলি)

## অধ্যায় বার - প্রচলিত পথে অগ্রসর

### ১. কৈফিয়ত

আমার সাহিত্যিক জীবনীকে দুই খণ্ডে ভাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কারণ এ দিককার জীবনটাই আমার দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ভিন্ন খাতে তা প্রবাহিত। সুলত দুই ভিন্ন দিকে। অদূরবর্তী ভিন্ন গন্তব্যের দিকে। পথ ও গন্তব্যের এ ভিন্নতার কারণ রাজনৈতিক। রাজনৈতিক কারণে দেশ ভাগ হইয়াছে। দেশ ভাগ হইলেও সাহিত্য ভাগ হয় নাই যারা বলেন, সে দলের আমি নই। আমার জন্য এটা নূতন কথা নয়। কারণ আমার বিচারে সাহিত্য মানেই জীবনভিত্তিক সাহিত্য। জীবন মানেই জন-জীবন। সে সাহিত্যের ভাষা মানেই গণ-ভাষা। আমার ক্ষেত্রে এ চিন্তাটা উৎপ্রেরণা, সহজাত। দেশভাগ যখন কল্পনাতীত ছিল, সেই ১৯২২ সালে আমি 'গোলামী সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তৎকালীন সাহিত্যিক দিকপালদেরে ধান ক্ষেত ভাঙ্গিয়া গোলাপ বাগান রচনা না করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। শ্রেণীর জন্য সাহিত্য রচনা না করিয়া জনগণের জন্য সাহিত্য রচনা করিবার দাবি করিয়াছিলাম। পরবর্তীকালে এ কথাটাকেই 'আইভরি টাওয়ার হইতে মাটির বুকে নামিয়া আসার কাজ বলিয়াছিলাম। এসব লেখার কথা পরে যথাস্থানে বলিব। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে সাহিত্যের বস্তু জনগণ। জনগণ মানেই একটি জনপদের, একটা ভূখণ্ডের, একটা দেশের, একটা রাষ্ট্রের জনগণ। আমাদের বেলা আগে এটা ছিল গোটা বেঙ্গল। বাটোয়ারার পর এটা প্রথমে পূর্ব বাংলা, পরে পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমানে বাংলাদেশ হইয়াছে। দেশভাগ হওয়ার ফলে কোন কোন ব্যাপারে কী কী পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তার ফলে সাহিত্যিকদের কর্তব্যের কী কী মোড় পরিবর্তন হইয়াছে, সেসব কথা পরে যথাস্থানে বলিতেছি। এখানে বলিতেছি শুধু সেইটুকু, দেশভাগ না হইলে একই দেশের সাহিত্যিক হিসাবে আমাদের যা কর্তব্য ও করণীয় ছিল। শুধু সেই পথে সেই উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সাধনার দায়িত্বটাই ছিল আমাদের সাহিত্যিকদের প্রচলিত মামুলি কর্তব্য ও করণীয়। দেশ ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত সব সাহিত্য-সেবকের মতই আমিও সেই গতানুগতিক পথেই চলিতেছিলাম। সেইটুকুই ছিল আমার এলাকা ও কর্তব্য এই কারণে এই মুদ্দতের সাহিত্য-সাধনাকে আমি মামুলি গতানুগতিক বা সাধারণ সাধনা বলিয়াছি। এই মুদ্দতের আমার সাহিত্যিক জীবনকেও কাজেই মামুলি সাহিত্যিক জীবনী' আখ্যা দিয়াছি। ঠিক এই কারণেই বিভাগোত্তর সাহিত্য-সাধনাকে নূতন, অভিনব, অসাধারণ, সুতরাং গরমামুলি বলিয়াছি। এই কারণেই দুই মুদ্দতের সাহিত্য-সাধনাকে, সুতরাং সাহিত্যিক জীবনীকে, স্বতন্ত্রভাবে দুই ভিন্ন খণ্ডে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি। দুই মুদ্দতের সাহিত্য ও সাহিত্যিকের দায়িত্বের চরিত্রটা অতিশয় সুস্পষ্ট। তবু এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করিতেছি। ১৯৪৭ সালে বেঙ্গল বাটোয়ারা হওয়ার আগ পর্যন্তও আমরা বাঙ্গালীরা সবাই এক দেশের নাগরিক ছিলাম। কলিকাতা আমাদের প্রশাসনিক, সুতরাং ব্যবসায়িক, কৃষ্টিক,

সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রভূমি ছিল। ইংরাজ আমলের প্রায় দুইশ বছর পূর্ব বাংলা কলিকাতার হিন্টারল্যান্ড ছিল এবং সেই হিসাবে দেশের মেজরিটি বাসেন্দার দেহ, মন ও মস্তিষ্ক কলিকাতার জীবনেও বাংলা সাহিত্যে অবহেলিত ছিল। ইংরাজ শাসনের অবসানে অবশ্য সে অবস্থা আর থাকিত না। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী চাপে ও প্রভাবে সারা বাংলার, সুতরাং মেজরিটি জনগণের সার্বিক রূপ কলিকাতার সাহিত্যে প্রতিফলিত হইতই। অবিভক্ত বাংলা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইলে ত কথাই নাই, অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে ভারতীয় ইউনিয়নের বা ফেডারেল পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য হইলেও গণতান্ত্রিক অন্তর্নিহিত শক্তিতেই রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রেও এটা ঘটিত।

স্মরণীয় ব্যাপার এই যে, ইংরাজ আমলের দুইশ বছরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে বিপুল ও সার্বিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক কারণে তার মোল আনা উদ্যোগ ও কৃতিত্ব ছিল হিন্দুদের। মুসলমানদের তাতে কোনও অংশদারিত্ব ছিল না। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণেই এই উন্নত বাংলা সাহিত্যের গোটা চেহারাটাই ছিল হিন্দুদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির রূপায়ণ। শরিক হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমানেরা সেখানে শুধু অনুপস্থিতই ছিল না, ঐ সাহিত্যের তারা বাঙ্গালী বলিয়া স্বীকৃতই ছিল না। এসব কথাই দুই খণ্ডের যথা-যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, বাংলা-সাহিত্যের এই চেহারার জন্য হিন্দুরাই এমন দোষী ছিলেন না। মুসলমানদের এই সাহিত্যিক অবমূল্যায়নের জন্য তারা নিজেরাও কম দায়ী ছিলেন না। বিশ শতকের গোড়া হইতেই দেশে গণতান্ত্রিক জাগরণের ফলে দেশের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনের যে লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হইতে শুরু করিয়াছিল। রাজনৈতিক কারণে দেশভাগ না হইলে গোটা বাংলার ভাষিক ও সাহিত্যিক জীবনে বাঙ্গালী মুসলমানদের গণতান্ত্রিক দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংঘাত-সংগ্রামের আকারেই দেখা দিত। বস্তুত সে প্রসেস শুরু হইয়াই গিয়াছিল। গোড়ার দিকে কিছু কাল তাতে মতবিরোধ, বিতর্ক, অপ্রিয়তা, ভুল বুঝাবুঝি, এমনকি সাম্প্রদায়িক সংঘাত, দুর্নিবার অবশ্যম্ভাবী হইলেও শেষ পর্যন্ত একটা সমঝোতা অবশ্যই হইত। স্পষ্টতই এবং দৃশ্যতই এটা কঠিন ছিল। রাজনৈতিক বিবর্তনের মত সাহিত্যিক পরিবর্তন অত সহজ হইত না। রাজনীতিতে ফজলুল হকের জন্ম হওয়া যত সহজ, সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পয়দা হওয়া তেমন সহজ নয়। বাঙ্গালী মুসলমানদের মুখের ভাষাকে হিন্দুরা বিশুদ্ধ বাংলাভাষা বলিয়া স্বীকার করিত না। মুসলমানদের ধর্ম-কৃষ্টি-সম্পর্কিত আরবি-ফারসি-জাত শব্দাবলিকে হিন্দু লেখকরা এবং সরকারি শিক্ষা-বিভাগ বাংলা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করিতে ত রাজি ছিলেনই না, তাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত অন্য শব্দগুলিও হিন্দুরা সাহিত্যে স্থান। দিতে আপত্তি করিতেন। হিন্দুদেরও সরকারি শিক্ষা বিভাগের এই অস্বীকৃতির ভয়ে স্বয়ং মুসলমান লেখকরাও গোড়াতে সেসব শব্দ বর্জন করিয়া চলিতেন। এসব শব্দের ও বাক্যের সাহিত্যিক স্বীকৃতি পাইবার জন্য যে ধরনের অসাধারণ প্রতিভাধর লেখকের দরকার, নজরুল ইসলামের আগে অমন প্রতিভাবান মনীষী মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত হন নাই। স্বয়ং নজরুল ইসলামের প্রতিভাও হিন্দুরা সোজাসুজি স্বীকার করেন নাই। মুসলিম ভারত, সওগাত, নওরোজ ইত্যাদি মুসলমান-পরিচালিত কাগজে লিখিয়া ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডে গান গাহিয়া নজরুল ইসলাম জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার পরেই হিন্দু লেখক-সম্পাদকরা নজরুল ইসলামকে মর্যাদা দিয়াছিলেন। এ মর্যাদা দানের মধ্যেও জাতীয় উদারতা ছিল না, ছিল

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা। কারণ সে স্বীকৃতিও ছিল মুসলমান কবি হিসাবেই, জাতীয় কবি হিসাবে নয়।

তবু দেশভাগ না হইলে এই প্রসেস চলিতে থাকিত এবং কালক্রমে গণতন্ত্রের নিজস্ব জোরেই তার গতিবেগ ও জোর বাড়িত। সব রকমের ভেস্টেড ইন্টারেস্টের স্বাভাবিক বিরোধের মতই সাহিত্য হিন্দু ভেস্টেড ইন্টারেস্টের প্রতিরোধও স্বভাবতই বাড়িত। কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভেস্টেড ইন্টারেস্টের চেয়ে কালচারের ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কম শক্তিশালী নয়, বরঞ্চ বেশি। বাংলার মুসলিম সাহিত্যিক জাগরণের মোকাবিলা হিন্দু প্রতিরোধের এই অনমনীয়তা লক্ষ্য করিয়াই আমি ১৯৪৩ সালে এক সাহিত্য সভায় হিন্দু লেখকদের সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলাম : রাজনৈতিক পাকিস্তান হইবে কিনা জানি না, কিন্তু আপনারা বাংলার মেজরিটি মুসলমানের মুখের ভাষাকে বাংলা সাহিত্যে যেমন উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাতে বাংলায় সাহিত্যিক পাকিস্তান হইতে বাধ্য।

কিন্তু সে সংঘাতের পথে আমাদের যাইতে হয় নাই। তার আগেই দেশভাগ হইয়া গিয়াছে। দৃশ্যত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশভাগ হইয়াছে। মনে হইবে। কিন্তু একটু গভীরে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এ বিভাগের আসল কারণ ছিল কৃষ্টিক। বিশ শতকে এটা প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, রাজনৈতিক পরাধীনতা মানব-মনের যে ক্ষতি করে, কৃষ্টিক পরাধীনতা ক্ষতি করে তার চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই সাহিত্যে দুইশ বছরের হিন্দু প্রাধান্যের অবসান ঘটাইয়া বাংলার গণতন্ত্রের জোরে মুসলিম-প্রাধান্য প্রবর্তন করিলে সেটা হইত হিন্দুর উপর অবিচার। তার বদলে দেশভাগ হইয়া বাংলার হাজার বছরের দুইটা সমান্তরাল কালচারের স্বকীয়তা রক্ষা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের নিশ্চিত ব্যবস্থা হইয়াছে। ভালই হইয়াছে। পূর্ব বাংলায়, পূর্ব পাকিস্তানে এবং বর্তমানের বাংলাদেশে মুসলিম-প্রধান বাঙ্গালী কৃষ্টি ও সাহিত্যের নয়া বাগিচা, নূতন প্রাসাদ, নবীনদুর্গ গড়ার সুযোগ হইয়াছে। অথচ এটা করিতে গিয়া হিন্দু-কৃষ্টি সাহিত্যের কলিকাতা-কেন্দ্রিক বাগিচা বা দুর্গ ভাঙ্গার কোনও দরকার থাকে নাই। মুসলমানের হাতে সেটা ভাঙ্গা অশোভন ও হিন্দুর মনে পীড়াদায়ক হইত। আধুনিকতা ও গণতান্ত্রিক দাবিতে ও প্রয়োজনে তার যদি সংস্কার অথবা কোনও অংশ ভাঙ্গার দরকার হয়, তবে সেটা হিন্দুরা নিজেরাই নিজ হাতে করিবে, এটাই ভাল। বিশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকে হক মন্ত্রিসভা কলিকাতা ভার্সিটি জমিদারি-মহাজানি প্রথাসমূহের মত হিন্দু কৃষ্টি ভাঙ্গিবার যেসব চেষ্টা করিয়াছিলেন, হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাতে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ বিভাগের পর তারা নিজেরাই সেসব দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। অখণ্ড বাংলার অস্থায়ী ও সাময়িক মুসলিম-প্রাধান্যের মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উপলক্ষে মুসলিম দাঙ্গাকারীরা হিন্দুদের মূর্তি-মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিত। ঐ উপলক্ষে আমার এক শ্রদ্ধেয় কংগ্রেসি হিন্দু বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন : "তোমরা মুসলমানরা আমাদের সমাজ-সংস্কারে বাধা দিতেছ। আমরা হিন্দুরা নিজেরাই সেসব মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিব স্থির করিয়াছিলাম, তোমরা মুসলমানরা সেগুলি ভাঙ্গিতেছ বলিয়া আমরা একটার জায়গায় আরো দশটা বানাইতেছি।' কথাটার অনেকখানি সত্য। এর অন্তর্নিহিত সত্যটা লক্ষণীয়।

দেশভাগের এটাই তাৎপর্য। এই কারণেই অখণ্ড বাংলায় আমরা মুসলমানরা যে কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য-সাধনা করিতেছিলাম, দেশ ভাগের পরের ঢাকা-কেন্দ্রিক সাহিত্য তার থনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক নবজীবনের সাধনা। এই কারণেই আমার সাহিত্যিক জীবনকে দুই আলাদা খণ্ডে বিচার বিবেচনা

করিয়াছি। ঢাকার সাহিত্য-সাধনা কলিকাতার সাহিত্য-সাধনার বিকাশ, উন্নতি ও পরিণাম নয়। নয়া জাতির জন্মে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই আমাদের এটা নবজীবন, নয়া জিন্দিগি।

## ২. শৈশবের খোরাক পুঁথি

আমাদের নিজেদের বাড়িতে এবং দুই মামুর বাড়িতে পুঁথি পড়ার খুব চর্চা ছিল। চাচাজী মুনশী ছমিরুদ্দিন ফরাযী, দুই মামু হোসেন আলী ফরাযী ও ওছমান আলী ফকির নামযাদা পুঁথি-পড়ুয়া ছিলেন। তিনজনের গলাই খুব মিঠা ছিল। ওছমান আলী ফকির সাহেবের গলা খুব দায় ও বুলন্দ ছিল। বিবাহ মজলিসে, ছোট-বড় যিয়াফতে, এমনকি ওয়াযের মজলিসের শেষে, নিয়মিতভাবে পুঁথি পড়া হইত। সাধারণত গুরুগম্ভীর বা ধর্ম-ভাবের সভায় কাছাছুল আম্বিয়া, আমির হামযা, শাহনামা, শহীদে-কারবালা, জঙ্গনামা, ফতুহশোমইত্যাদি কেতাব পড়া হইত। এ ছাড়া বিবাহ-মজলিসে, ছোটখাটো মেহমানিতে আলেফ-লায়লা, হাতেম-তাই, লায়লি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, বাহার-দানেশ, চাহার-দরবেশ, সূর্য-উজাল, জইগুন ও সোনাভানের কিচ্ছা, তুতিনামা ইত্যাদি হরেক রকমের পুঁথি পড়া হইত। চাচাজী মুনশী মানুষ ছিলেন বলিয়া তিনি বাছাই করা মজলিসে বাছাই করা পুঁথি পড়িতেন। কিন্তু মামুদের বেলা সে রকম কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। সকল রকম মজলিসেই তাঁদেরে ডাকা হইত। যাইতেনও তাঁরা। পড়িতেনও হরেক রকমের পুঁথি। পার্শ্ববর্তী হিন্দুপাড়ায় যেমন মাঝে-মাঝে রাতভর কীর্তন হইত, আমাদের গ্রামের মুসলমান পাড়ার অনেক বাড়িতে তেমনি সারারাত পুঁথি পড়া হইত। এমন অনেক দিন গিয়াছে, যখন হিন্দুবাড়ির কীর্তনের লাইন : 'কালা ত আইল না, কালা ত আইল না' শুনিতে-শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি এবং ফযরে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে তখনও শুনিয়াছি ভাঙ্গা গলায় গাওয়া হইতেছে : কালা ত আইল না। ঠিক সেইরূপ, এমন অনেক রাত গিয়াছে, যেদিন 'ওছি মামুর সুর করা দরা গলার 'এতেক কহিল যদি আলী পালোয়ান, গোস্বায় জ্বলিয়া গেল বীর হনুমান' শুনিতে-শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি আবার ফযরে 'গোস্বায় জ্বলিয়া গেল বীর হনুমান' শুনিয়াই ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

## ৩. পুঁথির নিশা

এই পুঁথি পড়ায় আমি এত প্রভাবিত হইয়াছিলাম যে সাত-আট বছর বয়সে আমিও একজন মজলিসি পুঁথি-পড়ুয়া হইয়া গেলাম। চাচাজী ও মামুরা পুঁথি পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হইলে আমাকে বদলি দিতেন। এইভাবে অল্পদিনেই স্বাধীন পড়ুয়া হইয়া গেলাম। ছেলেবেলা সকলেরই স্মরণশক্তি খুব প্রখর থাকে। আমারও ছিল। অনেক পুঁথির পৃষ্ঠাকে-পৃষ্ঠা আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। স্কুলে যাইবার কালে পথেঘাটে এবং খেলা করিতে গিয়া মাঠে উচ্চসুরে এইসব আবৃত্তি করিতাম। ক্ষেতে কাজ করিবার সময় চাষিরা এবং গরু রাখিবার সময় রাখালরা যেমন গলা ছাড়িয়া ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া গান গাইত, আমিও তেমনি তাদের সাথে পাল্লা দিয়া গলা ছাড়িয়া পুঁথি পড়িতাম। পুঁথি পড়ায় আমি এমন অভ্যস্ত হইয়া গেলাম যে, এক পুঁথি পড়িতে-পড়িতে অন্য পুঁথির অনুরূপ দু-চার ছতর ঢুকিয়াইয়া দিতাম। শ্রোতারা টেরও পাইত না। এই অভ্যাস শেষ পর্যন্ত এমন হইল যে, পুঁথি পড়িতে-পড়িতে আমি এক্সটেমপোর স্বরচিত দু-চার লাইন ঢুকাইয়া দিতাম। আস্তে আস্তে এ কথা জানাজানি হইয়া গেল। এক কথা একশ কথা হইয়া প্রচারিত হইল। আমার সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। আমি পুঁথি রচনায় হাত দিলাম। সে সব লেখা অবশ্য আমি ছাড়া আর কেউ পড়ে নাই। কিন্তু নিজেই ঐসব পড়িয়া নিজেকে বাহবা দিতাম।

## ৪. গদ্য সাহিত্যের সাথে পরিচয়

ধানীখোলা পাঠশালায় আমার পড়া শেষ হওয়ায় আমি পুঁথি ছাড়া অন্য রকম বই-পুস্তক পড়িবার সুযোগ নাই। তার মধ্যে যশোহরের মুনশী মেহের উল্লার মেহেরুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জের মুনশী মেহেরুল্লার নসিহত নামা ও ময়মনসিংহের মওলানা খোন্দকার আহমল আলী আকালুবীর শুভ জাগরণ কবিতার বই, দারোগার দপ্তর নামে ডিটেকটিভ গল্পের মাসিক এবং প্রবাসী নামক মাসিক পত্র এবং বঙ্গবাসী, মিহির ও সুধাকরনামক সাপ্তাহিক কাগজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত ১৯০৭-০৮ সালে ময়মনসিংহ শহরে মুসলিম শিক্ষা সম্মিলনী নামে খুব বড় একটি সভা হয়। চাচাজী ও এ অঞ্চলের অনেক মাতব্বর ও আলেম-ফাযেল ঐ সভায় যোগদান করেন। চাচাজী ঐ সম্মিলনী হইতে অনেক কাগজ-পত্র ও বই-পুস্তক নিয়া আসেন। তাতে বাংলা ইংরাজি দুইই ছিল। ইংরাজি পড়িতে পারি নাই। কিন্তু বাংলাগুলি রাক্ষসের ক্ষুধা লইয়া পড়িয়াছিলাম। তার সব কথা মনে নাই। শুধু মনে আছে, মি. শার্প নামে এক ইংরাজ সাহেব মুসলমানদের শিক্ষার কথা বলিয়াছিলেন। আর মনে আছে, করটিয়ার খান পন্নি ও জঙ্গলবাড়ি-হায়বতনগরের দেওয়ান সাহেবদের কয়েকজনের নাম ছাপার হরফে দেখিয়াছিলাম। তাঁদের মধ্যে ওয়াজেদ খান পন্নি ও দেওয়ান মান্নান দাদ খাঁর নাম মনে ছিল। আর সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এর পর সম্ভবত ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বৈলর বাজারে এক বিরাট সভা হয়। তাতে আমি ভলান্টিয়ার ছিলাম এবং কিছু বই-পুস্তক কিনিয়া ফেলিয়াছিলাম। সিরাজগঞ্জের মুনশী মেহেরুল্লা সাহেব এই সম্মিলনীর প্রধান বক্তা ছিলেন। তার বই-পুস্তক এই সভাতেই বিক্রয় হইয়াছিল।

## ৫. শৈশবে সম্পাদকতা

পাঠশালার ছাত্র হইয়াও আমি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পড়িতাম, এমনকি, ডিটেকটিভ গল্পের বইও পড়িতাম, এ কথা আজকালকার তরুণ পাঠকদের বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলা এটা কোনও অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। আমার সহপাঠীদের অনেকেই তা করিত। তরুণ পাঠকরা শুনিয়া হয়ত আরো বিস্মিত হইবেন যে, আমার অন্যতম সহপাঠী শামসুদ্দীন (বর্তমান প্রবীণ সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন) ও আমি নিম্ন প্রাইমারি পাঠশালার শেষ বছর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় মঞ্জুষা নামে একটি সংবাদ-সাহিত্য-পত্র বাহির করিয়াছিলাম। এটি স্বভাবতই হইল হাতের লেখা। সম্পাদক-লেখকও হইলাম আমরা দুইজনই। সম্পাদক মানে সত্যই সম্পাদক। কিন্তু লেখক মানে রাইটার’ নয় কপিস্ট। ছাপার বদলে যা করিতে আমরা বাধ্য ছিলাম। প্রথমে ইচ্ছা ছিল সাপ্তাহিক মঞ্জুষাকরা। সম্পাদনা মানে নিজেদের মৌলিক রচনা নয়, সাপ্তাহিক বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে পছন্দমত নকল করা। এ কাজও কঠিন ও শ্রমসাধ্য বিবেচিত হওয়ায় সাপ্তাহিকের বদলে মাসিক মঞ্জুষা বাহির হইল। শেষ পর্যন্ত সারা বছরে দুই-তিন সংখ্যার বেশি বাহির হইতে পারিল না। তবু চেষ্টা ত করিয়াছিলাম।

আসলে তৎকালে বাংলা ও অঙ্ক শিক্ষার মানই অনেক উন্নত ছিল। ইংরাজি শিক্ষার বোঝা ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষ কয়মাস স্পেলিং বুক নামে একটি ছোট্ট বই ছিল মাত্র। আরবি-ফারসি ও বাড়িতেই পড়ার নিয়ম ছিল। সে জন্য বাংলা বই-পুস্তক যা কিছু সামনে পড়িত, তা পড়িতে চেষ্টা করিতাম, পারিতামও। যেসব শব্দ বুঝিতাম না, চাচাজীকে জিজ্ঞাস করিতাম। তিনি না পারিলে

মাস্টার সাবকে জিগাইয়া বুঝিয়া নিতাম। তা-ও না হইলে কাল্পনিক অর্থ করিয়া সন্তুষ্ট হইতাম। কাল্পনিক অর্থগুলিই অনেক সময় বেশি রোমাঞ্চকর হইত।

এরপর দাদাজীর নামে মিহির ও সুধাকর নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ আসিতে শুরু করে। আমাদের প্রতিবেশী এবং সম্পর্কে চাচা ওসমান আলী সরকার (পরে খান সাহেব ওসমান আলী) এই সময় বঙ্গবাসীর গ্রাহক ও আমার মামু হুসেন আলী ফরাযী হিতবাদীর গ্রাহক হন। আমি এই তিনখানা সাপ্তাহিকই নিয়মিতভাবে পড়িতাম। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া দরিরামপুর মাইনর স্কুলে যাওয়ার পর গদ্য সাহিত্য পড়িবার সুযোগ আরো বেশি বাড়ে। পূর্বোক্ত ওসমান আলী সাহেব সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীছাড়া দারোগার দপ্তর নামক একটি মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। ওসমান আলী সাহেবের ছোট ভাই সাদত আলী আমার সাথে দরিরামপুর স্কুলে পড়িতেন। তিনি বড় ভাই-এর দারোগার দপ্তর গোপনে আনিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। দরিরামপুর স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার কৈলাস বাবু আমাকে প্রবাসীর গ্রাহক করিয়া দেন। এইভাবে আমি পুঁথিপাঠ হইতে গদ্য বই-পুস্তক পড়িতে শিখি। চাচাজী এই সময় একটি বিষাদ-সিন্ধু কিনেন। তিনি বৈঠকখানায় বসিয়া লোকজনকে এই ‘গদ্যে শহীদে কারবালা পড়িয়া শুনাইতেন।

এই সব বইয়ের মধ্যে দারোগার দপ্তর পড়িয়া আমি খুবই মুগ্ধ হই। কয়েক সংখ্যা দারোগার দপ্তর পড়িয়াই আমি নিজে পরপর কয়েকটি ডিটেকটিভ গল্প লিখিয়া ফেলি। সাদত ও শামসুদ্দীন উভয়েই আমার গল্পের তারিফ করে। কাজেই ছাপাইবার জন্য ঐসব গল্প দারোগার দপ্তর অফিসে পাঠাই। স্বভাবতই একটাও ছাপা হয় নাই। কাজেই বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা আমার ঐ ডিটেকটিভ গল্প পাঠ হইতে একদম বঞ্চিত না হন, সেজন্য এসব গল্পের একটির সারমর্ম এখানে উল্লেখ করিতেছি : খুনি নিহত লোকটাকে অন্ধকারে ছুরি মারিয়া খুন করে। তদন্তকারী দারোগা কিছুতেই খুনের আশকারা করিতে পারেন না। অবশেষে খুনি আরো লোক খুন করিবে বলিয়া দারোগা বাবুকে চ্যালেঞ্জ করিয়া পত্র দেয়। সেই পত্রে প্রথমে সে নিজের নামই লিখিয়াছিল। পরে চিন্তাভাবনা করিয়া সাবধানতা হিসাবে নিজের নাম কাটিয়া সে স্থলে লেখে ‘তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। নামটি সে কাটিয়াছিল বটে, কিন্তু একটু নজর দিয়া পড়িলেই তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব ছিল। দারোগা বাবু কাটা নামটি পড়িতে সমর্থ হন এবং খুনিকে গ্রেফতার করেন। এইভাবে খুনের ঐ ‘গভীর রহস্য উদঘাটিত হয়।

## ৬. কৈলাস বাবুর প্রভাব

কৈলাস বাবু ছিলেন কবি, সাহিত্যিক ও গায়ক। তার কয়েকখানা কবিতার বই ছাপা হইয়াছে। দরিরামপুরে আমাদের শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী নারী চরিত্রহীন নাটক লিখিতেন। তাতে যে সব গান থাকিত তার সবই তাঁর নিজের রচিত। এই সব নাটক তিনি আমাদের দিয়া অভিনয় করাইতেন। নাটকের বিষয়বস্তু ছাত্রদের প্রতি উপদেশ। যথা : সত্যের পুরস্কার’, ‘মিথ্যাবাদীর শাস্তি’, ‘কুসংসর্গের পরিণাম’। এসব নাটকের মূল চরিত্র ভাল ছাত্রের পার্ট তিনি আমাকে দিয়াই করাইতেন। তিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরই চেষ্টায় আমি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী প্রাইম পাই। মোট কথা, তারই প্রেরণায় আমার। মনে কবি-সাহিত্যিক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগে।

## ৭. আতিকুল্লাহ

বন্ধুবর আতিকুল্লাহর গুণের কথা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে কী মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাই এখানে বলিতেছি। আতিকুল্লাহর সঙ্গে আমার পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরই তিনি একদিন আমাকে তাঁর বাসায় নিয়া যান। এরপরও অনেক দিন আমি তার বাসায় গিয়াছি। কিন্তু আমি প্রথম দিনের কথাই এখানে বলিতেছি। আতিকুল্লাহ নিকটবর্তী এক বাড়িতে যায়গীর থাকিতেন। আমাকে সেখানে নিয়া যখন তাঁর থাকার ঘরটা দেখাইলেন, আমি অবাক হইয়া গেলাম। ঘরের সামনে দাঁড়াইতেই প্রথমে নজর পড়িল ঘরের দরজার কাঠে কপাট জুড়িয়া একটা কাগজ সাঁটা আছে। তাতে সবুজ ও লাল কালিতে সুন্দর বড়-বড় হরফে লেখা আছে : 'আতিকিয়া। লাইব্রেরি। আরো কাছে গিয়া দেখিলাম, অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে লেখা আছে : 'এইখানে পাওয়া যায়। তারও নিচে আরো ছোট-ছোট হরফে দুই সারিতে শতাধিক পুস্তকের নাম ও দাম লেখা আছে। পুস্তকের নামের সারিদ্বয়ের নিচে একটু বড় হরফে লেখা আছে : 'এতদ্ভিন্ন অর্ডার পাইলে যে কোনও পুস্তক কলিকাতার দরে সরবরাহ করা হয়।'

আতিকুল্লাহ দরজার তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন কিন্তু পিছনে-পিছনে আমি ঢুকিলাম না দেখিয়া তিনি ফিরিলেন। আমাকে তার বিজ্ঞাপন পড়িতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে নিলেন। আমিও হাসিয়া ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে বলিলাম : 'এইসব বই আপনার এখানে পাওয়া যায়?

কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি থাকিল না। আমার প্রশ্নের কথা ভুলিয়া আতিকুল্লাহর ঘরের সৌন্দর্য দেখিতে থাকিলাম। ছোট্ট ঘর। চাটাইর বেড়া। কিন্তু চাটাইর বেড়াতে খবরের কাগজ লাগানো হইয়াছে। আর সেই খবরের কাগজের উপর সুন্দর-সুন্দর ছবি তরে-তরে সারি-সারিতে লাগানো হইয়াছে। ছবিগুলির কোনোটা লতা-পাতা, কোনোটা টবের উপর আস্ত একটা গোলাপ গাছ। তাতে অনেকগুলি ছোট-বড় ফুল ফুটিয়াছে। কোনোটা মাত্র কলি। কোনও ছবি একটা নদীর বাক। দুই ধারে গাছপালা। নদীর বাঁকে লাল সুরুজ ডুবিতেছে। পাখিরা উড়িয়া বাসায় যাইতেছে। এই ধরনের ছবিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আরবি ও বাংলা হরফে সুন্দর রূপে সাজান তুগরা। মোট কথা, চারপাশের এই সুন্দর ছবিগুলি আতিকুল্লাহর ঘরটিকে একটি ছোটখাটো বাগিচা বানাইয়াছে। তার মধ্যে বিছানাটিও পরিপাটি। সাদা বিছানার চাদরটি টান-টান করিয়া পাতা। বালিশের সাদা ওয়াড়ে লতা-পাতা ফুল আঁকা। আতিকুল্লাহ বাহিরে পোশাক-পাতিতে মোটেই বাবু নন। বরঞ্চ তাকে অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন বলা যায়। তাঁরই শোবার ঘর ও বিছানা এত সুন্দর। এত পরিষ্কার। জানিলাম ঐ সব তাঁর নিজের হাতের আঁকা। নিজেই ময়দার আটা দিয়া লাগাইয়াছেন। বালিশের ফুলও তিনি নিজেই তুলিয়াছেন। অনেকক্ষণ দেখিবার পর আমার বিস্ময় কাটিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনার লাইব্রেরিটা কোথায়?

আতিকুল্লাহ কিছুমাত্র বিব্রত না হইয়া বিছানার পাশে একটি তক্তার উপর রাখা একটি ছোট্ট টিনের বাক্স খুলিলেন। বাক্সের কিছু কাপড়-চোপড় সরাইয়া একখানা-একখানা করিয়া চার-পাঁচখানা পুস্তক ও কেতাব বাহির করিলেন। পুস্তক মানে ছোট সাইযের বই। কেতাব মানে পুঁথি সাইযের বই। পুস্তক মানে বাম দিকে হইতে শুরু করা বই; আর কেতাব মানে ডান দিক হইতে শুরু করা বই। সুতরাং দেখামাত্র চিনিলাম কোনোটা পুস্তক আর কোনোটা কেতাব।

এগুলি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া আমি বন্ধুকে বলিলাম : আর বই কই?

কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া আতিকুল্লাহ জবাব দিলেন : "আর সব বই কলিকাতায় আছে। চিঠি লিখিলেই চলিয়া আসিবে। বড়জোর সাত দিন। আর পোস্টাফিস যখন আপনার বাড়ির কাছে, তখন আপনার আরো কম দিন লাগিবে।'

৮. হাজী আহমদ আলী

আমার মুখে নৈরাশ্যের ভাব দেখিয়া আতিকুল্লাহ বাক্সের অজতলা হইতে একটি ছোট বই বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি দেখিলাম উহা 'সকল রকম বই পুস্তকের তালিকা।' পুস্তক বিক্রেতার নাম হাজী আহমদ আলী। আহমদীয়া লাইব্রেরি। ...নম্বর মেছুয়া বাজার স্ট্রীট কলিকাতা। পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, পিপড়ার মত ছোট হরফে কত যে পুস্তকের নাম লেখা হইয়াছে, তার লেখাযুখা নাই। আমার পাতা উল্টানো শেষ হইলে আতিকুল্লাহ বলিলেন : এই হাজী সাহেব কলিকাতার সবচেয়ে বড় ধনী, ইমানদার মুসলমান। আহমদীয়া লাইব্রেরি কলিকাতার শ্রেষ্ঠ পুস্তকের দোকান।

আতিকুল্লাহর অত ক্যানভাসের দরকার ছিল না। আমি প্রথম দৃষ্টিতেই হাজী সাহেবের প্রেমে পড়িয়াছিলাম। তিনি আমার মিতা। হাজী বাদ দিলে তার আর আমার নাম এক। তারপর হাজী আগে না লিখিয়া আমাদের দেশের মত নামের পরে লিখিলে তিনি হন আহমদ আলী হাজী। আর আমি হইলাম আহমদ আলী ফরাযী। এমন খাপে-খাপে মিলিয়া যাওয়া মিতা আর কয়টা আছে? অতএব ইনি যে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ধনী, আর তার লাইব্রেরিই যে। সবচেয়ে বড়, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

অতঃপর আতিকুল্লাহ আমার হাত হইতে তালিকা পুস্তকটি নিয়া পড়িয়া শুনাইলেন, হাজী সাহেবের লাইব্রেরি হইতে পুস্তক কিনিলে শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাওয়া যায়। তিনি আমাকে ঐ কমিশনের মর্ম ও তাহা পাওয়ার। সহজ উপায় বাতলাইলেন। তাঁর দরজায় লটকানো বিজ্ঞাপন পড়িয়া লোকেরা তাঁর কাছে বইয়ের অর্ডার দেয়। তিনি সেই অর্ডারি পুস্তকের জন্য হাজী সাহেবের নিকট পোস্টকার্ড লিখেন। হাজী সাহেব ডাকে সেইসব পুস্তক পাঠাইয়া দেন। এই প্রসঙ্গে আতিকুল্লাহ আমাকে ডাক, পোস্টাফিস, পার্সেল ইত্যাদি কথার অর্থ ও কার্যপ্রণালি প্রাঞ্জল করিয়া বুঝাইয়া দেন। এত সহজে পঁচিশ টাকা কমিশন রোযগারের আমার খুব লোভ হইল। হয়ত মিতাজী আমাকে কমিশন আরো বাড়াইয়াও দিতে পারেন। মনে মনে ঐ কমিশনে ব্যবসা করা স্থির করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু আতিকুল্লাহর কাছে প্রকাশ করিলাম। শুধু তালিকা পুস্তকটি চাহিলাম। ওটি দেওয়ার অসুবিধা বুঝাইয়া তিনি শীঘ্রই আরেকটি আনাইয়া দেওয়ার ওয়াদা করিলেন। আমি দৃঢ়সংকল্প লইয়াই সেদিন বিদায় হইলাম।

৯. আহমদীয়া লাইব্রেরি

মাসেক-পনের দিনের মধ্যেই আতিকুল্লাহ আমাকে একটি নূতন তালিকা বই দিলেন। এটি আরো সুন্দর আরো বড়, পুস্তকের সংখ্যা আরো বেশি। ইতিমধ্যে আতিকুল্লাহর শিষ্যত্বে আমি আরো বেশি পাকিয়াছি। নিজহাতে লাল-সবুজ কালি বানাই। সুন্দর লেখা। আতিকুল্লাহর হুবহু অনুকরণে আমি

আমাদের বৈঠকখানার বেড়ায় পুস্তকের তালিকা লটকাইলাম। তালিকার উপরে বড়-বড় হরফে হেডিং বসাইলাম। আহমদীয়া লাইব্রেরি। আতিকুল্লাহর অনুকরণে লাল-সবুজ-কালির লেখা। দেখিতে বেশ সুন্দর। চাচাজী এটাকে পাগলামি মনে করিয়া গোড়াতে ধমক দিয়াছিলেন। আমি কাঁদিয়া দাদাজীর কাছে নালিশ করি। দাদাজী চাচাজীকে পাল্টা ধমক দেন। চাচাজী আমাকে আর কিছু বলেন না। পাড়ার লোক আসিয়া আমার লাইব্রেরির সামনে ভিড় করিত। যারা পড়িতে জানিত তারা জোরে-জোরে পুস্তকের নাম পড়িত, আর যারা পড়িতে জানিত না তারাও আমার লেখার তারিফ করিত। কিন্তু কেউই আমার কাছে বইয়ের অর্ডার দিত না।

কিন্তু তাতে আমি নিরুৎসাহ হইলাম না। আমি হাজী সাহেবের নিকট পঁচিশ টাকা কমিশনের প্রস্তাব করিয়া পোস্টকার্ড লিখিলাম। হাজী সাহেব আমার প্রস্তাবে রাজি হইয়া খুব তাড়াতাড়িই পত্রের জবাব দিলেন। তাতে আমার কী কী পুস্তক কত কপি চাই অতি সত্বর জানাইতে লিখিলেন। আমার আর কোনও সন্দেহ থাকিল না যে, আমার নাম দেখিয়াই হাজী সাহেব অত সহজে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং অতি সত্বর বইয়ের লিস্টি চাহিয়াছেন। আমি কি আর দেরি করি? হাজী সাহেবের তালিকা পুস্তকের প্রায় অর্ধেক বইয়ের নাম লিখিয়া ফুলস্কেপ কাগজের এক শিট ভরিয়া ফেলিলাম এবং সেটা ইনভেলাপ ভরিয়া পোস্ট মাস্টারের পরামর্শে অতিরিক্ত টিকিট লাগাইয়া পাঠাইয়া দিলাম। পুস্তকের বদলে আরেকটি চিঠি পাইলাম। তাতে হাজী সাহেব জানাইয়াছেন যে, অর্ডারি পুস্তকের মোট দাম হাজার টাকার উপরে হইবে; অত টাকার পুস্তক বিনা-অগ্রিমে পাঠানোর নিয়ম নাই। অতএব পত্র পাওয়ামাত্র যেন আমি শতকরা পঁচিশ টাকা অগ্রিম হিসাবে অন্তত আড়াই শ টাকা মনি-অর্ডারযোগে হাজী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেই। ঐ টাকা পাইয়াই হাজী সাহেব আমার নামে সমস্ত বই পাঠাইয়া দিবেন। অবশ্য অগ্রিম পাওয়া বাদ দিয়াই তিনি পুস্তক ভি পি করিবেন।

এই পত্র পাইয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কোথায় হাজী সাহেব নিজে দিবেন আমাকে শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন। তা না করিয়া তিনি এখন আমারই নিকট শতকরা পঁচিশ টাকা অগ্রিম চাহিয়া বসিয়াছেন? নিশ্চয়ই কোথাও বুঝিবার কোনও ত্রুটি হইয়াছে। কিন্তু কোথায়? হাজী সাহেব যে লিখিয়াছেন ভি পি করিবেন, সে কথারই বা অর্থ কী? বড় ভাবনায় পড়িলাম। যিনি এ বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিতে পারিতেন, সেই আতিকুল্লাহর কাছে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। কারণ ব্যাপারটা তার কাছে গোপন রাখিয়াছি। তার কাছে শিক্ষা পাইয়া, তারই নিকট হইতে তালিকা আনিয়া তাঁরই ব্যবসাটা নিজের হাতে লইয়া আসিতেছি, এটা জানিলে আতিকুল্লাহ ভাই মনে কষ্ট পাইবেন বলিয়াই ব্যাপারটা তাকে জানিতে দেই নাই। এখন তার কাছে যাওয়াটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার হইবে। কাজেই নিজেই বুদ্ধি করিয়া হাজী সাহেবের চিঠির জবাব দিলাম। এইরূপ লিখিলাম : 'আমি আপনার মিতা, এ কথা ভুলিবেন না। বিনা অগ্রিমে বই পাঠাইয়া দেন। বই বিক্রয় করিয়াই টাকা পাঠাইয়া দিব। আল্লাহর ওয়াস্তে মিতাকে বিশ্বাস করুন। হাজী সাহেবের জবাব পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন : কোনও বয়স্ক ও বিশ্বাসী লোক যামিন না হইলে তিনি অত টাকার বই বিনা-অগ্রিমে বাকি দিতে পারেন না বলিয়া তিনি খুবই দুঃখিত।

### ১০. বৃদ্ধ মিতাজির দোওয়া

চিঠিটা পাইয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বয়স্ক লোকের যামিনের কথা হাজী সাহেব লিখিলেন কেন? তবে কি তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে আমি নয় বছর বয়সের ক্লাস থ্রির ছাত্র? বড় ভাবনায় পড়িলাম।

এখন করা যায় কী? এতদূর অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া পড়া বড়ই লজ্জা ও অপমানের বিষয় হইবে। অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়া বুঝিলাম, মিতা হওয়ার কথাটা হাজী সাহেব বিবেচনা করিয়াছেন। তাই আমাকে বাকি দিতে না পারিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছেন। তা হইলে বাকি দিবার ইচ্ছা হাজী সাহেবের আছে। শুধু আমাকে নাবালক সন্দেহ করিয়াই হাজী সাহেব দ্বিধায় পড়িয়াছেন কিন্তু আমি যে সত্যই নাবালক সেটা হাজী সাহেবের সন্দেহমাত্র। এই সন্দেহ দূর হইলেই তিনি আমাকে বাকি দিবেন। অতএব আমি লিখিলাম : মিতাজি, আপনি আমার বয়স সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়াছেন। আমি নাবালক ছাত্র নই। আমি পঁয়ষট্টি বছর বয়সের বৃদ্ধ। আমি আহমদীয়া লাইব্রেরির মালিক। এটা খুব বড় পুরাতন পুস্তকের দোকান।

দাদাজীর আনুমানিক বয়সটাই নিজের বয়সরূপে চালাইয়া দিলাম। কম্পিত বুকে চিঠিটা পোস্ট করিলাম। জবাবের আশায় প্রবল আগ্রহে কানখাড়া রাখিলাম। দুই-একদিন পর-পর পোস্টাফিসে খবর লইতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত জবাব আসিল। কিন্তু এবারের চিঠি বরাবরের মত পোস্টকার্ডে না। তার বদলে নীল রঙের ইনভেলাপ। কম্পিত হস্তে চিঠিটা খুলিলাম। চিঠিটা নীল রঙের। বরাবর কার্ডের লেখা থাকে এক হাতের, দস্তখতটা অন্য হাতের। দস্তখতের নিচে রবার স্ট্যাম্প মারা। ইতিমধ্যে আতিকুল্লাহর নিকট আমি রবার স্ট্যাম্প দেখিয়াছি। কিন্তু এবারের নীল রঙের পত্রটা আগাগোড়া এক হাতের লেখা। তাতে কোনও রবার স্ট্যাম্প নাই। আমি একদমে চিঠিটা পড়িয়া ফেলিলাম। চিঠিতে আমাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এইভাবে : 'আমার প্রাণের ক্ষুদে মিতাজি'। তারপর আমার শতকোটি আন্তরিক দোওয়া-স্নেহ জানিবা,' বলিয়া শুরু করিয়া বিশেষ স্নেহপূর্ব মোলায়েম ভাষায় লিখিয়াছিলেন, তার সব কথা মনে নাই। কিন্তু তার সারমর্ম ছিল এইরূপ : এত অল্প বয়সে পুস্তক বিক্রয় বা অন্য কোনও ব্যবসায়ের দিকে খেয়াল না দিয়া আমি যেন মন দিয়া লেখাপড়া করি। হাজী সাহেবের দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস, আমি যদি মন দিয়া পড়াশোনা করি, তবে আমি ভবিষ্যতে পুস্তকের দোকানদারি না করিয়া পুস্তকের লেখক হইতে পারিব। তিনি এই মর্মে আল্লার দরগায় সর্বদাই মোনাজাত করিতেছেন। পত্রের নিচে তিনি লিখিয়াছেন : দোওয়াগো তোমার বৃদ্ধ মিতা। তার নিচেই বরাবরের মত দস্তখত।

হাজী সাহেব নিশ্চয়ই বহুদিন আগেই বেহেশতবাসী হইয়াছেন। আজ প্রায় তার সমান বয়সের বৃদ্ধ হইয়া এখন মনে পড়িতেছে, বৃদ্ধ মিতার ঐ আশীর্বাদ-পত্রখানা আমার সযত্নে রক্ষা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু সযত্নে রক্ষা করার বদলে আমি কী করিয়াছিলাম? অতি সাবধানে ও সঙ্গোপনে আমি চিঠিটা পুনঃপুন পড়িলাম। যতই পড়িলাম, ততই মনে হইল, হাজী সাহেবের ঐ চিঠিটা চিৎকার করিয়া আমাকে জনসমক্ষে তিরস্কার করিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, চিঠিটা আমার মস্ত বড় একটা কুকর্মের জাজ্বল্যমান সাক্ষী। এই মুহূর্তে ঐ সাক্ষী একদম গায়েব না করিলে যেন আমার আর রক্ষা নাই। কাজেই বিনা দ্বিধায় আমি চিঠিটা টুকরা-টুকরা করিয়া টুকরাগুলি আবার টুকরা করিয়া, আবার টুকরা করিয়া, অতি সাবধানে বাড়ির পুকুরে ডুবাইয়া দিলাম। যতক্ষণ সবগুলি টুকরা ভিজিয়া লুথা ও সাদা হইয়া পানিতে না ডুবিল, ততক্ষণ আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম না।

এইভাবে বাহিরের সাক্ষী নিশ্চিহ্ন করিলাম বটে, কিন্তু আমার ভিতরের সাক্ষী ত বাঁচিয়া থাকিল! বহুদিন পর্যন্ত হাজী সাহেবের চিঠিটা সময় পাইলেই আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিত। ঐ

চিঠির প্রত্যেক লাইন, প্রত্যেক শব্দ, এমনকি প্রতিটি হরফ, বিকট অট্টহাসিতে আমাকে তিরস্কার করিত। আজ মনে হইতেছে, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম : ওটা তিরস্কার ছিল না, ছিল আশীর্বাদ।

১১. উচ্চতর পরিবেশ

১৯১৩ সালে ময়মনসিংহ পড়িতে আসিয়া আমার সাহিত্যচর্চার নিশা আরো বাড়িয়া যায়। বাসায় শামসুদ্দীন ও সাঈদ আলী সাহেবের সাহচর্য এবং স্কুলের শিক্ষকের উপদেশ দুইটাই সাহিত্য-সাধনার অনুকূল ও উপযোগী ছিল। শামসুদ্দীন ও সাঈদ আলী সাহেব নিজেরা বই-পুস্তক কিনিতেন। মাসিক কাগজ লইতেন। সাঈদ আলী সাহেব সম্পর্কে আমার চাচা, বয়সেও কিছু বড়, পড়িতেনও উপরের ক্লাসে। কাজেই সাহিত্য আলোচনা ও রসালাপ তার সাথে হইত না। সেটা সীমাবদ্ধ থাকিত আমার ও শামসুদ্দীনের মধ্যে। তবে সাঈদ আলী সাহেব তার কিনা বই-পুস্তক আমাদেরে পড়িতে দিতেন। আমাদের কিনা পুস্তকও পড়িতে নিতেন। এই সময় আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কিনিতাম যাতে তিনজন একই বই কিনিয়া না ফেলি। আমি আগে হইতেই প্রবাসীর গ্রাহক ছিলাম বলিয়া শামসুদ্দীন সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য ও সাঈদ আলী সাহেব প্রমথ চৌধুরীর (বীরবলের) সবুজ পত্র-এর গ্রাহক হইলেন। আমি প্রবাসীর ও শামসুদ্দীন সাহিত্য-এরও গ্রাহক হওয়ায় আমাদের সাহিত্যিক মতও যার-তার কাগজের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। কবি হিসাবে আমি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হইলাম। শামসুদ্দীন অক্ষয় বড়ালও ডি এল রায়ের সমর্থক হইল। ফলে এই সময় রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইয পাওয়ায় আমি যতটা খুশি হইলাম, শামসুদ্দীন তা হইল না। নিজেরা বই-পুস্তক কিনায়। আমাদের অনেক বন্ধু জুটিল। অবশ্য বন্ধুদের মধ্যে হিন্দুই ছিল বেশি। তাদের সাথে আমাদের বই-পুস্তক আদান-প্রদান হইত। তার ফলে শহরে যাওয়ার এক বছরের মধ্যে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, দুর্গেশ নন্দিনী ও রাজসিংহ, রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা, কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা, চন্দ্র শেখর করের উদভ্রান্ত প্রেম, কায়কোবাদের অশ্রুমালা ও মহাশোন, মাইকেলের মেঘনাদবধ নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ইত্যাদি কাব্য-উপন্যাস পড়িয়া ফেলিলাম। এ ছাড়া অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিম ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থও আমি কিনিয়াছিলাম। মাইকেলের মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমরা কেউ ডা. আবুল হোসেনের যমজভগ্নি কাব্যও কিনিয়াছিলাম। এসব পুস্তক ছাড়া আমি মাস্টার মশায়দের মুখে নাম শুনিয়া স্কটের আইভানহো, টেলিসম্যান, মেরি কোরেলির সরোয-অব-স্যাটান, জর্জ ইলিয়টের অ্যাডাম বিডিইত্যাদি ইংরাজি নভেল স্কুল লাইব্রেরি হইতে আনিয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বন্ধু-বান্ধবদেরে দেখাইয়াও ছিলাম যে ঐসব বই আমি বুঝিতে পারি।

১২. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

লোকমুখে শুনিয়া এবং মুসলমান সাপ্তাহিক খবরের কাগজ পড়িয়া আমি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি খুব বিরূপ ছিলাম। তাকে আমরা মুসলিম-বিদ্বেষী বলিয়াই জানিতাম। দুর্গেশ নন্দিনী ও রাজসিংহ পড়িয়া সে বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ থাকিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় খুবই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। অবশ্য তৎকালের অন্যান্য লেখক যথা কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও চন্দ্রশেখর কর প্রভৃতির ভাষাও খুব ভাল লাগিত। এমনকি বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস-এর ভাষাও আমার কাছে খুব মধুর লাগিত। এটা আমাদের পাঠ্য বহি ছিল। কিন্তু এঁদের মধ্যে সবচেয়ে মজাদার লাগিল আমার কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা। বিশেষত দুর্গেশ নন্দিনীর ভাষায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাঁর বাণী-বন্দনা

আমার মুখস্থ ছিল। এটা উদ্ধৃত করিবার সময় আমি ধবল’ কথাটা যোগ করিয়া বলিতাম : হে বাগদেবী, হে কমলাসনে, অমলধবল-কমল-দল-নিন্দিত-চরণ-ভকত-জন বসলে ইত্যাদি ইত্যাদি। বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকদের কেউ কেউ ঐ ‘ধবল’ শব্দ দুর্গেশ নন্দিনীতে নাই বলিয়া আমার ভুল ধরিতেন। কিন্তু আমি সেদিকে কান দিতাম না। এইভাবে সমাসবহুল শব্দরচনা আমার ও শামসুদ্দীনের তখন একটা নিশা হইয়া গিয়াছিল। আমরা স্কুলের রচনায় এমনকি, পরীক্ষার খাতায়ও সমাসবহুল শব্দ প্রয়োগ করিতাম। প্রতিযোগিতায় আমরা এমনি মাতিয়াছিলাম যে, শামসুদ্দীনের চৌষট্টি হরফের শব্দের জবাবে আমি একশ আট হরফের শব্দ রচনা করিয়াছিলাম। পঞ্চাশ-ষাট হরফের শব্দ ত আমাদের ডাল-ভাত হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে আমরা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছিলাম। কারণ তাঁর সব চেয়ে বড় শব্দেও পঁচিশটার বেশি হরফ নাই।

আমাদের বাংলার শিক্ষক বাবু বিপিন চন্দ্র রায় আমার সাহিত্য-প্রীতির জন্য আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে সব সময়ে উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন। রচনার মুনশীয়ানার জন্য তিনি তাঁর সহকর্মী ও বন্ধুদের নিকটও আমার তারিফ করিতেন। আমার সমাস-বহুলতার প্রশংসা করিয়াও তিনি আমাকে মাত্রাধিক্য বর্জন করিতে পরামর্শ দিতেন। আমি তাঁর অন্য সব উপদেশ পালন করিলেও এ ব্যাপারে তা অমান্য করিতাম।

### ১৩. কাব্য-সাধনা

কবিতা না লিখিয়া শুধু গদ্য রচনা করিলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, এই ছিল। তকালের জনমত। বস্তুত সাহিত্যিকের জীবন আরম্ভই হয় পদ্য রচনা হইতে। আমার বেলাও তাই হইয়াছিল। গোপনে-গোপনে কবিতা লিখিয়া বিভিন্ন কাগজে পাঠাইতে লাগিলাম। কোনও দিন ছাপা হয় নাই। ছাপা না হওয়ার দরুন নিজের কবি-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতাম না। সম্পাদকদের পক্ষপাতিত্ব ও নির্বুদ্ধিতাকেই সেজন্য দায়ী করিতাম।

গ্রামে থাকিতে প্রথমে অবশ্য পুঁথির অনুকরণে মিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী, একাবলি ইত্যাদি মাত্রায় কবিতা লিখিতাম। ময়মনসিংহ শহরে আসিবার পর মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও কায়কোবাদের বই পড়িবার পর অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিতে শুরু করি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখিবার নিয়ম প্রচলন করায় মাইকেল ও তার অনুসারী কবিদের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। কারণ পয়ার, ত্রিপদীর চেয়ে মিলহীন কবিতা লেখা অনেক সোজা বলিয়াই ছিল তৎকালে আমার বিশ্বাস। পদান্ত মিল সম্বন্ধেও আমার এবং তৎকালীন সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। ‘খালে’ ‘বিলে’ মিল দিতে তখন আমরা লজ্জা পাইতাম না। ময়মনসিংহ শহরে আসিবার পরই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আমার চোখ খোলে। অতুল চন্দ্র। চক্রবর্তী নামক আমাদের বাংলার শিক্ষক একদিন অধম মিলের কবিতাকে বিদ্রূপ করিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করেন : কাঁঠালের ঠোঙ্গা নিয়া নাচে নন্দলাল, ফস্ করে নিয়া গেল এক বেটা চিল্। কাঁঠালের’ জায়গায় মিঠাই’ বসাইয়া অনেককেই এই কবিতা পরবর্তীকালে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু আমি জীবনের প্রথমে অতুল বাবুর মুখে ইহা এইভাবেই শুনি। অতুল। বাবুর উচ্চারণ ও আবৃত্তি এতই বিদ্রুপাত্মক হইয়াছিল যে, অধম পদান্ত মিলের হাস্যকরতা না বুঝিবার কোনও উপায় ছিল না।

ফলে অতঃপর পদান্ত মিল সংগ্রহে খুবই সাবধান হইলাম। তার ফলে পদান্ত মিল দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া গেল। শব্দের তালাশে অভিধানে অভিযান চালাইতে হইল। স্কুল-পাঠ্য ছোটখাটো অভিধানে পোষাইল না। এই সময়ে সমাস-বহুল বৃহত্তম শব্দরচনার উদ্দেশ্যেও অষ্টপ্রহর অভিধান খুঁজিতে হইত। এই দুই কারণে আমি তঙ্কালীন বৃহত্তম দুইটা বাংলা অভিধান 'প্রকৃতিবোধ' ও 'প্রকৃতিবাদ কিনিলাম। শব্দকোষ বা এই নামের একটি অভিধান কিনিল শামসুদ্দীন। এই সব অভিধান ঘাটিয়া এমন সব অজানা নূতন শব্দ আবিষ্কার করিতাম ও গদ্য রচনায় ব্যবহার করিয়া বসিতাম, যার অর্থ অনেক সময় নিজেই বলিতে পারিতাম না। কিন্তু পদান্ত মিল সম্বন্ধে ক্রমে এতটা সচেতন হইয়া গেলাম যে, অর্থহীন শব্দ প্রয়োগের দ্বারা হইলেও পদান্ত মিল সুন্দর করিতে হইবে, ইহাই হইয়া উঠিল আমার মতবাদ। অতুল বাবুর বক্তৃতা শুনিবার এবং এ সম্পর্কে শামসুদ্দীন ও অন্যান্য কবি-বন্ধুর সহিত আলাপ করিবার পর আমার বাল্যের ভুলিয়া-যাওয়া স্মৃতিকথা মনে পড়িল। ছেলেবেলা চাচাজীর মুখে আমাদের বাড়ির মাদ্রাসার মৌলবীদের মুখে এবং বিশেষ করিয়া মৌলবী এরফান আলী নামে আমার এক ফুফাত ভাইয়ের মুখে আমি বহু ফারসি কবিতা শুনিয়াছিলাম। আমি অর্থ না বুঝিয়া তার অনেকগুলি নিজেও আবৃত্তি করিতাম। এতদিনে গুন-গুন করিয়া মনে-মনে আবৃত্তি করিয়া দেখিলাম, ওগুলির পদান্ত মিল অতি সুন্দর। বাংলা কবিতায়, 'চিল' ও 'বিল', 'খাল' ও 'লাল' এইরূপ দুই হরফের মিল হইলেই চমৎকার পদান্ত মিল হইল। কিন্তু ফারসিতে বহু কবিতার শেষের চার হরফে পর্যন্ত মিল আছে। কোনও কোনও কবিতার দুইটা লাইনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়াই মিল। তখন লাইনগুলিরও কোন-কোনটা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু এই বুড়া বয়সে এই বই লেখার সময়ে হাজার মাথা কুটিয়াও একটা লাইন বা তার অংশ মনে করিতে পারলাম না। হাতের কাছে ফারসি বইও দু-চারটা নাই যা হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। তবু ব্যাপারটা এবং মিলের ধরনটা দেখাইবার জন্য অর্থ নির্বিশেষে কয়েকটি অক্ষর-সমষ্টির উল্লেখ করিতেছি। যথা : 'গেরেফ তানের' সঙ্গে 'সেরেফ খান', 'আকরিব'-এর সঙ্গে ফান ফরিব'। পরওয়ারদিগারের সঙ্গে 'সরওয়ারনিগার'-এর পদান্ত মিল হইলে চমৎকার হইবে। এতে পাঁচ-ছয় অক্ষর হইতে আট-নয় অক্ষর পর্যন্ত মিল হইয়া যাইবে।

পয়ারের দুই পদের আগাগোড়া মিলের লাইন মোটেই মনে পড়িতেছে না। তবে সেটার কল্পিত রূপ এই :

খাতায়ে বুযুর্গান গেরেফতান খাতাস্ত;

আতায়ে হুযুর খান সেরেফ জান আতাস্ত!

শুধু মিল দেখাইবার জন্য এই 'কবিতা'। কাজেই দুসরা ছতরের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না। এই ধরনের পয়ার রচনায় যে কী পরিমাণ মুনশীয়ানা ও শব্দ-জ্ঞান-প্রয়োজন, তা ভাবিয়া বিস্মিত হইতাম। কিন্তু উহার অনুকরণে হাজার চেষ্টা করিয়াও সফল হইতাম না। অথচ অন্তত পাঁচ-ছয় অক্ষরে পদান্ত মিল না দিয়া কবিতা রচনায় মনও উঠিত না।

## ১৪. মাইকেলের প্রভাব

এমন বিপদের দিনে মাইকেল মধুসূদন আসিলেন আমার বিপত্তারক হিসাবে। প্রথমে তার একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে', পড়িলাম পাঠ্যবইয়ে। তারপর আস্ত মেঘনাদবধ কাব্যটাই পড়িয়া ফেলিলাম। তারপর এক-দুই করিয়া পলাশীর যুদ্ধ, বৃত্রসংহার ও মহাশ্মশান কাব্য পড়িলাম। নবীনচন্দ্র ও কায়কোবাদের কবিতা মাইকেলের কবিতার চেয়ে সহজ লাগিল। মাইকেলের কবিতা তুলনায় অনেক কঠিন। কঠিন বলিয়াই উহাকে শ্রেষ্ঠতর কাব্য মনে হইল। কারণ কবিতায় যত বেশি কঠিন শব্দ থাকিবে, কবিতা পড়িতে পাঠককে যত বেশি অভিধান দেখিতে হইবে, যত দুর্বোধ হইবে, কবিতা তত উৎকৃষ্ট হইবে, ইহাই ছিল আমার ধারণা। আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে যথাসম্ভব দুর্বোধ্য কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। তাতে যথেষ্ট নাম হইল। মাসিক কাগজের সম্পাদকরা আমার কবিতা না ছাপিলেও বিবাহ-মজলিসে আমার আদর ছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে চেনা-অচেনা অনেক লোক প্রীতি উপহার' লেখাইতে আমার কাছে আসিত। আগ্রহের সঙ্গে তাদের ফরমায়েশ পালন করিতাম। রাত জাগিয়া নিজের কাগজ-কলম খরচ করিয়া কবিতা লিখিতাম। অত খাটুনির ফল কবিতাটা ছাপার ভুলের জন্য নষ্ট না হয়, সেজন্য প্রেসে গিয়া প্রুফ দেখিয়া দিতাম।

বিবাহের 'প্রীতি উপহার' লিখিতে গিয়া এবং প্রেম-ভালবাসার কবিতা লিখিতে গিয়া বুঝিলাম অমিত্রাক্ষর ছন্দে তা চলে না। প্রেম-ভালবাসার মর্ম অবশ্য তখনও বুঝিতাম না। কিন্তু তাতে প্রেমের কবিতা লিখিতে কোনও অসুবিধা হইত না। কোকিল-পাপিয়া না দেখিয়াই ওদেরে সম্বোধন করিয়া যেমন অনেক কবিতা লিখিলাম, কোনও সুন্দরী না দেখিয়াও তেমনি তাকে সম্বোধন করিয়াও অনেক কবিতা লিখিলাম। বলা বাহুল্য, এসবই বড়-বড় কবিদের অনুকরণমাত্র।

## ১৫. পুস্তক বাইন্ডিং

কবিতা লেখার সঙ্গে নাটক-নভেল পড়াও সমান জোরে চলিতে লাগিল। শামসুদ্দীন, সাঈদ সাহেব ও আমি পুস্তক খরিদে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতাম। তাতে আমাদের তিনজনেরই নিজস্ব লাইব্রেরি গড়িয়া উঠে। শামসুদ্দীনের ও আমার লাইব্রেরি পুস্তক-সংখ্যা সাঈদ মিঞাকে অনেক ছাড়াইয়া যায়। এর একটা গুপ্ত কারণও ছিল। পয়সা দিয়া কিনা ছাড়াও আমি ও শামসুদ্দীন অন্য উপায়ে পুস্তক সংগ্রহ করিতাম। অন্যের নিকট হইতে ধার করিয়া আনা কোনও পুস্তক খুব পছন্দ হইলেই আমরা কয়েক হাত ঘুরাইয়া বইটি শেষ পর্যন্ত গায়েব করিয়া ফেলিতাম। কয়েক দিন গুপ্ত থাকিয়া অন্য চেহারায় সেই বই আসিয়া আমার অথবা শামসুদ্দীনের লাইব্রেরিতে স্থান পাইত। শামসুদ্দীন ও আমার মধ্যে এ কাজের 'কোড ল্যাংগুয়েজ ছিল বাইন্ডিং করা। অর্থাৎ ঐ বইটির মলাট ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া বইয়ের আকারভেদে চামড়ার ফুল বাধাই, হাফ বাধাই ও টিশ বাধাই করাইয়া ফেলিতাম এবং প্রয়োজনবোধে সোনালি-রুপালি হরফে নিজেদের নাম লেখাইয়া ফেলিতাম। এ কাজে আমরা দুইজন এমন সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলাম যে, আমাদের বন্ধু বান্ধবদের কেউ কোনও ভাল বই হারাইলেই আমি ও শামসুদ্দীন পরস্পরকে সন্দেহ করিতাম। চোখ ঠারাঠারি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম : 'কিহে বাইন্ডিং করিয়া ফেলিয়াছ নাকি?' এইরূপ বাইন্ডিং করানোর কাজে যে আমরা শুধু পুরাতন ছেঁড়াছুটা বইই বাঁধাই করাইতাম তা নয়, অনেক নূতন বইয়েরও ভাল বাঁধাই খুলিয়া ফেলিম এবং সম্পূর্ণ নূতন ধরনে নূতন বাঁধাই করিতাম। এ কাজে আমাদের বিশ্বস্ত দফতরি ছিল। কিন্তু সব ব্যাপারে শুধু দফতরির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম না। দফতরির হাতে দিবার

আগেই বাঁধাই ভোলা হইতে শুরু করিয়া বইয়ের ভিতরে নাম লেখা নিশ্চিহ্ন করা পর্যন্ত সব কাজ নিজ হাতে করিতাম। প্রয়োজন হইলে দুই-এক পাতা বা পাতার অংশ ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। এ কাজে আমাদের লোভ ও দক্ষতা এমন। বাড়িয়া গিয়াছিল যে, স্কুল-কলেজের লাইব্রেরি-কমন রুমে বা পাবলিক পাঠাগারে কোনও বই আমাদের একজনের পছন্দ হইলে অপর জনকে বলিতাম : বইখানা বাইন্ডিং করার যোগ্য হে'। অতঃপর দুই বন্ধুতে ঐ বইখানা বাইন্ডিং করার সুবিধা-অসুবিধা, বিপদ-আপদ চারদিক চিন্তা করিতাম। অবস্থা গতিকে বাইন্ডিং করার লোভ অনেক ক্ষেত্রেই ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এ সব ক্ষেত্রে ইসু-করা পুস্তক একাধিকবার রিইসু করাইয়া দীর্ঘদিন একজনের কাছে রাখিয়াছি। নিয়মে না কুলাইলে দুজনের নাম বদলা-বদলি করিয়াছি। তবু বইখানা নিজেদের হাতছাড়া করি নাই। বেশ কিছুদিন এইভাবে রাখিয়াও যখন বাইন্ডিং করার কোনও নিরাপদ পন্থা বাহির করিতে পারি নাই, তখন বাধ্য হইয়া বই ফেরৎ দিয়াছি। প্রিয়জনকে দাফন করিতে গোরস্তানে লইয়া যাইবার সময় মানুষ যেমন শোকে মুহ্যমান থাকে, আমরা দুইজন তেমনি মুহ্যমান অবস্থায় বইখানা ফেরৎ দিতে গিয়াছি।

১৬. চোরের উপর বাটপারি

এইভাবে আমরা দুইজন নিজ-নিজ ব্যক্তিগত লাইব্রেরি এত বড় করিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, তৎকালে আমাদের সহপাঠী, পরিচিত বা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কারো এত পুস্তক-সম্পদ ছিল না। বলা আবশ্যক, আমাদের লাইব্রেরির আয়-ব্যয়, জমা-খরচ ও হ্রাস-বৃদ্ধিও ছিল। অর্থাৎ আমাদের পুস্তকও হারাইয়া যাইত। সে সব পুস্তকও 'বাইন্ডিং' হইয়া যাইত কিনা বলা কঠিন। কারণ যাঁরা। আমাদের বই গায়েব করিতেন, তাঁরা আর যাই করুন, বাইন্ডিং করার ফন্দি তাঁদের মস্তিষ্কে ঢোকার কথা নয়। এটা ছিল আমার-শামসুদ্দীনের নিজস্ব আবিষ্কার। আমাদের বন্ধু-বান্ধবরা ছিল সবাই সাধারণ শ্রেণীর মামুলি পাঠক। আমাদের দুইজনের মত 'প্রতিভাশালী' কেউ ছিল না। ঐসব মামুলি পুস্তকের কিড়ারা-ফন্দি আবিষ্কারে আমাদের ধারে-কাছে আসিতেই পারে না। কাজেই তাদের চুরি ছিল মামুলি চুরি। ফলে কালে-ভদ্রে আমাদের হারান পুস্তক দু একটা ধরাও পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের চুরি ছিল আর্টিস্টিক। ধরা পড়িবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

কিন্তু আমাদের কিছু বই সত্য-সত্যই বাইন্ডিং হইয়াছিল। কারণ এটা। আমরা নিজেরাই করিতাম। অর্থাৎ আমরা দুই বন্ধু বাইন্ডিং কাজে এমন মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর উপর হাত সাফাই করিতে দ্বিধা করিতাম না। তবে দুর্নিবার প্রলোভন না হইলে এ কাজ করিতাম না। করিলে এত সাবধানে করিতাম যাতে কিছুতেই ধরা না পড়ি। ধরা পড়িলে আত্মহত্যা করিয়াও লজ্জা নিবারণ করা যাইবে না। কারণ আমার ধারণা, আমিই শুধু শামসুদ্দীনের বই বাইন্ডিং' করিয়া ঘুমন্ত বন্ধুর পিঠে ছুরি মারিতেছি। কাজেই সময়ে সাবধান হইলাম। হোস্টেলে পুস্তকের স্টক বুকশেলফ হইতে পোর্টমেন্টে তুলিলাম। বাড়িতে বৈঠকখানার আলমারি অন্দর বাড়িতে নিয়া গেলাম। তাতে তালা-চাবি লাগাইলাম। তার পর একদিন নিতান্ত দৈবাৎ জানিতে পারিলাম আমার একখানা ভাল বই শামসুদ্দীন বাইন্ডিং' করিয়া ফেলিয়াছে। নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু অল্পক্ষণেই সে ভাব কাটিয়া গেল। বুকের উপর হইতে একটা পাপের বোঝা নামিয়া গেল। শুধু আমিই শামসুদ্দীনের বই বাইন্ডিং' করিয়া ঘুমন্ত সরল বিশ্বাসী বন্ধুর ডাকাতি করিতেছি বলিয়া আমি মনে-মনে শামসুদ্দীনের নিকট অপরাধী ছিলাম। প্রতি কাজে প্রতি কথায় আমার বুকে সেটা

কাঁটার মত বিধিত। আজ সেটা হইতে রক্ষা পাইলাম। নিজের প্রিয় জিনিস চুরি হইলেও যে তাতে আনন্দ পাওয়া যায়, এই অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম আমি ঐদিন।

আমি কিছু বলিলাম না। কিন্তু অতঃপর আমার কথাবার্তায় ও চাল-চলনে শামসুদ্দীনের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হইল। শেষ পর্যন্ত সে কথাটা নিজেই স্বীকার করিল। আমি তার সব কথা শুনিয়া বুঝিলাম সেও নিজেকেই একা অপরাধী মনে করে। আমি যে তার অনেক ভাল বই বাইন্ডিং' করিয়া ফেলিয়াছি সে ঘুণাক্ষরেও তেমন সন্দেহ করে নাই।

অতঃপর দুই বন্ধুর কনফেশনের পালা। কে কার কতখানা বই বাইন্ডিং করিয়াছি, তার খতিয়ান করা হইল। দেখা গেল : কেহ কারে নাহি পারে, সমানে সমান। দুই জনের খতিয়ান প্রায় কাছাকাছি।

দুই বন্ধু খুব জোরে হ্যান্ডশেক করিলাম। বলিলাম : কুচপরওয়া নাই। তোমার বই আমার বই, আমার বই তোমার বই। আমাদেরটা জয়েন্ট লাইব্রেরি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের দুইজনের লাইব্রেরির একটাও টিকে নাই চুরিতে যে লাইব্রেরি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ডাকাতিতে তা শেষ হইল। এ ডাকাতি শুরু হইল, চাকরি ও ব্যবসা উপলক্ষে আমরা বাড়ি ছাড়িবার পর হইতে। কারণ আমাদের বইগুলি লোকেরা নিল বলিয়া-কহিয়া। যিনি নিলেন তিনি আর ফেরৎ দিবার নামটি করিলেন না। আমরা টাকা-কড়ি খরচ করিয়াই বই কিনিতাম। যেগুলি বাইন্ডিং' করিতাম, তাতেও বেশ পয়সা খরচ হইত। তারপর আমাদের নাম বহন করিয়াই আমাদের লাইব্রেরিতে থাকিত। কিন্তু আমাদের যে সব বন্ধু ও আত্মীয়েরা আমাদের পুস্তক নিয়াছেন, তাঁরা

বাইন্ডিং'-এ টাকা খরচ করেন নাই বলিয়া তাদের বাড়িতে বসিয়াই আমাদের পুস্তকগুলি আমাদেরেই বুড়া আঙুল দেখাইতেছে।

# ১৩. সাহিত্য-সাধনা

## অধ্যায় তের – সাহিত্য-সাধনা

### ১. কবি হওয়ার অপচেষ্টা

ছাপার হরফে নিজের নাম দেখার ইচ্ছা বোধ হয় সব মানুষেরই ছেলেবেলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বিশেষত কবি-সাহিত্যিক হওয়া যাদের শখ তাদের ত নিশ্চয়ই। আমারও এই শখ ছিল খুব তীব্র। কবি হিসাবে নাম প্রকাশ করিবার আশায় বিভিন্ন মাসিক কাগজে নিজ নামে অনেক কবিতা পাঠাইয়াছি। নিজ নামে ছাপা না হওয়ায় ধারণা হইয়াছে, হিন্দু সম্পাদকরা মুসলমান কবিদের কবিতা ছাপাইবেন না। মুসলমানকে ওরা দু'চোখে দেখিতে পারেন না। কাজেই অবশেষে হিন্দু নামে কবিতা পাঠাইতে লাগিলাম। সে ফন্দিও ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বড় বড় নাম করা কবিদের নামে কবিতা পাঠাইতাম। আমার যতদূর মনে পড়ে একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দিয়াও একটা কবিতা পাঠাইয়াছিলাম।

ছাপার হরফে নিজের নাম মাসিক পত্রিকায় দেখিবার আশাতেই এসব ফন্দি-ফিকির করিয়াছিলাম, বলা বোধহয় ঠিক হইবে না। কারণ ঐসব কবিতা যদি ছাপা হইতও, তবু তাতে আমার নাম থাকিত না। তবে কিসের আশায় এত শ্রম, এত কাগজ ও এক টিকিট ব্যয়? নিজের নাম নয়, নিজের কবিতা ছাপার হরফে দেখিবার জন্য। নিজের সৃষ্টির প্রতি মানুষের এমনি একটা টান বোধ হয় স্বাভাবিক ও সহজাত। সন্তান ও আর কেউ যদি বাপ মাকে নাও চিনে, তবু বোধ হয় বাপ-মারা নিজের সন্তানকে সুস্থ ও যশস্বী দেখিয়া এমনি একটা পুলকের রোমাঞ্চ অনুভব করিয়া থাকেন।

### ২. গদ্যে প্রথম সাফল্য

যা হোক শেষ পর্যন্ত কবিতা লেখার দিকে ঝোঁক কমাইতে বাধ্য হইলাম। প্রবন্ধ ও গল্প লিখিতে চেষ্টা করিলাম। একটা লাগিয়া গেল। বোধ হয় **১৯১২ ১৩** সালের কোনও এক সময়ে নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিক-আলেমরা 'আঞ্জুমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন এবং তার মুখপত্র রূপে আল-এসলাম নামে একটি মাসিকপত্র বাহির করেন। **১৯১৩** সালে এটা আমি প্রথম দেখি। মুসলমানদের নিজস্ব মাসিকপত্র বাহির হওয়ায় আমি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এই কাগজে কবিতা না পাঠাইয়া একটি প্রবন্ধ পাঠান স্থির করিলাম। কারণ, ভয় হইল যদি একবার এই কাগজের সম্পাদক আমার লেখা না-পছন্দ করিয়া বসেন, তবে পরে হাজার ভাল লেখাও তিনি ছাপিবেন না। হয়ত বা নাম দেখিয়াই লেখাটা ফেলিয়া দিবেন, পড়িয়াও দেখিবেন না। অতএব প্রবন্ধই পাঠাইতে হইবে। অনেক খাঁটিয়া-খুটিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠাইলাম। প্রথম গুলিতেই শিকার পড়িল। প্রবন্ধ ছাপা হইয়া গেল। শুধু ছাপা হইল না। পরবর্তী লেখাটার জন্য সম্পাদক সাহেব তাকিদ-পত্র লিখিলেন। সেদিন আমার আনন্দ দেখে কে? বন্ধু-বান্ধবের কাছে, এমনকি মুরুব্বিদের কাছে, আমার কদর কত! কলিকাতায় প্রকাশিত মাসিক কাগজে নিজের নামসহ প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে। সারা গায় রোমাঞ্চ হইল। তা দুই-এক দিনে কাটিল না। নিজের

প্রবন্ধটা অন্তত কুড়িবার এবং ছাপার হরফে নিজের নামটা অন্তত হাজার বার পড়িলাম। যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই ভাল লাগিতে লাগিল।

### ৩. অনুবাদ

অথচ প্রবন্ধটা কোনও মৌলিক নিজস্ব লেখা নয়। ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর টেলস-অব আল-হামরা গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদমাত্র। কিন্তু সেটাও কম কৃতিত্বের বিষয় ছিল না। কারণ ঐ পুস্তকে বিষয়বস্তু ছিল স্পেনে মুসলিম স্থপতির বিশদ বর্ণনা। গ্রানাডা, কর্ডোভা, সেভিল ইত্যাদি স্পেনীয় প্রাচীন নগরীগুলিতে মুসলিম স্থপতির যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন আছে, ঐ বইয়ে তার নিখুঁত ও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। স্থপতি বিদ্যার বহু টেকনিক্যাল ইংরাজি শব্দ ঐ পুস্তকে দেদার ব্যবহার করা হইয়াছে। ঐ সব ইংরাজি শব্দের বাংলা শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া কত কঠিন কাজ! কারণ অভিধান দেখিয়া শুধু ইংরাজি শব্দের বাংলা অর্থ বাহির করিলেই চলিবে না। আমাদের দেশেও মুসলিম স্থপতিতেও ঐসব শব্দের টেকনিক্যাল প্রতিশব্দ আছে। কাজেই এটা এমনিতেই দুরূহ ব্যাপার। আমার মত পনের-ষোল বছর বয়সের ক্লাস সেভেন-এইটের ছাত্রের পক্ষে এটা ছিল আরো কঠিন। তবু স্পষ্টতই আমার অনুবাদ ভাল হইয়াছিল। প্রমাণ, সম্পাদক সাহেব পরবর্তী প্রবন্ধের জন্য তাকিদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। বাল্যের দুর্বলতা ও অহমিকাহেতু ঐ প্রবন্ধের কোথাও উহাকে অনুবাদ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। ঐ বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থকারের নামও কোথাও উল্লেখ করা হয় না। স্পষ্টই বুঝা যায়, উহাকে মৌলিক প্রবন্ধ বলিয়া চালাইয়া দেওয়াই আমার অভিসন্ধি ছিল। নব্য সাহিত্যিক হিসাবে আমি যে ঐ কাজ করিয়া কত বড় রিস্ক নিয়াছিলাম, তা বুঝিবার মত বুদ্ধি ও বয়স তখনও আমার হয় নাই। আমি তখন জানিতাম না যে, নিজের মৌলিক প্রবন্ধরূপে না পাঠাইয়া ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর অনুবাদরূপে চালাইলে তা সম্পাদক সাহেবের অধিক শ্রদ্ধা পাইত সুতরাং প্রবন্ধ ছাপা হওয়া এবং আমার নাম ছাপার হরফে বাহির হওয়া একরূপ নিশ্চিত ছিল। তা না করিয়া আমার মত অখ্যাতনামা নবীন লেখক তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রের মৌলিক প্রবন্ধরূপে পাঠাইয়া আমি উহার ছাপা হওয়ার চান্সকে শতকরা নিরানব্বই ভাগ কমাইয়া দিয়াছিলাম। তাতেও যে উহা সম্পাদক সাহেবের কাঠোর পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিল এইটাই ঐ প্রবন্ধের, তার ভাষার, সুতরাং আমার কৃতিত্বের বিষয়।

### ৪. আল-এসলাম

কিন্তু তবু আল-এসলাম-এ প্রথমে কবিতা পাঠানোর মত রিস্ক এটা ছিল না। সেটা আমি পরে বুঝিয়াছিলাম। আল-এসলাম-এ প্রথম লেখা পাঠাইবার সময় কবিতার বদলে প্রবন্ধ পাঠাইবার বুদ্ধি কে দিয়াছিল, তা মনে নাই। যতদূর মনে পড়ে বুদ্ধি কেউ দেয় নাই। কারণ কারো বুদ্ধি চাই নাই। অবিবাহিত মেয়ের গর্ভপাত হওয়ার মতই নব্য-লেখকদের এ ধরনের ব্যাপার চরম গোপনীয় বিষয়। নিছক আল্লার মেহেরবানিতে নিজের মগজের ঢেউ'-এর জোরেই এ কাজ করিয়াছিলাম। এটা না করিয়া কবিতা পাঠাইলে কী হইত, সেটা বুঝিলাম কিছুদিন পরে। আঞ্জুমনে ওলামার অন্যতম নেতা, আল-এসলাম-এর ভারপ্রাপ্ত সহ-সম্পাদক ও মুদ্রাকর মৌ. মোযাফফর উদ্দিন আহমদ ময়মনসিংহ বেড়াইতে আসেন এবং আমার মত নগণ্য অচেনা লোককে খুঁজিয়া বাহির করেন। সুপারের খাতিরে তিনি হোস্টেলে সরকারি মেহমান। তিনি সকলের সামনে আমার তারিফ করেন। এবং কথায় কথায় বলেন : এই ছেলের যে বিশেষ গুণটায় আমরা এর সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি, সেটা এই যে,

সাধারণ নব্য-লেখকদের মত সে কবি হওয়ার চেষ্টা করে নাই। নব্য-কবিদের জ্বালায় শান্তিতে সম্পাদকতা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কবিতার যে বস্তা আফিসে জমা হইয়াছে, তাই ঝটাইয়া ফেলিবার আমার লোকের অভাব। তার উপর কবিরা আফিসে গিয়া পর্যন্ত আমাকে ধাওয়া করে। আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। গায়েবের মালিক আল্লাহকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিলাম।

আল-এসলাম-এ গ্রানাডা-কর্ডোভার স্থপতি সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পর ওদিককার প্রচেষ্টা বন্ধ হয়। এর পরে আমি ছোট-গল্প লেখায় মন দেই। এই সময় শরত্যাবুর পল্লী সমাজ পাঠ করি এবং ঐ একটি বই পড়িয়াই শরত্যাবুর ভক্ত হইয়া পড়ি। অতঃপর শরত্যাবুর বিভিন্ন বই পড়িয়া তার স্টাইল-এ এতই প্রভাবিত হই যে, পরবর্তীকালে শরবাবুর প্রভাব হইতে চেষ্টা করিয়াও মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই।

৫. পিওর আর্টের বিতর্ক

১৯১৫ হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে আমি বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যের কাব্য-উপন্যাসের বহুলাংশ পাঠ করিয়া ফেলি। বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, রমেশ দত্ত, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের বসুমতী-প্রকাশিত গ্রন্থাবলি এই সময় হইতেই প্রকাশিত হয়। সে জন্য এঁদের সব বই পড়া তখন খুবই সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ডা. নরেশ সেন, নারায়ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির সামাজিক নভেল এবং দীনেন্দ্র কুমার রায় ও পাঁচকড়ি দে প্রভৃতির ডিটেকটিভ নভেল পৃথকভাবে হয় নিজের কিনিতে, নয় ত বন্ধু-বান্ধবকে দিয়া কিনাইতে হইত, অথবা স্কুল-কলেজ, লাইব্রেরি ও পাঠাগার হইতে সংগ্রহ করিতে হইত। প্রাইভেট পাঠাগারের মধ্যে এই সময় ঢাকাস্থিত সারস্বত সমাজের লাইব্রেরিটি উল্লেখযোগ্য। এতে অনেক বই পাওয়া যাইত। বাবু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক এক ভদ্রলোক এই সময় ঐ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। তিনি আমাকে পঠিতব্য পুস্তক নির্বাচনে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। কলেজ লাইব্রেরি হইতে এই সময় হল কেইন, মেরি কোরেলি, স্কট, জর্জ ইলিয়ট, টমাস হার্ডি, গেলওয়ার্দি, টলস্টয়, ভিক্টর হিউগো, টুর্গেনিভ ও ডস্টয়ভস্কির নামকরা সব পুস্তক পড়িয়া ফেলি।

এই সময় বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলিতে 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এই প্রশ্ন। লইয়া বাদ-বিতণ্ডার ঝড় বইতে ছিল। নামকরা পণ্ডিত লোকদের প্রায় সবাই এই বিতর্কে যোগ দিয়াছিলেন। এই সব প্রবন্ধ আমি প্রবল আগ্রহ লইয়া পড়িলাম। কিন্তু সে বিতণ্ডায় আমি কোনও আলো পাইলাম না।

মাঝখান হইতে এইসব তর্ক-বিতর্কে আমার নিজস্ব একটা মতবাদ গড়িয়া উঠিল। আমার মত নগণ্য তরুণ যুবকের মনোভাবকে মতবাদ বলা ঠিক হয় না। তবু নিজের কথাটা বলিবার আগ্রহ আমার দুর্নিবার হইয়া উঠে। কথাটা ঠিক পজিটিভ কোনও মতবাদ নয়। একটা নিগেটিভ অ্যাটিচুড মাত্র। শরৎবাবুর বই পড়িবার জন্য আমার মধ্যে একেবারে রাক্ষসী ক্ষুধা ছিল। তাঁর বই আমাকে একেবারে সম্মোহিত করিয়া রাখিত। তবু শরৎবাবুর পল্লী সমাজ বাদে আর সমস্ত বইয়ের বিরুদ্ধে আমার একটা গোপন বিদ্রোহ ছিল। এ যেন মদখোরের মদ-নিন্দা। মদখোরেরা বন্ধুদের মজলিসে বসিয়া মদ খাওয়ার নিন্দায় সককে ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু মদের বোতল দেখিলেই সব কথা ভুলিয়া যায় এবং গোগ্রাসে বোতলকে-বোতল গিলিয়া ফেলে। আমার বিবেচনায় শরৎবাবুর এই গুণটাই ছিল দোষ। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধেও আমার এই একই রকম অ্যাটিচুড ছিল। একমাত্র গোরা

সম্বন্ধেই আমার ধারণা ছিল অন্যরূপ। এটাকে আমি রবিবাবুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিতাম। কেন বলিতাম, সে কথা কাউকে বুঝাইতে পারিতাম না। ঠিক তেমনি টলস্টয়, টুর্গেনিভ ও ডস্টয়ভস্কির পুস্তকগুলিকে আমি আদর্শ উপন্যাস বলিতাম। কিন্তু সেগুলি কেন আদর্শ নভেল, তা বুঝাইতে পারিতাম না। ইংরাজি নভেলিস্টদের মধ্যে একমাত্র হল কেইনকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলিতাম। ফরাসি নভেলিস্টদের মধ্যে আমি ভিক্টর হিউগোকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নভেলিস্ট বলিতাম। তাঁর লা মিজারেবলস ও লাফিং ম্যানকে আমি মহাকাব্যের অনুকরণে মহা-উপন্যাস বলিতাম।

কিন্তু একমাত্র রাশিয়ান নভেলগুলিকেই আমি আদর্শ নভেল বলতাম। কিসের জন্য, কী কারণে, ওগুলি আদর্শ নভেল বন্ধু-বান্ধবের এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারিতাম না। কিন্তু নিজে-নিজে চিন্তা করতাম। এই চিন্তার ফল ১৯২২ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'গোলামী সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটা বর্তমানে আমার সামনে নাই। অনেক তালাশ করিয়াও যোগাড় করিতে পারিলাম না। তাই কোন যুক্তিতে কী বলিয়াছিলাম, তা বলিতে পারিব না। কিন্তু ওতে আমার প্রতিপাদ্য ছিল যা সে কথাটা আমার মনে আছে। আমি ঐ প্রবন্ধে বলিতে চাহিয়াছিলাম যে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল শিল্পীরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, সেটা বাঙ্গালীর সত্যিকার জীবনালেখ্য নয়; এটা গোলাম বাংলার সাহিত্য। কাজেই গোলামী সাহিত্য। এঁদের সৃষ্ট আর্ট শুধু আর্টেরই জন্য, জীবনের জন্য নয়। আমার মতে আর্ট আর্টের জন্য নয়, আর্ট মানুষের জীবনের জন্য। যে আর্ট মানুষের উপকারে আসিল না, সেটা সুন্দর নয়, অসুন্দর। আমি তাতে বলিয়াছিলাম আমাদের শিল্পীরা ধানক্ষেত কাটিয়া সেখানে ফুলের বাগিচা করিতেছেন। এই প্রবন্ধে আমি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলাম। তাতে সাহিত্যিক মহলে বেয়াদবির জন্য আমার যথেষ্ট নিন্দা হইয়াছিল। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ভোলার কবি মোজাম্মেল হক সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐ প্রবন্ধ ছাপার জন্য কলিকাতার সাহিত্যিকরা তাকে তিরস্কার করিতেছেন। এত প্রতিবাদ ও নিন্দার মধ্যে আমি একটা সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম বরিশাল হইতে প্রকাশিত বরিশাল হিতৈষীনামক একটি সাপ্তাহিক কাগজে দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমার ঐ প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং আমার সমালোচকদের নিন্দা করা হইয়াছিল।

আমি শরত্যাবুর যতই বিরোধী হই না কেন, তার প্রভাবমুক্ত হইতে পারিলাম না। তাঁর অনুকরণে অনেকগুলি গল্প লিখিয়া ফেলিলাম। ঐ সব গল্পই সওগাত-এ ছাপা হইয়াছে। ঐগুলি লেখার সময় আমি মাত্র আইএ পড়ি, অথবা সবেমাত্র আইএ পাশ করিয়াছি। সওগাত-এর সম্পাদক নাসিরউদ্দীন সাহেব শুধু মাসের পর মাস আমার গল্পই ছাপিতেন না, আমাকে উৎসাহ দিয়া পত্রও লিখিতেন। সেই হইতে নাসিরউদ্দীন সাহেব ও তার সওগাত-এর সাথে আমার ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া যায়। এ সম্পর্কের মধুরতা এই বৃদ্ধ বয়সেও অটুট রহিয়াছে।

### ৬. সাহিত্যিকদের সাথে প্রথম পরিচয়

আমি ১৯২২ সালের মাঝামাঝি বোধহয় জুলাই মাসে খিলাফত কমিটির সভায় যোগ দিতে প্রথম কলিকাতা যাই। কিছুদিন আগে শামসুদ্দীন কলিকাতা গিয়াছেন। তিনি মুসলিম জগত নামক সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকতা করেন। তিনি ছাত্রজীবনের দুই বছরও কলিকাতায় কাটাইয়াছেন। সুতরাং কলিকাতার ব্যাপারে তিনি আমার বিবেচনায় একজন এক্সপার্ট। আর আমি আনাড়ি, একদম

বাঙ্গাল। কাজেই আগে হইতে তাঁকে চিঠি লিখিয়া জানাইলাম। তিনি শিয়ালদহ স্টেশন হইতে আমাকে নিয়া গেলেন। আমি তার মেহমান হইলাম। যাকারিয়া স্ট্রিট ও চিৎপুরের মোড়ের একটি বাড়িতে খিলাফত আফিস। সেখানেও শামসুদ্দীনই আমাকে পৌঁছাইয়া দিলেন। কলিকাতা এত ভাল লাগিল যে খিলাফত কমিটির সভার কাজ শেষ হইবার পরও কলিকাতা ছাড়িতে মন চাহিল না। স্বরাজ ও খিলাফত দুই আন্দোলনেই তখন মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই নিজের গ্রামে বা জিলায় চাঞ্চল্যকর কিছু। করিবারও নাই। শহরের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া যা কিছু পাই, তাতে পকেট খরচা ও খাওয়াই চলে না। কাজেই কলিকাতায় কোনও কাজের যোগাড় করা যায় কি না দুই বন্ধুতে সে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

একদিন শামসুদ্দীন বলিলেন, কলেজ স্ট্রিটে সাহিত্য-সমিতির সভা আছে। আমাকে যাইতে হইবে। তিনি অন্য মেম্বরদেরে কথা দিয়া আসিয়াছিলেন। আল-এসলাম, সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় গল্প-প্রবন্ধ লিখিয়া আমি তখন সাহিত্যিক সমাজে কতকটা পরিচিত হইয়াছি। কাজেই শামসুদ্দীন বলিলেন সবাই আমাকে দেখিতে চান। ইতিমধ্যে পথে-ঘাটে সমিতির সম্পাদক কবি মোজাম্মেল হক (ভোলা) ও সহকারী সম্পাদক মোযাফফর আহমদ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। শামসুদ্দীন তাঁদেরও দোহাই দিলেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় কথা বলিলেন, কাজী নজরুল ইসলাম আজকার সভায় উপস্থিত থাকিবেন। দু-এক দিনের মধ্যে তিনি ধূমকেতুনামে সাপ্তাহিক বাহির করিবেন।

যথাসময়ে সভায় গেলাম। অনেক নাম-শোনা চোখে-না-দেখা কবি সাহিত্যিকের দেখা পাইলাম। শামসুদ্দীন সভার মধ্যে আমাকে ফরমালী পরিচিত করিতে গিয়া আমার প্রতিভার, লেখার ও রসিকতার অনেক তারিফ। করিয়া শেষে বলিলেন : কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। আমার এই বন্ধু যে সব কথা বলিবেন, তার বার আনা বাদ দিয়া মাত্র চার আনা বিশ্বাস করিবেন। আমার প্রতি এই আক্রমণ সকলে উচ্চ হাসিতে উপভোগ করিলেন। আমিও অগত্যা সে হাসিতে যোগ দিলাম। সকলের শেষে আমার জবাবের পালা। তারিফের উত্তরে ততোধিক তারিফ। করিয়া বিনয়ের উত্তরে সর্বাধিক বিনয় দেখাইয়া উপসংহারে বলিলাম : বন্ধুবর শামসুদ্দীন আমার কথার বার আনা বাদ দিয়া মাত্র চার আনা বিশ্বাস করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সরলভাবে আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাতেও আমার দুই আনা নেট মুনাফা থাকিবে।

হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল। সবার সমবেত উচ্চ-হাসি তলাইয়া দিয়া ছাদফাটা হাসি হাসিলেন যিনি তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি আসন ছাড়িয়া রসিক বটে, এমনটি আর দেখি নাই বলিতে-বলিতে আমাকে হাবিলদারের সমস্ত শক্তি দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। অন্তরে-অন্তরে আমাদের পরিচয় হইয়া গেল।

সাংবাদিক জগতে প্রবেশ করার জন্য কিছু-কিছু প্রাথমিক কোদাল-কাম করিয়া সেবারের মত ফিরিয়া আসিলাম। পরে আরো কয়বার গিয়া পাকাভাবে গেলাম ১৯২৩-এর মার্চ-এপ্রিলে। সেবারও আবুল কালাম শামসুদ্দীনেরই মেহমান হইলাম। মেহমানদারির বদলা তাঁর সম্পাদিত মুসলিম জগত-এ কিছু-কিছু লেখা দেওয়া আমার কর্তব্য এবং সুযোগ মনে করিলাম। এইভাবে আমি 'ছহি বড় তৈয়ব নামা' নামে একখানা স্যাটায়ার কাব্য এবং সভ্যতায় দ্বৈতশাসন' নামে একটি বড় প্রবন্ধ লিখিলাম। ছহি বড় তৈয়ব নামা' মশহুর পুঁথি 'ছহি বড় সোনাভানের অনুকরণে একটি রাজনৈতিক

প্যারডি-স্যাটায়ার। আমার রাজনৈতিক সহকর্মী খেলাফত নেতা শ্রদ্ধেয় মৌলবী তৈয়ব উদ্দিন আহমদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ দলের একজন আইন সদস্য। তিনি অন্যতম মন্ত্রী স্যার আবদুল করিম গযনবীর খাতির এড়াইতে না পারিয়া সরকার পক্ষে একটি ভোট দিয়া দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন। তার এই কাজের নিন্দায় আমি এই স্যাটায়ারটি লিখি। স্যাটায়ার লেখায় এই আমার প্রথম উদ্যম। মুসলিম জগত-এ এটি বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে বিশেষত মুসলিম সাহিত্যিক মহলে আমার সুনাম হয়। আমি খুবই উৎসাহবোধ করি। সভ্যতায় দ্বৈতশাসন' রাজনৈতিক দার্শনিক দীর্ঘ প্রবন্ধ। ইহা কয়েক মাস কাল ধরিয়া মুসলিম জগত-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে যে কিছু আংশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেস-খিলাফত নেতারা উহাকে 'ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসন' বলিতেন। কাজেই আমরা তখন দ্বৈতশাসনকে খুব খারাপ জিনিস মনে করিতাম। আমি এই প্রবন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, ইংরাজের-দেওয়া শাসন-ব্যবস্থাটাই শুধু দ্বৈতশাসন নয়, ইংরাজি সুতরাং গোটা ইউরোপীয় সভ্যতাটাই আসলে দ্বৈতশাসন। কাজেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা যে আমাদের ঘাড়ে রাজনৈতিক দ্বৈতশাসন চাপাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এটা কোনও 'বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ব্যাপার নয়। তাদের সভ্যতার এটা অংশ মাত্র। ছহি বড় তৈয়ব নামা' বা 'সভ্যতায় দ্বৈতশাসন' কোনটারই কপি বর্তমানে আমার কাছে নাই। কাজেই এত বড় বিষয়ে আমার মত সাধারণ যুবক কী লিখিয়াছিলাম, আজ তা বলিতে বা বুঝিতে পারিতেছি না। যতদূর স্মরণ পড়ে, ঐ প্রসঙ্গে আমি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে পাশ্চাত্য সভ্যতা দু'মুখা সভ্যতা। এ সভ্যতা মুখে-মনে এক কথা বলে না। যা শিখায় তা করায় না। আমার আরো মনে পড়ে যে তৎকালে মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইন্ডিয়া এবং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলি পড়িয়া আমি খুবই প্রভাবিত হইয়াছিলাম। তাদেরই ভাবকে নিজের ভাব মনে করিয়া ছোটমুখে বড় বড় কথা বলিয়াছিলাম। নিজে ঐ সব কথা বলিতে পারিয়া আমি এতটা গর্ব বোধ করিয়াছিলাম যে, গোটা প্রবন্ধের কাটিংগুলি একত্রে গাঁথিয়া আমার দর্শনের অধ্যাপক (তকালে ভাইস চ্যান্সেলার) ডা. ল্যাংলির কাছে ঢাকা পাঠাইয়াছিলাম এবং সঙ্গীয় পত্রে তাঁকে সসম্মানে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি যেন কাউকে দিয়া উহার অনুবাদ করাইয়া পড়িয়া দেখেন। ল্যাংলি সাহেব ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান ছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি একখানা স্নেহপূর্ণ সংক্ষিপ্ত পত্রে জানাইয়াছিলেন, যে আমার প্রবন্ধটা তার ভাল লাগিয়াছে। লেখক হিসাবে আমার সাফল্যের জন্য তিনি দোওয়া করিতেছেন।

## ৭. প্রথম বইয়ের কপিরাইট

আমি ১৯২২ সালের মাঝামাঝি খুব সম্ভব জুলাই মাসে প্রথম কলিকাতায় যাই। ঐ বছর মাঝে-মাঝে এবং ১৯২৩ সাল হইতে একটানা প্রায় আট বছর কলিকাতা থাকি এবং সংবাদপত্রের সেবা করি। আমার সাংবাদিক জীবন অন্য খণ্ডে বর্ণনা করিব। এখানে শুধু সাহিত্যিক জীবনের কথাটুকুই বলিতেছি। ১৯২৪-২৫ সালে আমি যখন সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে সহকারী সম্পাদকের কাজ করিতাম, তখন আমার বেতন ছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এই টাকায় তৎকালে সচ্ছলে আমার চলিয়া যাইত। কিন্তু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতাম না। এই সময় কতকটা উপরি আয়ের আশায় কতকটা গ্রন্থকার হইবার শখে, ছেলেদের উপযোগী করিয়া কাছাছুল আম্বিয়ার কতকগুলি গল্প লইয়া একটি বই লিখিলাম। তার নাম রাখিলাম মুসলমানী উপকথা। বই লেখা সমাপ্ত করিয়া উহা প্রকাশের জন্য প্রকাশক ও ছাপাখানার সঙ্গে দেন-দরবার করিতেছি, এমন সময় বাড়ি হইতে বাপজী জানাইলেন,

শত খানেক টাকার জন্য তিনি একটা কাজে ঠেকিয়াছেন। ঐ পরিমাণ টাকা যোগাড় করা আমার দ্বারা সম্ভব হইলে তাঁর খুবই উপকার হয়। ছেলের কাছে বাপের টাকার চাওয়ার এর চেয়ে মোলায়েম ভাষা আর হইতে পারে না। কিন্তু আমি বুঝিলাম নেহাত নিরুপায় না হইলে বাপজী আমার নিকট টাকা চাহিতেন না। কিন্তু একশ টাকা যোগাড় করা তৎকালে আমাদের মত পঞ্চাশ টাকার সাংবাদিকের পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। কাজেই ঠিক করিলাম, আমার জীবনের প্রথম বই মুসলমানী উপকথার কপিরাইট বিক্রয় করিব। কপিরাইট যদি বিক্রয় করিতেই হয়, তবে যার নিমক খাই, তার কাছেই প্রথম যাচাই করা দরকার। কারণ তাদেরও 'মোহাম্মদী বুক এজেন্সী' নামক প্রকাশকের ব্যবসা ছিল। কাজেই আমার তকালীন মনিব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী খায়রুল আনাম খার নিকট প্রস্তাব দিলাম। তারা ছয়শত টাকার বেশি দিতে চাহিলেন না। অন্যত্র বেশি দাম পাইলে সেখানে কপিরাইট বিক্রয় করিতে তাদের আপত্তি নাই বলিয়া দিলেন। এই সঙ্গে মাওলানা সাহেব বইটির নামের মধ্য হইতে 'উপ' কথাটা বাদ দিয়া শুধু মুসলমানী কথা নাম রাখিবার উপদেশ দিলেন। এ উপদেশ আমার পছন্দ হইল। ডা. দীনেশ চন্দ্র সেনের রামায়ণী কথার অনুকরণে আমার বইয়ের নাম রাখিলাম মুসলমানী কথা।

বেশি দামের সন্ধানে ঘুরিতে-ঘুরিতে অবশেষে এগারশ টাকা কপিরাইট বিক্রয় করিতে সমর্থ হইলাম। খরিদ্দার বিখ্যাত প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স। যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি তাদের হাতে দিয়া এক শ টাকা অগ্রিম লইলাম। বাকি হাজার টাকা পুস্তক ছাপা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাইব, কথা স্থির হইল। ছাপা হওয়ার সময় প্রথম প্রফটা আমি দেখিয়া দিতে ওয়াদা করিয়াছিলাম। তাই বোধ হয় অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য। মহাশয় বাকি টাকা দেওয়ার ঐরূপ শর্ত করিয়াছিলেন। আমার তাতে মোটেই আপত্তি ছিল না। কারণ প্রথমত বাড়িতে পাঠাইবার মত টাকা আমি পাইয়াছি; এখন আমার আর টাকার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়ত নিজের প্রথম বইটায় ছাপার ভুল না থাকে, সে বিষয়ে আমার আগ্রহ প্রকাশকের আগ্রহের চেয়ে কম ছিল না।

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স রঙ্গিন কালিতে বড় বড় হরফে বর্ডারসহ বই ছাপিবার জন্য ব্লকাদি করিয়া ফেলিলেন। একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের চমৎকার শিশুপাঠ্য পুস্তক বাহির হইতেছে বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমার নামও প্রকাশ হইল। ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্সের এই সময়ে শিশু সাথী নামে একটি সুন্দর শিশু মাসিক ছিল। এই শিশু মাসিকে কারুনের ধন' নামক মুসা ও কারুনের গল্পটি ছাপা হইয়া গেল। কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজে গল্পটির যথেষ্ট সমাদর হইল। আমার আনন্দ আর ধরে না। ঐ বইয়ে আমার কোনও স্বত্ব নাই। ওটা লাখ লাখ কপি বিক্রয় হইলেও তাতে আমার এক পয়সা লাভ হইবে না। এসব কোনও কথাই আমার আনন্দে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিল না।

৮. আরবি-ফারসি বনাম বাংলা শব্দ

কয়েক দিন পরই ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্সের মালিক আমাকে নিবার জন্য লোক ও গাড়ি পাঠাইলেন। আমি তাদের কর্নওয়ালিস স্ট্রিটস্থ দোকানে গেলাম। কুশল মন্দ জিজ্ঞাসা ও চা'র অর্ডার ইত্যাদি প্রাথমিক ভদ্রতার পরই আমার বইয়ের কথা তুলিলেন। বই খুব জনপ্রিয় হইবে, গল্প ও ভাষা খুবই চমৎকার, ইত্যাদি কয়েক কথার পরেই তিনি বলিলেন : "কিন্তু বই-এ অনেক আরবি-ফারসি শব্দ আছে। এইগুলির ফুটনোট দিতে হইবে।' ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথা আমার পছন্দ হইল না। কিন্তু

ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্ক করা যায় না, কারণ হাজার টাকা এখনো বাকি। কাজেই খুব সাবধানে অতি মোলায়েম ভাষায় যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলাম যে অমন সুন্দর রঙ্গিন কালির ছাপ শিশুপাঠ্য বইয়ে ফুটনোট একেবারে বেমানান হইবে। বইয়ের সৌন্দর্য একদম নষ্ট হইয়া যাইবে।

ভদ্রলোক আমার যুক্তি মানিয়া লইলেন। কিন্তু ফুটনোটের বদলে 'পরিশিষ্টে' শব্দার্থ দিতে বলিলেন। পরিশিষ্টের বিরুদ্ধে খানিকক্ষণ এটা-ওটা যুক্তি দিয়া শেষ পর্যন্ত আসল যুক্তিটা বাহির করিলাম। বলিলাম : আমার বইয়ে কোনও আরবি-ফারসি শব্দ নাই। সবই বাংলা শব্দ। কাজেই পরিশিষ্টে শব্দার্থ দেওয়ার দরকার নাই।

ভদ্রলোককে বুঝাইবার জন্য বলিলাম যে ঐসব শব্দের উৎপত্তি আরবি ফারসি ভাষা হইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বাংলার জনসাধারণ ঐ সব শব্দ তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করায় ও-সবই বাংলা হইয়া গিয়াছে। বলিলাম : যেসব শব্দ তিন বছরের নিরক্ষর বাঙ্গালী শিশু বুঝিতে ও বলিতে পারে, মূল যা-ই হোক, যেসব শব্দই বাংলা। দৃষ্টান্ত দিলাম 'জংগল' ও 'জানালা দিয়া। দুইটাই ওলন্দাজ শব্দ। কিন্তু আমাদের দেশের মাটিতে উহারা এমন মিশিয়া গিয়াছে যে ও-গুলির বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজিয়া বাহির করার কল্পনাও কেউ করে না।

ভদ্রলোক আমার কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন : আমাকে ভাষা-বিজ্ঞান শিখাইবার চেষ্টা করিবেন না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার বই বিক্রয় দিয়া কথা। ঐ সব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ না দিলে হিন্দুরা বুঝিতে পারিবে না। মুসলমানরা ঐসব শব্দ ব্যবহার করিলেও হিন্দুরা করে না।

আমি যখন ভদ্রলোককে বলিলাম যে হিন্দুরা ও-সব শব্দ সাধারণত ব্যবহার না করিলেও তারা সকলেই বুঝিতে পারে, তখন ভদ্রলোক ধৈর্য হারাইয়া বলেন যে তবু ওগুলি আরবি-ফারসি শব্দ, বাংলা শব্দ নয়।

আমিও রাগ করিয়া প্রশ্ন করিলাম :

শতকরা ছাপ্পান্ন জন বাঙ্গালীর মুখের ভাষাকে আপনি বাংলা স্বীকার করেন? দেশের দুর্ভাগ্য!

আমি তখন পুরা কংগ্রেসি। মাথা হইতে পা পর্যন্ত মোটা খদ্দর। তিনি নূতন করিয়া আমার পোশাকের দিকে চাহিয়া বলিলেন : দেখুন, আমি ব্যবসায়ী। আপনার সাথে আমি দেশের ভাগ্য লইয়া তর্ক করিতে চাই না। আমার শুধু জানা দরকার আপনি ঐ সব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দিবেন কি দিবেন না?

ভদ্রলোকের সুরে অশুভ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল। আমি অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিলাম : আমাকে ব্যাপারটা বুঝিতে দেন। আপনি কী বলিতে চান, পরিশিষ্টে 'পানি' অর্থ 'জল', 'আল্লাহ' অর্থ 'ঈশ্বর', 'রোযা' অর্থ উপবাস', এইভাবে ওয়ার্ড বুকের মত শব্দার্থ লিখিয়া দিতে হইবে?

আমি অনেকটা নরম হইয়াছি মনে করিয়া ভদ্রলোক খুশি হইলেন। বিনীতভাবে বলিলেন : আজ্ঞে হাঁ, ঠিক ধরিয়াছেন।

আমি : তা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে পানি, আল্লাহ, নামাজ, রোযা এসব শব্দ বাংলা নয়? জল, ঈশ্বর, উপাসনা ও উপবাসই বাংলা শব্দ?

ভদ্রলোক একটু ভাবিয়া বলিলেন : না, তা কেন? বাংলা শব্দেরও কি বাংলা প্রতিশব্দ থাকে না? ঈশ্বর অর্থ ভগবান, জল অর্থ বারি, এসব কথা কি আমরা বলি না?

আমি বলিলাম : ঠিক আছে। আপনার কথাই মানিয়া লইলাম। ঐ সব শব্দের প্রতিশব্দ আমি লিখিয়া দিব। কিন্তু এক শর্তে।

ভদ্রলোক খুশিতে হাসিতে যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ মুখের হাসির বদলে চোখে কৌতূহল দেখা দিল। বলিলেন : কী শর্ত?

আমি: আপনি বহু হিন্দু গ্রন্থকারের বইয়ের প্রকাশক। তাঁদেরে ডাকিয়া রাজি করুন : তাঁদের বইয়ের পরিশিষ্টের শব্দার্থে ঈশ্বর অর্থ আল্লাহ, জল অর্থ পানি, উপবাস অর্থ রোযা; ইত্যাদি যোগ করিবেন। এতে রাজি আছেন আপনি?

৯. প্রথম স্যাক্রিফাইস

ভদ্রলোক রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। এর পর যা কথাবার্তা হইল তার খুব স্বাভাবিক পরিণতি হইল আমার জন্য খুব খারাপ। ভদ্রলোক স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, আমার সাথে তার চুক্তি বাতিল। তিনি কপিরাইট কিনিলেন না। ব্লক তৈয়ার করিতে তাঁর যে হাজার খানেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, তা তিনি আমার কাছে দাবি করিলেন না। আমার অগ্রিম নেওয়া একশত টাকা ফেরৎ দিয়া যে-কোনও দিন আমি পাণ্ডুলিপি ফেরৎ নিতে পারি বলিয়া ভদ্রলোক চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা আমিও উঠিলাম। আদাব' বলিয়া বাহির হইলাম। প্রায় চৌকাঠ পার হইয়াছি এমন সময় ভদ্রলোক ডাকিয়া বলিলেন : মনসুর সাহেব, আপনি রাগিয়া গিয়াছেন। আবার ভাবিয়া দেখুন। পরিশিষ্ট দিতে রাজি হইলে এখনও আপনার বই নিতে পারি।

কিন্তু এ কথার যে জবাব আমি দিতে চাহিলাম, তা পারিলাম না। তার বদলে কে যেন আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া দিল : 'ভট্টাচার্য্য মশায়, আপনি রাগিয়া গিয়াছেন। আবার ভাবিয়া দেখুন। পরিশিষ্ট ছাড়া বই ছাপিতে রাজি হইলে এখনও আপনাকে বই দিতে পারি।'

ব্যবহারের প্রতিবিম্বরূপে ব্যবহার করা, আর কথার প্রতিধ্বনি রূপে কথা কওয়ার সেই পুরাতন বদভ্যাস! আমি কিছুতেই এই অভ্যাসের হাত হইতে রেহাই পাইলাম না।

গিয়াছিলাম মোটরে। ফিরিতে হইবে ট্রামে। ফুটপাথ ধরিয়া ট্রামস্টপে যাইতে, ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতে এবং ট্রামে চড়িয়া শিয়ালদহে মোহাম্মদী আফিসে আসিতে শুধু একটা কথাই আমার মাথায় কিলবিল করিতে থাকিল : এটা কী করিলাম? এক হাজার টাকা হারাইলাম একটা জিদের বশে? হাজার টাকা ত গেল, আবার আগাম-নেওয়া টাকাটাও ত ফেরৎ দিতে হইবে। এগারশ টাকার সব গেল? মনে হইল, বাদশাহী তখ্ত হারাইয়া পথের ফকির হইলাম। বস্তুত, তৎকালে আমার জন্য এগারশ টাকাই ছিল বিপুল সম্পদ। মাসে চল্লিশ হাজার টাকার আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় একদা ঐ মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে মাথা নত করিয়া আমিও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলাম। আজ মনে হইল আমার এই এগারশ টাকা ত্যাগ দেশবন্ধুর ত্যাগের চেয়েও বড়। কারণ দেশবন্ধু ঐ ত্যাগের পরেও সুখে-সম্মানে বাঁচিয়া আছেন। কিন্তু আমার এই ত্যাগে সুখ-সম্মান ত দূরের কথা, একশ টাকা ফেরৎ না দিলে ত আমাকে চরম অপমান হইতে হইবে। কী দরকার ছিল জিদ করিবার? দিলেই ত হইত একটা পরিশিষ্ট লিখিয়া। বইটায় ত আমার কোনও স্বত্বাধিকার থাকিত না। কাজেই তার ভুলত্রুটির জন্য আমাকে কেউ দোষও দিত না, তবে কি ভুল করিলাম?

কিন্তু মুহূর্তেই জবাব পাইলাম। আমার সারা অস্তিত্ব এক সঙ্গে হুংকার দিয়া উঠিল : না না, ভুল করি নাই। আমার আত্মসম্মানবোধ ঝাঁকি মারিয়া মাথা তুলিয়া বুক টান করিয়া বলিল : ঠিক করিয়াছি। বাংলার মেজরিটি মুসলমানের মুখের ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া স্বীকার করিল না বাংলার মাইনরিটি হিন্দুরা? এ অবস্থা চলিতে থাকিলে মুসলমানের ত ভাল হইবেই না, সারাদেশের, সুতরাং হিন্দুরও ভাল হইবে না। কাজেই এটা বন্ধ করিতেই হইবে। হিন্দুদের বর্তমান মতিগতিতে কাজটা খুবই কঠিন। কাজেই স্যাক্রিফাইস দরকার। আমার মত গরীবের পক্ষে এগারশ টাকা স্যাক্রিফাইস খুব বড় ত্যাগ বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যের তুলনায় এ ত্যাগ খুবই সামান্য। হয়ত এর চেয়েও বড় ত্যাগ করিতে হইবে। মনে সান্ত্বনা পাইলাম। আফিসে ফিরিয়া খায়রুল আনাম খাঁ সাহেবকে সব বলিলাম। তিনি দয়া করিয়া পূর্ব প্রস্তাব মত ছয়শ টাকায় আমার বই কিনিতে রাজি হইলেন। এক শ টাকা অগ্রিম দিলেন। পাণ্ডুলিপি ফেরৎ আনিলাম।

যথাসময়ে মোহাম্মদী বুক এজেন্সী আমার মুসলমানী কথা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর যা ঘটিল, তাতে মুসলমানের মুখের ভাষার জন্য আমার মত গরীবের স্বার্থ ত্যাগের অহংকার ষোল আনা অটুট থাকিল। কারণ আমার ত্যাগের পরিমাণ আরেকটু বাড়িল। কিন্তু ঐ ত্যাগও যথেষ্ট নয়, আর ত্যাগের দরকার হইতে পারে বলিয়া আমি সেদিন যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, বারটি বছর না যাইতেই সে আশঙ্কা আমারই ঘাড়ের উপর দিয়া কার্যে পরিণত হইল।

### ১০. দ্বিতীয় স্যাক্রিফাইস

আমি তখন ময়মনসিংহ জজকোর্টে উকালতি করি। নূতন উকিল। পসার খুব জমে নাই। সাহিত্যিক নেশায় এবং উপরি আয়ের জন্য নয়া পড়া নামক চার খণ্ডের একখানা শিশুপাঠ্য বই লিখি। চার খণ্ড বই মকতবের চার ক্লাসের জন্য টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই চারখানা বই হইতে আমি যথেষ্ট টাকা-কড়ি পাইতে থাকি। তিন বছর মুদ্দত পার হয়-হয় অবস্থায় বাংলার প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট পাশ হয়। এই নূতন আইনে প্রাইমারি স্কুল ও মকতব এক করিবার বিধান হয়। আমার নয়া পড়াঅনুমোদিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'এ' ক্লাসের বই ছিল। সুতরাং নূতন বিধানেও আমার বই পাঠ্য-পুস্তক থাকিয়া যাইবে, এ কথা প্রকাশকসহ সকলেই বলিলেন। নয়া পড়ার চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। আমার আয়ও বাড়িবে, এই আশায় আমি গোলাপি স্বপ্ন দেখিতে থাকিলাম।

।এমন সময় টেক্সট বুক কমিটির তরফ হইতে এক পত্রে আমাকে জানান। হইল যে আমার নয়া পড়া নূতন আইনে পাঠ্য-পুস্তকরূপে অনুমোদিত হইয়াছে, তবে উহাতে যে সব আরবি-ফারসি শব্দ আছে, সেসব শব্দের জায়গায় বাংলা প্রতিশব্দ বসাইতে হইবে।

বার বছর আগেকার ঘটনা মনে পড়িল। তখন ছিলেন ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স, এবার স্বয়ং টেক্সট বুক কমিটি মানে, খোদ সরকার। কিন্তু আমিও আজ বার বছর আগের অসহায় লোকটি নই। ইতিমধ্যে দেশে বিরাট পরিবর্তন হইয়াছে। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছেন। তাঁর আমি একজন প্রিয় শিষ্য। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট হাত আছে। হক সাহেব আমার কোনও কথাই ফেলেন না।

অতএব টেক্সট বুক কমিটিকে আমার সেই পুরাতন মত জানাইলাম, যা ভট্টাচার্য্যকে জানাইয়াছিলাম। টেক্সট বুক কমিটি কিন্তু ভট্টাচার্য্যকে ছাড়াইয়া গেলেন। তারা অন্যান্য যুক্তির সঙ্গে এটাও জানাইলেন : "আল্লা', 'খোদা', 'পানি ইত্যাদি শব্দ প্রাইমারি পাঠ্য-পুস্তকে থাকিলে হিন্দু ছাত্রদের ধর্মভাবে আঘাত লাগিবে। আমার মাথায় আগুন চড়িয়া গেল। আমি জানাইলাম, একশ বছরের বেশি বাংলার মুসলমান ছাত্ররা পাঠ্য-পুস্তকে 'ঈশ্বর', 'ভগবান', 'জল' পড়াতেও যদি তাদের ধর্মভাবে আঘাত লাগিয়া না থাকে, তবে এখন হইতে 'আল্লা', 'খোদা পড়িয়া হিন্দুদেরও ধর্মভাবে আঘাত লাগা উচিৎ নয়।

আমার যুক্তি ভট্টাচার্য্য যেমন মানেন নাই, টেক্টট বুক কমিটিও মানিলেন না। আমাকে জানাইয়া দিলেন, অত্র অবস্থায় আমার বই বাতিল করিয়া দিতে তারা বাধ্য হইলেন বলিয়া দুঃখিত।

আমি রাগ করিলাম না। মনে মনে হাসিলাম। বেচারা টেক্সট বুক কমিটি জানেন না : কার বই তাঁরা বাতিল করিলেন। তাঁরা জানেন না, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী হক সাহেবকে দিয়া আমি শুধু তাদের এই বাতিল অর্ডারই বাতিল করিতে পারি না। তাদের চাকুরি পর্যন্ত নট' করিয়া দিতে পারি। অবশ্য আমি বেচারাদের চাকরি সত্য-সত্যিই নট' করিব না। তবে সে মর্মে ধমক দিয়া তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য হুঁশিয়ার করিয়া দিতে এবং তাঁদের বাতিলি অর্ডার বাতিল করাইতে আমি কলিকাতা গেলাম। হক সাহেব যথারীতি হৈ চৈ করিলেন : টেক্সট বুক কমিটি ভাঙিয়া পড়িবেন, কর্মচারীদের ডিসমিস করিবেন। বলিয়া হুংকার দিলেন। তাঁদের কৈফিয়ত তলব করিলেন। আমি আশ্বস্ত হইয়া এবং কারো চাকুরি নষ্ট না করিতে হক সাহেবকে পুনঃপুন অনুরোধ করিয়া ময়মনসিংহ ফিরিয়া আসিলাম। বহুদিন অপেক্ষা করিবার পর আবার কলিকাতা গেলাম। এইবার হক সাহেব আমাকে জানাইলেন যে হিন্দু বদমায়েশ অফিসারদের জ্বালায় তিনি কিছু করিতে পারিলেন না। বিলম্বও হইয়া গিয়াছে যথেষ্ট। এখন পাঠ্যবই বদলাইলে ছাত্রদের অসুবিধা হইবে। আমারও আর্থিক লাভ বিশেষ হইবে না। তবে আগামী বৎসর যাতে আমার বই অবশ্যপাঠ্য হয়, সে ব্যবস্থা তিনি নিশ্চয় করিবেন। আমি এতদিন ব্যাপারটার আর্থিক দিক মোটেই ভাবিতেছিলাম না। হক সাহেবের আশ্বাসের পর সে বিষয়েও আমি সচেতন হইলাম। কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুত আগামী বছর আর আসিল না। বাঙ্গালী মুসলমানের মুখের ভাষা বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি পাইবার প্রয়াসে ইহাকে আমার আরেকটা স্যাক্রিফাইস বলিয়া অবশেষে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

১৯২৬ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চার বছর কাল আমি সওগাত-এর সম্পাদকের দফতর লেখায় সাহায্য করি। ঐ সাথেই আমার আয়নার গল্পগুলিও সওগাত-এ বাহির হয়। এই সময় সওগাত আফিস তৎকালীন প্রগতিবাদী সমস্ত মুসলিম সাহিত্যিকদের আড্ডা ছিল। ঐ আড্ডাতে আমরা সওগাত ক্লাব' বলিতাম। নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, হবিবুল্লাহ বাহার, কবি মঈনুদ্দীন, কবি ফজলুর

রহমান, কবি বেনীর আহমদ, কবি মহিউদ্দিন প্রভৃতি সমস্ত সাহিত্যিকদেরই সওগাত আফিসের আড্ডায় যাতায়াত ছিল। কাজী আবদুল ওয়াদুদ ও অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেবরা তৎকালে ঢাকায় শিখা সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত প্রগতিবাদী মুসলিম সাহিত্য সংঘ চালাইতেন। এঁদের সঙ্গে চিন্তার দিক দিয়া আমাদের বহুলাংশে মিল ছিল বলিয়া ব্যক্তিগত সহযোগিতা ও যাতায়াত ছিল।

## ১১. সাহিত্য-সমিতির সেক্রেটারি

এই মুদ্দতটাতে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সেক্রেটারি ছিলাম। বয়স, যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার দিক দিয়া আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ইয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেবকেই আমি সেক্রেটারি করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তার স্বাস্থ্য খারাপ ও দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ছিল বলিয়া তিনি আমাকে সেক্রেটারি হইবার জন্য জিদ করেন এবং নিজে আমার সহকারী সেক্রেটারি হইতে সম্মত হন। ফলে বার্ষিক সভায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. এস ওয়াজেদ আলী সাহেব প্রেসিডেন্ট, আমি সেক্রেটারি, ইয়াকুব আলী চৌধুরী ও আয়নুল হক খাঁ সাহেবদ্বয় সহ সেক্রেটারি ও মৌ. মুজিবর রহমান সাহেব কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন। আমরা নির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলী ছাড়া মৌ. ওমেদ আলী নামে এক ভদ্রলোক ড. শহীদুল্লাহ-মমাজাম্মেল হক সাহেবের আমল হইতে বরাবর সমিতির আফিস সেক্রেটারি ছিলেন। সাহিত্য সমিতির প্রতি এই ভদ্রলোকের এমন একটা পিতৃস্নেহ ছিল যে, সামান্য বেতনে তিনি বহুদিন এই সমিতির সেবায় কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব ক্যাম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট ব্যারিস্টার ছিলেন। নামের শেষে তিনি বরাবর 'বি. এ. ক্যানটাব' লিখিতেন ও লিখাইতেন। বন্ধুবর ওমেদ আলী এ বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন। সমিতির প্রচারে বাহিরে গিয়া অথবা আফিসে বসিয়া নূতন লোকের প্রশ্নের উত্তরে কেউ আমরা যখন বলিতাম আমাদের প্রেসিডেন্ট মি. এস ওয়াজেদ আলী, ওমেদ আলী সাহেব ব্রাকেটে বলিয়া দিতেন 'বি. এ. ক্যানটাব'। স্যার আবদুর রহিম, মৌ. ফজলুল হক, মৌ, আবদুল করিম প্রভৃতি বড়-বড় নেতাদের বাড়িতে আলোচনায় এমনকি সমিতির সভায়ও যদি কেউ কোনও কারণে মি. এস ওয়াজেদ আলী উচ্চারণ করিতেন, অমনি ওমেদ আলী সাহেব সভার যে-কোনও কোণ হইতে বলিয়া উঠিতেন, বি. এ. ক্যানটাব। আমরা ওমেদ আলী সাহেবের এই ব্যবহারে হাসিতাম। আমরা মনে করিতাম, ওয়াজেদ আলী সাহেবের 'ক্যানটাব'প্রীতিকে তিনি এইভাবে বিদ্রূপ করিতেছেন। কিন্তু ওমেদ আলী সাহেব ছিলেন সিরিয়াস। তিনি আমাদের হাসিতে মনে মনে দুঃখিত হইতেন।

যা হোক ওমেদ আলী সাহেব ছিলেন সমিতির একটা অ্যাসেট। তার মহানুভবতায় আমি এতদিন নির্বিঘ্নে সমিতির সেক্রেটারিগিরি করিতে পারিয়াছিলাম।

সাহিত্য সমিতির সেক্রেটারিগিরি করিতে গিয়া আমার যে দুইটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হইয়াছিল আমার সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে তার কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকিলেও এখানে তার উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

## ১২. চাঁদা আদায়

প্রথমটি নবাব মশাররফ হোসেন সাহেবের সঙ্গে। তিনি একবার বার্ষিক সভায় সমিতির তহবিলে পাঁচ শত টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তখন তিনি বাংলা সরকারের একজন মন্ত্রী। এই প্রতিশ্রুত

চাদা আদায়ের জন্য আমরা সম্পাদকমণ্ডলী তার হাজরা রোডের বাড়িতে হানা দিলাম। হাজরা রোড ট্রাম লাইন হইতে অনেক দূরে। কাজেই কিছুদিন হাঁটাহাঁটি করিবার পর প্রথমে ইয়াকুব আলী চৌধুরী, পরে আয়নুল হক খ এবং শেষ পর্যন্ত ওমেদ আলী সাহেবও নিরাশ হইয়া খসিয়া পড়িলেন। আমি সেক্রেটারি পাওনাদারের তাকিদ আমার উপরই ছিল প্রত্যক্ষভাবে। সুতরাং পাঁচ শ টাকা আমি অত সহজে ছাড়িতে পারিলাম না। ঘুরা-ফেরা করিতেই থাকিলাম। একদিন আমি চটিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিলাম : 'নবাব সাহেব, আমাকে আর কত ঘুরাইবেন? টাকা দিবেন কি না আজ স্পষ্ট কথা বলিতে হইবে।' নবাব সাহেব আমার কথা বলার ভঙ্গিতে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন : 'বড় যে পাওনাদারের মত মেজে কথা বলিতেছেন। আপনার কথা শুনিয়া মনে হয় আমি যেন আপনার খাতক। আমি সমান জোরে বলিলাম : 'আলবত আপনি আমার খাতক; আলবত আমি আপনার পাওনাদার।' নবাব সাহেব চোখ লাল করিলেন। ঘর-ভরা বড়-বড় সাহেব আইসিএস অফিসার। তারা আমার দুঃসাহসে ও আসন্ন বিপদে বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র না ঘাবড়াইয়া মাথা উঁচা করিয়া বলিলাম : আপনি যেদিন প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া সমিতির তহবিলে পাঁচ শত টাকা চাঁদা দিবেন ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে সমিতি আপনার পাওনাদার। আপনি সমিতির খাতক। আপনি যদি ওয়াদা খেলাফ করিতে চান, তবে বলিয়া দেন সে কথা। আমি সমিতির সভা ডাকিয়া সে কথা বলি। সমিতি আপনাকে মাফও করিয়া দিতে পারে।

নবাব সাহেব আমার দিকে আর না চাহিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারিকে একটা পাঁচ শ টাকার চেক লিখিয়া আনিতে বলিলেন। চেক আসিলে তিনি তাতে সই করিয়া আমার দিকে ঠেলিয়া দিলেন। আমিও একটা রসিদ লিখিয়া একটানে ছিঁড়িয়া তাঁর দিকে ঠেলিয়া দিলাম। খুব নুইয়া একটা 'আদব আরয' করিয়া বিদায় হইলাম। দুইদিন পরে আমার মনিব মৌ. মুজিবর রহমানের কাছে। নবাব সাহেব বলিয়াছিলেন : 'আপনার ঐ আবুল মনসুরটা একটা মস্তবড় বেয়াড়া লোক। সে আমাকে সেদিন অফিসারদের সামনে কি বেকায়দায়ই না ফেলিয়াছিল।' সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মৌলবী সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন : 'ছেলেটা অমন বেয়াড়াই বটে।'

## ১৩. চাঁদা দান

দ্বিতীয় ঘটনাটা হক সাহেবের সঙ্গে। বাড়িওয়ালা কর্পোরেশনের বকেয়া ট্যাক্স না দেওয়ায় সেবার আমাদের সমিতি অফিস, লাইব্রেরির বই-পুস্তক, আলমারি ও টেবিল-চেয়ার ক্রোক হইয়াছিল। তিন দিন সময় নিয়াছিলাম। সে তিন দিনের শেষ দিন। সেদিন টাকা শোধ না করিলে পরদিন সকালে নিলাম হইবে। মোট দেনা সাড়ে তিনশ টাকা। সম্পাদকমণ্ডলী আড়াই দিন ঘুরিয়া নবাব, জমিদার, ব্যারিস্টার, উকিল, মার্চেন্ট প্রভৃতি বিরাট ধনী লোকের নিকট হইতে মাত্র পঞ্চাশ টাকার মত চাঁদা তুলিতে পারিয়াছি। তৃতীয় দিনের বেলা তিনটা পর্যন্ত বিনা গোসল-খাওয়ায় তিন-চার-বন্ধু নিতান্ত নিরাশ হইয়া ক্ষুধা ক্লান্ত দেহে বাসায় ফিরিতেছি। পথে মৌলবী ফজলুল হকের বাসা। বাসার সামনে গিয়া হঠাৎ একজন বলিয়া ফেলিলেন : হক সাহেবের কাছে একবার গেলে হয় না? কিন্তু আমরা কথাটায় আমল দিলাম না। আমরা সবাই হক সাহেবের ভক্ত বটে, কিন্তু তাঁর ওটা চরম দারিদ্র্যের সময়। কাবুলী মহাজনের তাগাদায় তিনি রাস্তায় বাহির হইতে পারেন না। তার ভাঙ্গা ফোর্ড মোটরের হেডলাইট, সাইড লাইট কিছুই না থাকায় দুই দিকে দুইটা হ্যারিকেন বাঁধিয়া রাত্রে রাস্তায় বাহির হন। হাইকোর্টে প্রায় যানই না। শুধু মফস্বলে প্র্যাকটিস করেন। তার বাসার

অদূরেই একটা মেসে আমরা থাকি। কাজেই এসবই আমাদের জানা কথা। হক সাহেবকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য পাবলিকের কাছে অর্থ সাহায্য চাহিয়া কিছুদিন আগে ইয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে আমরা আবেদনপত্র ছাপিয়া বিলি করিয়াছি। এমন বিপন্ন হক সাহেবের কাছে চাঁদা চাইতে যাওয়া কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়ামাত্র। কিন্তু ঐ বন্ধু জিদ করিলেন : হক সাহেব সমিতির অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট। চাঁদা চাই আর না চাই, সমিতির বর্তমান বিপদটা তাকে জানান আমাদের কর্তব্য।

এ যুক্তির জবাব ছিল না। কাজেই আমরা হক সাহেবের বৈঠকখানায় ঢুকিলাম। দেখিলাম তিনি একজন মাত্র মওক্কেল লইয়া বসিয়া আছেন। আমরা সবিস্তারে সব কথা তাঁকে বলিলাম। তিনি মাথা চুলকাইলেন এবং মওক্কেলটির দিকে চাহিয়া বলিলেন : বেশ আমি যাইব। বায়নার টাকা ফেলেন। লুঙ্গি-পরা সাদাসিধা বুড়া মানুষ। জলপাইগুড়ির এক কেসে হক সাহেবকে জলপাইগুড়ি নিতে আসিয়াছেন। হক সাহেবের আদেশে তিনি টেবিলের উপর পাঁচশ টাকা রাখিয়া বলিলেন : এটা বায়না। টিকিট আমি কিনিব। বাকিটা জলপাইগুড়িতে দিব।

হক সাহেব আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন : তোমাদের দরকার কত?

আমাদের দরকার তিনশ। কিন্তু মোটে পাঁচশ টাকার মধ্যে তিনশ টাকা চাহিতে আমাদের জিভ আড়ষ্ট হইয়া আসিল। আমাদের সংকোচ দেখিয়া হক সাহেব নিজেই হিসাব করিয়া দুইশ টাকা নিজের ড্রয়ার টানিয়া বাকি তিনশ আমাদের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। স্তম্ভিত আমরা কম্পিত হস্তে টাকা তুলিয়া নির্বাক সালাম দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

১৪. সাহিত্য-জীবনের মুদ্দত ভাগ

প্রকাশিত পুস্তকগুলির রচনাকালের দিক হইতে আমার সাহিত্যিক জীবনকে চারটি মুদ্দতে ভাগ করা যায়। প্রথম মুদ্দত কলিকাতা-জীবন ১৯২২ হইতে ১৯২৯। দ্বিতীয় মুদ্দত, ময়মনসিংহ-জীবন ১৯৩০ হইতে ১৯৩৮। ১৯৩৮ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত আবার কলিকাতা-জীবন আমার সাহিত্যিক জীবনের তৃতীয় মুদ্দত। ১৯৫০ সাল হইতে আজ পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহের জীবন। আমার চতুর্থ মুদ্দত। পূর্বেকার মুদ্দতে ছাত্রজীবনে আমি যেসব প্রবন্ধ আল এসলাম-এ এবং যেসব গল্প সওগাত-এ লিখিয়াছিলাম, তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া এই চার মুদ্দতে সেটা পড়ে না।

১৯২২ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত এই আট বছরে আমি যেসব গল্প লিখিয়াছিলাম এবং সওগাত-এ প্রকাশিত হইয়াছিল তার প্রায় সবগুলি আয়নায় ছাপা হইয়াছে। কাছাছুল আম্বিয়ার কিচ্ছাগুলি শিশুদের জন্য লিখিত মুসলমানী কথাও এই মুদ্দতেই লেখা। সেটিও পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল এই মুদ্দতেই আয়না প্রকাশের আগেই। এই মুদ্দতের লেখা আমার গোলামী সাহিত্য ও সভ্যতায় দ্বৈতশাসন ইত্যাদি বিতণ্ডামূলক প্রবন্ধগুলি তৎকালে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, তবে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এই মুদ্দতে সওগাত-এ যেসব প্রবন্ধাদি ছাপা হইয়াছিল, সেগুলিরও সংগ্রহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

১৯২৯ সালের শেষ দিকে সাংবাদিকতা ও কলিকাতা ছাড়িয়া উকালতি করিতে আমি ময়মনসিংহ শহরে আসি এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এখানে থাকি। এই সময়ে সওগাত আমি সাহিত্য ও যুগ-ধর্ম',

‘মুসলমান সমাজে আনন্দ ইত্যাদি যেসব সাহিত্যিক-সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম সেগুলিও পুস্তকাকারে ছাপা হয় নাই। কিন্তু এই মুদ্দতে আমার জীবন ক্ষুধা নামক বিশাল আকারের নভেলটি সওগাত-এ ক্রমশ প্রকাশিত হইতে শুরু হয়। প্রতিমাসে বাহির হইয়াও চার বছরে শেষ হয়। আমার আয়নাও পুস্তকাকারে এই মুদ্দতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ সালে সাংবাদিকতা করিতে আবার কলিকাতা যাই। সেখানে একটানা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বার বছর বাস করি। এই সময়কার লেখা আমার গল্পগুলি ফুড কনফারেন্স-এ এবং দুই-একটা আসমানী পর্দা ও গালিভারের সফরনামাতেও ছাপা হইয়াছে। আমার সত্য-মিথ্যা নভেলও এই মুদ্দতেই লেখা হয়। যদিও এসব পুস্তক আরো পরে ঢাকা আসার বাদে ছাপা হইয়াছে। ছোটদের কাছাছুল আম্বিয়াও এ সময়ে লেখা, কিন্তু পরে ছাপা হইয়াছে।

১৯৫০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুদ্দতে আমার জীবন ক্ষুধা, সত্য মিথ্যা, আবে হায়াত ইত্যাদি নভেল, আসমানী পর্দা, গালিভারের সফরনামা ইত্যাদি গল্পগ্রন্থ ও পাক-বাংলার কালচার (বর্তমান বাংলাদেশের কালচার) ও পরিবার পরিকল্পনা নামক সন্দর্ভ পুস্তক, আল-কোরআনের নসিহত নামে সিলেকশন অনুবাদ গ্রন্থও এই মুদ্দতেই বাহির হইয়াছে। এই মুদ্দতেই আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু ও এন্ড অব এ বিট্রেয়াল (ইংরাজি) ইত্যাদি রাজনৈতিক গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ উকালতি জীবনে (১৯২৯-১৯৩৮) আমার সাহিত্য-সাধনার বিষয়বস্তুর মধ্যে অভিনবত্ব আসিয়াছিল দুই দিক হইতে : একটি স্বভাবের টানে; অপরটি অভাবের টানে। নিতান্ত দৈবাৎ। প্রথমটি আমার পাঠ্য-পুস্তক লেখা। এটি ঘটে এই ভাবে। কলিকাতার সদাব্যস্ত সাংবাদিক জীবন হইতে এই প্রথম আসিয়াছি মফস্বল শহর ময়মনসিংহের উকালতি জীবনে। নূতন উকিল। কাজ কম। অবসর প্রচুর। আনন্দ মোহন কলেজের আরবি-ফারসির দ্বিতীয় অধ্যাপক মৌ. আসাদুজ্জমান সাহেব এই শহরেরই ফিরোয় লাইব্রেরি’র মালিক। তিনি আমাকে ধরিলেন শিশু পাঠ্য-পুস্তক লিখিতে। তার অনুরোধে নয়া পড়া নামে চার খণ্ডের একটি পাঠ্য-পুস্তক লিখিলাম। মকতবের ১ম, ২য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য পুস্তক চারটি কমপালসারি পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচিত হইল। চার বছর পাঠ্য থাকিল। প্রচুর বিক্রি হইল। আমার বেশ অর্থাগম হইল। নূতন উকিলের প্র্যাকটিসের স্বল্পতাহেতু অর্থাভাব এতে পোষাইয়া গেল। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। অতএব এখানে এ বিষয়ে আর কিছু লিখিলাম না।

১৫. অভিনব বিষয়বস্তু

দ্বিতীয়টা, আমার জীবনে প্রথম যৌনবিজ্ঞানের পুস্তক রচনা। এটি ঘটে এইভাবে। আমার ছাত্রজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম পরে খান বাহাদুর এই সময়ে ময়মনসিংহে মুনসেফ। নবাবযাদা সৈয়দ হাসান আলী এই সময়ে এই শহরে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ হাসান মনজিলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করিয়াছেন। আমার সাথে রাজনীতি করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছি। সিরাজুল ইসলাম সাহেব ও নবাব্যাদা ঘন-ঘন আমার বাসায় যাতায়াত করেন। আমার স্ত্রী এই সময়ে (১৯৩৫ সালে) তৃতীয় পুত্র মতলুব আনামকে প্রসব করিয়াই টাইফয়েড জ্বরে ঘোরতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁর খোঁজখবর করিতে তারা আরো

বেশি ঘন-ঘন আসিতে বাধ্য হন। কারণ আমি এ সময়ে কোর্টে খুবই কম যাইতে পারিতাম। এমনি দিনে তারা দুইজনই এক সঙ্গে এ জিলার এডিশনাল এসপি মি. আবুল হাসানাত মোহাম্মদ ইসমাইলের সাথে আমার পরিচয় করাইয়া দেন। তাদের প্রস্তাব : আবুল হাসানাত সাহেব উদীয়মান সাহিত্যিক। তিনি একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আমাকে পুস্তকখানা সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। এসপি সাহেব আমাকে যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিবেন। আমার বর্তমান অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে এতে আমার খুবই উপকার হইবে।

আমি রাজি হইলাম। আবুল হাসানাত সাহেব তার লেখা যে পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দিলেন, সেটি একটি যৌন পুস্তক। কলিকাতার আন্ডার ওয়ার্ল্ড বাজারে এই ধরনের পুস্তকের গোপন বিক্রির কথা আমি কিছু-কিছু জানিতাম। এই ধরনের অশ্লীল পুস্তক রচনাকে আমি পাপ ও অপরাধ মনে করিতাম। কাজেই এসপি সাহেবের এ কাজে সহায়তা করিতে আমি অস্বীকার করিলাম। এসপি সাহেব তখন আমাকে বুঝাইলেন, অশ্লীল যৌন রচনা তার উদ্দেশ্য নয়। তিনি পশ্চিমী সভ্য জগতে প্রচলিত বিজ্ঞানের সাহিত্যই রচনা করিতে চান। এই ধরনের কোনও পুস্তক আমি পড়ি নাই, জানিতে পারিয়া তিনি অবাক হইলেন এবং কিছু কিছু পুস্তক আমাকে দিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি আমাকে হ্যাভলক এলিস, ফোরেল এবং মেরিস্টোপস প্রভৃতির বেশ কিছু বই পড়িতে দিলেন। ফলে এই ধরনের পুস্তক রচনায় এসপি সাহেবকে সহায়তা করিতে রাজি হইলাম। জনাব সিরাজুল ইসলাম ও নবাব্যাদার মধ্যস্থতায় আমার পক্ষে সুবিধাজনক আর্থিক চুক্তি হইয়া গেল। এসপি সাহেব আমার স্ত্রীর চিকিৎসা খরচা বাবত বেশ কিছু টাকা অগ্রিম দিলেন। ঔষধের দামের সব বিল তাঁর কাছে পাঠাইবার জন্য ঔষধের দোকানদারকে বলিয়া দিলেন। আমি কোর্টে যাওয়া প্রায় একদম বন্ধ করিয়া দিয়া রুগণ্ স্ত্রীর শুশ্রূষায় ও যৌন বিজ্ঞানের বিশাল বিশাল পুস্তক পড়ায় লাগিলাম। আমার স্ত্রীর অসুখ সারিতে চার মাস লাগিয়াছিল। সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে আরো দুই মাস লাগিয়াছিল। প্রথম চার মাস আমি শুধু পড়িলাম ও নোট করিলাম। পরের দুই মাস আমি অবিরাম লিখিয়া গেলাম। চার মাসে আমি মোট ১৪৩ খানা যৌন বিজ্ঞানের বই পড়া শেষ করিয়াছিলাম। এর মধ্যে চল্লিশখানার বেশি বড়-বড় বই। আর শত খানেকের বেশি চটি বই। এর প্রায় সবাই এসপি সাহেব এ জিলার চার-পাঁচটি বড়-বড় জমিদার বাড়ির লাইব্রেরি হইতে যোগাড় করিয়াছিলেন। এঁদের মধ্যে ময়মনসিংহের ও সুসুঙ্গের মহারাজা, মুক্তাগাছা ও গৌরীপুরের রাজা, শেরপুর ও আঠারবাড়ির জমিদারদের লাইব্রেরিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা-জমিদাররা এইসব পুস্তক লাইব্রেরি হইতে বাহিরে যাইতে কখনও দিতেন না। কিন্তু একজন এসপির অসাধ্য তৎকালে কিছুই ছিল না।

এসব পুস্তক ছাড়া দুই-একখানা সর্বাধুনিক যৌন-বিজ্ঞানের বইও তিনি নিজে বিদেশ হইতে খরিদ করিলেন। এইসব বইয়ে দীর্ঘ চার মাস কাল আমি এমন ডুবিয়াছিলাম যে, এই চার মাস কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, আমি যেন তার টেরই পাইলাম না। এই সব বই পড়িয়া আমি সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। সাধারণভাবে জীবন-দর্শন বিশেষভাবে যৌন-জীবন সম্পর্কে আমার ধ্যান-ধারণা বহু পরিবর্তন হইল। অতিশয়োক্তি না করিয়াও বলা যায়, আমি যেন জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকে একদম অন্ধকার হইতে আলোর রাজ্যে চলিয়া আসিলাম।

ফলে যে কাজ শুরু করিয়াছিলাম অনিচ্ছা ও অভক্তি লইয়া নিতান্ত আর্থিক টানে বাধ্য হইয়া, সেই কাজই শেষ করিলাম স্বেচ্ছায়, সশ্রদ্ধভাবে এবং বিপুল জ্ঞান ও আনন্দ-উৎসাহের মধ্য দিয়া।

মানসিক এই পরিবর্তনে দেহে ও হাতে এমন শক্তি ও উদ্যম আসিল যে দেড়শ বইয়ের সারমর্ম পাঁচশ পৃষ্ঠার একটি বইয়ে জমাট বাঁধাইলাম বিনা আয়াসে দুই মাস সময়ে। লেখাটাও এমন প্রাণবন্ত, জোরালো, যুক্তিপূর্ণ ও শালীন ভাষায় রচিত হইল যে, যিনি এই বইয়ের জন্য ছয় মাসে আমাকে ছয় হাজারের বেশি টাকা দিলেন, তিনি পুস্তকের ভূমিকার একাংশ পড়িয়াই আর পড়িলেন না। সোজা ছাপার ব্যবস্থা করিলেন। মধ্যস্থ বন্ধুদ্বয় সিরাজুল ইসলাম ও নবাবদা পড়িতে বা শুনিতেও চাহিলেন না। বলিলেন : আমরা জানিতাম মনসুর সাব যা লিখিবেন, তাই শ্রেষ্ঠ হইবে। পড়িয়া দেখিতে হইবে কেন?

বড়াই-অহংকার না করিয়াও বলা যায় যে চল্লিশ বছর আগে, তকালীন সমাজ-চিন্তার স্তরে ও জনমতের সেই পরিবেশে যৌন-বিজ্ঞানের প্রথম বাংলা গ্রন্থটি সত্যই ভাল হইয়াছিল। তার প্রমাণ এই যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত চিরকুমার ব্রহ্মচারী-বিজ্ঞানী-দর্শনী এই পুস্তকটিকে 'যৌন-সংহিতা' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তাছাড়া ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ডা. গিরিন্দ্র চন্দ্র দে প্রভৃতি বিশেষ-বিশেষ দৃঢ় মতবাদী পণ্ডিত ব্যক্তিগণও এই পুস্তকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। কলিকাতার সকল মত, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের দৈনিক, সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ও মাসিকাদি সাহিত্য-পত্র যেভাবে এই তথাকথিত অশ্লীল বিষয়ে লেখা পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন ও এর প্রকাশককে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, তাতে বলা যায়, বইটি সকল দিক দিয়াই সুলিখিত হইয়াছিল।

বইটি ছাপিতে দেওয়া হইয়াছিল কলিকাতা মোহাম্মদী প্রেসে। মোহাম্মদী প্রেসের সব প্রবীণ ও প্রধান কম্পোযিটররাই দীর্ঘদিনের পরিচিতির ফলে আমার হাতের লেখা চিনিতেন। প্রেসে যাওয়া-মাত্র তারা ধরিয়া নিলেন ওটা আমার বই। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ও উপরওয়ালাদের কাছে খবর দেওয়ার সময় তারা ওটাকে 'মনসুর সাহেবের বই' বলিয়াই উল্লেখ করিতেন। এ সব কথা আমাকে বলিলেন আবুল হাসানাত সাহেব নিজেই। তিনি এ সব খবর আমাকে দিলেন আমাকে তাঁর বইয়ের একটা প্রুফ দেখিতে অনুরোধ করিয়া। তিনি নিজেই ছুটি লইয়া কলিকাতা থাকিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু প্রফ দেখায় তিনি তখনও উস্তাদ নন। খুব ভাল প্রুফরিডার তিনি রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাদের দিয়া বিশ্বাস পাইতেছেন না। আমি ত কৃষক-প্রজা সমিতির কাজে ঘন-ঘন কলিকাতা গিয়াই থাকি; এ কাজে কিছুদিন বেশি করিয়া থাকিয়া-থাকিয়া এক-একটা ফাইনাল প্রুফ দেখিয়া দিলে খুব ভাল হয়। সেজন্য তিনি আমাকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিবেন। ততদিনে ১৯৩৫ সাল পার হইয়া '৩৬ সালে পড়িয়াছে। আসন্ন নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি কনটেস্ট করিবে। এই উপলক্ষে সত্যই আমাকে ঘন-ঘন কলিকাতা যাতায়াত করিতে হইতেছিল। তাছাড়া নিজের লেখা ছাপার সময়ে প্রুফ দেখার আগ্রহ আমার বরাবরের। নিজের লেখাটা, তা যার নামেই প্রকাশ হউক না কেন, ভুল ছাপান হইলে আমার মনে অসহনীয় কষ্ট হইত। কাজেই আমি রাজি হইলাম। সপ্তাহ-পনের দিনে কলিকাতা যাতায়াত করা, সেখানে থাকা-খাওয়া আমার ব্যবসায়িক লোকসান ইত্যাদি সাকুল্য বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি আমাকে এবারেও যথেষ্ট টাকা দিলেন। আমাকে প্রুফরিডার পাইয়া প্রেসও কাজে জোর দিল। ত্রিশ-বত্রিশ ফর্মার বই দুই মাসে ছাপা হইয়া গেল। ছাপা শেষ হইয়া আসিতে থাকায় আবুল হাসানাত সাহেব আমাকে আরেক বিপদে ফেলিলেন। তিনি আমাকে তার বইয়ের কো-অথার রূপে নাম দিতে চাপিয়া ধরিলেন। আমার মধ্যস্থ বন্ধুদ্বয়ও সে অনুরোধে যোগ দিলেন। কিন্তু এবার আমি দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করিলাম। দুই কারণে। এক, আমি তখনও পাক্কা কংগ্রেসি। অধিকাংশ কৃষক-প্রজা নেতা-কর্মীও তাই। জিলার পুলিশ সুপারের সাথে বইয়ের কো-অথার রূপে নাম ছাপা

হইলে সহকর্মী ও কংগ্রেসি সার্কেলে আমার বদনামের সীমা থাকিবে না, এ ভয়ে আতঙ্কিত হইলাম। দুই, আমি নিজে ততদিনে যৌন-বিজ্ঞানকে একটি সুষ্ঠু-শালীন বিজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের দেশের পাবলিক তখনও ওটাকে অশ্লীল কুকর্ম বলিয়াই জানিত। সরকারি অফিসাররা বিশেষত একজন পুলিশ অফিসার অনায়াসে জনমত অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারেন। কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর পক্ষে ওটা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যস্থ বন্ধুদ্বয়কে। উভয় আপত্তিই জানাইলাম বটে, কিন্তু আবুল হাসানাত সাহেবকে শুধু দ্বিতীয় আপত্তির কথাই জানাইলাম। আবুল হাসানাত সাহেব অগত্যা আমাকে কো অথার করার অভিপ্রায় ত্যাগ করিলেন। কিন্তু নিজে একটি সংক্ষিপ্ত 'গ্রন্থকারের নিবেদন' লিখিয়া তাতে বলিলেন, 'সুসাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ' এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

আমি নিজে যতই গোপন করিতে চেষ্টা করি না কেন, মুসলিম সাংবাদিক ও রাজনৈতিকদের কাছে ধরা পড়িয়া গেলাম। প্রধানত মোহাম্মদী আফিস হইতে এটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আবুল হাসানাত সাহেব চারিত্রিক সবলতার দরুন নিজেই তার বন্ধুমহলে এটা প্রকাশ করিয়া দিলেন। মোহাম্মদী আফিস হইতে এই সময় দৈনিক আজাদ বাহির হয়। প্রজা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব এই সময় মুসলিম লীগে যোগ দেন। ফলে মোহাম্মদী তথা আজাদ আফিস মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীদের আড্ডায় পরিণত হয়। সেখান হইতে প্রায় সকল মুসলিম রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা যৌন-বিজ্ঞানের রচনায়। গোপন তথ্য জানিয়া ফেলিলেন। হিন্দু সাংবাদিক বন্ধুরা এবং কংগ্রেসি সহকর্মীরা এটা জানিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার মারফতে। কলিকাতার সব ইংরাজি, বাংলা দৈনিক পত্রিকায় সদ্য-প্রকাশিত 'যৌন-বিজ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার সমালোচক এক ডিগ্রি আগাইয়া যান। বিরাট আকারের সমালোচনা। তাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে এ কথাও বলেন : "এই গ্রন্থের ভাষা পড়িয়া আমরা বুঝিলাম গ্রন্থকারকে আমরা চিনি। তিনি ছদ্মনামে এই বই লিখিয়াছেন। এই সময় আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মি. সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। আমরা হিন্দু মুসলিম সাংবাদিকরা প্রায় সবাই তাকে সত্যেনদা বলিয়া ডাকিতাম। এই সময় আমি সাংবাদিকতা ছাড়িয়া দেওয়া সত্বেও কলিকাতা সফরের সময় প্রায়ই আনন্দবাজার পত্রিকা আফিসে গিয়া সত্যেনদা'র সম্পাদকীয় রুমে আড্ডা দিতাম। যৌন-বিজ্ঞান বাহির হইবার পর একদিন আমি এমনি ধরনের আনন্দবাজার পত্রিকার আফিসে সত্যেনদার রুমে হাজির হইলে সত্যেনদা সমাগত বন্ধুদের (যাদের অনেকেই আমার পূর্বপরিচিত) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : বহুল প্রশংসিত যৌন-বিজ্ঞানের আসল গ্রন্থকারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিতেছি। সমবেত বন্ধুদের বিস্ময়-কৌতূহলের জবাবরূপেই যেন তিনি আমার রচনার বৈশিষ্ট্য, শব্দপ্রয়োগে নিজস্বতা, ভাষার সাবলীল তেজস্বিতা, স্টাইলের অনুকরণীয়তা ইত্যাদি তাঁরই নিজস্ব ভাষার গুণাবলি উদারভাবে আমার উপর আরোপ করিয়া আমার প্রাপ্যাধিক প্রশংসা করিলেন। এ ব্যাপারে সত্যেনদা সত্যই অতুলনীয়ভাবেই উদার ও মুক্ত-রসনা ছিলেন।

আবুল হাসানাত সাহেব তাঁর 'যৌন-বিজ্ঞান'-কে পরবর্তীকালে আকারে অনেক বিশাল ও বিষয়-সম্ভারে আরো অনেক সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। এসব কৃতিত্বপূর্ণ কাজে আমার কিছুমাত্র অবদান বা সহযোগিতা নাই। এ সবই তাঁর নিজস্ব কীর্তি। তিনি আগে হইতেই স্বাধীন চিন্তক ও শক্তিশালী

লেখক ছিলেন। যৌন-বিজ্ঞানকে উন্নততর মানের গ্রন্থে পরিণত করা ছাড়াও এ সম্পর্কে আরো অনেক বই-পুস্তক লিখিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন।

হয়ত গোড়ায় আমার প্রদর্শিত পন্থায় তিনি কিছুটা উপকৃত হইয়াছেন। কিন্তু আমি নিজে উপকৃত হইয়াছি অনেক বেশি। তার দেওয়া উল্লিখিত বিপুল সংখ্যক বই পড়িয়া আমার জীবন-দর্শনে প্রভূত প্রসারতার উন্মেষ হইয়াছে সে কথা আগেই বলিয়াছি। তাছাড়াও আবুল হাসানাত সাহেবের প্রদর্শিত পথে আরো অগ্রসর হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রয়েড ও ইয়ুংয়ের বই-পুস্তকের ও মনোবিকলনের সঙ্গে পরিচিত হই। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মনোবিকাশের ফলে ফ্রয়েডিয়ান মতবাদের শুধু ভক্ত পাঠকই হই নাই, তার মতবাদের তীব্র সমালোচকও হইয়াছি।

সক্রিয় রাজনীতি ও উকালতি হইতে অবসর গ্রহণের পর বৃদ্ধ বয়সে নিজেই পরিবার পরিকল্পনা নামে যৌন-বিজ্ঞানের একখানা বইও লিখিয়া ফেলিয়াছি। তাতে আমি খাদ্যাভাব মোচনের প্রচলিত উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেয়ে দম্পতি ও পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণকে উচ্চতর ও মহত্তর জীবন-বিধি রূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

# ১৪. গণভিত্তিক সাহিত্যিক মোড়

## **পঞ্চম খণ্ড**

## সাহিত্যিক জীবন (গরমামুলি)

## অধ্যায় চৌদ্দ - গণভিত্তিক সাহিত্যিক মোড়

### ১. উৎপ্রেরণা-জাত জাতীয় চিন্তা

সাহিত্যকে জীবন-ভিত্তিক হইতে হইবে এ ধারণাটা আমার ছিল একরকম সহজাত। এটাকে উৎপ্রেরণা-ভিত্তিকও বলা যাইতে পারে। তবে সে জীবন যে গণজীবন হইতে হইবে, এ উপলব্ধি আসে আরো পরে। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হইবে যে, গোড়ায় এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। সাম্প্রদায়িক চেতনা ত ছিলই না। ছাত্রজীবনের গোড়া হইতেই আমি বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, রমেশ দত্ত, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কবি ঔপন্যাসিককে বাংলা সাহিত্যের দিকপাল মনে করিতাম, এবং এঁদের অনুসারী আরো শত-শত হিন্দু সাহিত্যিককে আমার অনুকরণযোগ্য আদর্শ ভাবিতাম। শ্রদ্ধার সঙ্গে অথবা মনোযোগে পড়িতামও। এই সব মনীষীর লেখায় কোনও মুসলমান চরিত্র নাই। বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রের মত দুই-একজনের লেখায় যাও আছে, তা-ও ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ। এসব দেখিয়া মনে আফসোস হইত বটে, কিন্তু তাতেও কোনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখিতাম না। কাজেই আফসোস হইলেও রাগ হইত না।

বরঞ্চ মনে করিতাম, বলিতামও যে, মুসলমান সমাজে নাটক-নভেলের চরিত্র হইবার মত লোকই নাই। নারী-পুরুষের প্রেমই যখন নাটক নভেলের উপজীব্য তখন কড়া পর্দাপালক মুসলিম সমাজ লইয়া উপন্যাসই হইতে পারে না। শিশু-সুলভ এই সব চিন্তা-ধারণার যখন অবসান হইল, তখনও হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম-চরিত্রহীন বই-পুস্তককে ক্ষমার চক্ষেই দেখিয়া আসিতে থাকিলাম। লেখকদেরে কোনও দোষ দিতাম না। কারণ দোষটা ত আমাদের সমাজের, মানে আমাদের। নাহক অপরকে দোষ দিব কেন?

### ২. সাহিত্য-জীবন

ছাত্র-জীবনের অবসানে এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন হয়, সেটা গোড়ায় ছিল রাজনৈতিক। সে রাজনীতিতেও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। কারণ আমার রাজনৈতিক জীবনই শুরু হয় কংগ্রেসের মধ্য দিয়া। হিন্দু কংগ্রেস নেতাদের প্রশিক্ষণের অধীনে। রাজনৈতিক জীবনের প্রাইমারি স্তরেই ১৯২২ সালে আমি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও কবি মোজাম্মেল হক সাহেবদ্বয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'গোলামী সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধে গোটা বাংলা সাহিত্যকেই বিশেষত রবীন্দ্র শরৎচন্দ্রকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করি। সমালোচনা ত নয়, একেবারে নিন্দা। সে নিন্দায় অজ্ঞানতা, সাহিত্য সমালোচনায় অনধিকার, যতই থাকুক। তাতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। সাহিত্যিক সাম্প্রদায়িকতা মানে এখানে রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার মত

অবিচার বোধ নয়। এখানে সাম্প্রদায়িকতা মানে হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্র্য বোধ। গোলামী সাহিত্যে আমি গোটা বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতেই কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। গোটা বাঙ্গালী জাতির স্বার্থের দিক হইতেই তৎকালীন সাহিত্যকে গোলামী সাহিত্য বলিয়াছি। বঙ্কিম-মাইকেল তত দিনে উনিশ শতকের ইউরোপীয় নব-জাগরণের বাণীই বাঙ্গালী জীবনে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারের পথনির্দেশ করিয়াছেন। তাদেরই প্রদর্শিত পথে চলিয়া রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে সত্য-সত্যই আধুনিক সাহিত্যে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছেন। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের 'স্বর্ণযুগ তখন আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমার মত তরুণের মনে অতবড় উপলব্ধি কোনও নাড়া দেয় নাই। আমার চোখে পড়িয়াছিল শুধু এই একটা দিক : বঙ্কিম-মাইকেল যা লিখিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যা লিখিতেছেন এবং এ দুই শক্তিধরের অনুকরণে বাঙ্গালী সাহিত্য-সাধকরা যা লিখিতেছেন, তার সাথে বাঙ্গলার বাস্তব জীবনের কোনও মিল নাই। ইংরাজ-ফরাসি সাহিত্যিকদের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী নামে কতকগুলি ইংরাজ ফরাসি চরিত্রের কাহিনী লিখিতেছেন। আমার বিবেচনায় পৌনে দুইশ বছরের বিদেশি প্রভাবে রাজনীতির দিক হইতে আমরা যেমন ইংরাজের গোলাম হইয়া গিয়াছি, শিল্প-সাহিত্য-কৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমনি আমরা ইংরাজের গোলাম হইয়া গিয়াছি। এটা অবশ্য অংশত আমার তকালীন রাজনৈতিক ভাবাবেগেরই ফল। কংগ্রেসের অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের দ্বারা ভারতের অন্যান্য তরুণদের মতই আমিও বিপুলভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে কারণে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার ঐ মতবাদের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ছিল না। বরঞ্চ জাতীয় সাহিত্যের প্রাণ ও রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা প্রকাশের প্রয়াস ছিল। কেউ-কেউ তা স্বীকারও করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি উৎসাহিতও হইয়াছিলাম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে আমার এই প্রবন্ধে প্রকাশিত আমার মতবাদকে ধৃষ্টতা বলিয়া বিরূপ সমালোচনা করা হইলেও বরিশাল হিতৈষীর সম্পাদক খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তাঁর কাগজের সম্পাদকীয়তে আমার প্রবন্ধের সত্যভাষণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং একজন অখ্যাতনামা সাহিত্যে-নবাগত'কে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। এই মতবাদ যে আমার ক্ষণস্থায়ী ভাবাবেগ ছিল না, তার প্রমাণ এই যে পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে আমি একাধিক লেখায় এই একই কথা বলিয়া ও লিখিয়াছিলাম। তার মধ্যে ১৯৩২-৩৩ সালের সওগাত-এ 'সাহিত্য ও যুগ-ধর্ম ও ১৯৪১ ৪২ সালে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির-সম্পাদিত চতুরঙ্গ-এ 'সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে রাজনীতি' শীর্ষক দুইটি বিতণ্ডামূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাতে মোটামুটি ঐ একই কথা বলিয়াছিলাম বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া।

৩. খণ্ডতার সংগত কারণ

এই সব বিতর্কমূলক প্রবন্ধে আমি তৎকালীন সাহিত্যিক নেতৃত্বের সমালোচনামূলক অনেক কথা বলিয়াছি বটে, কিন্তু সে সব আপত্তিকর কথার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ঐ সব সাহিত্যিক সমস্যার মধ্যে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থের কোনও বিরোধ আছে, তেমন কোনও কথা আমি প্রকারান্তরেও বলি নাই। কারণ এ সম্পর্কে আমার কোনও চেতনাই তখনও জন্মে নাই। সামাজিক আচার-আচরণে মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ব্যবহারে ছেলেবেলা হইতেই আমি ঘোরতর অসন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ওটাকেই হিন্দুদের সামাজিক কুসংস্কার, তার মানে তাদের দুর্বলতা মনে করিতাম।

ওতে আমার মনে মুসলমানদের কোনও ইনফিরিওরিটি বা হিন্দুদের কোনও সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স ছিল না। তবু সামাজিক ব্যবসায় হিন্দু ও মুসলমানের স্বাতন্ত্র সম্বন্ধে ছেলেবেলা হইতেই একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি সাধারণভাবে আমার কোনও বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছিল না। হিন্দু শিক্ষক-অধ্যাপকদের ও বহু গুরুজনের প্রতি আমার সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল। আজও আছে। ঐ ধরনের স্বাতন্ত্রের চিন্তা ভাবনা আমার সামাজিক চিন্তা-ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমার চিন্তা-ধারায় এই প্রকার কোনও ভাবনাই আমাকে স্পর্শ করিত না। রাজনীতিতে আমি ছিলাম জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসি। সে কারণেও আমার সাহিত্য-চিন্তায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সামাজিক স্বাতন্ত্র-চিন্তা আমার মনে আসে রাজনীতি ক্ষেত্রের আগে সাহিত্যক্ষেত্রে। কংগ্রেসি হিসাবে আমি যখন প্রজা-আন্দোলনে প্রবেশ করি, তখন প্রায় সকল হিন্দু কংগ্রেস-নেতাই তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। প্রজা-আন্দোলনের বহু মুসলিম সহকর্মী এটাকে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতা বলিতেন। কিন্তু আমি তা বলিতাম না। সাম্প্রদায়িকতার বদলে এটাকে আমি ভেস্টেড ইন্টারেস্টের স্বার্থপরতা বলিতাম। হিন্দু-জমিদার মহাজনদের দ্বারা হিন্দু মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণভাবে উপকৃত হইতেছেন বলিয়া কৃষক-প্রজা-খাতক আন্দোলনে তারা সাধারণভাবে যোগ দিতেছেন না, এই যুক্তিতে এ ক্ষেত্রেও হিন্দুদের সাম্প্রদায়িকতা অভিযোগ হইতে রেহাই দিতাম।

৪. পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কোনও যুক্তিতে হিন্দু সাহিত্যিকদেরে রেহাই দিতে পারিলাম না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কোনও প্রকারের ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আমি কল্পনা করিতে পারিলাম না। কাজেই বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু সাহিত্যিকরা তাদেরে লইয়া কোনও বই-পুস্তক লেখেন না, এতে আমি দুঃখিত ছিলাম। কিন্তু এই অভিযোগ ভিত্তি করিয়া মুসলমানদের তরফে কোনও প্রকার লেখালেখি করাটাকে আমি মর্যাদা হানিকর মনে করিতাম। এ ধরনের অভিযোগ আন্দোলনকে আমি নারী জাতির, তফসিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের, চাকুরিতে মুসলমানদের এবং কৃষক খাতকের অধিকার আদায়ের অভিযোগ-আন্দোলনের মতই শক্তিধরের বিরুদ্ধে অশক্তির, ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে অক্ষমের, উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের আন্দোলন মনে করিতাম। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা ছিল আমার চিন্তার অতীত। এই জন্য আমি সওগাত, নওরোজ ইত্যাদি মুসলিম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ সমর্থন করিতাম এবং রাজনৈতিক কারণে দি মুসলমান, মোহাম্মদী, মুসলিম হিতৈষী ইত্যাদি সংবাদপত্র প্রকাশ সমর্থন করিলেও গোড়াতে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা ও মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের বিরোধী ছিলাম। কিন্তু বেশি দিন এই মনোভাব বাঁচাইয়া রাখিতে পারি নাই। বয়স ও অভিজ্ঞতা যত বাড়িতে লাগিল, জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে আমার মত ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। আমি উপলব্ধি করিতে থাকিলাম, পরকীয়া প্রেম, নর-নারীর প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণই সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। পশ্চিমা সাহিত্যের তথাকথিত 'ইটারন্যাল ট্রায়েঙ্গল'ই নর-নারীর প্রেমের সত্যিকার ও শাশ্বত রূপ নয়। আমার এই মতবাদ আরো দৃঢ় হইতে থাকিল যে অনর্জিত ধন সম্পদের অধিকারী কর্মহীন, শ্রমহীন, সুতরাং নিদ্রাহীন, অবসর-বহুল বহুভোগী বড়লোকদের কাছে নারী-প্রেম দুর্লভ ও নারী-হৃদয় দুয়ে রহস্যপুরী হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়বান একভোগী সাধারণ পুরুষের কাছে নারী-প্রেম

দুর্লভও নয়, নারী-হৃদয় রহস্যপুরীও নয়। কাজেই জীবন-শিল্প সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তুও এটা হইতে পারে না। বরঞ্চ গণ-মানুষের অসংখ্য দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, তাদের মহত্ত্ব-নীচতা, বীরত্ব-ভীরুতা, ক্ষমা-ঘৃণা, ত্যাগ-লোভ ইত্যাদি হৃদয়-বৃত্তি অবলম্বনে সাহিত্য রচিত হইলে সেটাই হইবে সত্যিকার শিল্প ও উপভোগ্য সাহিত্য।

এই মতবাদ জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন উপলব্ধিও উন্মোষিত হইতে লাগিল যে সমাজ-ব্যবস্থার দরুন হিন্দু-সাহিত্যিকরা মুসলমান চরিত্র লইয়া গল্প-উপন্যাস লিখিতে পারেন না বলিয়া আমি যে এতদিন তাঁদেরে ক্ষমা করিয়া আসিতেছিলাম, সে ধারণা আমার ঠিক নয়। আমাদের প্রতি ঘৃণা-অবজ্ঞাই এ অবহেলার কারণ। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের অযোগ্যতার দরুনই হিন্দু মাসিকাদিতে মুসলমান লেখকদের লেখা ছাপা হয়, নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পরে এ যুক্তিও আর টিকিল না। মরহুম আফ্যালুল হকের মুসলিম ভারত ও নওরোজ-এর এবং নাসিরউদ্দীন সাহেবের সওগাত-এর মাধ্যমে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জনের পরেই নজরুল ইসলাম হিন্দু-সাহিত্যিকদের দ্বারা স্বীকৃতি পান, তার আগে নয়।

৫. নূতন উপলব্ধি

রাজনীতির মত সাহিত্যেও হিন্দু-মুসলিমের এই স্বাতন্ত্র-বোধ দেখিয়া ক্রমে আমি নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। আমার ক্রমশ এই উপলব্ধি হইতে লাগিল যে নজরুল ইসলামের মত যুগ-প্রবর্তক প্রতিভাকেও যে দেশে স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া পরিচিত ও স্বীকৃত হইতে হয়, সে দেশে এই স্বাতন্ত্রটাই বোধহয় বাস্তব সত্য। এর পর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সেক্রেটারিগিরি গ্রহণ করিতে আমার আর কোনও আপত্তি থাকিল না। রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক উদারপন্থী কংগ্রেস-খিলাফতী সহকর্মী ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমার অন্যতম মুরুব্বি ও পথপ্রদর্শক মৌ. মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী সাহেবই বস্তুত আমাকে এই 'সাম্প্রদায়িক সাহিত্য সমিতির সেক্রেটারিগিরি গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ততদিনে প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে সকল মতের ও সকল শ্রেণীর হিন্দুর ও সকল মতের ও সকল শ্রেণীর মুসলমানরা দুই পৃথক লাইনে কাতারবন্দী হইয়া উঠিয়াছেন। ভাষা ও শব্দের হিন্দু-মুসলমানিত্ব সম্বন্ধে মুসলমানী কথার অভিজ্ঞতার সাথে যোগ হইল নয়া পড়ার অভিজ্ঞতা। কঠোর বাস্তবতার কাছে ভাবাবেগ-সম্ভূত আদর্শবাদ পরাজিত হইল। জীবন-ক্ষুধানামক আমার যে নভেল কৃষক-প্রজা আন্দোলন। রূপায়ণের উদ্দেশ্যে শুরু হইয়াছিল, তা পর্যবসিত হইল পাকিস্তান আন্দোলনের বাস্তবতা চিত্রায়ণে। আমার সাহিত্যিক চিন্তাধারার এই ক্রমোন্নতি, অথবা বলিতে পারেন, ক্রমাবনতি, এমন স্তরে আসিল যে ১৯৪৩ সালে কলিকাতার প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মিলনীতে এক ভাষণে আমি লিখিয়াছিলাম : ভারতে রাজনৈতিক পাকিস্তান হইবে কি না জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে বাংলার মেজরিটি সম্প্রদায় মুসলমানদের মুখের ভাষাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লেখক-সাহিত্যিকরা এবং শিক্ষা বিভাগে যেভাবে সাহিত্য ও পাঠ্যপুস্তক হইতে পরিহার করিয়া চলিয়াছেন, তাতে বাংলায় সাহিত্যিক পাকিস্তান হইতে বাধ্য।

## ৬. জটিলতা বৃদ্ধি

এটা ত গেল লেখ্য বাংলা ভাষার সমস্যা। এর পরেও গোদের উপর একটা বিষফোঁড়া দেখা দিল। আঠার শতকের শেষ দিককার মার্কিন ও ফরাসি বিপ্লব ও বিশ শতকের গোড়ার রুশ বিপ্লবের ফলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভাষা ও সাহিত্য একটা গণমুখী মোড় গ্রহণ করিল প্রবল স্রোতের বেগেই। খুব স্বাভাবিক কারণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এটা প্রতিফলিত হইল। কলিকাতা-কেন্দ্রিক বাংলাতে স্বভাবতই এই গণমুখিতা পশ্চিম বাংলায়। কেন্দ্রীভূত হইল। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক কথ্য ভাষা সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা লাভ করিয়া ইতিপূর্বে বাংলায় যেটা ছিল শুধু হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য, তার সাথে যোগ হইল পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র। এই ডাবল সমস্যার সমাধান স্পষ্টত দুঃসাধ্য ছিল। এমনি সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক পাকিস্তান দাবি উঠিল। হিন্দুরা স্বভাবতই প্রবল বিরোধিতা করিল। পরিণামে হিন্দুদের দাবিতে বাংলা পশ্চিম ও পূর্ব বাংলায় বিভক্ত হইয়া গেল। কলিকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল। দুইশ বছরের কলিকাতার হিন্টারল্যান্ড পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। ঢাকা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী হইল। আগে ছিল যেটা ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের প্রশ্ন, সেটাই হইয়া গেল দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় স্বকীয়তার প্রশ্ন।

## ৭. আমার উভয়সংকট

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিটা আমাকে যতটা আঘাতিত ও বিভ্রান্ত করিল, আমার জানা কাউকে বা আমার বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের ততটা আঘাতিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আমার এই একাকিত্ব ও অনন্য সাধারণত্বের কারণ খুঁজিবার অনেক চেষ্ট করিয়াছি। দেশভাগের আগের প্রায় দশ-পনের বছর ও দেশভাগের পরের পঁচিশ বছর একুনে আমার সাহিত্যিক জীবনের এই চল্লিশটি বছর এই গবেষণায় না হোক, ধ্যান ধারণা ও চিন্তা-ভাবনায় কাটিয়াছে। আমি কোনও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নই। তবু আমার এই একাকিত্বের কারণ কী? এর একমাত্র উত্তর, আমার বিবেচনায়, এই যে বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই আমার বিশেষ একাকিত্ব বরাবরই ছিল। রাজনীতিতে আমি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসি ছিলাম আন্তরিকতার সাথেই। কিন্তু সেখানেও আমি গণমুখী, ভাষান্তরে ও কার্যান্তরে, কৃষক-প্রজা কংগ্রেসি ছিলাম। রাজনীতিতে আমার বাঙ্গালী জাতীয়তা ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্যাটার্নের। এ জাতীয়তাবাদে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অর্থ ছিল রাজনৈতিক ফেডারেশন, কৃষ্টিক ফিউশন ছিল না। ব্যবহারিক রাজনীতিতে এটা সম্ভব ও বাস্তব ছিল। কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে এটা সম্ভব ছিল না। কারণ রাজনীতিতে মেজরিটি আধিপত্য, সাহিত্যে মাইনরিটির রাজত্ব। দেশবন্ধুর জাতীয়তাবাদ যখন বাঙ্গালী হিন্দুরা গ্রহণ করিল না তখনই বহুজাতিক উপমহাদেশ ইন্ডিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজাতিক বেঙ্গলও ভাগ হইয়া গেল। বহু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসি মুসলিম পাকিস্তান দাবির সমর্থন করিয়াছেন। বহু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসি হিন্দু বেঙ্গল পার্টিশন-সমর্থন করিয়াছেন। এটা তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিল। রাজনৈতিক পরিবেশ ও স্বাধিকার-বোধই জাতীয় চেতনায় বিবর্তন ঘটাইয়া এ কাজ সহজ করিয়া দেয়। কিন্তু কংগ্রেসি মুসলিম সাহিত্যিকের পক্ষে এটা তত সহজ ছিল না। বহু মুসলিম সাহিত্যিক পাকিস্তান দাবির সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁরা কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদী ছিলেন না। পাকিস্তান দাবির সমর্থনের আগে তারা সক্রিয় রাজনীতি করিতেন না। মুসলিম-প্রধান একটা নয়া রাষ্ট্র গঠনের

দাবিতে তারা অতি সহজেই সমর্থন করিতে পারিলেন। আমার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। কাজেই আমাকে চিন্তা-ভাবনা করিয়া পাকিস্তানি হইতে হইয়াছিল। তাতে তিন-চার বছর লাগিয়াছিল। গোড়াতে আমি আমার সম্পাদিত দৈনিক কৃষক-এ কষিয়া পাকিস্তান দাবির নিন্দা করিয়াছি। মুসলিম স্বার্থ সম্বন্ধে আমি সচেতন ও মুখর ছিলাম না, তা নয়। বরঞ্চ কংগ্রেসে আমি মুসলিম স্বার্থ রক্ষার দাবি সবল ভাষায় করিয়াছি। কিন্তু সে কারণে দেশভাগ করার আমি প্রয়োজন বোধ করি নাই। বরঞ্চ আমি মনে করিয়াছি, দেশভাগে মুসলমানদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হইবে বেশি। পরে আমি যখন পাকিস্তানবাদী হইলাম, তখন এমন সর্বাত্মক পাকিস্তানি হইলাম যে মুসলিম লীগ নেতাদের চেয়েও গোড়া পাকিস্তানি হইলাম। কারণ আমার পাকিস্তানি চিন্তার মধ্যে কৃষক-প্রজা অর্থনৈতিক অধিকারের এবং মুসলমানদের কৃষ্টি সাহিত্যিক স্বকীয়তার প্রবল অনুভূতি ছিল। এই দুইটা দাবির মধ্যে প্রথমটা যেমন স্থূল ও দৃশ্যমান ছিল, দ্বিতীয়টা তত স্থূল ও দৃশ্যমান ছিল না। সে জন্য মুসলিম ইন্টেলিজেনশিয়া সাধারণত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র সম্বন্ধে যতটা সচেতন ছিলেন, কৃষ্টি-সাহিত্যের ব্যাপারে তত সচেতন ছিলেন না।

৮. পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম সাহিত্যের দ্বিধাবিভক্তি

অধিকন্তু এটা স্মরণীয় যে বাংলার অধিকাংশ প্রতিভাধর মুসলিম সাহিত্যিকরাই পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। সেকালের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি ছিল সাধারণত আসমানের দিকে মাটির দিকে নয়। পাকিস্তান দাবিকে তারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দাবি মনে করিতেন। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নাই বলিয়া তারা বিশ্বাস করিতেন। এর দুইটা কারণ ছিল। প্রথমত, কৃষ্টি-সাহিত্যকে তাঁরা ক্লাসের (উচ্চবর্ণের) সম্পদ ভাবিতেন, মাসের' (জনগণের) সম্পদ ভাবিতেন না। দ্বিতীয়ত, তাদের এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত জাতীয়তার ক্ষেত্রে তারা আপন আপন প্রতিভাবলেই নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারিবেন। একটি মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। নজরুল ইসলাম তার মুসলিম-চৈতন্যে আকাশচুম্বী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান দাবির তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্য তাঁর অসাধারণ যুগ-প্রবর্তক-প্রতিভাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে নাই। এই অভিজ্ঞতার চূড়ায় বসিয়া তিনি বাঙ্গালী মুসলমানের প্রাণের প্রকাশ সোচ্চারে এবং সাফল্যজনকভাবেই করিয়াছেন। কিন্তু তাদের মুখের চিন্তা করা তখনও প্রয়োজন মনে করেন নাই। নিজের বিপুল আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়ার দিকে তার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশভাগ হইয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও তিনি সেই মতবাদে বিশ্বাসী থাকিতেন কি না, আজ তা বলা খুবই কঠিন। যতই কঠিন হোক, এটা অনুমান করা তত কঠিন নয় যে, তাঁর মুসলিম-চৈতন্যের তীব্রতা এবং মুসলিম ঐতিহ্যে আস্থার প্রাচুর্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত ঢাকায় আনিত এবং এ দেশেরই কৃষ্টি-সাহিত্যের নবায়নের নেতৃত্ব গ্রহণে বাধ্য করিত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নাই। পাকিস্তান আন্দোলনের গোড়াতেই তিনি শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হন। আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া তিনি সম্বিহারা হইয়াও বাঁচিয়া আছেন। দুই বছর আগে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ঢাকায় আনিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থাদি করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে অপর প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফা বাংলার মুসলমানদের মুসলিম সত্তায় তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন বটে, কিন্তু তাদের বাঙ্গালী সত্তার দৈশিক জাতীয় ঐতিহ্য ও স্বকীয়তায় তেমন সচেতন ছিলেন না। এই জন্যই পরবর্তীকালে পাকিস্তান স্থাপনের পরে তিনি পাকিস্তানের

রাষ্ট্রভাষা রূপে উর্দুর সমর্থন করিতে পারিয়াছিলেন। এই দুই প্রতিভাধরের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে পাকিস্তান আন্দোলনের মুখে, পঞ্চম দশকের গোড়ার দিকে বাঙ্গালী মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকরা মোটামুটি দুইটি দলে বিভক্ত ছিলেন। একদল ছিলেন পাকিস্তানের বিরোধী। তাঁরা বলিতেন, ধর্মের সাথে জাতীয়তা ও জাতীয় সাহিত্যের কোনও সংশ্রব নাই। শিল্প-সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান নাই। অপর দলে ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক। তারা দৈশিক জাতীয়তা ও কৃষ্টি-সাহিত্যের স্বাতন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না। ধর্মকেই তারা মুসলমানদের রাজনীতি, কৃষ্টি ও সাহিত্যের একমাত্র নিয়ন্ত্রক মনে করিতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও প্রথম দল বলিতে থাকিলেন, দেশভাগ হইলেও আমাদের কৃষ্টি-সাহিত্য ভাগ হয় নাই। কৃষ্টি সাহিত্য অবিভাজ্য। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা পৃথক-পৃথক ও স্বাধীন-স্বাধীন রাষ্ট্র হইলেও দুই বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্য অবিভক্ত রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দল বলিতে লাগিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্বারা এটাই প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইল যে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টি-সাহিত্য অভিন্ন।

আমি এই দুই দলের কোনটারই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেও ছিলাম না; পরেও নাই। এ সব কথাই আমি এই খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি।

# ১৫. স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি

## অধ্যায় পনের - স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি

### ১. সোজা পথ সহজ না

পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় এক যুগ পূর্ব হইতে আমার সাহিত্যিক মতবাদে যে ধীর অথচ দৃঢ় পরিবর্তন আসিতেছিল, তাতে আমার আশা হইয়াছিল অখণ্ড বাংলার কৃষ্টিবোধের ও সাহিত্যিক-স্বাতন্ত্রের জটিলতা বাংলা বাটোয়ারায় সহজ হইয়া গেল। রাজনীতিতে 'স্পিরিট-অব-পার্টিশন'-এর ব্যাখ্যা করিয়া আমি ভারত বাটোয়ারাকে যেমন হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সর্বাঙ্গীণ সুন্দর সমাধান বলিয়াছিলাম ও বিশ্বাসও করিয়াছিলাম, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার স্বতন্ত্রীকরণকে আমি তেমনি আমাদের কৃষ্টিক, ভাষিক ও সাহিত্যিক জটিলতার সহজ সমাধানের পন্থা বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে আমি এই মতবাদের সমর্থক খাড়া করিয়াছিলাম। মৃত্যুর মাত্র দুই বছর আগে বোধ হয় দূরদর্শিতা বলেই তিনি লিখিয়াছিলেন : বাংলা আসলে দুইটা। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা শুধু দেহে নয়, অন্তরেও দুই। কলিকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিম বাংলা হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক। ও অর্থনৈতিক দিকে স্বাধীনতা পাইল, রাজনৈতিক নেতারা অবশ্যই তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। আমি ভাবিয়াছিলাম, কৃষ্টিক-ভাষিক ও সাহিত্যিক দিকে পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলার সবল দুচ্ছেদ্য বাহু-ডোর হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয়তা আত্মস্থ ও বিকশিত হইবার সুযোগ লাভ করিল। এটা অচিন্তনীয় অপূর্ব সুযোগ। অন্যথায় কলিকাতার পাটকেলের হাত হইতে পূর্ব বাংলার কৃষকদের মুক্তির যেমন কোনও সম্ভাবনা ছিল না, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরশ্চন্দ্রের দুর্ভেদ্য বৃত্ত হইতে পূর্ব বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকদের মুক্তিরও কোনও আশা ছিল না। এ অবস্থায় কলিকাতা ছাড়িয়া সকলের আগে ঢাকা আসা আমার প্রথম কর্তব্য ছিল লেখক-সাহিত্যিকদের জন্য টেবিল-চেয়ার সাজাইতে, অভাবে সিলেটের শীতল পাটি বিছাইতে; আর, নারী-সাহিত্যিকদের জন্য কলিকাতার শিফন কাথানের বদলে ঢাকাইয়া জামদানি যোগাড় করিতে। কিন্তু ইত্তেহাদ-এর ঢাকা আসার পথে সরকারি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ায় উহার সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের দরুন আমারও ঢাকা আসিতে তিন বছর দেরি হইয়া গেল। তাই কলিকাতায় বসিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সামান্য খেদমত করিবার চেষ্টা করিলাম। পূর্ব পাকিস্তানের শিশুদের জন্য ছোটদের কাছাছুল আম্বিয়া নামক দুই খণ্ডের একটি শিশু-পাঠ্য-পুস্তক লিখিলাম। এই প্রথম চেষ্টায় সরকার পক্ষ হইতে যে বাধা পাইয়াছিলাম, তৎকালে সেটা খুবই কঠোর মনে হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বয়ং সাহিত্যিকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বাধার কাছে সে সরকারি বাধাটা ছিল নিতান্তই তুচ্ছ। শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিরোধিকার কথা পরে ক্রমে-ক্রমে বলিতেছি। সরকারি বাধাটার কথাটা আগে কহিয়া লই।

## ২. প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা

আমি চিত্র-শিল্পকে শিল্প-সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করি। এ বিষয়ে আমি আমাদের ওলামা-সমাজের একাংশের সহিত একমত কোনও দিন ছিলাম না। সাধারণ শিল্প-সাহিত্য ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রেও চিত্রকে অত্যাবশ্যক মনে করিতাম। বিশেষত শিশুশিক্ষায় 'পিকটরিয়েল রিপ্রেয়েন্টশন'-কে অপরিহার্য বিবেচনা করিতাম। এই বিশ্বাসকে পাকিস্তানের শিক্ষা-বিভাগে চালু করিবার আশায় ১৯৪৭ সালে কলিকাতা বসিয়াই ছোটদের কাছাছুল আম্বিয়া নামে দুই খণ্ডের একটি সচিত্র শিশুপাঠ্য বই লিখিলাম। তাতে শেষ পয়গম্বর হযরত রসুলুল্লাহ ছাড়া কতিপয় প্রধান নবীর ও সেই সঙ্গে ইবলিস, নমরুদ ও কারুনের কাহিনী লিখিলাম। এই বইয়ে কাহিনীর সাথে সংগতি রাখিয়া কিছু কিছু কাল্পনিক ছবি দিলাম। ছবিগুলি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুসলিম আর্টিস্টদের অন্যতম কাজী আবুল কাসেমের হাতে আঁকাইলাম। মানুষের, বিশেষত, পীর-পয়গম্বরদের, ছবি সম্বন্ধে মুসলিম সংস্কারের প্রতি নজর রাখিয়া এই সব কাল্পনিক ছবি আঁকিতেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইল। কোনও ছবিতেই সংশ্লিষ্ট নবীর মুখ দেখান হইল না। শিশুদের পক্ষে কাহিনী বুঝিবার জন্য যেভাবে যতটুকু দরকার সেইভাবে ও ভঙ্গিতে একজন কল্পিত মানুষের ছবি আঁকা হইল মাত্র। আমার প্রিয় বন্ধু আয়নুল হক খ ও মোহাম্মদ নাসির আলীর ঢাকায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত নওরোজ কিতাবিস্তান এই বই ছাপিয়া বাজারে ছাড়িলেন। বইটি তৎকালীন জনপ্রিয়তা লাভ করিল। কোনও কোনও শিক্ষাবিদ বইখানাকে ক্লাস থ্রি-ফোরের 'র‍্যাপিডরিডার' করিবার সুপারিশ করিলেন। এমন সময় পূর্ব বাংলা শিক্ষা দফতরের সেক্রেটারি জনাব এফ। করিমের একটি শোক' নোটিস ও ঢাকা হইতে প্রকাশিত একমাত্র দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদকীয় রূপে একটি হুঁশিয়ারি পাইলাম। সরকারি নোটিসে আমার এ বই কেন বাযেয়াফত হইবে না, তার কারণ দর্শাইতে বলা হইল। আর আজাদ-এর সম্পাদকীয়তে আমাকে ভোলানাথের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। উল্লেখ্য যে, কিছুদিন আগে হযরত পয়গম্বর সাহেবের ছবিসহ একটি বই বিক্রির অপরাধে ভোলানাথ সেন নামক কলিকাতার এক পুস্তক বিক্রেতাকে জনৈক মুসলমান আততায়ী হত্যা করিয়াছিল। এই উপলক্ষে আজাদ আমার এই পুস্তকের প্রকাশক ও বিক্রেতাদিগকেও হুঁশিয়ার করিয়া দিলেন। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের আজাদএর কথার জবাবে শহীদ সুহরাওয়ার্দীর ইত্তেহাদ-এর কিছু বলিবার উপায় ছিল না। তাই আমি পূর্ব বাংলা সরকারের শিক্ষা-দফতরের সেক্রেটারি সাহেবের জবাব দিলাম। মি. এফ করিম ছিলেন উর্দু সাহিত্যিক। তাঁর সাথে আমার পরিচয় ছিল। তাই আমার ক্য শশা করিবার কৈফিয়তটি শুধু সরকারি অভিযুক্ত আসামির কাঠখোট্টা লিগ্যাল স্টেটমেন্ট ছিল না। একজন সাহিত্যিকের কাছে অপর একজন সাহিত্যিকের পত্রও ছিল সেটা। পয়গম্বর সাহেবরাও দেহী মানুষ 'বাশার আল-কোরআনের এই শিক্ষার দিকে এবং পিকটরিয়েল রিপ্রেযেন্টেশন ছাড়া শিশুশিক্ষা হয় না বলিয়া আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীদের অভিমতের দিকে সেক্রেটারি সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ ত করিলামই, তাছাড়া সদ্য-প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সরকারের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন পেশ করিলাম। শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সরকারের অভিমত কী সে প্রশ্নও তুলিলাম। নয়া রাষ্ট্রের নয়া সরকার পাকিস্তানে সিনেমা-থিয়েটার করিতে দিবেন কি না, দিলে সে সবে আউলিয়া-দরবেশ পীর-পয়গম্বদের মত আদর্শ ও অনুকরণীয় চরিত্রসমূহ রূপায়ণ ও চিত্রায়ণ করিতে দেওয়া হইবে? না প্রচলিত নাটক-সিনেমার মত শুধু অমুসলমানদের দেব-দেবী ও মহাপুরুষদেরে লইয়াই পাকিস্তানি ছায়াছবি ও ড্রামা-নাটক হইতে থাকিবে? যদি মুসলিম মহাপুরুষদের জীবনালেখ্য নাটকে-সিনেমায় আঁকিতে হয়, তবে ছবি ত ছবি জিন্দা মানুষকে পীর-

পয়গম্বর সাজিতে হইবে কি না? যদি, পক্ষান্তরে, মুসলিম মহাপুরুষদের জীবন লইয়া কোনও নাটক সিনেমা করিতে না দেওয়া হয় তবে, পাকিস্তানের জনগণ নাটক-সিনেমার মারফত একটা বিপুল সম্ভাবনাময় মহৎ শিক্ষার মাধ্যম হইতে বঞ্চিত থাকিবে কি না? যদি পাকিস্তানের নাটক-সিনেমায় শুধু অমুসলমান দেব-দেবী ও মহাপুরুষদের জীবনালেখ্য প্রদর্শিত হয়; তবে পাকিস্তানি মুসলমানদের ধর্মীয় ও কৃষ্টিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ কী দাঁড়াইবে, পাকিস্তানের বর্তমান শাসকরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

মি. এফ করিম আমার এই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন মাত্র দু-চার লাইনে। কোনও জবাবও দিলেন না। আমার বইটা ফর্মালি বাযেয়াফতও করিলেন না। কিন্তু তার দরকারও হইল না। আজাদ-এর হুমকিতে পূর্ব বাংলার পুস্তক বিক্রেতাদের মধ্যে এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি হইল যে তার এই বই আর বিক্রয় করিলেন না। যার-তার মওজুদ কপি হয় পাবলিশারকে ফিরাইয়া দিলেন, অথবা পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন বলিলেন। পাবলিশার নিজেও তাই করিলেন। ছবিগুলি বাদ দিয়া নূতন করিয়া বইখানি আবার ছাপাইলেন। ছবি ছাড়া শিশুপাঠ্য বই স্বভাবতই ছবিওয়ালা বইয়ের মত চলিল না। এ ঘটনার বেশকিছু দিন পরে শিক্ষা দফতর ছোটদের কাছাছুল আম্বিয়াকে সত্য-সত্যই র‍্যাপিডরিডার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেটা ছবিওয়ালা না ছবিহীন তার উল্লেখ না থাকায় সরকারি আদেশের চেয়ে আজাদ-এর আদেশই পাবলিশার ও বিক্রেতার নিকট বেশি মর্যাদা পাইল।

৩. পশ্চিমাদের অদূরদর্শিতা

১৯৫০ সালের মে মাসে আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিলাম। কলিকাতা বসিয়া পূর্ব বাংলার লেখক-সাহিত্যিকদের কৃষ্টিক-সাহিত্যিক স্বকীয়তা-বোধ সম্বন্ধে আমি যে আশা ও ধারণা করিয়াছিলাম, ঢাকায় তার কিছুই দেখিলাম না। বরঞ্চ তার উল্টাটাই দেখিলাম। অবশ্য এর রাজনৈতিক কারণও ছিল। স্বয়ং কায়েদে আযম হইতে শুরু করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা বাংলার বিরুদ্ধে ও উর্দুর পক্ষে যে অভিযান চালাইয়াছিলেন, পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতারা সে অভিযানে যেরূপ আত্মমর্যাদাবোধহীন অদূরদর্শী জি-হুঁযুর বৃত্তি চালাইয়া যাইতেছিলেন, তাতে পূর্ব বাংলার ইনটেলিজেনশিয়া ও ছাত্রসমাজ স্বভাবতই উর্দু ও পশ্চিমা নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই উর্দু-বিরোধিতা বোধগম্য কারণেই পশ্চিম বাংলামুখিতার রূপ নিল। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিপুল সাফল্যও নয়া রাষ্ট্র পূর্ব বাংলার কৃষ্টিক স্বকীয়তা লাভের কোনও কাজে লাগিল না। পূর্ব বাংলার ছাত্র তরুণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় নিতান্ত আত্মরক্ষার দায়ে যে পরিমাণ ও অনুপাতে উর্দু-বিরোধী সংগ্রাম চালাইলেন, সেই পরিমাণ ও অনুপাতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এবং যুদ্ধের নিয়ম অনুসারেই তাঁরা পশ্চিম বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যিক দুর্গের শক্তিশালী প্রচারের অন্তরালে ঢুকিতে লাগিলেন। দুই যুগ পরে সত্তরের দশকে রাজনৈতিক অধিকারের সংগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-তরুণ ও শিক্ষিক সম্প্রদায় পাঞ্জাবি সৈন্যের পিটুনিতে যেমন ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সামরিক ছায়ায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, পঞ্চাশের দশকের উর্দুর হামলা হইতে ভাষা-কৃষ্টি রক্ষার জন্য ঠিক তেমনি তারা কলিকাতার কৃষ্টি-সাহিত্যিক দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। ভাষা-আন্দোলনে আমি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছি। বস্তুত কলিকাতা হইতেই ইত্তেহাদ-এর লেখায় ও সংবাদ সরবরাহের মাধ্যমে ভাষা-আন্দোলনের সমর্থন শুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনকে নয়া রাষ্ট্রের কৃষ্টিক স্বকীয়তাবোধ স্ফুরণের কাজে লাগাইতে পারি নাই।

পাকিস্তান আন্দোলনের বন্যা-স্রোতের সামনে দাঁড়াইয়া কলিকাতা হইতে চল্লিশের দশকে আমরা কতিপয় সাহিত্যিক পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, কৃষ্টিক স্বকীয়তা ও জাতীয় স্বাতন্ত্রের কথা সগর্বে বুলন্দ আওয়াজে বলিতে পারিয়াছিলাম, পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় বসিয়া তার কিছুই বলিতে পারিলাম না। পশ্চিম পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে লাহোর ও কলিকাতার মধ্যে এবং ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটা পূর্ব বাংলা, একটা ঢাকা, একটা নজরুল ইসলাম আছে, তা আমরা কেউ বুঝিলাম না। এই না বুঝারও একটা সংগত কারণ আছে। সেটা পাকিস্তান সৃষ্টির আগের উর্দু ও বাংলা-সাহিত্যের একশ বছরের ইতিহাস। এই মুদ্দতে উর্দু-সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। বাংলা-সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিল হিন্দুদের হাতে। শুধু ফর্ম ও কনটেন্টেই নয়, প্রাণরূপ ও আঙ্গিকেও উর্দু-সাহিত্য ছিল মুসলিম কৃষ্টির বাহন, সুতরাং মুসলিম সাহিত্য। পক্ষান্তরে, ঐ সব ব্যাপারে বাংলা সাহিত্য ছিল হিন্দু কৃষ্টির বাহন, অতএব হিন্দু সাহিত্য। এটা অবশ্য স্কুল ও সুপারফিশিয়াল দৃষ্টি। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টি। কারণ ভারত বাটোয়ারার সমগ্র ব্যাপারটাই তৎকালে এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হইতেছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন স্পিরিট-অব পার্টিশনটা দুই নয়া জাতি-রাষ্ট্রের দুই ফাদারের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কৃষ্টি-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অবিকল তাই ঘটিয়াছিল।

৪. পূর্ব বাংলার দুধারী বিপদ

পূর্ব বাংলার ভাগ্যে এই বিভ্রান্তির কুফল হইতেছিল বিষময়। একদিকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রথমে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার অপচেষ্টা করিলেন এবং পরে আরবি হরফে বাংলা লিখিবার প্রয়াস পাইলেন। অপরদিকে পূর্ব বাংলার লেখক-সাহিত্যিকরা উর্দু-আরবি-ফারসির সাথে বাংলা ভাষার কোনও মিল নাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে বহু যুগ-প্রচলিত বাঙ্গালী মুসলিমদের মুখের ভাষা হইতে আরবি-ফারসি সব শব্দ তাড়াইবার অভিযান শুরু করিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অবিভাজ্য, এই যুক্তিতে স্বভাবতই তারা হিন্দু মনীষীদের অনুকরণ করিলেন। ঐ মনীষীরা ইতিমধ্যে গণমুখী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে পশ্চিম-বাংলার আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিয়াছিলেন, আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরাও না বুঝিয়া তাই করিতে লাগিলেন। ক্রমে পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষা পূর্ব বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া গেল। পূর্ব বাংলার ভাষিক-সাহিত্যিক, সুতরাং কৃষ্টিক, স্বকীয়তার পথ দ্রুতগতিতে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। আমি আমাদের ভাষা আন্দোলনের মর্ম ব্যাখ্যায় বাংলা একাডেমির বিভিন্ন বৈঠকে, ছাত্র-তরুণদের সভায়, বিভিন্ন সাহিত্য সম্মিলনীতে এবং সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের সাহিত্যকদেরে হুঁশিয়ার করিতে লাগিলাম। বাংলা একাডেমি আমাকে অ্যাওয়ার্ড দিলেন, ফেলো নির্বাচিত করিলেন, জীবন-সদস্য করিলেন, সম্মান দিলেন খুবই। কিন্তু কথা শুনিলেন না।

৫. বাংলা সাহিত্যের মুসলমানি রূপ

দেশভাগ হওয়ার আগেকার প্রায় গোটা ত্রিশ বছরের লেখক-জীবনে আমার সাহিত্য-কর্মের প্রধান দাবি ছিল এই : বাংলার মেজরিটি মুসলমানের মুখের ভাষাকে বাংলা-সাহিত্যে সম্মানের স্থান দিতে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ হওয়ার অজুহাতে মুসলমানদের নিত্য-ব্যবহৃত বহু শব্দকে শুধু ঐ কারণে বাংলা সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নেতা হিন্দু লেখকরাই। তাঁদের লেখাতেই যে শুধু মুসলমান বাঙ্গালীর মুখের ভাষা বর্জিত হইত তা নয়, সরকারি শিক্ষা কর্তৃপক্ষ

তা-ই করিতেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই এটা আমার মনে পীড়া দিত। আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিত। আমার মনে হইত, হিন্দু লেখকদের এই মনোভাব আসলে মুসলমান সমাজের প্রতি উপেক্ষার এমনকি অবজ্ঞার শামিল। এ সম্পর্কে আমার অভিমত ক্রমে এত দৃঢ় হইয়া উঠে বলিয়াই উনিশশ তেতাল্লিশ সালে কলিকাতার 'প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের সাহিত্য সম্মিলনীতে ভাষণ দিতে গিয়া আমি ভারতে রাজনৈতিক পাকিস্তান হওয়ার চেয়ে বাংলায় সাহিত্যিক পাকিস্তান হওয়ার সম্ভাবনাকে অধিকতর নিশ্চিত বলিয়াছিলাম।

দেশভাগ হওয়ার পর আমার সাহিত্যিক অ্যাপ্রোচে মৌলিক পরিবর্তন আসিল। মুসলমান' শব্দটার স্থান দখল করিল 'পূর্ব বাংলা। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশ হয় শুধু রাষ্ট্রীয় অর্থে। কৃষ্টিক অর্থে পূর্ব বাংলা ছিল বরাবর একটি স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। এর কৃষ্টিক স্বকীয়তা এক দিকে যেমন পাকিস্তানের অপর অঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল, অপরদিকে তেমনি ঐতিহাসিক বাংলার অপর অঞ্চল পশ্চিম বাংলা হইতে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু আমাদের কবি-সাহিত্যিক চিন্তা-নায়কদের বিপুল মেজরিটির মধ্যে এই উপলব্ধির অভাব দেখিয়া আমি শুধু দুঃখিত হইলাম না, বিস্মিতও হইলাম। এঁদের মধ্যে একদল বলিতে লাগিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি কৃষ্টি হইতে আমাদের কৃষ্টি স্বতন্ত্র নয়; কারণ উভয়টাই ইসলামি বৃষ্টি। অপর দল সমান জোরে বলিতে থাকিলেন, আমাদের কৃষ্টি পশ্চিম বাংলার কৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র নয়; কারণ উভয়টাই এক বাঙ্গালী কৃষ্টি। ইসলামি কৃষ্টি-ওয়ালারা বলিতে থাকিলেন, ইসলামি বিশ্বকবি ইকবাল আমাদের জাতীয় কবি; বাঙ্গালী কৃষ্টি-ওয়ালারা বলিতে চলিলেন, বাঙ্গালী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি। বিস্ময়ের কথা, এই পরস্পরবিরোধী দ্বিমুখী দল দুইটি আশ্চর্যরূপে একমত যে আমরা পূর্ব বাঙ্গালী বা পূর্ব পাকিস্তানিদের নিজস্ব কোনও কৃষ্টিক স্বকীয়তা নাই। আমাদের স্বতন্ত্র ভাষা-সাহিত্যের কোনও অস্তিত্ব নাই। থাকার প্রয়োজনও নাই।

এ ব্যাপারে আমি দুই-এর কোনও দলের মিছিলেই শামিল হইতে পারিলাম না। কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে আমি ত্রিশ-ত্রিশটা বছর ভাষায় মুসলমান' রহিয়া গিয়াছিলাম, ঢাকার সাহিত্যিক মহলে আমি তেমনি বাঙ্গাল থাকিয়া গেলাম। কলিকাতায় বরঞ্চ নজরুল ইসলামের মত প্রতিভাধর মনীষী আমার কতকটা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কতকটা' বলিলাম এই জন্য যে, আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহারে নজরুল ইসলাম ও আমার মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য আছে। আমি আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করি ওগুলি আরবি ফারসি বা মুসলমানি শব্দ বলিয়া নয়, শব্দগুলি বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ব্যবহারে চালু বলিয়া। সে কারণে এগুলি বাংলা শব্দ হইয়া গিয়াছে বলিয়া। বানানে ও উচ্চারণে অনেকগুলির রূপান্তরও ঘটিয়াছে। ঐ রূপান্তরিত অবস্থাতেই আমি ও-সব শব্দ ব্যবহার করি। শুধু বাঙ্গালী মুসলমানরাই ব্যবহার করে, হিন্দুরা করে না, এমন আরবি-ফারসি-মূল শব্দকেও আমি বাংলা শব্দ মনে করি এবং আমার লেখায় বাংলা শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করি। যে শব্দ এমনভাবে চালু নাই, তেমন শব্দ শুধু আরবি-ফারসি বা মুসলমানি হওয়ার যুক্তিতে ব্যবহার করি না। এই কারণে অজানা ও অপ্রচলিত নূতন আরবি-ফারসি শব্দ আমদানি আমি করি না। এই কারণে আমার সকল বিষয়ের প্রবন্ধে বা গল্পে-উপন্যাসে মোটামুটি একই ধরনের ভাষার ব্যবহার দেখা যাইবে।

কিন্তু নজরুল ইসলাম ঠিক তা করেন নাই। তিনি মুসলমানি বা ইসলামি বিষয়ে কবিতা রচনায় এমন সব সুন্দর-সুন্দর মিঠা-মিঠা ও কঠিন-কঠিন আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যেগুলি

বাংলার মুসলিম জনসাধারণের কাছেও সুপরিচিত নয়। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে শব্দচয়নে। ও সুপ্রয়োগে তিনি এমন কারিগরি দেখাইয়াছেন যে, মনে হইবে ওখানে ঐ শব্দটি না বসাইলে কবিতাটি অমন সুন্দর হইত না। এসবই সত্য কথা। কিন্তু এটাও স্বীকার করিতে হইবে যে নজরুল ইসলাম তার বিস্ময়কর মনীষার বলে এমন অনেক আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকাইয়াছেন, যা আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে এটা লক্ষণীয় যে, মুসলমানি' বিষয় ছাড়া আর কোনও লেখায় তিনি এমন করেন নাই। তিনি তার সাধারণ গদ্য-পদ্য লেখায় হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের প্রচলিত ধারাই বজায় রাখিয়াছেন। যেহেতু আমি কবি নই, কাজী সাহেবের কাব্যিক ভাষা আমার লেখা প্রভাবিত করার প্রশ্নই উঠে না। গদ্য লেখাকে মুসলমানি করার উদ্দেশ্যে আমি চেষ্টা করিয়া বা অভিধান খুঁজিয়া কোনও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করি নাই। মুসলমান বাঙ্গালীর মুখে যেসব শব্দ প্রচলিত আছে, সেগুলিই আমি অবাধে ও নির্দ্বিধায় ব্যবহার করিয়াছি। মোটকথা, বাংলা ভাষার কাব্য-সাহিত্যিকে নজরুল ইসলাম মুসলমানি, মানে সত্যিকার বাঙ্গলার জাতীয় কাব্য করিয়াছেন। কিন্তু গদ্য সাহিত্যকে মুসলমানি করিবার চেষ্টা করেন নাই।

৬. বাংলা সাহিত্যের বাঙ্গাল রূপ

দেশত্যাগের পরে এ বিষয়ে আমার শব্দচয়নের মাপকাঠি রূপান্তরিত হইল মুসলমানি' হইতে 'বাঙ্গালে। পূর্ব বাঙ্গালীর শব্দ প্রয়োগ ও বাচনভঙ্গিই আমার রচনার উপজীব্য হইল। অখণ্ড ভারতে ব্যাপারটা ছিল মাইনরিটির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষার ব্যাপার। অবিভক্ত বাংলায় ছিল অধিকতর অগ্রসর মাইনরিটির দ্বারা অনগ্রসর মেজরিটির সাংস্কৃতিক অবদমনের ব্যাপার। কিন্তু পূর্ব বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমানের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ) এটা হইয়া উঠিল একটা স্বাধীন দেশ ও রাষ্ট্রের কৃষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় পরিচিতি, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রের প্রশ্ন। অবিভক্ত বাংলায় কলিকাতা ছিল গোটা বাংলার রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, ভাষিক ও সাহিত্যিক কেন্দ্রবিন্দু। সারা বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমিও ছিল কলিকাতা। কলিকাতা প্রায় দুইশ বছর বাংলার রাজধানী থাকায় এ সব ঘটিয়াছিল নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই। বাংলা বিভাগের ফলে এই অবস্থার মৌল ও সার্বিক পরিবর্তন ঘটে। কলিকাতার পরে ঢাকা হয় পূর্ব বাংলা, পূর্ব-পাকিস্তান, ও (পরে) বাংলাদেশের রাজধানী। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে শাসনতান্ত্রিক, শাসনযান্ত্রিক, প্রশাসনিক সকল ব্যাপারে পূর্ব বাংলা স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা লাভ করিল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের অমোঘ ও দুর্নিবার চাপেই। শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনও স্বাভাবিকভাবেই নিজস্বতা লাভ করিল আপনা-আপনি, কারো চিন্তা-ভাবনার ফল ছাড়াই। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌমত্ব সত্তার সাথে-সাথে কৃষ্টিক, সাহিত্যিক ও ভাষিক স্বাতন্ত্রটা অমন সুস্পষ্ট, দুর্নিবার ও অটোমেটিক হইয়া যায় না। কৃষ্টিক, সাহিত্যিক ও ভাষিক ঔপনিবেশিকতটা রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক শ্রেণীভেদের মত দৈহিক ও বাহ্যিক প্রাধান্যের ব্যাপার না হওয়ায় এবং প্রধানত মানসিক ব্যাপার হওয়ায় সহজে সাধারণের দৃষ্টিগোচর নয়। কৃষ্টি-সাহিত্যের ব্যাপারটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারের মত সাধারণ ও প্রাত্যহিক ব্যক্তি বা জাতীয় স্বাতন্ত্রের স্থূল স্বার্থের ব্যাপারও নয়। এটা আসলে সূক্ষ্ম জাতীয় স্বকীয়তার আধ্যাত্মিক স্বার্থের ব্যাপার। রাষ্ট্র-নেতাদের অতিব্যস্ত চোখে এসব ব্যাপার সহজে ধরা পড়িবার কথা নয়; নয়া রাষ্ট্রের ফর্মেটিভ স্তরের নেতাদের ত নয়ই। সে কারণে শিল্পী-সাহিত্যিক প্রভৃতি চিন্তা-নায়কদের উপরই ন্যস্ত হয় এদিককার প্রাথমিক দায়িত্ব। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় শিল্পী-সাহিত্যিকরা নিজেদের মন মস্তিষ্ক ও কলমকে রাজনীতির উর্ধ্বে ও বাহিরে রাখায় অভ্যস্ত। এটাকে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র, বৈশিষ্ট্য ও কর্তব্য মনে করেন। রাখিতে

পারাকে তারা গৌরবের বিষয় মনে করেন। উনিশ শতকের ইউরোপীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের অনুকরণে বিশ শতকের প্রথমার্ধের কলিকাতা-কেন্দ্রিক বাঙ্গালী শিল্পী সাহিত্যিকরাও বাংলা সাহিত্যকে যথাসম্ভব রাজনীতির ‘ধুলা-মাটি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এ সময়কার বাংলা সাহিত্য মানেই হিন্দু বাংলা সাহিত্য। নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগেতক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের কোনও উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল না। এ অবস্থায় বাঙ্গালী মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার সাফল্যের মাপকাঠি ছিল হিন্দু কবি সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের অনুকরণ-অনুসরণে সাফল্যের কৃতিত্ব। এই বিচারে ও কারণে বাংলার মুসলমান শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিপুল মেজরিটি দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত দেশ যখন ভাগ হইয়াই গেল তখন অপর সকলের মত তারাও কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু মনের দিক হইতে তারা কলিকাতায়ই থাকিয়া গেলেন। তারা বলিতে লাগিলেন : শিল্প-সাহিত্য অবিভাজ্য। রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাগ হইলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভাগ হয় নাই।’ এসব কথা যারা বলেন, বিশ্বাস করেন, পূর্ব বাংলার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রের দাবি বা উপলব্ধি তাদের নিকট আশা করা যায় না। তারা স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে বসিয়া কলিকাতার ভাষায় পশ্চিম-বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিলেন। তারা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় কবি, কলিকাতার কৃষ্টিকে পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গৌরববোধ করিতে লাগিলেন। এটা করিলেন তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই, অভ্যাসবশতই। তাদের বিশ্বাসও অনেকখানি আন্তরিক। নয়া রাষ্ট্র, নয়া জাতি, নয়া কৃষ্টি ও নয়া সাহিত্য যে পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এটা বুঝিতে একটু সময় লাগেই। এই কারণে এটা উপলব্ধি করিবার প্রাথমিক দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতাদের। শুধু প্রয়োগ করিবার দায়িত্বটাই শিল্পী। সাহিত্যিকদের। এক পক্ষ তাদের দায়িত্ব পালন না করায় অপর পক্ষ তাদের দায়িত্ব পালন করেন নাই। অথচ উভয় পক্ষেরই দিবার মত কৈফিয়ত আছে। মুখে ও কলমে দিতেছেনও সেসব কৈফিয়ত। আপাতদৃষ্টিতে তারা জিতিতেছেনও। স্কুল দৃষ্টিতে দেখা যাইবে, দেশের লেখক গোষ্ঠী ও পাঠক সাধারণের মেজরিটি তাদের কথা ও কাজ মানিয়া লইয়াছেন।

৭. বিভ্রান্তির হেতু

কিন্তু ভাষা-সাহিত্য ও শিল্প-কৃষ্টির ইতিহাস একটু তলাইয়া বিচার করিলেই বুঝা যাইবে তাঁদের ধারণাটা ভ্রান্ত ও তাদের কার্যকলাপ অবাস্তব। এটা আজকাল সকলেই জানেন যে, শিল্প সাহিত্য, সুতরাং ভাষাও, এককালে ভদ্রলোক ও পণ্ডিতদের একচেটিয়া সম্পদ ছিল। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বেলাও ছিল তাই। ইংরাজ শাসনের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য যখন পশ্চিমী অর্থে উন্নতির পথ ধরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি, তখন এটা সংস্কৃত-ঘেঁষা পণ্ডিতি বাংলা হওয়ার দিকে ধাবিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীর নেতৃত্বে তার এই গতির পরিবর্তন হয়। বাংলা ভাষা হয় অতঃপর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের, তৎকালীন কথায় ভদ্রলোকের, সাহিত্যের মাধ্যম। ইউরোপ মার্কিন সাংস্কৃতিক বিপ্লবে বিশ শতকের গোড়া হইতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গণমুখী হয়। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তাদের অনুসারীরা এই প্রগতির পথে বিরাট অবদান রাখেন। স্বাভাবিক ক্রমোন্নতি, ভদ্রলোকের ভাষায় ক্রমাবনতি ও ভাষা-সাহিত্যের এই গণমুখিতা, ভদ্রলোকের ভাষায় নিম্নমুখিতা, সাহিত্যের ভাষাকে পরিমণ্ডলীয় চাপেই কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ভাগীরথী-তীরবর্তী আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় (কনভার্সেশনাল ল্যাংগুয়েজে) পরিণত করে। রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শ পাইয়া ভাগীরথী তীরের ‘গ্রাম্যতা’ (রাসটিসিটি), তার জিভের অশালীন মোচড়সহ (ইন্ডিসেন্ট টাং

টুইসৃটিং) সভ্য ও শালীন সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হইল। এটা স্বাভাবিক। ভাষার নিজস্ব অভদ্রতা ও অশালীনতা বলিয়া কিছু নাই। যা ভদ্রলোকের মুখের ভাষা, তাই ভদ্রভাষা। ভদ্রসাহিত্যে যে ভাষা ব্যবহৃত ও প্রযুক্ত হয়, সেটাই ভদ্র, শালীন সাহিত্যের ভাষা। আসলে ভাষা সাহিত্যকে ভদ্র করে না। সাহিত্যই ভাষাকে ভদ্র করে। বস্তুত, ভাষায় স্ল্যাং বা অপভাষা ও অশালীন শব্দ বলিয়া কিছু নাই। সব সভ্য, শালীন ও সাহিত্যের ভাষাই গোড়ায়, সাহিত্যে স্থান পাওয়ার আগ পর্যন্ত, স্ল্যাং থাকে। সভ্য জাতসমূহের সব উন্নত ভাষাই গোড়ায় স্ল্যাং ছিল।

রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের মনীষার যাদুর কাঠিস্পর্শে ভাগীরথী অঞ্চলের অসাধু কথ্য ভালগার ভাষা যেদিন উন্নত বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইতে শুরু করিল, সেদিন অনেক ভদ্র ও শালীনতাবাদী লেখক-সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু সে প্রতিবাদ বন্যার স্রোতে বাধা দেওয়ার শামিল হইল। তবু সেই প্রতিবাদীদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, এটা স্বীকার করিতেই হইবে। সে মহৎ উদ্দেশ্যের দুইটা বড় দিক ছিল। এক দল ছিলেন বাংলা ভাষার মার্জিত রূপের পক্ষে। অপর দল ছিলেন বাংলা ভাষার অখণ্ডতার পক্ষে। আমি এখানে দ্বিতীয় দলের কথাই বলিব। কারণ এঁদের মতের সাথেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এদের নেতা ছিলেন স্বনামধন্য সর্বজনমান্য ভাষাবিজ্ঞানী ডা. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তার প্রতিপাদ্য ছিল ভাগীরথী-তীরের আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে (কনভার্সেশনাল ল্যাংগুয়েজকে) সাহিত্যের ভাষা করিয়া বাংলার কবি-ঔপন্যাসিকরা বাংলা ভাষাকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার দুই ভাষায় বিভক্ত করিতেছেন। কথাটা তিনি বলিয়াছিলেন মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির ও বাংলা বাটোয়ারার অনেক আগে ১৯৩৭ সালে। তিনি তার এক সারগর্ভ ভাষণে বলিয়াছিলেন : ‘ভালর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক, উচিতই হউক, আর অনুচিতই হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের বিশেষত কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্রসমাজের কথ্য ভাষা আজকাল সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ভাষা অঞ্চল-বিশেষের মৌখিক ভাষা। ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ-রীতি সমগ্র বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবহারিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও নিজ মাতৃভাষার রিথ হিসাবে উহার বিশেষত্বের অধিকারী হয় নাই সে জন্য অবিসংবাদিতার্থ সাধু বাংলা ভাষার রাজপথ ছাড়িয়া যারা কলিকাতার আঞ্চলিক ভাষার পথে চলিতেছেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাঁদের অনেকে এমন অনেক বিভ্রাট ঘটাইয়া থাকেন, যাহা লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর। আজকালকার যে কোনও বাংলা দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিকপত্রে অনেক লেখকের লেখা পড়িলেই এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ডা. সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নন। কিম্বা সমাজবিজ্ঞানীও নন। তিনি অখণ্ড বাংলার এগার কোটি মানুষের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা লইয়া গর্ব করিতেন। কাজেই আঞ্চলিকতার অভিশাপে বাংলা ভাষার দ্বিধাবিভক্তির আশঙ্কায় তিনি ঐ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী না হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারেন নাই, দুর্বার গতি গণতন্ত্রের চাপে শিল্প-সাহিত্য ও ভাষাকে যে গণমুখী হইতে হইতেছে, বাংলা ভাষার অখণ্ডতা ও সাধুতার দোহাই দিয়া সে দুর্বার গতিরোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রক্ষমতা ও জাতীয় সম্পদ ভোগের অধিকার যেমন করিয়া সমাজের উপরতলা হইতে মধ্যবিত্ত পার হইয়া সমাজের তথা জাতির একেবারে নিচের তলায় আসিতে বাধ্য ছিল, শিল্প-সাহিত্য ও ভাষার বেলাও তাই ঘটা অপ্রতিরোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ভাষা ও সাহিত্যের এই গণমুখী গতি স্বভাবতই তকালীন রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রস্থল কলিকাতার পার্শ্ববর্তী জনগণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইল।

৮. আমাদের কথ্য ভাষার শক্তির উৎস

এটা বুঝিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধু বিশ্বকবি ছিলেন না। তিনি শুধু বাংলা ভাষাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উন্নীতই করেন নাই। তিনি শুধু শিল্পী সাহিত্যিক-কবি-সংগীতজ্ঞই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও স্বপ্নদ্রষ্টা। রাজনীতিতে ছিলেন তিনি মহাভারত বিশ্বভারতীয় প্রবক্তা। সমাজবিজ্ঞানে ছিলেন তিনি আর্য-অনার্য-হিন্দু-মুসলিম-শক-হুঁন মোগল-পাঠানের সংমিশ্রণে ভারত-তীর্থের', মহামিলনের কুম্ভমেলার স্বাপ্নিক। যিনি বিশাল দেখেন, তিনি ক্ষুদ্রও দেখেন। কারণ বিশাল ত খণ্ডেরই সংমিশ্রণ। তাই মহাভারতের স্বপ্ন দেখার সময়ও তার বিশাল চিন্তা-রাজ্যে খণ্ডিত বাংলার দৃশ্যও তার চোখ এড়াইয়া যাইত না। মৃত্যুর মাত্র দুই বছর আগে তিনি তাই বুঝিতে ও বলিতে পারিয়াছিলেন : বাংলা শুধু দেহে দুই নয়, অন্তরেও দুই। বাংলা সাহিত্যে কলিকাতা-কেন্দ্রিক আঞ্চলিকতার প্রাধান্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্বিখণ্ডিত হইবার আশঙ্কায় সুনীতি বাবুর মত তাই রবীন্দ্রনাথ ভীত হন নাই। এটা স্বাভাবিক বলিয়া তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। ডা. সুনীতি চ্যাটার্জিকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় লিখিয়াছিলেন যে, বাংলা সাহিত্যের ভাষায় কলিকাতা-কেন্দ্রিক আঞ্চলিক প্রাধান্য দোষেরও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। কলিকাতার বদলে ঢাকা যদি বাংলার রাজধানী হইত, তবে তথাকার আঞ্চলিকতা "ঢাকাইয়া-বাংলাই" বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইত। তাতে পশ্চিম-বাংলা মুখ বাঁকা করিলে সে বক্রতা আপনি সিদা হইয়া যাইত।

খুবই খাঁটি সত্য কথা। স্বাভাবিক ঘটনা। বাস্তব সত্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটা বুঝিয়াছিলেন জীবন-সায়াহ্নে। এটা বুঝিতে তার মহাসাগরের মত বিশাল মনীষার দরকার হইয়াছিল। কারণ এটা ছিল তাঁর জন্য অপরের ব্যাপার। নিজের ব্যাপার এটা তাঁর ছিল না। অপর পক্ষে তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভক্ত অনুসারী হইয়াও আমি এটা বুঝিয়াছিলাম তরুণ বয়সেই। আমার জন্য মনীষার বিশাল মহাসাগর ত দরকার ছিলই না, বড় রকমের জলাশয়েরও আবশ্যকতা ছিল না। একটি অগভীর ডোবাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ এটা আমার ছিল নিজস্ব ব্যাপার। একজন সাধারণ দেশপ্রেমিক আত্মসম্মানী, 'বাঙ্গালের' মনই ছিল এটা বুঝার জন্য যথেষ্ট।

বাংলা সাহিত্যের একজন নগণ্য লেখক হিসাবে আমি যথাসময়ে বুঝিয়াছিলাম, সাহিত্যকে জনগণের মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশের মাধ্যম হইতেই হইবে। কলিকাতা বসিয়াই এই উপলব্ধি ঘটিল বলিয়া এটাও বুঝিলাম, কলিকাতা-কেন্দ্রিক ঐ আঞ্চলিকতাটা আকস্মিক ও পরিবেশিক। ওটা প্রকৃতির দেওয়া স্বাভাবিকতা নয়। রবীন্দ্রনাথের মত দূরদর্শী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নিশ্চয়ই ছিলাম না। কাজেই ঢাকা বাংলার রাজধানী হওয়ার কল্পনা আমার মাথায় ঢোকে নাই। কিন্তু এটা অতিসহজেই বুঝিয়াছিলাম যে, পশ্চিম-বাংলার কনভার্সেশনাল ল্যাংগুয়েজে সাহিত্য রচিত হইতেছে হউক, কিন্তু ঐ সঙ্গে পূর্ব বাংলার কনভার্সেশনাল ল্যাংগুয়েজেও সাহিত্য রচিত হইবে। হইতে পারে এবং হওয়া উচিৎ। লেখা শুরুও করিলাম। এটা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা-বোধও ছিল না। পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বোধও ছিল না। এটা পাকিস্তান হওয়ার বার বছর আগের কথা। এই সময়ে আমি আমার জীবন ক্ষুধা নামক একটা বড় আকারের নভেল লিখিতে শুরু করি। শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌ. নাসিরউদ্দীন সাহেব তার সওগাত-এ ধারাবাহিক ছাপিতে থাকেন। অনেক দিন লাগে শেষ হইতে। নভেল হিসাবে এর বাহাদুরি বা মূল্যায়ন এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে, এই

পুস্তকে আমি পাত্র-পাত্রীর ডায়লগ পূর্ব বাংলার কথ্যভাষায় লিখিয়াছি তখনকার দিনেই। আরো কেউ-কেউ পূর্ব বাংলার কথ্যভাষা তাদের নাটক-নভেলে স্থানে-স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন।

৯. 'মনিব' ও 'চাকরের' ভাষা

কিন্তু অহংকার না করিয়াও আমি বলিতে পারি এবং এখানে সে কথাটাই বলিতেছি যে, আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে মৌল পার্থক্য রহিয়াছে। তারা পূর্ব বাংলার কথ্যভাষা দেন নাই বইয়ের চাকরবাকর শ্রেণীর চরিত্রের মুখে। ভদ্রলোক চরিত্রের সবাই বিশুদ্ধ আর্য উচ্চারণে কলিকাতার কথ্যভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। পশ্চিম-বাংলার কথ্যভাষা যে ভদ্র, শালীন ও শ্রুতিমধুর এটা এমফাসাইয করিবার মতলবেই যেন চাকরবাকরের মুখেও যতটুকু পূর্ব বাংলার কথ্যভাষা ঢোকান তা-ও বিকৃত উচ্চারণে ও বিশ্রীমুখ ও অঙ্গ-ভঙ্গিতে। পূর্ব বাংলার কনভার্সেশনাল বাংলাকে বিদ্রূপ করার সুচিন্তিত মতলবেই যেন ঐটুকু করা হয়। পশ্চিম-বাংলার ভদ্রতা' ও পূর্ব বাংলার 'অভদ্রতা' আন্ডারলাইন করার জন্য আরো উপায় ইতিমধ্যে বাহির হইয়াছে। অশিক্ষিত কৃষক, অর্ধশিক্ষিত ইংরাজি না-জানা ব্যবসায়ী, কারবারী ও আরবি ফারসি-জানা-মৌলবী বাপ-দাদারা ও ইংরাজি-শিক্ষিত কলেজ-পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও দারোগা-ডিপুটিদের মধ্যকার ডায়লগের বেলাও ওঁদের মুখ দিয়া পূর্ব বাংলা ও এদের মুখ দিয়া পশ্চিম-বাংলা অসংকোচে বলাইতেছেন। এই নাট্যকার-ঔপন্যাসিকরা ভাল করিয়াই সমঝাইতেছেন যে খোদ পূর্ব বাংলায় (বাংলাদেশে) ও পূর্ব বাংলার কথ্যভাষাটা অসভ্য লোকের ও পশ্চিম-বাংলার কথ্যভাষাটাই ভদ্রলোকের ভাষা। বৈঠকখানা, আফিস-আদালত ও সভা সমিতি সর্বত্রই এটা সত্য। মনে পড়িতেছে, এর মধ্যে এক সিনেমায় বাংলাদেশের মেন্টাল হসপিটালের একটি ছবি দেখিয়াছিলাম। সে হাসপাতালে সব পাগলও কী সুন্দর কলিকাতার কথ্যভাষা বলিয়াছিল! এ সবই টাওয়ার বাংলা ও খামার বাংলার মধ্যে দুইশ বছরের মনিব-চাকর সম্বন্ধ বজায় রাখিবার অপচেষ্টা। পরিভাষা সৃষ্টির নামে 'বিদেশি শব্দ' হওয়ার অজুহাতে 'আদালত', 'কলেজ ইত্যাদি চলতি সহজ বাংলা শব্দের জায়গায় ন্যায়পীঠ' ও 'মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি দুর্বোধ্য-দুরুচ্চার সংস্কৃত শব্দ প্রবর্তন এবং তুলা-মুলা ইত্যাদি চেনা শব্দকে তুলো-মুলো ইত্যাদি অচেনা ভদ্র উচ্চারণ ঐ একই অপচেষ্টার অংশমাত্র। এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ পাড়া গাঁয়ের কৃষক-শ্রমিক লইয়া নাটক-নভেল লিখিয়াছেন। ঐ সব বইয়ের পাত্র পাত্রীর মুখে পূর্ব বাংলার কথ্যভাষা দিয়াছেন। লোকাল কালার দানে ও স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতা অঙ্কনের তার অনেকগুলিই সুন্দর-সফল-সজীব আর্ট হইয়াছে। কিন্তু যেই ঘটনার মধ্যে কোনও দারোগা-মাস্টার বা অন্য কোনও শিক্ষিত লোকের আমদানি হইয়াছে, অমনি তার মুখে পশ্চিম-বাংলার কথ্যভাষা দেওয়া হইয়াছে। যেন পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোনও সফিসটিকেটেড কথ্যভাষা নাই।

এইখানেই তাঁদের সাথে আমার বিরোধ। আমি জানি, এবং সেটাই বলিতে এবং বই-পুস্তকে দেখাইতে চাই যে, পূর্ব বাংলার বিপুল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁদের একটা নিজস্ব সুসভ্য, শালীন শ্রুতিমধুর সফিসটিকেটেড কথ্য বাংলা বিদ্যমান আছে। এই ভাষা পূর্ব বাংলার হিন্দু মুসলিম ভদ্রলোক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশ বাঁটোয়ারা হইবার আগে হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এবং আজও ব্যবহার করিতেছেন। চিরকাল ব্যবহার করিবেন। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা হাজার পশ্চিম-বাংলার কথ্যভাষাকে আমাদের সাহিত্যের এবং সরকারি

কাগজপত্রের ভাষা করিলেও আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়সহ জনগণের মুখের ভাষা করিতে পারিবেন না। কারণ ব্যক্তির ভাষা বদলান সম্ভব হইলেও জাতির ভাষা বদলান যায় না।

এটা ভাষাবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য হইলেও আমি ঐ সব বিজ্ঞান না পড়িয়াই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান হইতেই তা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বাংলা বাটোয়ারা হওয়ার আগে পূর্ব বাংলার মুখের ভাষার প্রতি আমার এই দরদ ছিল আঞ্চলিক আত্মসম্মানের প্রশ্ন। কলিকাতা রাজধানী রাখিয়াও এবং বাংলাদেশ অখণ্ড রাখিয়াও যে বাংলা-সাহিত্য থাকিত, তাতে পূর্ব বাংলার মুখের ভাষা উপেক্ষিত হইবে, এতে আমি অপমান বোধ করিতাম। সেজন্য আমার জীবনক্ষুধায় এবং তারও আগে ছোটগল্পে পূর্ব বাংলার কথ্যভাষাকে স্থান দিবার চেষ্টা করিতাম। দেশ ভাগ হইয়া পূর্ব বাংলা প্রথমে পূর্ব-পাকিস্তান ও পরে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ হওয়ার পর এই আঞ্চলিক আত্মমর্যাদাবোধই জাতীয় মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে। কাজেই দেশভাগের পরে আমি আমার কোনও বইয়েই গ্রন্থকার বা গল্পকারে ভাষায় ত নয়ই, অপশ্চিম বাঙ্গালী পাত্র-পাত্রীর ডায়লগেও পশ্চিম-বাংলার কথ্যভাষা প্রয়োগ করি নাই। তার বদলে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজের সফিসটিকেটেড ও পরিমার্জিত কথ্য বাংলা ব্যবহার করিয়াছি। এই সব গ্রন্থে মন্ত্রী, মেম্বর, অধ্যাপক, প্রিন্সিপাল, ডাক্তার, বিচারক, উকিল, মোখতার সবার মুখে এই ভাষা দিয়াছি। আমার সত্য মিথ্যা ও আবে হায়াত নামের নভেল, গালিভারের সফরনামা ও আসমানী পদানামক গল্পের বইয়ে এই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছি। কর্তব্য যে কঠিন, সে সম্বন্ধে আমিও যে সম্পূর্ণ সচেতন পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে পাঠক তা বুঝিতে পারিবেন।

১০. আমার ‘একাকিত্ব’

নিজের অক্ষমতার দরুন গল্প-উপন্যাসে যা পারিলাম না, প্রবন্ধে-নিবন্ধে তা সমাধা করতে উদ্যত হইলাম। আমাদের রাষ্ট্রীয় রূপ ‘পূর্ব-পাকিস্তান বা স্বাধীন বাংলাদেশ’ যা-ই হউক ভাষা-সাহিত্য, কালচার-সংস্কৃতিতে যে আমরা একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ও অপর দিকে ভারত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এ সব ব্যাপারেই যে আমাদের নিজস্বতা ও স্বকীয়তা আছে, এটা আমার অনড় দৃঢ় মত। দেশের লেখক-সাহিত্যিকদেরে তা বুঝাইবার জন্য আমি ইংরাজি বাংলা মাসিক-দৈনিক কাগজে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলাম। একাধিক সাহিত্য সম্মিলনীতে, বাংলা একাডেমির ও একইশা ফেব্রুয়ারির ছাত্রদের সভায় ভাষণ পড়িতে লাগিলাম। এর সবগুলিই হয় দৈনিক কাগজ নয় ত একাডেমি পত্রিকায় তৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসব ভাষণ-নিবন্ধের অনেকগুলি যাইটের দশকে প্রকাশিত আমার পাক-বাংলার কালচার নামক পুস্তক ছাপা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই বইয়ের নাম বদলাইয়া বাংলাদেশের কালচার রাখা হইয়াছে। সত্তরের দশকে এন্ড অব এ বিট্রেয়াল নামক ইংরেজি বইয়ে এবং শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু নামক বাংলা বইয়ে রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহের সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলি কালচারেল নিবন্ধও সংযোজিত হইয়াছে। রাজনৈতিক প্রবন্ধের সাথে কালচারেল প্রবন্ধগুলি একত্র করিবার কারণ ছিল। আমার প্রতিপাদ্য ছিল এই যে রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৭ সালে যে দেশ ভাগ হইয়াছিল, কালচারেল দিক হইতেও ওটা ঠিকই হইয়াছিল। পাকিস্তানি আমলে একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও পূর্ব-পাকিস্তান শুধু ভাষায় নয়, আর্ট-কালচারের ব্যাপারেও, অবশিষ্ট পাকিস্তান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। স্বাধীন হওয়ার পরও বাংলাদেশ তেমনি

তার কৃষ্টি-সাহিত্যের ব্যাপারে পশ্চিম-বাংলা-ভারত হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রই আছে। চিরকাল থাকিবে।

কিন্তু আমার এ মতবাদ অন্তত কাগজে-কলমে কেউ মানেন নাই। একদল পাকিস্তানি আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষ্টিক স্বাতন্ত্র্য মানিতেন না। পূর্ব পাকিস্তানের কৃষ্টিকে তারা অখণ্ড পাকিস্তানি কৃষ্টির অংশ মনে করিতেন। অপর দল যারা পাকিস্তানি আমলেও পূর্ব-পাকিস্তানের কৃষ্টি-সাহিত্যকে পশ্চিম-বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিতেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের গলার আওয়াজ ও কলমের জোর বাড়িয়াছে। আমি যতই বলি, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় লাহোর প্রস্তাব ভিত্তিক পাকিস্তান বাস্তবায়িত হইয়াছে, তাঁরা তত জোর গলায় বলেন : এতে বেঙ্গলী কালচার-আর্টের অবিভাজ্যতা চূড়ান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি যত বলি, ইংরাজ-আমলের পৌনে দুইশ বছরের বাংলার শিল্প-সাহিত্য আসলে গোটা বাংলা তথা হিন্দু মুসলমানদের আর্ট-কালচার ছিল না ও নাই, তারা তত বলেন, কলিকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের ঐ কালচার-সাহিত্যই গোটা বাংলার তথা হিন্দু মুসলিমের যুক্ত জাতীয় সাহিত্য ও আর্ট-কালচার। আমি যত বলি, ভাগীরথী তীরের ইংরাজ-সৃষ্ট ঐ বেঙ্গল আসলে 'টাওয়ার বাংলা' আসল বাংলা পূর্ব বাংলায়, তাদের বিচারের খামার বাংলায়, আমার কথায় তাঁদের 'বিদগ্ধ' মনে ও প্রস্তরীভূত মস্তকে কোনও আসর হয় না। শুধু আমার কথাই বা কেন? টাওয়ার বাংলা হইতেও বলা হয় : 'তোমাদের আবার কালচার কী? তোমাদের ত একটিমাত্র কালচার : সেটা এগ্রিকালচার। কাজেই ওটা নিয়াই থাক, ভদ্রলোকের হেঁসেলে ঢুকিবার চেষ্টা করিও না। তবু আমাদের বিদগ্ধদের হুশ হয় না। কারণ তাদের মন-মস্তিষ্ক সত্যই টাওয়ারের কালচারের অগ্নিতাপে বিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এঁরা মুসলমান' হইলেও ভদ্রলোক।

শুধু 'বাঙ্গালী সংস্কৃতির' ও বাংলা সাহিত্যের অবিভাজ্যতাবাদী এই ভদ্রলোক মুসলমানরাই টাওয়ার বাংলার 'কথ্য ভাষা-শৈলী' ব্যবহার করেন তা নয়, যে সব ইসলামী রাষ্ট্রনীতিবাদী, মুসলিম নেশনহুড'-বিশ্বাসী, শরিয়তী আইনের প্রবক্তা', যারা সাধারণভাবে অমুসলমানদের সাথে বিশেষভাবে হিন্দুদের সাথে পলিটিক্যাল নেশন' গড়িতেও রাজি নন, তাঁরাও তাঁদের

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি' পশ্চিম-বাংলার তথা হিন্দু-বাংলার কথ্যভাষাতেই প্রচার করিয়া থাকেন। পাকিস্তান আমলে এঁরা আমাদের ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন উর্দুর সমর্থনে। এখন এঁরা নিজেদের সাহিত্যিক। আচরণে যেন আমাদেরে আজও 'উইথ ভেনজ্যান্স' বলিতেছেন : ইকবালের উর্দু যখন বর্জন করিয়াছ, তখন রবীন্দ্রনাথের বাংলা তোমাদেরে ধরাইয়াই ছাড়িব। যদি এতে তোমাদের আবার হুঁশ হয়।

সুতরাং এই সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ মতবাদী দুই দলের কেউ আমার সমর্থন করেন না। তবে কি আমি একা? দৃশ্যত আপাতত তাই মনে হইবে। দুই-একটি মাত্র দৈনিক খবরের কাগজ ছাড়া বাংলাদেশের নগর-শহরের সব কাগজই এমনকি মফস্বল শহরের সাপ্তাহিকগুলি পর্যন্ত কলিকাতার কথ্যভাষায় লেখার চেষ্টা হইয়া থাকে। কাজেই মনে হইবে, বাংলাদেশের শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, পণ্ডিত অপণ্ডিত লেখক সাহিত্যিক সাংবাদিকদের কেউই বাংলাদেশের কৃষ্টিক-ভাষিক সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র স্বকীয়তার সমর্থক নয়। এঁরা সবাই বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিম-বাংলার ভাষিক-কৃষ্টিক-সাহিত্যিক হিন্টারল্যান্ড, কলনি বা মার্কেটরূপেই বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। কিন্তু এটা হইতে পারে না। সত্যও হইতে পারে না, বাস্তবও হইতে পারে না। সত্যও না, রিয়ালিটিও না। বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষী

আট কোটি মানুষের একটা স্বাধীন সার্বভৌম জাতি অপর রাষ্ট্রের অঙ্গ চার কোটি বাংলা ভাষাভাষীর কালচারেল উপনিবেশ থাকিতে পারে না।

কাজেই আমি একা নই। এই আট কোটি বাঙ্গালীর শতকরা নিরানব্বইজনই আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মতই কৃষ্টিক স্বকীয়তারও দৃঢ় সমর্থক। আর লেখক-সাহিত্যিকদের কথা? তারা কত জন? এঁদের পাঠকই বা কয়জন? জনতার শতকরা মাত্র কুড়িজন লেখা-পড়া জানেন। এঁদের কত ডেসিমেল পয়েন্ট পার্সেন্ট লেখেন, আর কত ডেসিমেল পার্সেন্ট পড়েন? বলা যায়, এঁরা যতই মুষ্টির ভগ্নাংশ হউন, এঁরাই দেশের কৃষ্টি-সাহিত্যের নিয়ামক। কথাটা ঠিক। কিন্তু এঁদের কতজন সজ্ঞানে অপর রাষ্ট্রের ভাষিক কৃষ্টিক উপনিবেশের দালালি করিতেছেন? খুবই নগণ্য অংশ। আর সকলে পশ্চিম-বাংলার কথ্যভাষাকেই বাংলা-সাহিত্যের চলতি মাধ্যম বলিয়া জানেন। তারা ভাবেন, এটাই উন্নত বাংলা। সাহিত্যের উন্নত সর্বাধুনিক ভাষা। এটা যে পশ্চিম বাংলারই কথ্য ডায়লেক্ট তা-ও অনেকে জানেন না। তারা এটাকে সর্বাধুনিক সাহিত্যের ভাষা হিসাবেই চিনেন। যদিও তারা এ ভাষায় শুধু লেখেন, কথা বলেন না। কিন্তু এটাতে তারা কোনও অসংগতি দেখিতে পান না। আমরা কেতাবি ভাষায় কবে কথা বলিয়াছি? যেদিন এঁরা জানিবেন, কেতাবি ভাষা কেতাবি ভাষাই, ওটা অপর কোনও বিদেশের বা অঞ্চলের কথ্যভাষা নয়, সেদিন তারা আত্মমর্যাদার খাতিরেই নিজেদের কথ্যভাষায় যেমন কথা বলিবেন, তেমনি নিজস্ব সফিসটিকেটেড মার্জিত সাহিত্যের ভাষা নিজেরাই করিয়া লইবেন। এত বড় জাতির জনতা যেদিন সংকল্প করিবে : আমরা কারো থনে নিচু থাকিব না, কারো কাছে নীচ হইব না, সেদিনই আমরা মুক্ত হইব।

তবু আমি বুঝি ও সরলভাবে স্বীকার করি যে, আমি বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগ-ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছি। স্রোতের বিরুদ্ধে চলিবার চেষ্টা করিতেছি। এ ব্যাপারে আমি ডা. ইয়ুং ইমার্সনের কথাও ভুলি নাই। বরঞ্চ তাদের জীবন হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছি। ডা. ইয়ুং তার পশুচলেটস অব এনালিটিক্যাল সাইকলজিতে লিখিয়াছেন : স্পিরিট অব দি এজ, মানে যুগধর্ম, ধর্মোন্মাদনার চেয়েও শক্তিশালী। এটা কোনও যুক্তির ধার ধারে না। ওটা একটা প্রবণতা। অবচেতনার মধ্য দিয়া দুর্বল মনে তা প্রভাব বিস্তার করে দুর্বার গতিতে। এই যুগ-ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া শুধু নিস্ফল নয়, পাগলামিও। ওটা অবৈধ, অশালীন কুফরি ব্যক্তির জন্য বিপজ্জনক। তবু আমি এই যুগ-ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়াইছি এই সত্য উপলব্ধি করিয়া যে এটা 'যুগে'র হইলেও ধর্মে'র শক্তি এর মধ্যে নাই। এটা ফ্যাশন মাত্র। মার্কিন জাতির পথ প্রদর্শক ইমার্সন যে তথাকথিত যুগ-ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ছিলেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি। তা ছাড়া এঁদের কেউ কেউ যুক্তি দেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলা ও অঞ্চলের কথ্যভাষা এতই ভিন্ন ও পৃথক যে, এদেশে বাংলাভাষাকে সর্বাঞ্চলীয় সর্বজনগ্রাহ্য কোনও বাংলাদেশি জাতীয় রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।

কথাটা যে কত অসার, অসত্য ও ভ্রান্ত, তা ভাষাবিজ্ঞানীমাত্রেই জানেন। সব রাষ্ট্রের, সব জাতির, সব দেশের বেলাতেই গোড়াতে এই আঞ্চলিক বিভিন্নতা থাকে ও ছিল। দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির স্বার্থেই সে বিভিন্নতা ডিঙ্গাইয়া জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার যে ভাষাকে এঁরা এত সহজে চলতি বাংলা' বলেন, তারও জন্ম এইভাবেই হইয়াছে।

# ১৬. রাষ্ট্রিক বনাম কৃষ্টিক স্বাধীনতা

## অধ্যায় ষোল – রাষ্ট্রিক বনাম কৃষ্টিক স্বাধীনতা

### ১. মার্কিন নজির

আমাদের জাতীয় মর্যাদা, কৃষ্টিক স্বকীয়তা ও রাষ্ট্রিক সার্বভৌম-স্বাধীনতার জন্য যে দুইশ বছরের আমাদের কালচারের টাওয়ার কলিকাতার প্রভাবমুক্ত হইতে হইবে, এটা আমি উপলব্ধি করি জার্মান, ইটালি, আয়ারল্যান্ড ও মার্কিন মুল্লুকের ভাষিক-সাহিত্যিক কৃষ্টিক-উদ্বর্তনের ইতিহাস পড়িয়া। এইসব আন্দোলনের ইতিহাসই আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে সত্য কিন্তু মার্কিন মুল্লুকের সর্বগ্রামটা আমার মন ও মস্তিষ্ককে উদ্বেলিত করিয়াছে সবচেয়ে বেশি। এ দাগ সৃষ্টি করেন ইমার্সন। ১৯৬২ সালে আমি বাংলা একাডেমিতে 'সাহিত্যের প্রাণ, রূপ ও আঙ্গিক' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়ি। তাতে পাক-বাংলার ভাষা-সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও কৃষ্টিক স্বকীয়তার কথা বলি এবং বৃটেনের ভাষা-সাহিত্য হইতে মার্কিন ভাষা-সাহিত্যের স্বাতন্ত্রের নজির দেই। সমবেত সাহিত্যিকদের অধিকাংশ আমার প্রতিবাদ করেন। আমার কথাকে তারা অবিভাজ্য বাংলা কৃষ্টি-সাহিত্যকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র আখ্যা দেন। জবাবে আমি বলি ইমার্সনের মত পণ্ডিত ব্যক্তির কথা বুঝিতে মার্কিনবাসীর পঞ্চাশ বছর লাগিয়াছিল, আমার মত অপণ্ডিত ব্যক্তির কথা বুঝিতে আপনাদের একশ বছর লাগিলেও আমি তাতে বিস্মিত হইব না। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমি এখানে মার্কিন জাতির সেই সংগ্রামী উদ্বর্তনের কথাটারই পুনরুল্লেখ করিতেছি।

মার্কিনীরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে ১৭৭৬ সালে। কিন্তু ভাষিক ও সাহিত্যিক স্বাধীনতা লাভ করিতে তাদের আরো দেড়শ বছর লাগিয়াছিল। এ সব ব্যাপারে স্বকীয়তার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেই তাদের প্রায় একশ বছর লাগিয়াছিল। একবার জাতীয় স্তরে সে উপলব্ধি ঘটিয়া গেলে প্রয়োগের স্তরে আর বেশি সময় লাগে না। মার্কিনীদেরও লাগে নাই। মাত্র পঞ্চাশ বছরেই মার্কিন জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইংরাজ জাতির থনে পৃথক স্বতন্ত্র-স্বাধীন-স্বকীয় ব্যক্তিত্ব হাসিল করিয়া ফেলে। উপলব্ধির মুদ্দতটা যেমন ছিল দীর্ঘ, প্রসেসটাও ছিল তেমনি কণ্টকাকীর্ণ। রাজনৈতিক সিভিল ওয়ারের মতই এটাও ছিল কৃষ্টিক-সাহিত্যিক সিভিল ওয়ার। রাজনৈতিক যুদ্ধে জিতার চেয়ে কৃষ্টিক যুদ্ধে জিতা আরো বেশি কঠিন। রাজনীতিক পরাধীনতাটা দৈহিক ও দৃশ্যমান। কিন্তু কৃষ্টিক পরাধীনতাটা মানসিক ও অদৃশ্য। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন অভ্যাসে পরিণত হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ততটা হয় না। কৃষ্টিক-ভাষিক-সাহিত্যিক পরাধীনতাটা যেমন একটা এলিটিমের পোশাকি ভব্যতায় পরিণত হইতে পারে, রাজনৈতিক পরাধীনতা তেমন হইতে পারে না। ফলে রাজনীতিক চেতনার বিস্ফোরণটা যত সহজে গণভিত্তিক হইতে পারে কৃষ্টিক চেতনাটা তেমন গণভিত্তিক হইতে পারে না। এই কারণে আমাদের দেশের বর্তমান লেখক-সাহিত্যিকরা কলিকাতার ভাষা কৃষ্টির মোকাবিলায় যেমন হীনম্মন্যতায় ভুগিতেছেন, পুরা উনিশ শতকের মার্কিন সাহিত্যিকরা তেমনি হীনম্মন্যতায় ভুগিতেছিলেন লন্ডনের ভাষা সাহিত্যের মোকাবিলায়। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা বর্তমানে যেমন আমাদের নিজস্ব ভাষার বাক-রীতি ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে কলিকাতা শান্তিনিকেতনের বাক-রীতির মোকাবিলায় হেয় ভালগার ও অভব্য মনে করেন, ঐ যুগের

মার্কিন লেখক-সাহিত্যিকরাও তেমনি লন্ডন-অক্সফোর্ডের বাক-রীতি ও উচ্চারণ-ভঙ্গির মোকাবিলায় মার্কিনী বাক-রীতি ও উচ্চারণ ভঙ্গিকে ভালগার ও অসভ্য মনে করিতেন।

২. স্বাতন্ত্র-বোধের উন্মেষ

মার্কিনীদের ভাষিক-সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য লাভে দেড়শ বছরের বেশি সময় লাগিলেও দু-চারজন মার্কিনীর মধ্যে সে চৈতন্য-স্ফুরণ ঘটিয়াছিল খুব দ্রুতগতিতেই। এঁদের মধ্যে সকলের আগে নাম করিতে হয় বিশ্ববিখ্যাত ওয়েবস্টারস ডিকশনারির রচয়িতা নোআ ওয়েবস্টারের। যদিও তিনি তাঁর রচিত ডিকশনারি প্রকাশ করেন ১৮২৮ সালে; কিন্তু তাঁর চল্লিশ বছর আগেই ১৭৮৯ সালে তাঁর ইংরাজি ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য 'ডিসার্টেশন অন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ' নামক নিবন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ যুক্তি দিয়া এই উপসংহার টানিয়াছিলেন : কতিপয় অবস্থা-গতিক ভবিষ্যতে ইংরাজি ভাষা হইতে মার্কিন ভাষার পৃথকীকরণ আবশ্যক ও অনিবার্য করিয়া তুলিবে।' এই নিবন্ধ প্রকাশের চল্লিশ বছর পরে ওয়েবস্টার ১৯২৮ সালে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত অভিধান প্রকাশ করেন। এই অভিধানে তিনি ইংরাজি ভাষায় অপ্রচলিত বহু মার্কিন শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেন।

৩. ওয়েবস্টারের দৃঢ়তা

কিন্তু তার আগেই ১৮০৬ সালেই নোআ ওয়েবস্টারের প্রতিবাদে বেশ কিছু মার্কিন সাহিত্যিক কলম ধরেন। তার মধ্যে ডেভিড ব্যাসনে ওয়েবস্টারকে লেখেন : দুর্ভাগ্যবশত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের ভাষার মধ্যে এমন কোনও মিল ও মিলন নাই যাতে একটা ঐক্যবদ্ধ মার্কিন ভাষা হইতে পারে। মার্কিন জাতির নিজস্ব ভাষা সৃষ্টির নব উদ্যমকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার এমন চেষ্টা অনেকে করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও জিলার ভাষিক বৈচিত্র্যকে ঐক্যবদ্ধ 'ঢাকাইয়া বাংলা সৃষ্টির দূরপনেয় প্রতিবন্ধক আখ্যা দিয়া 'কোলকেতেয়ে বাংলাকেই আমাদের সাহিত্যের ভাষা রাখিবার যুক্তি যারা দেন, তাঁদের জুড়ি উনিশ শতকের আমেরিকাতে অনেক ছিলেন। এঁদেরে লক্ষ্য করিয়াই ১৮১৭ সালে জেমস পলভিং লিখিয়াছিলেন : 'এঁদের হাতে মার্কিনী ছাপা কোনও পুস্তক পড়িলেই তার ভাল দিক চাপিয়া গিয়া এঁরা শুধু খারাপ দিকই করিয়া দেখাইয়া থাকেন।'

এ সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নোআ ওয়েবস্টার ১৮২৮ সালে তার বিপ্লব সৃষ্টিকারী ডিকশনারি প্রকাশ করেন। এই সালেই এন্ড্রু জ্যাকসন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। জ্যাকশন ছিলেন গোড়া মার্কিন স্বকীয়তাবাদী। স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও রাষ্ট্র-দার্শনিক তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফার্সন তাঁর জীবন-সায়াহ্নে ১৮২১ সালে লেখেন : ইংরাজি ও মার্কিন কালচার সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের কালচার বিকশিত হইতে পারে কেবলমাত্র আমাদের নিজস্ব ভাষাতেই। এই সময় ইমার্সন তার অসাধারণ সৃজনশীল ও উর্বর কলম লইয়া মার্কিনী স্বকীয়তার পক্ষে মাঠে নামেন। বৃটিশ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেনস মার্কিনী ইংরাজির বিদ্রূপ করিয়া। কতিপয় চরিত্র সৃষ্টি করেন। আর বলেন যে আমেরিকানরা ঐ রূপ অমার্জিত ভালগারিযমকেই ইডিয়ম মনে করে। ১৮৪২ সালের জার্নালে ইমার্সন ডিকেনসের রচনার ও মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন : যদিও আমেরিকানরা বাস্তব জীবনে তাদের কথাবার্তায় অমন ভাষা ব্যবহার করে না, তথাপি মি. ডিকেনস এখান-ওখান হইতে দু-চারটা অমার্জিত শব্দ যোগাড় করিয়া উহাই মার্কিন চরিত্রগুলির মুখে ঢুকাইয়া দিয়া মার্কিনীদের ভাষার ক্যারিকেচার করিয়া থাকেন।

## ৪. দেশি শক্রুতা বনাম বিদেশি শক্রুতা

ইমার্সন-বর্ণিত ঘটনার নজির আমাদের দেশেও আছে। তবে সেটা করেন আমাদের বিখ্যাত পশ্চিম বাংলার লেখকরা না-খোদ আমাদের দেশের ঔপন্যাসিক-নাট্যকাররাই। তাঁদের রচিত নাটক-উপন্যাসের ডায়লগে বাংলাদেশি 'ভদ্রলোক' চরিত্রেরা পশ্চিম-বাংলার সাধু কথ্যভাষাই ব্যবহার করেন (যদিও বাস্তব জীবনে তা ঘটে না)। কিন্তু ঐ সঙ্গে চাকরবাকর, কুলি ও মজুরদের মুখে বাংলাদেশের কথ্যভাষার ব্যবহার করা হয় বিকৃতরূপে ও ভঙ্গিতে যেন শুধু ক্যারিকেচার করিবার উদ্দেশ্যেই।

যা হোক মার্কিনী জনগণের মধ্যে নিজেদের ভাষার প্রতি মমতা ততদিনে বেশ সচেতন ও মুখর হইয়া উঠিলেও নামযাদা শিল্পী-সাহিত্যিকরা তখনও বিলাতী ইংরাজির প্রতি তাঁদের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাদের মধ্যে হেনরি জেমস, কুপার, হথর্ন ও ওয়াশিংটন আর্ভিংসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুপার ও ওয়াশিংটন জনগণের ভয়ে প্রথম-প্রথম ছদ্মনামে লিখিতেন। শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করার পরে নিজ নামে লেখা শুরু করার পরেও তারা বিলাতী ইংরাজিতেই লিখিতেন। সেজন্য তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ইংরাজ ও ঘটনাস্থলগুলি ইংলন্ডের শহর নগর-পল্লী বাছিয়া লইতেন। ঘটনাকালকেও তারা স্বাধীনতা লাভের আগের দিনে লইয়া যাইতেন। এঁরা সকলেই যার-তার সময়ে নামযাদা শিল্পী হইলেও তাঁরা বলিতেন, মার্কিনীদের জীবনে নাটক-নভেলের উপকরণ খুব দুর্লভ।

বাংলাদেশেও এঁদের জুড়ির সংখ্যাই বেশি। আমাদের লেখক সাহিত্যিকদেরও অভিমত মনে হয় এই যে বাঙ্গালদের, বিশেষত মুসলমান বাঙ্গালদের, জীবনে নাটক-নভেলের উপকরণের খুবই অভাব। তাই তাঁদের গল্প-উপন্যাসের ঘটনাস্থলের নাম থাকে না। দেশহীন এই সব চরিত্রের নামগুলি বেশির ভাগ মুসলমান হইলেও তাদের কথাবার্তা আচার-আচরণে তাঁদেরে পশ্চিম-বাংলায় ভদ্রলোক' বলিয়াই মনে হইবে।

ঐ যুগের মার্কিনী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এইরূপ হীনম্মন্যতাকে তাই হুইটম্যান-মার্কটুইন, ফকনার কষিয়া গাল দিয়াছেন। মার্কটুইন সগৌরবে। ঘোষণা করিয়াছেন : আমাদের জনগণের মুখের ভাষাই আসলে শালীন ভাষা। কতিপয় শিক্ষিত লোকের ভাষাই আসল ভাষা নয়। মুষ্টিমেয় ভদ্রলোকের আচার-আচরণই ভদ্রতা নয়। বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর লোকের ভাষাই প্রকৃত জাতীয় ভাষা। এই দিক হইতে মার্কিনী ইংরাজি ও ইংলন্ডের ইংরাজি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুইটা ভাষা। হুইটম্যানও প্রায় একই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : 'ভালগারিযম বলিয়া কিছু নাই। সব জীবন্ত ভাষাই গোড়াতে ভালগার ছিল। জনগণের মুখের তথাকথিত অমার্জিত ভাষা জীবনের প্রয়োজনে সাহিত্যে গৃহীত হয়; তাতেই তা সাহিত্যের ভাষা হইয়া যায়। অবশেষে বৈয়াকরণদের প্রাণহীন শব্দতালিকাতেই সেই সব শব্দ স্থান। পায়। হুইটম্যান তার রচনায় বহুল ব্যবহারে প্রমাণ করিয়াছেন যে কথাকথিত ভালগার শব্দ ও শব্দসমষ্টিই বিপুল প্রাণবন্ত ও জীবন্ত ভাষার প্রকৃত সম্পদ। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখের ভাষার চেয়ে অশিক্ষিত জনতার তথাকথিত অশ্লীল শব্দগুলিই জীবন্ত কাব্য ও সাহিত্যকে প্রাণবন্ত করিয়া থাকে।

৫. দূরদর্শী বিদেশির সদুপদেশ

শুধু দূরদর্শী দেশপ্রেমিক আমেরিকান লেখকরাই নন, ইউরোপীয় কোনও কোনও মনীষীও মার্কিন জাতিকে ভাষা-সাহিত্যে স্বকীয়তা অর্জনের উপদেশ দিয়াছেন। বিখ্যাত ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পণ্ডিত এলেক্সি-ডি-তোকভিল ১৮৩১ সালে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন : আমেরিকান সাহিত্যিকরা নিজেদের দেশে বাস করেন না। তারা মনের দিক হইতে ইংলন্ডে বাস করেন। ইংরাজ সাহিত্যিকরাই আজও আমেরিকান সাহিত্যিকদের মডেল। কিন্তু এটা বেশি দিন চলিবে না। মার্কিনী জনগণের ভাষাই হইবে মার্কিন সাহিত্যের ভাষা। মার্কিন জনগণ ইংলন্ডের ভাষায় নয়, তাদের নিজস্ব ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি চায়। আমেরিকা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সে গণতন্ত্রের সম্যক বিকাশ হইতে পারে মার্কিন জনগণের ভাষাতেই।

প্রায় একশ বছর পরে আরেকজন ফরাসি পণ্ডিত প্রায় একই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অধ্যাপক এ জি সুলেয়ার। তিনি ছিলেন ইয়েল ইউনিভার্সিটির ফরাসি ভাষার অধ্যাপক। ১৯২৯ সালে তিনি ইয়েল রিভিউ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন : মার্কিন সভ্যতা যেদিন ইংরাজি সভ্যতার আবেষ্টনী হইতে মুক্ত হইয়া স্বকীয়তা লাভ করিবে, এবং এটা ঘটিতে আর বেশি বিলম্বও নাই, তখন মার্কিন ভাষা ও ভাষার নিজস্ব জীবনের প্রয়োজনেই, মার্কিন জাতি জাতীয় ভাষার রূপ প্রদানে মার্কিন বাচনভঙ্গিই গ্রহণ করিবে।

এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে সত্যই বেশি সময় লাগে নাই। কারণ ততদিনে মার্কিনবাসীর কৃষ্টিক-ভাষিক ও সাহিত্যিক স্বকীয়তার বাণী খুব জোরদার হইয়া উঠিয়াছে। ইমার্সন, মার্কটুইন, হেনরি ক্যাবটলজ, ফাউলার, জর্জ মেইশ, হুইটম্যান প্রভৃতি উনিশ শতকের শেষার্ধের শক্তিশালী লেখকদের প্রচারের ফলে মার্কিন গণ-মনে ততদিনে শুধু মার্কিন ভাষাপ্রীতি নয়, ইংরাজি বিদ্বেষও জাগ্রত হইয়া গিয়াছে। ভাষা-বিদ্বেষ ক্রমে জাতি-বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমাদের বেলা ঘটি' ও 'বাঙ্গালের মত ইংরাজকে 'জনবুল ও মার্কিনকে 'ব্রাদার জনাথন' বলাও ততদিনে গালিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মার্কিন জাতির নিজস্ব ভাষার পক্ষে জনমত ততদিনে এতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে ১৯২৩ সালে ইলিনিওস অঙ্গরাজ্যের রাজধানী শিকাগোর আইন পরিষদে এই মর্মে একটা বিল পাশ হয় যে ইলিনিওস অঙ্গরাজ্যের সরকারি ভাষা (অফিশিয়াল ল্যাংগুয়েজ) এর নাম ইংরাজি ভাষার বদলে আমেরিকান ভাষা রাখা হউক। এই সময়ে আমেরিকান তরুণ ভাষাবিজ্ঞানী হেনরি লুই মেনকেন (যিনি এর কিছু দিন পরেই আমেরিকান ল্যাংগুয়েজ' এই নামে একটি বিশাল আকারের পুস্তক প্রকাশ করেন) প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন। যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোঘণার দলিলটিকে ইংরাজি হইতে আমেরিকান ভাষায় অনুবাদ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯২৩ সালেই কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে বৃটিশ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালসমূহের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকরা এক সম্মিলনীতে মিলিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংরাজি হইতে স্বতন্ত্র একটি নয়া ভাষা সৃষ্টির আন্দোলনকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়া এই সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই উদ্যোগকে অধ্যাপকরা মার্কিনী বিকট রসিকতা অথবা ঘোরতর অপরাধ (এ ডিপ এ্যামিরিকান জোক অর এ গ্রেট ক্রাইম) বলিয়া আখ্যায়িত করেন। ঐ সম্মিলনীতে কলাম্বিয়া সুট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হেনরি ভ্যান ডাইক ও মিশিগান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ফ্রেড নিউটন স্কট হেনরি লুই মেনকেনের উদ্যোগকে মানবতা ও সভ্যতা-বিরোধী জংলি অপরাধ

বলেন এবং তাঁকে পশমের চট পরাইয়া শাস্তি দিবার প্রস্তাব করেন। এঁরা মার্কিনবাদের তীব্র নিন্দা করেন এবং ইংরাজি ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য কঠোরভাবে ব্যাকরণের নিয়মাদি পালনের নির্দেশ জারি করেন।

কিন্তু ততদিনে মার্কিন জাতির স্বকীয়তার দাবি ও উন্মাদনা দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে। ইমার্সনের স্বকীয়তা বাণীতে উদ্বুদ্ধ, মিস জারট্রড স্টেইন, এযরা পাউন্ড ও টি এস ইলিয়টের কৃষ্টি-সাহিত্যিক নবজাগরণের বাণী ততদিনে মার্কিন জাতির মধ্যে কৃষ্টি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কায়যারের হাতে মার-খাওয়া ইংরাজ জাতিকে বিপন্মুক্ত করার দায়িত্ব পালনে আগাইয়া আসেন যে প্রেসিডেন্ট উড্র উইলসন, তিনিও নীতিতে ইংরাজি ভাষার পবিত্রতা রক্ষার পক্ষপাতী হইয়াও ততদিনে 'বিশুদ্ধ ইংরাজি' শব্দের মাঝে-মাঝে 'অশালীন ও অমার্জিত মার্কিনী' শব্দও ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। এতে ইংলন্ডের ভাষিক কায়েমি স্বার্থবাদীরা এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে স্যার সিডনি বেপা প্রস্তাব দিয়াছিলেন যে মার্কিনী ছাত্রদের ইংরাজ অধ্যাপকদের নিকট ইংরাজি পড়িতে বাধ্য করা উচিৎ।

৬. উপলব্ধির বাস্তবায়ন

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মার্কিন জাতির কৃষ্টিক-ভাষিক স্বকীয়তা লাভের আন্দোলন সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রচারমাধ্যম রেডিও-সিনেমায় হামলা চালাইল। হলিউডের সিনেমা পরিচালক-প্রযোজকরা ইংরাজি সিনেমার নাম বদলাইয়া মার্কিনী নাম রাখিলেন মুভি। মুভির এ্যাকটার-একট্রেসরা বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ করিবার জন্য বিলাত হইতে প্রশিক্ষক আমদানি করা ছাড়িয়া দিলেন। কলাম্বিয়া, ন্যাশনাল ও আমেরিকান নামক তিনটা ব্রডকাসটিং কোম্পানিই তাদের সংবাদপাঠক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য ওয়েস্ট এন্ড-অক্সনিয়ার ইংরাজি উচ্চারণ প্রশিক্ষণের বিশেষ স্কুলগুলি উঠাইয়া দিলেন। মার্কিনীরা মার্কিনী ইংরাজি মার্কিন উচ্চারণ-ভঙ্গিতেই বলিতে লাগিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অর্থনৈতিক নিউডিলের উদ্দীপনা মার্কিন জাতিকে ভাষিক নিউডিলেও উদ্দীপিত করিয়া ফেলিল। ইংলন্ডের ভাষিক কায়েমি স্বার্থীরা, মানে শিক্ষক-লেখক ও পুস্তক-প্রকাশকরা, সবাই আগে হইতেই বিপদ গনিতেছিলেন। ১৯২৭ সালে এঁদের সমবেত উদ্যোগে লন্ডনে ইংরাজি ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মিলনীর অধিবেশন করিলেন। প্রধানত মার্কিন সাহিত্যিকদের উৎসাহ-উদ্যোগেই এই সম্মিলনী হইয়াছিল। কারণ মার্কিন মুল্লুকের সাহিত্যিক সনাতনীরা খোদ ইংলন্ডের সাহিত্যিকদের চেয়েও বেশি ইংরাজিপ্রীতি দেখাইতেছিলেন। এটা স্বাভাবিকও। আমাদের দেশের বাঙ্গাল' কবি-সাহিত্যিকদের পশ্চিম বাংলাভাষা প্রীতি পশ্চিম বাঙ্গালীদের চেয়েও বেশি। যা হোক লন্ডনের এই আন্তর্জাতিক সম্মিলনীতে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ইংরাজি ভাষার পবিত্র কুয়া অপবিত্রকরণের মার্কিনী (ডিফাইলিং পিওর অয়েল অব ইংলিশ বাই দি আমেরিকানস) অপচেষ্টা যে কোনও উপায়ে ঠেকাইতে হইবে। নিউ স্টেটসম্যান এ সম্পর্কে ১৯২৭ সালের ২৫ জুনের সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছিল : আমরা আমাদের মাতৃভাষা ইংরাজি সম্পর্কে আমেরিকানদের সাথে আলোচনায় বসিব না? কারণ ইংরাজি ভাষাকে যারা প্রাণ দিয়া ভালবাসে, তাদের মোকাবিলা আমেরিকানরাই সর্বাপেক্ষা ঘোরতর শত্রু। ঐ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া বিখ্যাত ব্যঙ্গ পত্রিকা পাঞ্চ সম্পাদকীয় লেখেন : ইংরাজি ভাষায় কুয়া পবিত্র রাখিতে হইলে আমেরিকানরা যাতে ঐ কুয়ায় কাদা না ফেলিতে পারে তার বিধান করিতে হইবে। ইয়াংকিরা যে ভাষায় কথা বলে, তাকে শুধু

কাদা-মাটি বলিলেও ঠিক হইবে না। তারা কথা ত বলে না, দস্তুরমত থুথু ফেলে। অতএব তাদের ভাষা আসলে শাব্দিক নিষ্ঠীবন মাত্র।'

এ সব স্পষ্টতই রাগের কথা; কটুক্তি ও গালাগালি। লোক রাগ করে যখন তাদের আর কোনও উপায় থাকে না। গাল দেয় যখন যুক্তি থাকে না। ১৭৭৬ সালে মার্কিনীদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঠেকাইবার জন্য ইংলন্ড অস্ত্র ধরিয়াছিল। দেড়শ বছর পরে তাদের ভাষিক-সাহিত্যিক স্বাধীনতা ঠেকাইবার কাজে অস্ত্রের বদলে ইংরাজরা জিভ ও কলম ধরিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্টিক-ভাষিক স্বকীয়তার বাসনা রাজনৈতিক স্বরাজের বাসনার চেয়ে কম শক্তিশালী নয়।

৭. জনগণের জয়

ইংরাজরা নাহক ভয় পাইয়াছিল। না বুঝিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ভ্রান্ত ধারণায় মার্কিনীদের ভাষিক-কৃষ্টিক স্বকীয়তায় বাধা দিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াও মার্কিনীরা আজও ইংরাজের সাথে একই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী হইয়াই আছে। ভাষিক-সাহিত্যিক স্বকীয়তা হাসিল করিয়াও আজও তারা ইংরাজি ভাষা গোষ্ঠীর সদস্যই আছে। মিসেস জারট্রুডস্টেইনের ভাষায় মার্কিনবাসী ইংরাজি ভাষা ও তার হরফ কিছুই ছাড়ে নাই। শুধু ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে মার্কিনী শব্দ ও বাচনভঙ্গি আমদানি করিয়া ঐ সাহিত্যে মার্কিনী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাই অতবড় বিশ্বশক্তি হইয়াও বৃটিশ সরকার প্রায় নিরস্ত্র মার্কিনীদেরে হারাইতে পারে নাই। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য অতবড় বিশ্ব সাহিত্য হইয়াও কয়েদির বুলি' ও অশালীন শাব্দিক নিষ্ঠীবন'কে ইংরাজি সাহিত্যের পবিত্র হেঁসেল হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই। এইভাবে ভাষা সাহিত্যের লড়াই-এ শেকসপিয়ার-স্কট-মিলটনের উত্তরাধিকারী জন বুল ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্যহীন ব্রাদার জনথনের কাছে হারিয়া গিয়াছিল। ইতিহাসের তাকিদেই তেমনি বঙ্কিম, মাইকেল-রবীন্দ্রের উত্তরাধিকারী ভদ্রলোকেরা ভাষা-ঐতিহ্যহীন' বাঙ্গালদের কাছে একদিন হারিয়া যাইবেন। কারণ বাঙ্গালরা বাংলাভাষা ও হরফ ছাড়িতে চায় না। তারা বাংলা সাহিত্যে বাংলাদেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় মাত্র।

উপরে আমেরিকাবাসীর ভাষিক স্বকীয়তার সংগ্রামের অতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল। এতে পাঠক নিশ্চয়ই দেখিতেছেন, মার্কিনীদের ভাষিক স্বকীয়তার সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল এইজন্য যে সংগ্রামটা ছিল কঠিন। সংগ্রামটা কঠিন ছিল এই জন্য যে সংগ্রামের অভীষ্টটা জনগণের নিকট সুস্পষ্ট ছিল না। সুস্পষ্ট ছিল না এই জন্য যে মার্কিনী ও ইংরাজরা ধর্ম-সমাজ কৃষ্টি ও ঐতিহ্যে মূলত একই ছিল। এই দিক হইতে কৃষ্টি-সাহিত্যের ব্যাপারে মার্কিনীদের স্বাতন্ত্র-স্বকীয়তা অপরিহার্য ছিল না। এই অপরিহার্যতা সৃষ্টি হইয়াছিল তাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন বিষয়ী তাকিদ; সুতরাং মস্তিষ্কের ব্যাপার। পক্ষান্তরে সৃষ্টি-ঐতিহ্যের তাকিদটা তাদের আবেগের তাকিদ; সুতরাং হৃদয়ের ব্যাপার। কৃষ্টিক-ভাষিক সাহিত্যিক স্বকীয়তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় আর্থিক স্বকীয়তার রক্ষা বিকাশ ও বিস্তৃতি অসম্ভব। এ সত্য উপলব্ধি করার পরই কেবল এটা তাদের আবেগের মানে হৃদয়ের ব্যাপারে উন্নত হইল। এটা ঘটিতেই তাদের সময় লাগিয়াছিল।

আমাদের বেলা এত দীর্ঘ সময় লাগিবার কোনও হেতু বা কারণ নাই। রাষ্ট্রীয় সত্তার সঙ্গে আমরা ধর্ম-সমাজ-কৃষ্টি-ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সকল ব্যাপার ও স্তরে আমরা স্বতন্ত্র। ভাষিক-সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র ছাড়া বাংলাদেশ তার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে। এই কারণেই মার্কিন পক্ষের

আমার ভাষাবাদের উৎস। মার্কিনীদের জাতীয় ভাষা সাহিত্য বিকাশে নোআ ওয়েবস্টারের আমেরিকান ইংলিশ ডিকশনারি যে অবদান রাখিয়াছিল, বাংলাদেশের ভাষা-সাহিত্য বিকাশে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-সম্পাদিত পূর্ব পাকিস্তানি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান-এর অবদান হইবে ঠিক তাই। ১৯৬৫ সালে ড. শহীদুল্লাহ ঐ অভিধান বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া কেউ নিরাশ হইবেন না। মনে রাখিবেন, ওয়েবস্টার তার অভিধান বাহির করিয়া ছিলেন ১৮২৮ সালে। আর আমেরিকার ভাষার সাহিত্যের মার্কিনী রূপায়ণ চূড়ান্ত হইয়াছিল একশ বছর পরে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে।

# ১৭. সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি

## **ষষ্ঠ খণ্ড**

## সাংবাদিক জীবন

## অধ্যায় সতের – সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি

### ১. এক ঢিলে দুই পাখি

সাংবাদিক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার ছেলেবেলা ছিল না। যেটা ছিল, সেটা সাহিত্যিক হওয়ার সাধ। আসলে সাহিত্যিক-সাংবাদিক যে দুইটা আলাদা বস্তু, সে জ্ঞানই তখন আমার ছিল না। সাহিত্যিক যারা তারাই খবরের কাগজও চালান, এটাই ছিল আমার ধারণা। সাহিত্যিক হওয়ার চেষ্টা ত আমি করিতেছিই। খ্যাতনামা লেখকদের বই-পুস্তক পড়িতেছি। নিজে কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প লিখিতেছি। আর খবরের কাগজ শুধু পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। খবরের কাগজ বাহির করার জ্ঞান ছাপার কৌশল দেখা পর্যন্ত। স্কুল-জীবনে ময়মনসিংহ শহর হইতে প্রকাশিত একমাত্র সাপ্তাহিক চারু-মিহির ছাপা হইতে দেখিয়াছি। বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু আকৃষ্ট হই নাই। কারণ লেখা সম্পাদনের কাজটা কারা করেন, কোথায় করেন, তা দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। সাংবাদিক হওয়ার সাধ জন্মানোর জন্য ঐটুকু অভিজ্ঞতা যথেষ্ট নয়। তার উপর, ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিবিধ প্রবন্ধে’, নবীন লেখকদের প্রতি উপদেশ’ পড়িয়াছিলাম। তাতে তিনি নবীন লেখকদের উপদেশ দিয়াছেন : ‘যদি প্রকৃত সাহিত্যিক হইতে চাও, তবে সাময়িক পত্রিকায় লিখিও না। সাহিত্যিক হওয়ার বাসনাটা প্রবল থাকায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশটা মানিয়া চলার একটা অস্পষ্ট সংকল্প আমার নিশ্চয়ই হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ উপদেশাবলিতে আরো একটা উপদেশ ছিল এই : যা লিখিবে তাই ছাপাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। তার এ উপদেশটা মানিতে পারি নাই। আল এসলাম নামক মাসিকে প্রবন্ধ ও সওগাত-এ গল্প লিখিতে শুরু করি। বঙ্গ দর্শন-এর সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই মাসিক কাগজকে সাময়িক পত্রিকা বলেন নাই। তিনি সাপ্তাহিক দৈনিক খবরের কাগজই মিন করিয়াছেন। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ অমান্য করার দরকার হইল না।

কিন্তু শিক্ষাজীবন শেষ করিয়াই বুঝিলাম, রোযগারের জন্য চাকরি করিতেই হইবে। রোযগারের জন্য চাকরি ও সাহিত্য সেবার মত এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায় শুধু খবরের কাগজেই। খবরের কাগজের কেন্দ্র কলিকাতা। কাজেই একদিন এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা গেলাম।

### ২. ‘ছোলতান’

আমার সাংবাদিক জীবন শুরু হয় ১৯২৩ সালে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তখন মুসলিম জগত নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদক। খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ সাহেবের ছোট ভাই মখদুমী লাইব্রেরির পরিচালক মো. মোবারক আলী সাহেব। (পরে খান বাহাদুর) এই কাগজের মালিক। আমি একটা কিছু চাকরি জোগাড়ের মতলবেই কলিকাতা গিয়াছিলাম। সাংবাদিকতার দাবি সবার আগে। চা-

নাশতা হইতে খাওয়া-থাকা সবই শামসুদ্দীনের ঘাড়ে। কাজেই তার সম্পাদকতায় যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য মনে করিলাম। এই কর্তব্যই শেষ পর্যন্ত সুযোগে পরিণত হইল। আস্তে আস্তে ছোট-ছোট সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে বড় প্রবন্ধ লিখিতে শুরু করিলাম। এরই মধ্যে ছহি বড় তৈয়ব নামা নামে পুঁথির ভাষায় একটি রাজনৈতিক প্যারডি স্যাটারার ও সভ্যতায় দ্বৈতশাসন' নামক একটি দীর্ঘ দার্শনিক রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখি। তাতে মুসলিম সাংবাদিকদের নজরে পড়ি। কতকটা এই কারণে, কতকটা আবুল কালামের চেষ্টায় আমি ত্রিশ টাকা বেতনে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেবের ছোলতান-এ সহ সম্পাদকের চাকুরি পাই।

ছোলতান-এ আমি প্রায় দেড় বছর কাজ করি। মাওলানা ইসলামাবাদী সাহেবের স্নেহ ও প্রশংসা অর্জন করি। তিনি আমার বেতন ত্রিশ টাকা হইতে চল্লিশ টাকা করিয়া দেন এবং বলেন সাধ্য থাকিলে আরো বেশি দিতেন। ছোলতান-এ কিছু দিন কাজ করিয়াই জানিতে পারি, মৌ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবও ছোলতান-এর একজন মালিক। তাঁর সাথেও পরিচয় হয়। তিনি আমার লেখার উদ্দীপনা ও ভাষার তেজস্বিতার বহুৎ প্রশংসা করেন। মওলানা সাহেব কিন্তু আমার লেখার তেজস্বিতার চেয়ে যুক্তিবত্তা ও বিষয়বস্তুর প্রশংসা করেন বেশি। যা হোক দুই মুনিবের মন রাখার চেষ্টায় আমার ভালই হইল। আমার লেখায় ওজস্বিতা ও যুক্তিপূর্ণতা সমানভাবে উন্নতি লাভ করিল। আমি মওলানা সাহেবের স্নেহ ও আস্থাভাজন হইয়া বেশ সুখেই দেড় বছর ছোলতান-এ কাটাইলাম। ১৯২৪ সালের জুন-জুলাই মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্ব ও মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মিলনী হয়। এই কনফারেন্স উপলক্ষে আমি মওলানা আকরম খাঁ সাহেবেরও আস্থা অর্জন করি। তিনি ছোলতান-এ আমার লেখায় আগেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেই সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের পর পরই তিনি মওলানা ইসলামাবাদী সাহেবের নিকট চাহিয়া নিয়া আমাকে তার সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে চাকুরি দেন। চল্লিশ টাকার জায়গায় পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেছি দেখিয়া মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব সম্মতি দেন।

### ৩. 'মোহাম্মদী'

মোহাম্মদীতেও আমি দেড় বছরের বেশি কাজ করি। এই সময় জনাব ফজলুল হক সেলবর্সী ও জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীও মোহাম্মদীতে কাজ করিতেন। আমি উনাদের জুনিয়র হইলাম। কাজেই সব সিনিয়রের মতই এই দুই বন্ধুও আমাকে দিয়া প্রায় সব কাজ করাইয়া নিতেন। তারা যথাসম্ভব কম লিখিতেন। এতে আমি অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হইতাম না। বরঞ্চ এটাকে আমি তাদের অনুগ্রহ মনে করিতাম। সারা দিন ভূতের মত খাঁটিতাম। সাপ্তাহিক কাগজে প্রতি সপ্তাহে দুইটা করিয়া সম্পাদকীয়তে মাসে আটটা হইত। কোনও কোনও মাসে পাঁচ-ছয়টাই আমি লিখিতাম। সেলবর্দী সাহেবের লেখা ছিল হৃদয়স্পর্শী উচ্ছ্বাস; তিনি যুক্তিতর্কের ধারে-কাছেই যাইতেন না। পক্ষান্তরে ওয়াজেদ আলী সাহেবের লেখা ছিল যুক্তিপূর্ণ। তিনি উচ্ছ্বাসের ধারে-কাছে যাইতেন না। আমি দুইটাতেই দক্ষ ছিলাম। রক্তচক্ষু', 'বজ্রমুষ্টি ইত্যাদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উদ্দীপক হেডিং দিয়া আমি একাধারে ওজস্বিতা ও যুক্তিপূর্ণ বহু সম্পাদকীয় লিখিয়া সাংবাদিক মহলে নাম ও মওলানা আকবর খাঁ সাহেবের প্রশংসা অর্জন করিলাম। স্বয়ং মওলানা আকরম খাঁ সাহেবেই বলিতেন আমার লেখার মধ্যে সেলবর্সী সাহেবের উচ্ছ্বাস ও ওয়াজেদ আলী সাহেবের যৌক্তিকতা

দুইটারই সমন্বয় হইয়াছে। বস্তুত 'রক্তচক্ষু', বজ্রমুষ্টি', 'সিংহ নিনাদ' ইত্যাদির মত উদ্দীপনাময়ী অনেক লেখা

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' রিডিং রুমে একজন আবৃত্তির ভঙ্গিতে পড়িতেন, আর সকলে শুনিতেন। একই প্রবন্ধ এমনিভাবে একাধিকবার পড়া হইত। এটা ত গেল সম্পাদকীয় লেখার দিক। একটা সংবাদপত্র, তা সাপ্তাহিকই হউক, আর দৈনিকই হউক, সম্পাদনায় সম্পাদকীয় লেখা ছাড়াও আরো অনেক দিক আছে। দেশি-বিদেশি সংবাদ ছাপা, সেসব সংবাদের হেডিং দেওয়া, পাঠকদের চিঠিপত্র ছাপা, মফস্বলের অভাব-অভিযোগ ও সভা-সমিতির রিপোর্ট ছাপা, সর্বোপরি কাগজটির সার্বিক ও সামগ্রিক গেট আপ ও মেক-আপের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য প্রকাশিত সংবাদসমূহের স্থান নির্ণয়-নির্দেশ করা এবং ঠিকমত এসব কাজ হইতেছে কিনা, শেষ পর্যন্ত তা নিরীক্ষণ ও তসদিক করার জন্য কম্পোযিটার ও মেশিনম্যানদের সঙ্গে সঙ্গে থাকা এবং সবশেষে এ সবের মোটামুটি প্রুফ দেখিয়া দেওয়া খুবই দায়িত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য কাজ। বড়-বড় কাগজে এবং দৈনিক কাগজ মাত্রই এ সব কাজ করিবার জন্য বিভাগীয় সাব-এডিটর আগেও ছিলেন। এখন ত আরো বেশি। কিন্তু একটি সাপ্তাহিকের জন্য তৎকালে এত সব ব্যবস্থা ছিল না। সাধ্যও ছিল না। দরকারও ছিল না। কাজেই সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর বেলা এ সবই আমাদেরই করিতে হইত। আমাদের মানে তৎকালে আমরা ঐ তিনজন। ওঁরা দুইজনই আমার সিনিয়র। তাঁদের ছিল যেমন সিনিয়রের বোঝা জুনিয়রের কাঁধে ঢালিয়া দেবার অধিকার ও অভিপ্রায়, আমারও ছিল তেমনি 'বড় বোঝা' বহিবার জন্য কাঁধ পাতিয়া দিবার আগ্রহ। জ্ঞানী সিনিয়ররা যেমন অজ্ঞ জুনিয়রদেরে 'ছেলে-ভুলানো' তারিফ করিয়া কাজ আদায় করিয়া থাকেন, আমার বেলা তা ঘটে নাই, তা বলিতে পারি না। তবে আমি তা বুঝি নাই। বুঝিবার দরকারও হয় নাই, তা বলিতে পারি না। কারণ আমার পরবর্তী সাংবাদিক জীবনে জুনিয়র-স্তরের এই খাটুনি খুবই কাজে লাগিয়াছিল।

যা হোক সিনিয়রদের স্নেহ ও আস্থার ফলে সম্পাদনার উপরোল্লিখিত সব দায়িত্ব ও কর্তব্যই আমার ঘাড়ে বর্তাইত। আমিও ঘাড় পাতিয়া সানন্দেই সব গ্রহণ করিতাম। তারা স্বেচ্ছায় যা দিতেন তার বেশি চাহিয়া নিতাম।

এ সব কাজের মধ্যে সকলের আগে সংবাদে 'কপি' তৈয়ার করা। এটা দৃশ্যত ছিল খুবই সহজ কাজ। প্রতিদিন সকালেই বাংলা দৈনিক কাগজগুলি পাইতাম। সে সব কাগজ হইতে বাছাই-করা সংবাদগুলি কেঁচি-কাটা করিলেই সাপ্তাহিকের কপি হইয়া যাইত। কিন্তু শুনিতে এটা যেমন সহজ মনে হয়, আসলে কাজটা তত সহজ নয়। দৈনিকে প্রকাশিত সব খবর সাপ্তাহিক কাগজে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাতে সর্ব সংবাদই যে সাপ্তাহিকে দেওয়া হইত না, তা-ও নয়। বাছাই-করা সংবাদগুলিই ছোট করিতে হইত। বড়-বড় লেখাকে ছোট করিবার জন্য স্কুল-কলেজে সামারি লিখিবার যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম, তা এখানে কাজে লাগিত না। সামারি করিলে আবার নিজের হাতে নিজের ভাষায় লিখিতে হয়। তাই সাংবাদিকরা বড় বড় লেখাকে ছোট করিবার নূতন কায়দা আবিষ্কার করিয়াছেন। গোটা রিপোর্টটা পড়িয়া তার দরকারি অংশগুলি কেঁচি-কাটা করিয়া সেই কাটা অংশগুলি অন্য সাদা কাগজে পেস্ট করিয়া দেওয়া হইত। এই উদ্দেশ্যে সাদা কাগজের পাশে ছোট ও দীঘে লম্বা করিয়া প্যাড বানান হইত। এই প্যাডে কাটা টুকরাগুলি আঠা দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইত। এতেও দক্ষতা লাগিত। কারণ এমন কাটা বিভিন্ন টুকরার মধ্যে সংগতি ও

ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কেঁচি-কাটা অংশগুলির ফাঁকে-ফাঁকে কিছু-কিছু কথা ভরিয়া দিতে হইত। এটা হাতের লেখাতেই করা হইত। তা ছাড়া, আরো একটা খুব বড় অথচ ছোট কাজও করিতে হইত। কলিকাতার সবগুলি বাংলা দৈনিক কাগজই ছিল হিন্দুদের সম্পাদিত ও পরিচালিত। কাজেই তাদের বাংলা ভাষাকেও আমাদের কিছুটা মুসলমানি করিয়া লইতে হইত। এই ধরুন, জলকে 'পানি', 'ঈশ্বরকে' 'আল্লাহ', ভগবানকে 'খোদা', 'পিসা'কে 'ফুফা, 'খোঁড়া'কে 'চাচা' করিতে হইত। এটা করিতে হইত এই জন্য যে হিন্দু লেখক-সাংবাদিকরা শুধু হিন্দু ব্যক্তিদের মুখ দিয়াই নয় মুসলমান ব্যক্তিদের মুখেও ঐ সব শব্দ ঢুকাইয়া দিতেন। এমনকি মুসলমান মৃত ব্যক্তিকেও 'কাফন-দাফন' না করাইয়া 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করাইতেন। ঈদের জামাতে মওলানা সাহেবদের দিয়া এমামতি' না করাইয়া 'পৌরাহিত্য' করাইতেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন যুগের এটা ছিল সেই মুদ্দত যখন বাংলা সাহিত্যের হিন্দু মহারথীদের লেখা নাটক-নভেলে ও মঞ্চে পাঠান-মোগল বাদশা বেগম ও শাহযাদা-শাহযাদীরা পরস্পকে 'পিসা-পিসি', 'খোঁড়া'-'খোড়ী' সম্বোধন করিতেন। কাজেই মুসলমান পাঠকদের জন্য সাপ্তাহিক চালাইতে গিয়া ঐ সব ভাষিক সংশোধন আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। এ সব কাজকে সাব-এডিটিং বলা হইত।

সম্পাদকের নামে লিখিত চিঠি-পত্রও সংশোধন করা দরকার হইত। এই সব চিঠি-পত্র সাধারণত দুই প্রকারের হইত। এক শ্রেণীর চিঠি-পত্র স্থানীয় অভাব-অভিযোগ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পোল মেরামত, স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপন, পানির ব্যবস্থার অভাব এই সব অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবিই সাধারণত এই শ্রেণীর চিঠি-পত্রের বিষয়বস্তু ছিল। কাজেই এক-আধটু ভাষা সংশোধন ছাড়া এসব পত্রে আর কিছু করা দরকার হইত না।

অপর শ্রেণীর চিঠিপত্র ছিল বাদ-প্রতিবাদের মত তর্কিত বিষয়। কোনও প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ। কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ কাজের অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি। এ ধরনের চিঠিপত্র খুব সাবধানে 'সম্পাদন মানে সংশোধন করিতে হইত। এ ধরনের পত্রে সাধারণ সত্য-মিথ্যার আশঙ্কা ছাড়াও মানহানি' এমনকি রাষ্ট্রদ্রোহিতার' রিস্ক থাকিতে পারিত। কাজেই এ ধরনের পত্রের সম্পাদনায় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক হইত।

সব লেখকদেরই, বিশেষত সাংবাদিকদের, প্রুফ রিডিং জানা অত্যাবশ্যক, এমনকি অপরিহার্য। অবশ্য সব সংবাদপত্রে, সব ছাপাখানাতেও, প্রুফরিডার নামে এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ থাকেন। প্রুফ রিডিংয়ের কাজ এঁরাই করিয়া থাকেন। কিন্তু সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক (এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর), সহ-সম্পাদক (সাব-এডিটর) সবারই প্রুফ রিডিং জানা দরকার। এঁদের মধ্যে অনেকে আমাদের সময়েও ছিলেন, আজকালও আছেন, যাঁরা প্রুফ রিডিংয়ে তেমন মনোযোগ দেন না। ওটা তাদের ডিউটি নয় বলিয়া। কিন্তু আমার মতিগতি ছিল অন্য রকম। প্রুফ দেখা আমার একটা বাতিক ছিল বলা চলে। মোহাম্মদীতে এ বিষয়ে আমার মডেল ও শিক্ষাদাতা ছিলেন ওয়াজেদ আলী সাহেব। তারও প্রুফ দেখার নেশা ছিল। ছিলেনও তিনি প্রুফ দেখার উস্তাদ। অবশ্য মোহাম্মদীতে আসার আগেই, ছোলতান-এ কাজ করার সময় হইতেই প্রুফ দেখার কাজে আমি বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। ছোলতান-এর ম্যানেজারই বলুন, মওলানা মনিরুজ্জামান। ইসলামাবাদী সাহেবের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি বা প্রাইভেট সেক্রেটারিই বলুন, আর ছোলতান-এর প্রধান সাব-এডিটরই বলুন, মৌ. আলী আহমদ ওলী ইসলামাবাদী সাহেব ছিলেন মিষ্টভাষী সদালাপী,

সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ একজন করিতকর্মা লোক। উপরে সাপ্তাহিক কাগজের সহ-সম্পাদকের যেসব। দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে, তার সবগুলি সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করি আমি জনাব আলী আহমদ ওলী সাহেবের নিকট হইতেই। তাঁর সাহচর্যে ছোলতান-এর দেড় বছর স্থায়ী চাকুরিজীবনে সাপ্তাহিক সম্পাদনার অনেক কাজই শিখিয়াছিলাম।

কিন্তু এ সব শিক্ষাই আরো পাকা হইয়াছিল মোহাম্মদীর চাকুরিজীবনে। কাগজও বড় ছিল, প্রচারও বেশি ছিল। কাজেই দায়িত্ব অনেক বড় ছিল। শিক্ষকও পাইয়াছিলাম ওয়াজেদ আলী সাহেবের মত অভিজ্ঞ ও প্রতিভাবান লেখককে। অন্যান্য দিকের মত প্রুফ রিডিংয়েও তিনি আমাকে অনেক শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। প্রুফ দেখা শুধু টেকনিক্যাল জ্ঞান লাভ নয়, এটা যে একটা বিশেষ আর্ট, জ্ঞানের চেয়ে দক্ষতা ও নিপুণতা যে এ কাজে অধিক আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাকে দান করেন ওয়াজেদ আলী সাহেবই। পরবর্তীকালে দি মুসলমান-এ যোগ দিয়া আমার রাজনৈতিক ও সাংবাদিক গুরু শ্রদ্ধেয় মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেবের নিকট বিশেষ করিয়া প্রুফ রিডিংয়ে বিশেষ তালিম পাইয়াছিলাম। সে কথা পরে যথাস্থানে লিখিব। মোহাম্মদীতে দেড় বছর কাল খুব সুখে ও উৎসাহেই কাজ করিবার পর ১৯২৬ সালের প্রথমেই বিনামেঘে বজ্রপাতের মত আমার চাকুরি গেল। আমি ইচ্ছা করিয়া এই চাকুরি ছাড়ি নাই। আমাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। ঘটনাটাও এমন বিশেষ কিছু নয়। ১৯২৫ সালের শেষ দিকে মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী সত্যাগ্রহী নামে একটি সাপ্তাহিক বাহির করেন। মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী দুই ভাই-এর সাথে আমি মোহাম্মদী আফিসেই পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হই। একই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতের লোক বলিয়া এই দুই ভাই-এর সাথে মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের খুবই মাখামাখি ছিল। কাজেই মওলানা কাফী সাহেব সত্যাগ্রহী বাহির করিলে আমি তাঁর আফিসে ঘন ঘন যাতায়াত করিতাম এবং দরকার হইলে লেখাটেখা দিয়া সাহায্যও করিতাম। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব এই খবর পাইয়া মনে-মনে রুষ্ট হইলেন। কিন্তু আমাকে কিছু বলিলেন না। মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি বহু ব্যাপারে খুবই উদার চিন্তানায়ক হওয়া সত্ত্বেও একটা ছোটখাটো দুর্বলতা তাঁর ছিল। মুরুব্বির নিন্দা করিতে নাই। কিন্তু না বলিয়া উপায়ও নাই। কোনও মুসলমান নূতন বাংলা কাগজ বাহির করিলেই তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন, এটা তাঁর বরাবরের দুর্বলতা। হয়ত তার সংগত কারণও ছিল। তিনি খুব সম্ভব মনে করিতেন, নূতন কাগজ বাহির হওয়ায় তাঁর কাগজের অনিষ্ট হইবে। এটা ভাবা নিতান্ত অস্বাভাবিক ছিল না। তৎকালে মুসলমানের পক্ষে সংবাদপত্র বাহির করা এবং চালান খুবই কঠিন ছিল। গ্রাহক-পাঠক সংখ্যাও খুব মুষ্টিমেয় ছিল। বোধ হয় সেইজন্যই মওলানা আকরম খাঁ মনে করিতেন, এই নূতন কাগজটা শেষ পর্যন্ত টিকিবে না; মাঝখান হইতে তাঁর নিজের কষ্টের চালু করা মোহাম্মদীর গ্রাহক কমাইয়া এবং তাতে আর্থিক ক্ষতি করিয়া যাইবে। কাজেই নূতন কাগজ বাহির করাই অন্যায় এবং প্রকারান্তরে মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের কাগজের দুশমনি। এই মনোভাব হইতেই মওলানা আকরম খাঁ সাহেব সত্যাগ্রহী বাহির করার দরুন কাফী সাহেবের উপরও নাখোশ ছিলেন। আমি তাঁরই বেতনভোগী কর্মচারী হইয়া তাঁর দুশমনের সাহায্য করিতেছি, এটাকে হয়ত তিনি ঘোরতর অন্যায় মনে করিলেন। কিন্তু আমাকে তিনি হুঁশিয়ার করিলেন না। কথাবার্তায় বা আভাসে-ইঙ্গিতে বাধাও দিলেন না। দিলে আমি কিছুতেই ও-কাজ করিতাম না। কারণ মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের বা মোহাম্মদীর অনিষ্ট করার ইচ্ছাও আমার ছিল না; পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরি ছাড়িবার সংগতিও আমার ছিল না। বরঞ্চ এই পঞ্চাশ

টাকা বেতনের চাকুরির উপর ভরসা করিয়া মাত্র অল্পদিন আগে বাপ-মার বহুদিনের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছি এবং বিয়ার দিন তারিখও ঠিক হইয়া গিয়াছে।

এমন সময় মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের বড় ছেলে এবং মোহাম্মদীর ম্যানেজার মৌ, খায়রুল আলম সাহেব আমাকে হঠাৎ একদিন জানাইলেন, পরদিন হইতেই আমার চাকুরি নাই। কেন নাই, কী আমার অপরাধ, কিছু বলিলেন না। আমি আসমান হইতে পড়িলাম। চোখে অন্ধকার দেখিলাম। আমি অতি বিনীতভাবে কারণ জানিতে চাইলাম। যা বলা হইল, তার সারমর্ম এই যে, মোহাম্মদীতে আর আমার মন নাই। যেখানে মন আছে সেই সত্যাগ্রহীতেই আমার যাওয়া উচিৎ। ততক্ষণে বুঝিলাম আমার অপরাধ কী? এও বুঝিলাম যে হাজার অন্ধকার দেখিয়াও কোনও লাভ নাই।

৪. 'দি মুসলমান'

মওলানা কাফী সাহেব শুনিয়া মর্মাহত হইলেন। তিনি সব বুঝিলেন। আমাকে বলিলেনও। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা মাহিয়ানা দিয়া আমাকে রাখিবার তাঁর সংগতি নাই বলিয়া আফসোসও করিলেন; তবে এও বলিলেন, কিছু একটা করিতেই হইবে। কিছু-একটা তিনি নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন। কারণ দুই-একদিন পরেই মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং পঁয়ষট্টি টাকা বেতনের দি মুসলমান-এ চাকুরি দিতে চাহিলেন, কথা-বার্তায় বুঝিলাম মওলানা কাফী সাহেব সব কথাই তাঁকে বলিয়াছেন। এমনকি, আমি যে বিবাহের তারিখ পিছাইয়া দিতে বাপজীর কাছে পত্র লিখিতে যাইতেছি, সে কথাটা পর্যন্ত কাফী সাহেব মৌলবী সাহেবকে বলিয়া দিয়াছেন। কারণ মৌলবী সাহেব বলিলেন : 'এক মাসের বেতন অগ্রিম লইয়া তুমি বাড়ি যাও। বিবাহের পরেই তুমি চাকরিতে যোগ দাও। বলা বাহুল্য, আমি কৃতজ্ঞতায় গলিয়া পড়িলাম। মনে হইল, গায়ের চামড়া দিয়া মৌলবী সাহেবের পায়ের জুতা বানাইয়া দিলেও এ ঋণ শোধ হইবে না। বিয়ার পরে যথাসময়ে দি মুসলমান যোগ দিলাম। অতি সুখে শান্তিতে মানে-মর্যাদায় একাদিক্রমে চার বছরকাল মৌলবী সাহেবের বিশ্বস্ত ও স্নেহসিক্ত সহকারী হিসাবে সাংবাদিকতা করিলাম। তিনি প্রথম প্রথম সাব-এডিটরের সাধারণ কাজ করান ছাড়াও এডিটরিয়েল নোট লেখাইতেন এবং শুদ্ধ করিয়া দিতেন। পরে আমাকে দিয়া বড়-বড় বিষয়ে এডিটরিয়েলও লেখাইতেন। ক্রমে আমি তাঁর এত বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিলাম যে তিনি নিজে না দেখিয়াও অনেক সময় আমার লেখা প্রেসে পাঠাইয়া দিতেন। এমন কাজ অন্য কারো বেলা তিনি করিতেন না। অধ্যাপক জে এল ব্যানার্জি মৌলবী সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে অনেকদিন মৌলবী সাহেবের মেহমানরূপে দি মুসলমান আফিসের দুতালায় বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি দি মুসলমান-এর সম্পাদকীয় রূপে বহু লেখা লিখিতেন। এ ছাড়া বাবু রসময় ধারা নামে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক নিয়মিতভাবে দি মুসলমান-এ লিখিতেন। এই দুইজন বিশিষ্ট পণ্ডিত লোকের লেখাও কোনও দিন মৌলবী সাহেব নিজে না পড়িয়া এবং কিছু সংশোধন না করিয়া প্রেসে দিতেন না। সেটা অবশ্য ইংরাজি ভাষা সংশোধন নয় মতবাদ সংশোধন। তিনি আমাকে বলিতেন : এঁরা ভাষা ও বিষয়বস্তুতে পণ্ডিত বটে, কিন্তু মুসলমানের মুখে যেমন করিয়া ফুটা উচিৎ ঠিক তেমনটি এঁরা সব ক্ষেত্রে পারেন না। আরেকটা কথা মৌলবী সাহেব বলিতেন এবং আমাদিগকে সব সময়ে স্মরণ করাইয়া দিতেন : কারো সমালোচনা এমনকি নিন্দা করিতে গিয়া শিষ্টাচার ও ভদ্রতার খেলাফ করিও না। তিনি এইরূপ দৃষ্টান্ত দিতেন :

তুমি জান একজন মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তার কথা লিখিতে গিয়া কখনও লিখিও না তিনি মিথ্যাবাদী, তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। তার বদলে লিখিবে, তিনি সত্যবাদী নন' বা 'তিনি সত্য কথা বলেন নাই। কোনও শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির কোনও সাধারণ দোষের কথা লিখিতে গিয়া কখনও লিখিবে না 'অমুক শ্রেণী সম্প্রদায় বা জাতির এই দোষ' তার বদলে লিখিবে 'ঐ শ্রেণী সম্প্রদায় বা জাতির কতকাংশের এই দোষ। এই ধরনের হাজারও নীতি-বাক্য ও মূল্যবান উপদেশ তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। আমরা অনেকেই শিখিয়াছি। পরবর্তী সাংবাদিক জীবনে ঐগুলি আমার পথের দিশারিরূপে কাজ করিয়াছে।

৫. 'খাদেম'

মৌলবী সাহেব আমার ইংরাজি লেখার খুব তারিফ করিলেও তিনি বলিতেন : 'কিন্তু তোমাকে দিয়া আমি যদি শুধু ইংরাজি লেখাই, তবে তোমার উপর এবং বাংলা সাহিত্যের উপর আমি অবিচার করিব। কতকটা শুধু তোমারই জন্য আমাকে একটা বাংলা কাগজ বাহির করিতে হইবে।' শেষ পর্যন্ত তিনি করিলেনও তাই। তিনি খাদেম নামে বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করিয়া তাঁর সম্পাদনা-পরিচালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর ছাড়িয়া দিলেন।

খাদেম সম্পাদনার সময় একটি ব্যাপারে আমার বিরাট জয়লাভ ঘটে। ব্যাপারটা এই : স্বামী সত্যদেব নামে এলাহাবাদের এক আর্য সমাজী ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা দেওয়া লইয়া মুসলমানদের মধ্যে বিরাট হৈ চৈ শুরু হয়। কলিকাতায় তাঁকে অভ্যর্থনা ও টাকার তোড়া দেওয়ার বিপুল আয়োজন। সব মুসলমান সংবাদপত্র এ কাজের সমর্থন করেন। শুধু খাদেম এ আমি একা এ কাজের প্রতিবাদ করি। আমার বক্তব্য এই যে কোনো অমুসলমান ইসলাম কবুল করিলেই তাকে অভ্যর্থনা দেওয়ার যে ঘটা হয়, এটা ইসলাম ও মুসলমান সমাজের জন্যই অপমানকর। এতে প্রমাণিত হয় যে ঐ ভদ্রলোক ইসলাম ও মুসলমান সমাজের শক্তি ও মর্যাদা বাড়াইয়াছেন। এই লেখার দরুন খাদেম-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হইল, আমার বিরুদ্ধে মৌলবী সাহেবের কাছে নালিশ করা হইল। মৌলবী সাহেব আমার মতের সমর্থন করিয়াও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে আমাকে উপদেশ দিলেন। আমি চুপ করিলাম। স্বামী সত্যদেব মওলানা মহীউদ্দিনরূপে কলিকাতা আসিলেন তাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দেওয়া হইল। যতদূর মনে আছে চার লাখ টাকার একটা তোড়া দেওয়া হইল। দেখাদেখি ঢাকা, চাটগা এবং রেঙ্গুনে তাঁকে অনুরূপ অভ্যর্থনা ও টাকার তোড়া দেওয়া হইল। এই ধুমধামে আমার পক্ষে রাস্তাঘাটে বাহির হওয়া বিপদসংকুল হইয়া উঠিল। কাগজে ও সভা-সমিতিতে আমার নামে ছি ছি হইতে থাকিল। মওলানা মহীউদ্দিনকে বাংলা-বর্মা ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিবার পথেও বিরাট বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হইল।

এরপর আমার জয়ের পালা। মওলানা মহীউদ্দিন মুসলমানদের পাঁচ লাখের মত টাকা হস্তগত করিয়া এলাহাবাদে ফিরিয়াই আর্য ধর্মে পুনঃ দীক্ষিত হইলেন এবং স্বামী সত্যদেব হইয়া গেলেন। শুধু তা-ই নয়। তিনি আমার অভিজ্ঞতা এই গোছের নাম দিয়া একটি বই লিখিলেন। তাতে তিনি বলিলেন, ইসলাম ও মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস মুসলমান থাকিয়া তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইসলামের মত অসভ্য ধর্ম ও মুসলমান সমাজের মত বর্বর ও ব্যভিচারী জাতি দুনিয়ায় আর নাই।

অভ্যর্থনাওয়ালাদের মুখে চুনকালি পড়িল। আমার সমর্থকদের দন্ত বিকশিত হইল। কিন্তু বিজয়ানন্দের উল্লাসের বদলে নিজের হতভাগ্য নির্বোধ সমাজের জন্য আমার চোখে পানি আসিল।

### ৬. প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি

ইতিমধ্যে আমি উকালতি পাশ করিয়াছিলাম। যদিও মৌলবী সাহেব আমার বেতন বাড়াইয়া পঁয়ষট্টি হইতে পঁচাশি করিয়া দিয়াছিলেন, তবু ঐ টাকাও যথেষ্ট নয় মনে করিয়া আমি ময়মনসিংহে উকালতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। মৌলবী সাহেবের ন্যায় পিতৃতুল্য স্নেহময় মুরুব্বি এবং সাংবাদিক জীবন ছাড়িয়া আসিতে আমার খুবই কষ্ট হয়। তবু এটা করিলাম। কারণ ইতিমধ্যে একটি ছেলে হইয়াছে। বাড়ির অবস্থাও অধিকতর খারাপ হইয়াছে। বাপজী আরো দেনাগ্রস্ত হইয়াছেন। কাজেই বেশি টাকা রোযগারের আশায় সাংবাদিক জীবন ছাড়িলাম।

মৌলবী সাহেব আমার স্বার্থপরতায় নিশ্চয়ই মনে-মনে দুঃখিত হইয়াছিলেন। কারণ এই সময় তিনি দি মুসলমানকে দৈনিক করিবার চিন্তা করিতেছিলেন। এ কাজে তিনি আমার উপর অনেকখানি নির্ভরও করিতেছিলেন। তবু আমাকে বাধা দিলেন না। বরঞ্চ আইনের বই-পুস্তক কিনায় আমাকে সাহায্য করিলেন। আমার মত নগণ্য সাব-এডিটারকে নিজ ব্যয়ে এক ফেয়ারওয়েল পার্টি দিলেন। এই পার্টিতে স্যার আবদুর রহিম, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌ, আবদুল করিম, মৌ. আবুল কাসেম, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, নবাব মশাররফ হোসেন, মওলানা আকরম খাঁ, ডা. আবদুল্লা সোহরাওয়ার্দী, মৌ. এ কে ফজলুল হক, হাজী আবদুর রশিদ, মি. সৈয়দ নাসিম আলী, খান বাহাদুর আজিজুল হক, অধ্যাপক জে এল ব্যানার্জি, খান বাহাদুর আসাদুজ্জামান প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলের সামনে তিনি আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। উপসংহারে বলিলেন : উকালতিতে আবুল মনসুর নাম করুক, আল্লাহর দরগায় এই দোওয়া করিয়াও তাঁকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, দি মুসলমান এর দরজা সর্বদাই তার জন্য ভোলা রহিল। যখনই সে মনে করিবে উকালতি তার ভাল লাগে না, তখনই দি মুসলমান-এ আসিতে পারিবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস মুসলিম সাংবাদিকতায় আবুল মনসুর যথেষ্ট দান করিতে পারিত। মৌলবী সাহেবের মতের উপর আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। কাজেই তাঁর প্রশংসায় আমি গর্বিত হইলাম। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত বদলাইলাম না। ভাগ্যিস, তিনি আমাকে মত বদলাইবার হুকুম করেন নাই। তিনি যদি একবার বলিয়া ফেলিতেন : 'তোমার যাওয়া হইবে না' তবে আমার পক্ষে তাঁর আদেশ অমান্য করা সম্ভব হইত না। তিনি তা জানিতেন বলিয়াই তেমন কথা বলেন নাই। এইভাবে আমার সাংবাদিক জীবনের প্রথম পর্যায় শেষ হইল ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে।

# ১৮. দ্বিতীয় পর্যায় ‘দৈনিক কৃষক’

## অধ্যায় আঠার - দ্বিতীয় পর্যায়

### ১. ‘দৈনিক কৃষক’

আমার সাংবাদিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই সময় নিখিল-বঙ্গ-কৃষক-প্রজা সমিতির উদ্যোগে কৃষক প্রজা আন্দোলনের মুখপত্ররূপে দৈনিক কৃষক প্রকাশ করা সাব্যস্ত হয়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং মৌ. শামসুদ্দীন আহমদ, মৌ. সৈয়দ নওশের আলী, নবাবযাদা সৈয়দ হাসান আলী, খান বাহাদুর মোহাম্মদ জান ও ডা. আর আহমদকে ডাইরেক্টর করিয়া একটি লিমিটেড কোম্পানি। রেজিস্ট্রারি হয়। আমাকে উহার প্রধান সম্পাদক নিয়োগ করাও তাঁরাই স্থির করেন। ডালহৌসি স্কোয়ারের নিকটবর্তী ৫ নং ম্যাংগো লেনে আফিস স্থাপিত হয়। নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এত সব ঠিক করিয়া আমাকে হুকুম দেওয়া হয় সম্পাদক হও, চালাও কাগজ। সমিতির প্রস্তাব। বন্ধুদের অনুরোধ নয়, আদেশ। অমান্য করিতে পারিলাম না। পারিলাম না মানে কী? করিলাম না। নিজের মনেও বোধ হয় কুকুতানি ছিল। মাসিক দুইশ টাকা বেতন ও পঞ্চাশ টাকা সম্পাদক-এর টেবিল এলাউন্স পাওয়ার শর্তে আমি কৃষক-এর সম্পাদকতার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। খাঁটিলাম খুব। অল্পদিনেই কাগজ সাংবাদিক মহলে সম্মান ও জনসাধারণের মধ্যে পপুলারিটি অর্জন। করিল। আদর্শ নিষ্ঠায় স্বাধীন মতবাদে এবং নিরপেক্ষ সমালোচনায় কৃষক বেশ নাম করিল।

কিছুদিন যাওয়ার পর আমি জানিতে পারিলাম তস্কালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কৃষক-এর একজন পৃষ্ঠপোষক। আমি এতে বরঞ্চ খুশিই হইলাম। কংগ্রেসের অনেক মত ও কর্মপন্থার সাথে আমার মিল না থাকিলেও সুভাষবাবুকে আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করিতাম। কৃষক শ্রমিকদের প্রতি তাঁর দরদ, কৃষক-প্রজা আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে তার উদারতা সবই আমার জানা ছিল। কাজেই সুভাষবাবুর মত একজন মুরুব্বি পাওয়ায় কৃষক-এর আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিকে অনেকখানি সাহায্য হইবে, ইহা আমি মনে করিলাম। কৃষক-প্রজা সমিতির আদর্শের সাথে সংগতি রাখিয়া কংগ্রেসি রাজনীতিতে ও সুভাষবাবুকে পূর্ণ সমর্থন দিলাম। মহাত্মা গান্ধীর সহিত সুভাষবাবুর বিরোধ ও ত্রিপুরী কংগ্রেসের হট্টগোল আমরা প্রকাশ্যভাবে সুভাষবাবুর পক্ষ অবলম্বন করিলাম। কলিকাতার হিন্দুদের মধ্যে কৃষক বেশ পপুলার হইল।

### ২. কৃষক’-এর অর্থাভাব

গেল এমনি করিয়া বছর খানেক। হঠাৎ হুমায়ুন কবির সাহেব জানাইলেন আর চলে না। অর্থাভাব। আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, দৈনিক চালাইবার মত যথেষ্ট মূলধন না লইয়াই এঁরা কাগজ প্রকাশে হাত দিয়াছিলেন। দৈনিক কাগজ চালান যে আগের মত মিশনারি ওয়ার্ক নয়, ইতিমধ্যে সংবাদপত্র যে একটা ইন্ডাস্ট্রি হইয়া উঠিয়াছে, এতে যে অন্যান্য শিল্পের মতই মোটা টাকা মূলধন লাগে পরিচালকরা এ খবর রাখিতেন না। দোষ তাদের নয়। কারণ তাঁরা কেউ সাংবাদিক নন, যদিও

হুমায়ুন কবির সাহেব সাংবাদিকতার সাথে কিছু কিছু পরিচিত ছিলেন। কাজেই তাদের দোষ দেওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমারও দোষ নাই। কারণ আমার সাথে আর্থিক ব্যাপারে বা পরিচালনা সম্বন্ধে কোনও পরামর্শ করা হয় নাই। সম্পাদকের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করিবার কথাও নয়। আর করিলেই যে আমি খুব নির্ভরযোগ্য উপদেশ বা অর্থ সংগ্রহে সাহায্য করিতে পারিতাম, তা-ও নয়। ডাইরেক্টর বোর্ডের মেম্বরদের তুলনায় আমার কি দাম আছে? তাঁরা সব কলিকাতার বাসেন্দা, আমি মফস্বলের লোক। তারা সব আইনসভার মেম্বর, ভূতপূর্ব বা হবু মন্ত্রী। টাকাওয়ালা লোকদের সাথে পরিচয়ও আমার তেমন ছিল না। অতএব টাকা-পয়সার ব্যাপারে তাঁরা আমাকে কিছু না জানাইয়া অন্যায় কিছু করেন নাই।

কিন্তু কৃষক বাঁচাইয়া রাখার ইচ্ছা ও উৎকণ্ঠা পরিচালক বোর্ড ও আমার নিজের সমান। কৃষক প্রজা পার্টি হইতে নিজস্ব দৈনিক বাহির করার চেষ্টা এই প্রথম। এটা ব্যর্থ হইলে কৃষক-প্রজা-নেতৃত্ব এবং আন্দোলন একটা মার খাইবে। জনপ্রিয় কৃষক-প্রজা-নেতা প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের সহিত আদর্শগত বিরোধ হওয়ায় এবং তার ফলে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব দিয়া পরাজিত হওয়ায় ইতিপূর্বে কৃষক-প্রজা-নেতৃত্ব একটা মার খাইয়াছে। তার পরপরই এটা হইলে আরো বিপদ। কৃষক-প্রজা নেতাদের দুশ্চিন্তা এইখানে। এই চিন্তায় আমিও শরিক।

৩. ব্যক্তিগত বিপদ

আর একটা দুশ্চিন্তা আমার ব্যক্তিগত। আমি দশ বছরের জমানো উকালতি ব্যবসাটা ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতার বাসেন্দা হইয়াছি। আসিবার সময় শুধু হাতের মামলা-মোকদ্দমাগুলি নয় বই-পুস্তক, সাজ-সরঞ্জাম, টেবিল চেয়ার, মায় গাউনটা পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ যাকে বলে 'পিছনে নৌকা তলাইয়া দিয়া সামনে অগ্রসর হওয়া', আমি তাই করিয়াছি। সুতরাং ফিরিবার উপায় নাই। নিজের অস্তিত্বের জন্যও কৃষককে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। পরিচালকদের সকলেই আমার হিতৈষী বন্ধু। তারাও আমার ব্যক্তিগত মঙ্গল-অমঙ্গল ও সুবিধা-অসুবিধায় সম্পূর্ণ সচেতন।

এইসব কারণে কৃষক-এর অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য আমিও পরিচালকদের সাথে সক্রিয় সহযোগিতা করিতে লাগিলাম। এতদিন আমি কাগজের সম্পাদনা কার্যের উন্নতির চিন্তায় সময় ব্যয় করিতাম। এখন হইতে উহার আর্থিক দিকটাতেও জড়াইয়া পড়িলাম। কাজটা কঠিন। সম্পাদকরা লেখক-ভাবুক। শিল্পী। টাকা-পয়সার ঝামেলার মত বৈষয়িক ও ব্যবসায়িক ব্যাপার তাদের চোখে নিতান্ত অশিল্পী দোকানদারি ব্যাপার। কাজেই নিম্নশ্রেণির বিষয়। এতদিন ছিল আমার এই ধারণা। এখন বুঝিলাম অশিল্পী অসুন্দর হইলেও এই ব্যবসায়ী দিকটাই আসল। এতদিনে বুঝিলাম, মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেবকে একাধারে সম্পাদকতা ও অর্থ সংগ্রহ করিতে কী ঝামেলা পোহাইতে হইত।

বিপদই মানুষের বড় শিক্ষক। কৃষক-এর সম্পাদকতা করিতে গিয়া আমি সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, সংবাদ-শিল্পী ও সংবাদ-বাণিজ্য সকল দিকে নজর দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শুধু প্রধান সম্পাদকের আসনে বসিয়া থাকিলে আমার চলিত না। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের সঙ্গে যেমন চাদা আদায়ে, বিজ্ঞাপন ক্যানভাসিং-এ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, তেমনি ছাপাখানার আধ-অন্ধকার চিশিলা

গরমের মধ্যে কম্পোযিটার, মেশিনম্যানের কাঁধের কাছে দাঁড়াইয়া কাজে তাকিদ দিতে হইত। এটা করিতে গিয়া একদিকে যেমন পরিচালকদের আর্থিক অভাবের কথা জানিলাম। অপর দিকে বেচারা কম্পোযিটারদের শারীরিক অসুবিধার কথাও জানিলাম। কম্পোযিটাররা অন্ধকার সংকীর্ণ ও আলো-বাতাসহীন কুঠরিতে বসিয়া দিনরাত শিসা হাতাইয়া কীভাবে শরীর, স্বাস্থ্য ও চোখ নষ্ট করিতেছে, তা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদের অভাব মিটিলে এদের জন্যও কিছু একটা করিব অন্তত দু-চারটা ফ্যানের ব্যবস্থা করিব মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম।

৪. অর্থাভাবের সংগত কারণ

কিন্তু টাকা কোথায়? কে দিবে টাকা কৃষককে? খবরের কাগজের টাকা মানে বিজ্ঞাপনের আয়। কাগজ বিক্রির টাকায় কাগজ-কালির দামটা উঠে মাত্র। বিজ্ঞাপনের টাকা দিয়াই স্টাফ চালাইতে হয়। লাভও থাকে। কিন্তু কৃষক বিজ্ঞাপন পাইবে কেন? বিজ্ঞাপনদাতারা বড়-বড় ধনিক-বণিক শিল্প মালিক। কৃষক কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক। জমিদারি শিল্প-বাণিজ্য সমস্ত কায়েমি স্বার্থ জাতীয়করণ করিতে চায়। এই কৃষককে বিজ্ঞাপন দিয়া তারা শত্রু পুষিবে? হিন্দুরা বিজ্ঞাপন দেয় না কৃষক মুসলমান বলিয়া, মুসলমানরা দেয় না কৃষক হিন্দু-কংগ্রেস', ঘেঁষা বলিয়া। বিপদের উপর বিপদ। কৃষক-প্রজা দলের একমাত্র মন্ত্রী মৌ. শামসুদ্দীন আহমদ সমিতির নির্দেশে মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। মন্ত্রিত্বের প্রভাব খাটাইয়া কিছু বিজ্ঞাপন ও অর্থ সাহায্য পাইব, সে আশায় ছাই পড়িয়াছে। সুভাষবাবুর সাহায্যে হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কিছু কিছু বিজ্ঞাপন পাইব, সে গুড়ে বালি পড়ে। সুভাষবাবু মহাত্মাজীর সাথে ঝগড়া করিয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। ধনিক-বণিকরা আসলে সকাজে চাদা দেয় না, তারা ভবিষ্যৎ মুনাফার আশায় টাকা খাটায়, ইনভেস্ট করে। অদূরে কংগ্রেস রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিবে, এটা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। সেজন্য সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও ধনিকরা তলে-তলে কংগ্রেসকে। সাহায্য করিত। সুভাষবাবু প্রেসিডেন্ট থাকিলে তার 'ছিটাফোঁটা' কৃষকও পাইত। সে আশাও গেল। শেষ পর্যন্ত সুভাষবাবু দেশ ত্যাগ করিলে এদিককার কোনও আশাই আর থাকিল না।

৫. খান বাহাদুর মোহাম্মদ জান

এ অবস্থায় অধ্যাপক হুমায়ুন কবির দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। পরিচালক বোর্ডের মধ্যে একমাত্র ধনী ব্যবসায়ী খান বাহাদুর মোহাম্মদ জানের উপর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরির ভার চাপান হয়। খান বাহাদুর সাহেব ভাল মানুষ। টাকাও তাঁর আছে। কিন্তু তিনি অবাঙ্গালী। বাংলা জানেন না। কৃষক পড়িতে পারেন না। তিনি কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন পছন্দ করেন না। তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সমর্থন করেন না বলিয়া আইনসভায় কৃষক প্রজা পার্টি ও কংগ্রেস পার্টিকে সমর্থন করে। এমন লোকের পক্ষে কৃষকের পরিচালনার এবং মাসে-মাসে দুই-তিন হাজার টাকা লস দেওয়ার উৎসাহ বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে না। কাজেই মাস চার-পাঁচেক পরে তিনি দায়িত্ব বহনে অস্বীকৃতি জানাইলেন।

৬. মি. এইচ দত্ত

এর পরে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হইলেন কলিকাতা কমার্শিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও অন্যান্য অনেক কোম্পানি পরিচালক মি. হেমেন্দ্র নাথ দত্ত। মি. দত্তের বাড়ি ময়মনসিংহ। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়াই ব্যস্ত থাকেন বটে তবে অসাম্প্রদায়িক সুস্থ রাজনীতির তিনি উৎসাহী সমর্থক। তিনি ধর্ম বিশ্বাসে ব্রাহ্ম বলিয়া সাধারণ হিন্দুর মত সংকীর্ণ নন। মুসলমানদের প্রতি তিনি খুবই উদার। এইসব কারণেই কংগ্রেসের চেয়ে কৃষক প্রজা পার্টির তিনি বেশি সমর্থক ছিলেন। এ ছাড়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল। সুভাষবাবু দেশত্যাগের আগেই মি. দত্তকে কৃষক-এর একজন শেয়ার হোল্ডার করিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই তাকে কৃষক-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করিতে কোনোই অসুবিধা হইল না। অন্যতম সুপরিচিত কৃষক নেতা ময়মনসিংহবাসী জনাব আবদুর রশিদ খাঁ এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রূপে সমস্ত কাজ পরিচালনা করায় এবং দত্ত সাহেব খুব কমই আফিসে আসায় এই পরিবর্তনের কথা বড় কেউ জানিতেও পারিল না। মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই কৃষক চলিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের আফিস করার উদ্দেশ্যে মি. দত্ত কৃষক আফিস ম্যাংগো লেন হইতে ক্রীক রোডে স্থানান্তরিত করিলেন। পরিচালনা স্থান সংকুলান ও পরিবেশ সকল দিক দিয়াই ইহাতে কৃষক-এর উন্নতি হইল। আমি কম্পোযিটারদের জন্য ফ্যানের ব্যবস্থা করিলাম। বড়-বড় লাভের কাগজ সচরাচর ঐ সময় তা করে নাই। আমার কাজকে তারা বিদ্রূপ করিয়াছে।

৭. নীতিগত বিরোধ

কিন্তু এ সুখ আমাদের বেশিদিন স্থায়ী হইল না। ঐ সময় হক মন্ত্রিসভার প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল লইয়া খুবই বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছিল। এই বিলের বিধান অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার কর্তৃত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতছাড়া হইয়া যাইবে বলিয়া হিন্দু শিক্ষিত সমাজের প্রায় সকলেই ইহার বিরুদ্ধতা করিতেছিলেন। হিন্দু সংবাদপত্রেরাও সমস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন। কংগ্রেস পার্টি ও আইন সভার ভিতরে বাহিরে এই বিলের বিরুদ্ধে জনমত গড়িতেছিল। এমন সময় কৃষক-এর সম্পাদকীয়তে এই বিলের সমর্থন করা হইল। মি. দত্ত এই সর্বপ্রথম সম্পাদকের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করিলেন। আফিসে আসিয়া আমার রুমে বসিয়া আমার লেখার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন যে সম্পাদকীয় ব্যাপারে নাক ঢুকাইবার তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এই ব্যাপারে না করিয়া পারিলেন না। কারণ আমি একটা সাম্প্রদায়িক বিল সমর্থন করিয়া কষক-এর মূলনীতি লঙ্ঘন করিতেছি। আমি যুক্তিতর্ক ও তথ্যাদি দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে প্রস্তাবিত বিলটা সাম্প্রদায়িক নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধতাটাই সাম্প্রদায়িক। তিনি আমার যুক্তি মানিলেন না। আমিও তারটা মানিলাম না। ঐ ব্যাপারে পরপর আরো কয়টা সম্পাদকীয় লিখিলাম। তিনি বোর্ডের মিটিং ডাকিয়া আমার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। বোর্ডের মেম্বাররা। স্বভাবতই আমারই সমর্থন করিলেন। মি. দত্ত পদত্যাগের হুমকি দিলেন। কৃষক-এর জীবনে আবার ক্রাইসিস।

অবস্থা শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়াইল যে আমি এডিটর থাকিলে মি. দত্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টর থাকিবেন না। তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর না থাকিলে কৃষক চলিবে না। কাজেই কৃষক বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে আমারই পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু পরিচালক বোর্ডের মেম্বাররা তা মনে করিলেন না। তাঁরা দেখিলেন আমার অবর্তমানে কৃষকচলিবে না। তার মানে এই নয় যে আমার মত যোগ্য সম্পাদক

আর নাই; আমাকে ছাড়া কাগজ চলিবে না। তারা দেখিলেন যে ইস্যুতে বিরোধ তাতে মি. দত্তকে মানিয়া নিলে কৃষক বাঁচিয়া থাকিলেও মুসলমানের কাগজ থাকিবে না। কিন্তু আমি অন্য দিক দেখিলাম। কৃষক বন্ধ হইলে শতাধিক মুসলিম যুবক বেকার হইবে। কৃষক-এর সম্পাদকীয় বিভাগের কম-বেশি পঁয়ত্রিশ জনের সকলেই মুসলমান। ম্যানেজিং বিভাগের চৌদ্দ-পনের জনের দুইজন বাদে সবই মুসলমান। কম্পোযিং বিভাগের পঞ্চাশজনের মধ্যে সকলেই মুসলমান। ইহাদের সকলকেই আমি নিযুক্ত করিয়াছি। কৃষক বন্ধ হইলে একযোগে এতগুলি লোকের চাকরি যাইবে। এঁরা সকলে আমারই দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁরা আমাকে আন্তরিক ভালও বাসিয়া থাকেন। কারণ সারা কলিকাতার সংবাদপত্র জগতে আমিই সর্বপ্রথম কম্পোষ সেকশনে 'ফ্যান' দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলিয়াছিলাম, যত দিন কম্পোযিটরদেরে ফ্যান দেওয়া না হইবে, ততদিন সম্পাদকের রুমে ফ্যানের দরকার নাই। আমার এই কাজে কলিকাতার কম্পোযিটার শ্রেণীর মধ্যে আমার খুব নাম ছিল। কাজেই একযোগে এতগুলি লোকের বেকারির সম্ভাবনায় আমি কাতর হইলাম। আমার নিজের চাকরির জন্য এতগুলি লোককে বেকার করা আমার বিবেকে কিছুতেই বরদাশত হইল না।

৮. 'কৃষক' ত্যাগ

পক্ষান্তরে আমি যদি সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেই তবে দত্ত সাহেব কৃষক চালাইবেন। স্টাফের কাউকে তিনি ছাড়াইবেন না। কারণ কাগজের পলিসির সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক নাই। দত্ত সাহেব স্পষ্টভাবেই প্রতিশ্রুতি দিলেন। কাজেই আমি পদত্যাগ করিতেই রাজি হইলাম। দত্ত সাহেব ডিরেক্টর বোর্ডের জরুরি সভা ডাকিলেন। সেখানে আমার বক্তব্য পেশ করিয়া পদত্যাগ করিলাম। আমাকে ধন্যবাদ দিয়া পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল।

অতঃপর কৃষক চলিতে থাকিল। কিন্তু দুই-এক দিনের মধ্যেই সব ডাইরেক্টর পদত্যাগ করিলেন। কৃষক কার্যত দত্ত সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়া গেল। কৃষক-প্রজা সমিতির দুয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য এবং আমার কোনও কোনও সাংবাদিক বন্ধু আমাকে বলিলেন : আমি ভুল করিয়াছি। দত্ত সাহেবের হাতে কৃষক তুলিয়া না দিয়া উহা বন্ধ করিয়াই বাহির হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র এইভাবে পুঁজিবাদী হিন্দুর হাতে তুলিয়া দিয়া আমি মুসলমান সমাজের শত্রুতাই সাধন করিয়াছি। মুসলমানের শ্রম ও ঘর্মে অস্ত্র তৈয়ার করিয়া তাতে শাণ দিয়া আমি মুসলমানের গলা কাটিবার জন্য হিন্দুর হাতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি। ব্যাপারটা অত সাংঘাতিক এ বিষয়ে আমি ঐ সব বন্ধুর সাথে একমত হইতে পারি নাই।

৯. সাংবাদিকতায় নূতন জ্ঞান

কারণ প্রায় তিন বছর কাল কৃষক-এর সম্পাদকতা করিয়া আমি দুইটা নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম। (১) সংবাদপত্র পরিচালন একটা ইন্ডাস্ট্রি; এতে প্রচুর মূলধন লাগে; কাজেই ধনী ছাড়া কেউ নূতন কাগজ বাহির করিয়া সফল হইবে না। মুদির দোকান চালাইতে চালাইতে বড় সওদাগর ও শিল্পপতি হওয়ার দিন যেমন আর নাই, সাপ্তাহিক চালাইতে চালাইতে দৈনিক করার দিনও তেমনি আর নাই। (২) ধনতন্ত্রী সমাজের অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন সংবাদপত্র-শিল্পও তেমনি, যার টাকা তিনিই মালিক। কাজেই শিল্পের ইঞ্জিনিয়ার যেমন শিল্পের নিয়ন্তা নন,

সম্পাদকও তেমনি খবরের কাগজের নিয়ন্তা নন। খবরের কাগজে মালিক-এর মত চলিবে, না সম্পাদকের মত চলিবে, এই তর্ক আমার কৃষক-সম্পাদকতার আমলেই উঠিয়াছিল। আমাদের সকল সাংবাদিকের 'দাদা' শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বোস ও আমার প্রায়ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডা. ধীরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের বিরোধ বাধে সম্পাদকীয় পলিসি লইয়া। মৃণালবাবু শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ধীরেনবাবু বামপন্থী কংগ্রেসী ছিলেন। কাজেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বড়-বড় ইস্যু সম্বন্ধে অমৃতবাজার-এর মালিকদের সাথে এঁরা একমত ছিলেন না। কাগজে তারা নিজেদের মতামত চালাইতেন। অমৃতবাজার কর্তৃপক্ষ এদের দুইজনকেই কর্মচ্যুত করেন। ব্যক্তিগতভাবে এঁরা দুইজনই সাংবাদিকদের কাছে খুব শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় ছিলেন। কাজেই বিভিন্ন কাগজে অমৃতবাজারকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনে এর কথা উঠিল। ঐ এসোসিয়েশনের অনেক মালিক মেম্বর ছিলেন বলিয়া ওয়ার্কিং জার্নালিস্টরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান খাড়া করিলেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করিতে। কাজেই শিক্ষিত সমাজে, বিশেষত সাংবাদিকদের সামনে একটি মাত্র ইস্যু দেখা দিল : খবরের কাগজে কার মত চলিবে : মালিকের? না সম্পাদকের? সব সাংবাদিক ও অধিকাংশ খবরের কাগজে একই মত দেওয়া হইতে লাগিল : সম্পাদকের মত চলিবে। একমাত্র আমি কৃষক-এর সম্পাদকীয় লিখিলাম : মালিকের মত চলিবে।

### ১০. সম্পাদক বনাম মালিক

কলিকাতার সাংবাদিক মহল স্তম্ভিত হইল। মালিকরাও বোধ হয় অতটা আশা করেন নাই। মালিকের পক্ষের কথা বলে একজন ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট তাও আবার বামপন্থী কাগজে? অনেক বন্ধু আমার নিন্দা করিলেন। ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন আমার কথায় প্রতিবাদ করিলেন। আমি কিন্তু অটল। নিজের কথার সমর্থনে পরপর আরো কয়েকটা সম্পাদকীয় লিখিলাম। আমি বলিয়াছিলাম সাংবাদিকতা উকালতির মতই একটা প্রফেশন। এটা মিশনারির মত আদর্শ সেবা নয়। উকিল যেমন দোষী-নির্দোষ-নির্বিশেষে সকলের কেস নেন, সাংবাদিকও তেমনি কংগ্রেস, মুসলিগ লীগ, হিন্দু সভা নির্বিশেষে সকলের কেস নিবেন। অর্থাৎ যিনি তার ফিস দিবেন তাঁরই পক্ষে সাংবাদিক কলম ধরিবেন। এটা তার ব্যবসায়িক কাজ। এটাকে তার ব্যক্তিগত মতামত বলিয়া কোনও বুদ্ধিমানই ধরিয়া লইবে না। সাংবাদিক এইভাবে পরের জন্য টাকার বিনিময়ে কলম চালাইতে গিয়া এতটুকু মাত্র দেখিবেন যে ঐ সাংবাদিক কর্তব্যের বাহিরে তার স্বাধীনতা যাতে ব্যাহত বা সংকুচিত না হয়। আপনি যদি কংগ্রেসী হন, তবে কংগ্রেস-বিরোধী কাগজে আপনি চাকুরি নিবেন না। যদি নেন, তবে কংগ্রেস-বিরোধী কথাই আপনাকে লিখিতে হইবে। আপনি কংগ্রেস-বিরোধীর টাকায় খানা খাইয়া তাঁরই কাগজে কংগ্রেসী প্রচার করিবেন, এটা আইন বা নীতির কোনও দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নয়। যদিও কংগ্রেস-বিরোধী কথা বলিলে কাগজ না চলে, তবে সেটা দেখা যার টাকা তারই কর্তব্য, সাংবাদিকের নয়। সাংবাদিক সে ক্ষেত্রে মালিককে সদুপদেশ দিতে পারেন মাত্র। মালিক যদি সে উপদেশ না রাখেন। তবে সাংবাদিককে কাগজের মালিকের কথাই লিখিতে হইবে। আমি কৃষক ছাড়িবার সময় মুসলিম স্টাফকে এই উপদেশ দিয়াই আসিয়াছিলাম।

# ১৯. তৃতীয় পর্যায় 'নবযুগ'

## অধ্যায় উনিশ - তৃতীয় পর্যায়

### ১. 'নবযুগ'

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে হক সাহেব নবযুগ বাহির করেন। আমি ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করি। কিন্তু উহাতে সম্পাদকরূপে আমার নাম দিতে রাজি হই নাই। ইহার একাধিক কারণ ছিল। প্রথমত, যদিও আমি সাংবাদিকতাকে প্রফেশন হিসাবে গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত মতামত নিরপেক্ষভাবে যে কোনও মতের কাগজে চাকুরি নিতে সাংবাদিক বন্ধুদের উপদেশ দিতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করিতে রাজি ছিলাম না। কারণ আমার নিজের একটা রাজনীতিক জীবন ছিল। সেটা নষ্ট করিতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দ্বিতীয়ত, যে উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য হক সাহেব নবযুগ বাহির করিলেন, সে উদ্দেশ্যের সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি থাকিলেও হক সাহেবের মতের স্থিরতায় আমার আস্থা ছিল না। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে বিশেষত জিন্নাহ সাহেবের সহিত হক সাহেবের বিরোধের মূল কথা আমি জানিতাম। মুসলিম বাংলার স্বার্থ জিন্নাহ নেতৃত্বের হাতে নিরাপদ নয় বলিয়াই হক সাহেব জিন্নাহ সাহেবের সাথে কলহ করিতেছেন, হক সাহেবের এ কথা আমি বিশ্বাস করিতাম। নবযুগ বাহির হইবার মাসাধিক কাল আগে হইতেই হক সাহেব তার উদ্দেশ্যের কথা আমাকে বলেন এবং আমার সহযোগিতা দাবি করেন। আমার কলমের উপর হক সাহেবের আস্থা ছিল। তিনি মুসলিম লীগে থাকিয়া মুসলিম লীগ প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই নবযুগ বাহির করিতেছেন। অথচ শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিবেন। এসব ব্যাপারে তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। এ অবস্থায় নবযুগ-এর সম্পাদকীয় নীতি পরিচালনার দায়িত্ব তিনি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিয়া বিশ্বাস পাইতেছেন না, হক সাহেবের এসব কথাও আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম। দাম্ভিকতা ও অহংকার না করিয়াও আমি বলিতে পারি, আমার মত উকিল-সম্পাদক ছাড়া আর কারো পক্ষে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে হক সাহেবের পছন্দ-মত কাগজ চালানো সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় আমি সর্ব শক্তি দিয়া হক সাহেবের সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিলাম। এর উপর আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ শ্রদ্ধেয় বন্ধু সৈয়দ বদরুদ্দোজা আমাকে বুঝাইলেন যে মুসলিম বাংলার স্বার্থে হক নেতৃত্বের পিছনে দাঁড়াইতে তাঁর মত বহু মুসলিম লীগার প্রস্তুত। আসল কারণ তারাও বিশ্বাস করেন যে হক সাহেব জিন্নাহ সাহেবের নিকট পরাজিত হইলে অথবা হক সাহেবের রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটিলে মুসলিম বাংলার ভবিষ্যৎ নাই। সুতরাং হক সাহেবের নবযুগ-এ যোগ দেওয়া সম্বন্ধে আমার মনে কোনও দ্বিধা থাকিল না। এলাউন্সসহ মাসে তিনশ টাকা বেতনের অফার দিয়া আর্থিক দিক দিয়া আমার আপত্তিও খণ্ডন করা হইয়াছিল। এসব সত্ত্বেও আমি সন্দেহ করিতাম এবং আমার অনেক বন্ধুও আমার সাথে একমত হইতেন যে, হক সাহেব যে কবে আবার লীগের সাথে রফা করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নাই। তৃতীয়ত, আমি জানিতাম নবযুগ বেশি দিন টিকিবে না। কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, রাজনৈতিক নেতাদের স্থাপিত কাগজ স্থায়ী হয় না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মি. জে এম সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু প্রভৃতি বড়-বড় নেতা নিজস্ব দৈনিক কাগজ বাহির করিয়াছেন। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও

ধুমধামের মধ্যে কাগজ চলিয়াছে কিছুদিন। তারপর সব ঠাণ্ডা। হক সাহেবের কাগজও এর ব্যতিক্রম হইবে না। সুতরাং ব্যাপারটা যখন শেষ পর্যন্ত একটা অনিশ্চিত এক্সপেরিমেন্ট তখন সম্পাদকরূপে নিজের নামটা দিয়া বদনাম কিনি কেন? বদনামের কথা আমি এই জন্য বলিলাম যে হক সাহেবের বিরুদ্ধে গত তিন চার বছর যত-কিছু লিখিয়াছি ও সভা-সমিতিতে যে সব কথা বলিয়াছি, নবযুগ-এ সে সবেরই উল্টা উতার গাইতে হইবে। তাছাড়া উকালতি সাসপেন্ড করারও রিস্ক ছিল।

২. বেনামী সম্পাদক

কাজেই হক সাহেবকে পাল্টা প্রস্তাব দিয়াছিলাম। সম্পাদকরূপে তাঁর নিজের নাম দিতে হইবে। যুক্তি দিলাম, প্রথম পর্যায়ে বিশ বছর আগের নবযুগ-এর সম্পাদকরূপে তাঁরই নাম ছিল। তার পছন্দ হইল। তিনি নিমরাজি হইলেন। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরে তিনি জানাইলেন যে সরকারি আইন ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ আপত্তি করিয়াছে। লাট সাহেবও বারণ করিয়াছেন। অতঃপর বন্ধুবর সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিঞা), জনাব ওয়াহিদুযযামান (ঠাণ্ডা মিঞা) ও স্নেহাস্পদ মাহমুদ নূরুল হুদা প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া হক সাহেবের সম্মতিক্রমে কাজী নজরুল ইসলামের নাম ঠিক করিলাম। কাজী সাহেব এ সময় দায়-দেনায় খুবই বিপন্ন ছিলেন। পাওনাদাররা ডিক্রিজারী করিয়া তাকে অপমান করিবার চেষ্টা করিতেছে। পক্ষান্তরে তার পাবলিশাররা ও গ্রামোফোন কোম্পানিরা তাকে ঠকাইতেছে। এ সময়ে কাজী সাহেবকে আর্থিক সাহায্য করাও হইবে। আমার সাড়ে তিনশ টাকা বেতন অফার করিলাম। কিছু করিতে হইবে না, মাঝে-মাঝে বিকাল বেলা আফিসে আড্ডা। এবং সপ্তাহে এক-আধটা কবিতা দিলেই যথেষ্ট। কাজী সাহেব রাজি হইলেন। ধুমধামের সাথে নবযুগবাহির হইল। চলিলও ভাল। কাজী সাহেব সত্য-সত্যই সন্ধ্যার দিকে আফিসে আড্ডা দিতে লাগিলেন। মুসলিম ছাত্র তরুণরা হক সাহেবের নয়া নীতিতে কতকটা, নজরুল ইসলামের আকর্ষণে কতকটা, নবযুগ আফিসে ভিড় করিতে লাগিল। আচ্ছা খুব জমিয়া উঠিল। নজরুল ইসলামও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তিনি জোরদার কবিতাই শুধু নয়, দুই-একটা সম্পাদকীয়ও লিখিয়া ফেলিলেন। এমনই একটার মধ্যে জিন্নাহ সাহেবকে কাফের' ও পাকিস্তানকে ফাঁকিস্তান' বলাতে মুসলিম লীগ মহলে আগুন লাগিল। নবযুগ বাহির হওয়ায় আজাদ স্বভাবতই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াই ছিল। এই সুযোগে নবযুগও নজরুল ইসলামকে কঠোর ভাষায় গাল দিয়া এক সম্পাদকীয় লিখিলেন। নজরুল ইসলামের নাম সম্পাদক হিসাবে প্রকাশিত হওয়ায় আমি কবি ও কাদা' নামে একটি দস্তখতী সম্পাদকীয় লিখি। লেখাটা সত্যই মর্মস্পর্শী ও যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল। ছাত্র-তরুণরা ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক মহলে উহা উচ্চ প্রশংসা লাভ করল। অনেকে আফিসে আসিয়া, অনেকে টেলিফোনে আমাকে কংগ্রেচুলেট করিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, নজরুল ইসলাম আমাকে ধন্যবাদ দিতে আসিয়া, আমার হাত ধরিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি নজরুল ইসলামের তর্কিত প্রবন্ধটা ছাপা হওয়ার দরুন নিজেই দুঃখিত ছিলাম। আমার অবর্তমানে লেখাটা ছাপা হইয়া যাওয়ায় নিজের উপরও যেমন রাগ ছিল, নজরুল ইসলামের উপরও গোস্বা ছিল। কিন্তু নজরুল ইসলামের শিশুসুলভ সরলতায় আমি এই দিন সব ভুলিয়া গেলাম।

কিন্তু নজরুল ইসলামের লেখায় কাজ হইল। হক সাহেব ও জিন্নাহ সাহেবের মধ্যে যে আপোস একরূপ চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছিল, কাজী সাহেবের ঐ লেখাকে কেন্দ্র করিয়া সে আপোস ভণ্ডুল হইয়া গেল। নবযুগ বাহির হইবার দুই-আড়াই মাস মধ্যে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লীগ

ত্যাগ করিয়া হক সাহেব ‘প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করিলেন এবং কংগ্রেস, হিন্দু সভা, কৃষক প্রজা সব পার্টিকে লইয়া নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন।

প্রস্তুতই ছিলাম। কলম ঘুরাইয়া ধরিলাম। আগের কথা ত পুরান কথা, গত আড়াই মাস ধরিয়া যা কিছু লিখিয়াছি সে সব কথাও উল্টাইয়া বলিতে শুরু করিলাম। এবার সত্য-সত্যই প্রফেশনাল সাংবাদিকতা শুরু করিলাম। অর্থাৎ নিজের মতামত, আদর্শ ও বিবেক-বুদ্ধি চুঙ্গায় ভরিয়া রাখিয়া নূতন নূতন যুক্তিতে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনকে জনপ্রিয় ও সফল করিতে উকিলের মতই আরগুমেন্ট করিতে লাগিলাম। এ কাজে এমন সফল হইয়াছিলাম যে, এই কোয়ালিশনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতা জনাব সৈয়দ নওশের আলী সাহেব একদিন নবযুগআফিসে আমার রুমে আসিয়া বলিলেন : কংগ্রেচুলেশন মনসুর সাহেব। আমি নীতিগতভাবেই খবরের কাগজ পড়ি না; কিনিয়া পয়সা অপব্যয় ত করিই না : খবরের কাগজের আফিসেও যাই না। বিনা পয়সায় যায়। বলিয়া নবযুগআমার বাড়িতে ঢুকিতে পারে। আপনার লেখা আমার ভাল লাগে বলিয়া দুই-একদিন নবযুগআমি পড়িয়া থাকি। আপনি প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন। সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে যে পাঁচ-সাতটা এডিটরিয়েল লিখিয়াছেন, আপনি শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে সবগুলি আমি এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়াছি।

আমি গালটি প্রশস্ত করিয়া বলিলাম : তবে ত কংগ্রেচুলেশন দিতে হয় আপনাকেই। কী হইয়াছে?

সৈয়দ সাহেবও হাসিয়া বলিলেন : হইবে আর কী? বুকের বোঝা নামিয়াছে। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন করিয়া আমার চোখের ঘুম গিয়াছিল। ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। আপনার সম্পাদকীয় কয়টা পড়িয়া এতদিনে বুঝিলাম, এমন ভাল কাজ জীবনে আর একটাও করি নাই। আমাদের এই কাজের সমর্থনে যে এত-এত যুক্তি আছে, আপনার লেখা পড়িবার আগে তা জানিতাম না।

সৈয়দ সাহেবের কথার জবাবে আমি মুখে কিছু বলিলাম না বটে কিন্তু মনে-মনে বলিলাম: আপনার ও আমার অবস্থা একই। লিখিবার আগে আমিও জানিতাম না যে আপনাদের পক্ষে অত কথা বলিবার আছে।

বস্তুত প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনের সমর্থনে পরপর কয়েকদিন এডিটরিয়েল লিখিয়া আমি নিজেই নিজের যুক্তির ফাঁদে পড়িলাম। যদিও প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন গঠনে আমার কোনও কনট্রিবিউশন ছিল না, সুতরাং উহাকে সফল করিবার কোনও দায়িত্ব আমার ছিল না। ক্রমেই আমার মনে হইতে লাগিল চেষ্টা করিলে ইহাকে সফল করা যাইতে পারে এবং সে চেষ্টা করাও উচিৎ। এমন সময় হক সাহেব এক বিবৃতিতে বলিলেন : ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম বাংলার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, আর হক সাহেব স্বয়ং নিয়াছেন হিন্দু বাংলার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব। হক সাহেব তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যতগুলি ঐতিহাসিক ঘোষণা করিয়াছেন, তার মধ্যে এইটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘোষণা। কারণ হিন্দু সভার নেতা ডা. শ্যামাপ্রসাদকে এই সময় বাংলার, এমনকি গোটা ভারতের, মুসলমানরা নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করিত। সেই ডা. শ্যামাপ্রসাদকেই মুসলিম স্বার্থ রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া মুসলমানরা সোজাসুজি বুঝিল বাঘের হাতেই ছাগল রাখানি দেওয়া হইয়াছে।

৩. আমার রাজনীতিক সাংবাদিকতা

কিন্তু আমি হক সাহেবের ঐ ঘোষণার মধ্যে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনের সাফল্যের চাবিকাঠি দেখিতে পাইলাম। বাহ্যত অসম্ভব এবং হাস্যকর এ ঘোষণা স্পষ্টতই একটা রাজনৈতিক স্টান্ট। সাংবাদিকের দায়িত্ব এটা নয়। 'রাজনীতি' ও 'সাংবাদিকতা সম্পূর্ণ আলাদা কাজ। সাংবাদিকতা উকিলের মত 'প্রফেশনাল' মাত্র, এসব কথা মাত্র কয়েকদিন আগে প্রচার করিয়াছি; ওটা তখনও আমার দৃঢ় মত। তবু আমি হক সাহেবের নবযুগ-এ চাকুরি নিয়া তাঁর রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িলাম। সেটা পারিলাম দুই কারণে। প্রথমত, রাজনীতি ও সাংবাদিকতার স্বাতন্ত্রটা আমার সাম্প্রতিক মত। অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি মাত্র। মুরুব্বিদের কাছে-শেখা জ্ঞান হইতে এই মত সম্পূর্ণ আলাদা। মওলানা ইসলামাবাদী, মওলানা আকরম খাঁ ও মৌলবী মুজিবর রহমান প্রভৃতি শিক্ষাগুরুদের কাছে পাওয়া জ্ঞানের এটা সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংবাদিকতা মিশনারির দায়িত্ব, চাকুরিয়ার কাজ নয়, এটাই শিখিয়াছিলাম এদের খেদমতে। পরে মুরুব্বিদের এই মতের ক্রটি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু অভ্যাস বদলাইতে পারি নাই। শৈশবে-পাওয়া মুরুব্বিদের-দেওয়া জ্ঞান সত্যই মানুষের স্বভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, হক সাহেবের তখনকার রাজনৈতিক সাফল্য-অসাফল্যের সাথে নবযুগএরা মরা-বাঁচা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। নবযুগ-এর বাঁচিয়া থাকা শুধু আমার একার নয়, নবযুগএর শতাধিক চাকুরিয়ার জীবিকা নির্ভর করিতেছে। দু-চারজন বাদে এঁরা সবাই মুসলমান। নবযুগ না থাকিলে এঁদের বিপদ হইবে। কৃষক-এর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে এটা আমি বুঝিয়াছিলাম।

কাজেই অন্তত নবযুগ-এর জন্যও হক সাহেবের এই নয়া রাজনীতিকে সফল করিতেই হইবে, এই প্রয়োজনের বিচারেই আমি সম্পাদকীয় লিখিয়া চলিলাম। তারই একটাতে বলিলাম: এই মুহূর্তে হক সাহেবের পশ্চিম বাংলা ও ডা. শ্যামাপ্রসাদের পূর্ব বাংলা সফরে বাহির হওয়া উচিৎ। এই সম্পাদকীয়ের সমর্থনে আমি হক সাহেব ও ডা. শ্যামাপ্রসাদকে মৌখিক পরামর্শ দিলাম এবং আমার নিজ জিলায় ডা. শ্যামাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ জানাইলাম। তাকে আমি ভরসা দিলাম, আমি নিজে গিয়া সভার আয়োজন করিব এবং লক্ষ লোকের সমাবেশ করাইব। ঐ সভায় ডা. শ্যামাপ্রসাদ যদি মুসলিম স্বার্থ রক্ষার ওয়াদা করিয়া আসেন, তবে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনের গতি ও জয় দুর্বার হইয়া উঠিবে। আমার এই প্রস্তাবে হক সাহেব ও ডা. শ্যামাপ্রসাদ উভয়েই রাজি হইলেন। মি. সন্তোষ কুমার বসু, অধ্যাপক প্রমথ ব্যানার্জী প্রভৃতি অন্য মন্ত্রীরাও পরম উৎসাহেই আমার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

কিন্তু কার্যত তা হইল না। বরঞ্চ হক সাহেব পূর্ব বাংলা এবং শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিম-বাংলা সফরে বাহির হইলেন। বোধ হয় তারা আগে যার যার ঘর সামলানোকেই অধিকতর আসন্ন জরুরি কাজ মনে করিলেন। আমি বুঝিলাম, এই ভুলের দরুনই কোয়ালিশনের সাফল্যের সম্ভাবনা দূর হইল। যদি শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা ব্যর্থই হয়, তবু এ ব্যর্থতায়ও যাতে হক সাহেবের চূড়ান্ত রাজনৈতিক মৃত্যু না ঘটে, সেদিকে নজর রাখিয়া আমি কলম চালাইলাম। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন না বাচুক, হক সাহেবকে বাঁচাইতে হইবে।

## ৪. আমার ব্যক্তিগত সংকট

এই ধরনের লেখা স্বভাবতই হিন্দু মন্ত্রীদের পছন্দ হইল না। যতদূর মনে পড়ে এই সময়ে বিভিন্ন বিভাগের চাকুরির ব্যাপারে বিশেষত এ. আর. পি. বিভাগের চাকুরিতে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া পদদলিত হইতেছে বলিয়া মুসলমানদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা যাইতেছিল, হক সাহেব এবং তার মন্ত্রিসভার কারো কারো সাথে পরামর্শ করিয়াই আমি এ ব্যাপারেও ভারত সরকারের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। এতে হিন্দু মন্ত্রীরা আমার উপর চটিলেন। কেউ-কেউ আমার সাথে তর্ক করিলেন। আমি নানা যুক্তি-তর্ক দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনের জনপ্রিয়তা রক্ষার খাতিরেই আমি ঐ সব লেখা লিখিতেছি।

হক সাহেব পরে আমাকে জানাইলেন, তাঁর হিন্দু মন্ত্রীরা আমার যুক্তিতে মোটেই কনভিন্সড হন নাই। তারা আমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট। কেউ-কেউ আমাকে সরাইবার কথা বলিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হক সাহেব অবশ্য আমাকে আশ্বাস দিলেন, আমার চিন্তার কোনও কারণ নাই। আমি যেভাবে সম্পাদকীয় লিখিতেছি, তাতে তাঁর নিজের এবং মুসলমান মন্ত্রীদের পূর্ণ সমর্থন আছে। অন্যতম মন্ত্রী খান বাহাদুর হাশেম আলী ও বন্ধুবর শামসুদ্দীন আহমদও আমার নীতিতে পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন। উভয়েই আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে বলিলেন।

আমি নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিলাম। নিশ্চিন্ত হওয়া আমার দরকারও ছিল। কারণ ইতিমধ্যে এই সনের আগস্ট মাসেই আমার চতুর্থ পুত্র মনজুর আনামের জন্ম হইয়াছে। আমার সংসার-খরচা বাড়িয়াছে।

## ৫. নজরুলের ধর্মে মতি

ইতিমধ্যে নজরুল ইসলাম সাহেবের মধ্যে একটু-একটু মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল। আগেই শুনিয়াছিলাম, তিনি বরদাবাবু নামক জনৈক হিন্দু যোগীর নিকট তান্ত্রিক যোগ সাধনা শুরু করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে কাজী সাহেব মিষ্ট হাসি হাসিতেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক প্রাণচঞ্চল ছাদ-ফাটানো হাসি তিনি আর হাসিতেন না। তার বদলে উঁচু স্তরের এমন সব আধ্যাত্মিক কথা বলিতেন, যা সংবাদপত্র আফিসে মোটেই মানায় না। একদিন আফিসে। আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন : একটা জায়নামাজ ও অযুর জন্য একটা বদনা কিনাইয়া দিন। তাই করা হইল। আফিসে দুতালার পিছন দিকে একটি ছোট কামরাকে নামাজের ঘর করা হইল। কাজী সাহেব সপ্তাহে দু চার দিন যা আসিতেন এবং দুই-তিন ঘণ্টা যা থাকিতেন তার সবটুকুই তিনি অযু ও নামাজে কাটাইতেন। অযু করিতে লাগিত কমছে-কম আধ ঘণ্টা। আর নামাজে ঘণ্টা দুই। এ নামাজের কোনও ওয়াকত-বেওয়াকত ছিল না। কেরাত-রুকু-সেজদা ছিল না। জায়নামাজে বসিয়া হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিতেন এবং তার পরেই মাটিতে মাথা লাগাইতেন, সিজদার মত কোমর উঁচা করিয়া নয়, কোমর উরুর সাথে ও পেট জমির সাথে মিশাইয়া। এইভাবে ঘণ্টার-পর ঘণ্টা এক সিজদায় কাটাইয়া দিতেন। আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাতে তিনি সিজদা শেষ করিয়া একবারই মাথা উঠাইতেন।

আমাদের দুশ্চিন্তার মধ্যেও এইটুকু সান্ত্বনা ছিল যে অন্তত তান্ত্রিক সাধনা ছাড়িয়া তিনি মুসলমানি এবাদত ধরিয়াছেন। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর তিনি একদিন আমাকে বলিলেন : তাঁকে সেই

দিনই পাঁচ শত নামাজশিক্ষা কিনিয়া দিতে হইবে। কারণ তাঁর পাঁচ শত হিন্দু মহিলা শিষ্য হইয়াছেন; তাঁদের সকলকে কাজী সাহেব নামাজ শিখাইবেন। তখন শেখ আবদুর রহিম সাহেবের নামাজ শিক্ষা'র দাম পাঁচ আনা। পাঁচশ কপি কিনিতে লাগে প্রায় দেড়শ টাকা। ম্যানেজার, একাউন্টেন্ট ও ক্যাশিয়ার গোপনে আমার সাথে। পরামর্শ করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হইল, দশটা টাকা দিয়া একজনকে বাজারে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। দশ টাকায় যা পাওয়া যায় আনিয়া বলা হউক, মার্কেটে আর কপি নাই। তাই করা হইল। ত্রিশ কপি নামাজ শিক্ষা আনিয়া কাজী সাহেবকে দেওয়া হইল। ঐ কৈফিয়তটাও দেওয়া হইল। আশ্চর্য এই যে কাজী সাহেব ঐ ত্রিশ কপি পাইয়াই খুশি হইলেন এবং বিনা প্রতিবাদে চলিয়া গেলেন। আর কপি কোনও দিন চাইলেন না। আরো কপি কিনিবার ভয়ে কাজী সাহেবের হিন্দু শিষ্যদের নামাজ শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধেও আমরা কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিন্তু কাজী সাহেবের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আমার সহকর্মী মি. কালীপদ গুহ ও মি. অমলেন্দু দাসগুপ্ত এটাকে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। এই দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আগের পরিচয় ছিল না। আমার দীর্ঘদিনের সাংবাদিক জীবনে বা কংগ্রেসী রাজনীতিতে এঁদেরে কোনও দিন দেখি নাই। তবু কাজী সাহেবের পীড়াপীড়িতে আমরা এই দুইজনকেই সহকারী সম্পাদক করিয়া নিয়াছিলাম। কাজী সাহেব এবং বোধহয় ম্যানেজমেন্টের কেউ-কেউ আমাকে বলিয়াছিলেন যে উহারা যুগান্তর'-'অনুশীলন দলের বিপ্লবী লোক বলিয়াই কংগ্রেসী রাজনীতিতে ওঁদের সাক্ষাৎ পাই নাই। শুনিয়া শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হইল। ওঁদেরে সহকারী সম্পাদক নেওয়া হইল কারণ ওঁদের দুইজনেই শক্তিশালী লেখক ছিলেন। বিশেষত, অমলেন্দু বাবুর কলমে খুবই জোর ছিল। তবে সাংবাদিকতায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবেই বোধ হয়, তাঁদের লেখাগুলি বাস্তবের চেয়ে অবাস্তব, জার্নালিস্টেকের চেয়ে লিটারিরি, অবজেকটিভের চেয়ে সাবজেকটিভই হইত বেশি। সেজন্য তাঁদের সব লেখা ছাপা যাইত না। সেজন্য তারা বোধ হয় মনে-মনে আমার প্রতি। অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কাজী সাহেবের কাছে বোধ হয় এক-আধবার নালিশও করিয়াছিলেন। কাজী সাহেব সম্পাদনার ব্যাপারে মোটেই হাত দিতেন না। তাঁর সময়ই ছিল না। কাজেই তাঁরা মনে-মনে আমার উপর বিক্ষুব্ধ ছিলেন, এটা বলা যায়। কিন্তু আমি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হইলাম। কাজী সাহেবের অসুখকে তারা অগ্রাহ্য করিতেন বলিয়া। শুধু অগ্রাহ্য করা নয়, এটাকে তারা আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। আমি ও-সব কথাকে প্রথমে হাসিয়া এবং পরে দৃঢ়তার সাথে উড়াইয়া দিতাম বলিয়া আমার সামনে তারাও ও-বিষয়ে কথা আর বলিতেন না। ফলে লাভ এই হইল যে, কাজী সাহেব আমার রুমে তার নির্দিষ্ট আসনে না বসিয়া প্রায়ই সহ-সম্পাদকের জন্য নির্দিষ্ট রুমে অমলবাবুদের সাথেই বেশি সময় কাটাইতেন। তিনিই আইনত নবযুগএর প্রধান-সম্পাদক। তাঁর আসনও প্রধান-সম্পাদকের উপযোগী করিয়া সাজানো। গদি-আঁটা-চেয়ার, সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে বিশালকার ব্লটিং প্যাড হইতে শুরু করিয়া প্রকাণ্ড কাঁচের দোয়াতদান, দুরঙ্গা দুইটা কালি-ভরা দোয়াত-কলমসহ পেন হোল্ডার, পেপার-কাটার সবই সাজান থাকিত। কিন্তু এ সব ফেলিয়া তিনি অমলবাবুদের রুমে কাঠের চেয়ারে বসিয়া চুপি-চাপি আলাপ করিতেন। নজরুল ইসলাম বাংলার তরুণদের বিশেষত মুসলিম তরুণদের জন্য বিরাট আকর্ষণ। প্রধানত তাঁকে দেখিবার জন্যই মুসলিম ছাত্ররা দলে-দলে নবযুগ আফিসে আসিত। অন্য কোনও কারণই ছিল না তাদের। মুসলিম ছাত্রসমাজের প্রায় গোটাটাই এই সময় পাকিস্তান আন্দোলনের সুতরাং মুসলিম লীগের, সমর্থক এবং হক সাহেবের নবযুগ-এর সমর্থক। গোড়াতে নজরুল ইসলামকে ঘিরিয়া মুসলিম ছাত্র-তরুণদের সমাগমে নবযুগ আফিস সরগরম থাকিত। এইরূপ

মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেওয়ার পর হইতে তিনি যেন ছাত্রদের এই ভিড় না-পছন্দ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁকে তাঁর সিটে থাকার পরামর্শ দিয়া আমলবাবু ও বরদাবাবুর যোগটোগের সমালোচনা করায় তিনি গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন : বরদাবাবু সিদ্ধ পুরুষ, তিনি বার বছর আগে-মরা বুলবুলকে একদিন সশরীরের তাঁর সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা বলিলে তিনি মনে কষ্ট পান। আমার সমালোচনার এটা দৃঢ় প্রতিবাদ। এরপর আমি আর কোনও কথা বলি নাই।

৬. নজরুলের আধ্যাত্মিকতা

তিনি দরজা বন্ধ করিয়া গোপনে আমার সাথে অনেক আধ্যাত্মিক আলোচনা করিতেন। আলোচনা করিতেন মানে তিনি বলিয়া যাইতেন, আমি শুনিয়া যাইতাম। এ সব কথার মধ্যে দুর্বোধ্যতা, এমনকি অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞানহীনতা থাকিলেও তাতে পাগলামি ছিল না। বরঞ্চ অনেক কথা আমার ভাল লাগিত। এমন ধরনের একটি কথা এখানে উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। একদিন তিনি আফিসে আসিয়া নিজের আসনে বসিলেন। মিনিট খানেক কী ভাবিলেন। পরে নিজের আসন ছাড়িয়া আমার টেবিলের সামনের ভিজিটার্স সিটে বসিলেন। তারপর আমার দিকে গলা বাড়াইয়া গোপন কথা বলিবার ভঙ্গিতে বলিলেন, তার সারমর্ম এই : তিনি এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য চীনা দেওয়াল উঠিয়াছে। তারা উভয়ে উভয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছেন। তারা উভয়েই পরস্পরের প্রেমের রজু টানিয়া একজন আরেকজনকে নিজের কাছে নিতে চাহিতেছেন। উভয়ের মধ্যে এই টাগ-অব-ওয়ার চলিতেছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। কিন্তু এ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ এটা অবৈজ্ঞানিক। কীরূপে, তা বুঝাইবার জন্য তিনি আমার টেবিলের উপর হইতে একটা বড় ডিকশনারি লইয়া তা উপুড় করিয়া টেবিলের উপর বসাইলেন। কলমদানের উপর হইতে এক টুকরা মোটা সুতা লইয়া তার দুই মাথায় দুইটা পেপার-ওয়েট সুকৌশলে বাঁধিলেন। এবং খাড়া করা বইটার উপর তা ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর তিনি বলিলেন : লক্ষ্য করুন, দুইটা পেপার-ওয়েট সমান ওজনের। তাই একটার ভারে অপরটা উঠিয়া আসিতেছে না। উভয়ের ওজন সমান না হইয়া যদি একটা অপরটার দশ গুণ ভারী হইত, তবে ভারীটার টানে পাতলাটা উঠিয়া আসিত। কারণ গত কয়েক বছর ধরিয়া আমি নিজের ওজন স্ত্রীর ওজনের দশ গুণ বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেক বাড়াইয়াছি। কিন্তু যথেষ্ট বাড়াইতে পারি নাই। তাই আমি ওজন বাড়াইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া দেওয়ালের চূড়ায় উঠিয়া সেখান হইতে তাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি। সেটা কেন দরকার এবং কেমন করিয়া সম্ভব, তাই এখন বুঝাইতেছি।

এইখানে আমাকে তিনি প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে নিচে হইতে টানিয়া অপর পারের পেপার-ওয়েটটা এ পাশে আনা যত কষ্টসাধ্য, বইটার উপর হইতে টানিয়া তোলা তেমন কঠিন নয়, অনেক সহজ। এটা যখন আমি অতি সহজেই স্বীকার করিলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন : “অতএব আমি স্থির করিলাম আমি এই চীনা দেওয়ালের উপর উঠিব। সেখান হইতেই স্ত্রীকে টানিয়া তুলিব। গত এক বছর এই চেষ্টা করিয়াও পারি নাই। এখন আমাকে অগত্যা দেওয়ালের অপর পারে নামিয়া পড়িতে হইবে। উপর হইতে রশি ধরিয়া টানিয়া তোলার চেয়ে ওপারে মিয়া ওকে কাঁধে তুলিয়া নিয়া আসা অনেক সহজ হইবে।’ আমি ব্যাপারটা বুঝিবার জন্যই

জেরা করিলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত বলিলেন : ‘আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন আমাকেও আমার স্ত্রীর রোগে পীড়িত হইতে হইবে।’

৭. নজরুলের রোগ লক্ষণ

কাজী সাহেবের স্ত্রী বহুদিন ধরিয়া দুরারোগ্য পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছেন। তার রোগের রোগী হওয়া মানে কাজী সাহেবেরও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া। কথাটা মনে হইতেই গা কাঁটা দিয়া উঠিল। এই অশুভ চিন্তার জন্য মনে-মনে তওবা করিলাম। কাজী সাহেব আমার বিচলিত ভাব দেখিয়া সান্ত্বনা দিলেন : ‘চিন্তার কোনও কারণ নাই। ব্যাপারটাকে যত সাংঘাতিক মনে করিতেছেন, তত সাংঘাতিক এটা নয়। আমি আমার স্ত্রীর মত অসুস্থ হইয়া আবার ভাল হইব এবং তখন স্ত্রীও আমার সাথে-সাথে আরোগ্য লাভ করিবে। আধ্যাত্মিক সাধনার বলে এমন ইচ্ছাধীন রোগাক্রান্তি এবং রোগমুক্তি সম্ভব এটা বৈজ্ঞানিক কথা। এটাকে বলে সাইকো-থিরাপি। আমার মন মানিল না, কারণ আমি ও-সম্বন্ধে কোনও বই-পুস্তক পড়ি নাই। কেমন যেন অশুভ অশুভ মনে হইতে লাগিল। যিনি শুনিলেন তিনিই এটাকে মস্তিষ্ক বিকারের লক্ষণ বলিলেন।

এরপর কাজী সাহেব আফিসে আসা একদম বন্ধ করিয়া দিলেন। শুধু বেতন নিবার নির্ধারিত তারিখে রশিদ সই করিয়া টাকা নিতে আসিতেন। তাও খবর দিয়া আনিতে হইত। কয়েক মাস পরে তা-ও বন্ধ করিলেন। লোক পাঠাইয়া বেতনের টাকা নিতে লাগিলেন। নজরুল ইসলাম সাহেবই ছিলেন নবযুগ আফিসে ছাত্র-তরুণদের বড় আকর্ষণ। তিনি আর আফিসে আসেন না কথাটা জানাজানি হইয়া যাওয়ায় আস্তে-আস্তে তাদেরও যাতায়াত কমিয়া গেল।

ইতিমধ্যে হক সাহেব একদিন কথা প্রসঙ্গে নবযুগ-এর আর্থিক দুরবস্থার কথা আমাকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন : মন্ত্রী হওয়ার আগে সকলেই তাঁদের বেতনের মোটা অংশ পত্রিকা ফান্ডে দিবার ওয়াদা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও মন্ত্রীই তার ওয়াদা পূরণ করেন নাই।’ কিছুদিন ধরিয়া আমিও এই আশঙ্কাই করিতেছিলাম। কারণ পরিচালকদের অর্থাভাবের হাওয়া বেতন-ভোগীদের গায়েই সবার আগে লাগিয়া থাকে। আমার চোখে-মুখে বোধহয় দুশ্চিন্তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হক সাহেব আমাকে আশ্বাস দিলেন, বিপদটা খুব আসন্ন নয়। আমি হক সাহেবের। আশ্বাসে খুব ভরসা পাইলাম না বটে, কিন্তু খুব চিন্তাযুক্তও হইলাম না। কারণ আমার কাছে এটা খুব অচিন্তিত-আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। এমন কিছু একটা ঘটিবে, আগে হইতেই তা আমি জানিতাম। তবে অত তাড়াতাড়ি হইবে তা জানিতাম না। তাছাড়া চাকরি পাওয়া-যাওয়া, সাধারণ আর্থিক দুরবস্থা ও বিপদ-আপদের সাথে এই কুড়ি-বাইশ বছরেই এত বেশি পরিচিত হইয়া গিয়াছি যে অদূর-ভবিষ্যতে বিপদের। সম্ভাবনাতেও চঞ্চল হইয়া উঠিলাম না।

৮. মি. দত্তের আবির্ভাব

ইহার কিছুদিন পরে মি. হেমেন্দ্র নাথ দত্ত আমার রুমে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন : নমস্কার মনসুর সাব, কৃষক-এ আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। ভগবানের ইচ্ছায় নবযুগ্এ আবার একত্র হইলাম।

বিনা-খবরে মি. দত্ত আমার ঘরে প্রবেশ করায় আমি বিস্মিত হইলাম না। কারণ মাত্র কয়েকদিন আগে বন্ধুবর অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের মুখে। শুনিয়াছিলাম, মি. দত্ত একটা বড় রকমের চাউলের কন্ট্রাক্ট পাইতেছেন। এবং হক সাহেব ঐ কন্ট্রাক্টের বদলা নবযুগ তহবিলে চাঁদা দাবি করিতেছেন। মি. দত্ত এককালীন চাঁদা না দিয়া নবযুগ-এর পরিচালন-ভার নিতে রাজি আছেন বলিয়া কিছু-কিছু কানাঘুষা শুনিতেছিলাম। কাজেই বিন্দুমাত্র-বিস্ময়ের ভাব না দেখাইয়া আমি প্রতি-নমস্কার দিলাম এবং হাত ইশারায় সামনের একটা চেয়ার দেখাইয়া মি. দত্তকে বসিতে বলিলাম। সাধ্যমত আত্মসম্বরণ করিয়া হাসি মুখের জবাবে হাসিমুখেই বলিলাম: কী রকম?

জবাবে মি. দত্ত যা বলিলেন তার সারমর্ম এই যে, হক সাহেব তাকে নবযুগ পরিচালনের ভার দিয়াছেন। তিনি সাধ্যমত নবযুগএর উন্নতির চেষ্টা করিবেন। টাকা-পয়সার জন্য আমাকে আর কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। নবযুগকে বাংলার শ্রেষ্ঠ দৈনিক করিতে আমার যত-কিছু স্কিম আছে, এখন হইতে তার সবগুলি আমি প্রয়োগ করিতে পারি।

মি. দত্ত প্রফুল্ল বদনে পরম উৎসাহের সঙ্গেই তাঁর কথাগুলি বলিয়াছিলেন। হয়ত আশা করিয়াছিলেন, আমিও উৎসাহ প্রকাশ করিব। কিন্তু আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাইলাম না। এক বছর আগে কৃষক উপলক্ষ করিয়া যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তার সবগুলি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। আমি বোধহয় তৎক্ষণাৎ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম নবযুগ-এ কাজ করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই আমি কৃত্রিম ভদ্রতা দেখাইয়া নিতান্ত জোর-করা হাসি মুখে বলিলাম : এ খোশ-খবরটা আপনি নিজে বহন না করিয়া যদি হক সাহেবের মারফত পাঠাইতেন, তবে ব্যাপারটা সুন্দর হইত।

মি. দত্ত আমার নিকট হইতে এমন রূঢ় কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিনা জানি না। কিন্তু তিনি অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী লোক। আমার কথার মধ্যেকার অপমানটা গায় না মাখিয়া মুখের হাসি বজায় রাখিয়া বলিলেন : 'ও-সব টেকনিক্যাল ফরমালিটি যথাসময়ে হইয়া যাইবে। তার জন্য আমাদের বসিয়া থাকা উচিৎ নয়। আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও অন্তরের সম্বন্ধ তাতে টেকনিক্যাল কথার স্থান নাই।' নবযুগকে উন্নত করার কাজে তার ও আমার পূর্ণ সহযোগিতা দরকার, এই জন্যই তিনি ফর্মালিটির অপেক্ষায় বসিয়া না। থাকিয়া প্রথম সুযোগেই আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। এ ব্যাপারে আমার সমস্ত দ্বিধা-সন্দেহের অবসান ঘটাইবার জন্যই বোধহয় তিনি কবে, কী শর্তে নবযুগ-এর ভার নিয়াছেন, কার-কার সামনে কথা হইয়াছে, কে-কী বলিয়াছেন, সব কথা বলিয়া ফেলিলেন।

আমি বোধহয় মাত্রাতিরিক্ত চটিয়া গিয়াছিলাম। তাঁর কথা মনোযোগ দিয়া শুনিবার আগ্রহ আমার ছিল না। তবু শুধু ভদ্রতার খাতিরে বাধা দিলাম না। তার কথা শেষ হইলে বলিলাম : 'এ সব কথা আমাকে বলিয়া লাভও নাই, দরকারও নাই। হক সাহেবের মারফতই এসব কথা জানাইবেন। হক সাহেব আপনাকে নবযুগ-এর পরিচালক বানাইয়াছেন, তিনি নিজেই আমাকে একথা জানাইবেন। তার পর আপনার পরিচালনায় নবযুগ্এ আমি চাকরি করিব কিনা, সে কথাও আমি হক সাহেবকেই জানাইব। আপনি মেহেরবানি করিয়া এখন যান। আমার কাজ আছে।

বলিয়া একটা প্যাড টানিয়া লেখা শুরু করিবার উদ্যোগ করিলাম, যদিও তখনি লেখার তাড়া ছিল না।

৯. লজ্জাকর দুর্ঘটনা

মি. দত্ত স্বভাবতই অপমান বোধ করিলেন। তিনি ধৈর্য হারাইলেন। এতক্ষণের ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের পোশাক তাঁর একদম খসিয়া পড়িল। তিনি গলায় অতিরিক্ত জোর দিয়া বলিলেন : 'আমাকে এভাবে এখান হইতে যাইতে বলার কোনও অধিকার আপনার নাই। আপনি জানেন, আজ হইতে এ। আফিসের মালিক আমি। আমি বাহির হইয়া যাইব না। যদি আমাদের দুইজনের কারো বাহির হইয়া যাইতে হয়, তবে সে ব্যক্তি আমি নই, আপনি।'

আমি বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিলাম: 'আপনি এ আফিসের কর্তা হইলে আমি এখানে থাকিব না। তা আমি মানি। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে আমিই এখানে কর্তা। সুতরাং আপনিই দয়া করিয়া বাহির হইয়া যান।'

মি. দত্ত চেয়ার ছাড়িতেছেন না দেখিয়া আমিই চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম। মি. দত্ত আমার এই দাঁড়ানোর খুব খারাপ অর্থ করিলেন। আমাকে উঠিতে দেখিয়াই তিনি চট করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন এবং বলিলেন : আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এ অপমানের আমি বিচার করাইব। অবশ্যই করাইব।

মি. দত্তের গলা ও সর্বাঙ্গ কপিতেছিল। তিনি অতি ব্যস্ততার সহিত দরজার দিকে ছুটিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হুমড়ি খাইয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেলেন এবং মূর্ছা গেলেন। আমার রুমের সামনেই প্রকাণ্ড হলঘর। এই হলঘরটাই। আমাদের আফিস ঘর। ম্যানেজার, একাউন্টেন্ট ও তাদের গোটা স্টাফই এই হলে বসেন। আফিস পাঁচটায় ছুটি হইয়া গেলেও ম্যানেজার ও একাউন্টেন্ট দুই একজন সহকারী লইয়া কাজ করিতেছেন। মি. দত্ত তার এক ছেলেকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পিতাকে আমার রুমে ঢুকাইয়া ম্যানেজারের সাথে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। দত্ত সাহেবকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া এঁরা সকলেই ছুটিয়া আসিলেন। চোখে-মুখে পানি ছিটাইয়া যথাসম্ভব প্রাথমিক তদবিরাদি করিয়া তাঁকে ধরাধরি করিয়া গাড়িতে তোলা হইল। দত্ত সাহেবের নিজের মোটর রাস্তায় দাঁড়ান ছিল। সেই গাড়িতেই তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হইল। পরে টেলিফোনে জানিতে পারিলাম, পথেই তার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসায় হাসপাতালে নেওয়ার দরকার হয় নাই। তিনি এখন ভাল আছেন।

ব্যাপারটা নিতান্তই আকস্মিক। আমার জন্য বড়ই লজ্জাকর। লোকে কী মনে করিবে? আমার মত ছয়ফুট লম্বা একটা জওয়ান মানুষের কামরায় চৌকাঠে দত্ত সাহেবের মত বৃদ্ধ ও শীর্ণ মানুষ বিনা কারণে হুমড়ি খাইয়া নিশ্চয়ই পড়েন নাই। দত্ত সাহেবকে নিয়া যাওয়ার পর-পরই আমাদের স্টাফের প্রায় সকলে আমার কামরায় ভিড় করিয়া আমার কথা শুনিলেন এবং সকল কথা শুনিয়া আমাকে কংগ্রেচুলেট করিলেন। কিন্তু আমি নিজে খুব উৎসাহ পাইলাম না। এই ঘটনার পরে এখানে আমার চাকুরি নাই, এ কথাটা হয়ত আমার মনের তলে লুকাইয়া আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিতে ছিল। কিন্তু আমার মনে যা পীড়া দিতেছিল তা ছিল আমার ব্যবহার। আমার ক্রমেই বেশি করিয়া মনে হইতে

লাগিল, সব দোষ আমার, দত্ত সাহেবের কোনও দোষ নাই। মনটা খারাপ হইল। সকলকে বিদায় দিয়া লেখায় ডুবিবার চেষ্টা করিলাম।

পরদিনই হক সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেন। যা অনুমান করিয়াছিলাম তাই। দত্ত সাহেব আগেই হাজির। আমি গেলে হক সাহেব আমাদের দুইজনকে লইয়া তাঁর শোবার ঘরে গেলেন। কাউকে কিছু বলিতে না দিয়া তিনিই শুরু করিলেন। ওয়াদা-করা চাঁদা না দেওয়ার অপরাধে সমস্ত মন্ত্রীদের বিশুদ্ধ বরিশালী ভাষায় গাল দিয়া, আর্থিক দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া তিনি। আমাকে বুঝাইলেন, তিনিই বাধ্য হইয়া অনিচ্ছুক দত্ত সাহেবকে এ ব্যাপারে টানিয়া আনিয়াছেন। দত্ত সাহেব রাজি না হইলে তিনি অগত্যা নবযুগবন্ধই করিয়া দিতেন। এমতাবস্থায় আমাকে ও দত্ত সাহেবকে এক যোগে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেই হইবে। গতকালের ব্যাপারটা উভয়কেই ভুলিয়া যাইতে হইবে। ওতে দত্ত সাহেবেরও দোষ আছে। দত্ত সাহেব অন্তত নান্না মিয়াকে সঙ্গে না লইয়া আফিসে যাইয়া কাজ ভাল করেন নাই। আমারও দোষ আছে। দত্ত সাহেবকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া ঠিক হয় নাই। হক সাহেবই কথা শুরু করিয়াছিলেন। তিনিই শেষ করিলেন। আমাদের কোনও কথা বলিতে দিলেন না। নবযুগ চালাইতে হইলে আমাদের উভয়কে মিলিতে হইবে, এই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে মুসাফিহা করাইয়া বিদায় দিলেন।

১০. আগুনে ইন্ধন

আমরা ভুলিতে চেষ্টা করিলে কী হইবে? পাড়ার লোক আমাদের ভুলিতে দিল না। ভোটরঙ্গ ও অবতার নামে এই সময়ে কলিকাতায় খুব জনপ্রিয় দুইটি ব্যঙ্গ-সাপ্তাহিক ছিল। আমাদের ঘটনা লইয়া ওদের একটিতে হেমেন্দ্র বধ কাব্য ও আরেকটিতে হেমেন্দ্র-মনসুর সংবাদ নামে অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুইটি কাব্য-নাটিকা প্রকাশিত হইল। তার ফলে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কলিকাতার রাস্তাঘাটে, ট্রামে-বাসে, স্কোয়ারে-ময়দানে, আমরা দুইজন আলোচনার বিষয় থাকিলাম। লেখা দুইটি ছিল মোটামুটি শক্তিশালী লেখকের হাতের। সুতরাং প্যারডি খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। ভাষায় যথেষ্ট মুনশীয়ানা ছিল। এই মুনশীয়ানা করিতে গিয়া লেখককে স্বভাবতই কল্পনার আশ্রয় নিতে হইয়াছিল। তবু তাকে সত্য-অর্ধসত্য মিলিয়া মোটামুটি লেখা দুইটিতে সত্যের রূপ দিতে পারিয়াছিল। ওতে আমাকেও যথেষ্ট বিদ্রূপ করা হইয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যিক রণযোদ্ধা হিসাবে আমি সে সব বিদ্রুপের কশাঘাতকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু রস-কষহীন নিরেট ব্যবসায়ী ভাল মানুষ দত্ত সাহেব ঐ স্যাটায়ারের রস গ্রহণ করিতে স্বভাবতই অসমর্থ হইলেন। বরঞ্চ তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেন, ও-দুইটা ব্যঙ্গ-রচনা আমার সাহায্যে লেখা হইয়াছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখাইলেন যে, রচনা দুইটিতে আমাকে নরম হাতে এবং দত্ত সাহেবকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। ফলে আমরা উভয়কে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। দত্ত সাহেব এর পরে দুপুরের দিকেই নবযুগ”এ আসিতেন। বিকাল বা সন্ধ্যায় কখনও আসিতেন না।

এই সময়ে আমি কঠিন আমাশয়ে আক্রান্ত হই। ডাক্তার স্থান পরিবর্তনের উপদেশ দেওয়ায় আমি হক সাহেবের নিকট হইতে এক মাসের ছুটি নিয়া সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে চলিয়া যাই। বার্তা সম্পাদক কবি বেনীর আহমদকে মাসখানেক কোনও মতে চালাইয়া যাইবার ভার দিয়া যাই।

## ১১. 'নবযুগে' চাকুরি খতম

ছুটির পনের দিন যাইতে না যাইতেই নজরুল ইসলাম সাহেবের এক টেলিগ্রাম পাইলাম : আপনার সার্ভিসের আর দরকার নাই।' অর্থাৎ আমার চাকুরি খতম। এমনটি একদিন ঘটিবেই, তা জানিতাম। কিন্তু কাজী সাহেব আমাকে টেলিগ্রাম করেন কেন? হয় হক সাহেব নয় ত মি. দত্তই আমার চাকুরি খতম করিবেন। কাজী সাহেব কেন? আমার সন্দেহ হইল। আমি আগেই জানিতাম, অন্যতম মন্ত্রী এবং কাগজে-পত্রে নবযুগ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর খান বাহাদুর হাশেম আলী ঐদিন ময়মনসিংহ শহরে আছেন। আমি তার সাথে দেখা করিলাম। তিনি ব্যাপার শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন। এটা কিছুতেই বরদাশত করা হইবে না বলিয়া তিনি অবিলম্বে কলিকাতা যাইতে আমাকে পরামর্শ দিলেন। তিনি নির্দিষ্ট ট্যুর প্রোগ্রাম শেষ করিয়াই দু-চার দিনের মধ্যেই কলিকাতা ফিরিবেন বলিলেন।

মন বলিল কোনও লাভ হইবে না। তবু কলিকাতা গেলাম। কারণ দেনা-পাওনা মিটাইয়া এবং জিনিস-পত্র গোছাইয়া আসিতে একবার কলিকাতা ত যাইতেই হইবে। সে জন্য বাড়িতে কাউকে কিছু না বলিয়া শহরে দু-এক বন্ধুকে আমার জন্য একটি বাড়ি ঠিক করিতে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা গেলাম। হক সাহেবের সাথে দেখা করিয়া টেলিগ্রামটা দেখাইলাম। তিনি শুধু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না : 'কোন বদমায়েশ এই বদমায়েশি করিল' বলিয়া দু-চারটা হুঙ্কারও দিলেন। কিন্তু নান্না মিয়া, মি. সৈয়দ বদরুদ্দোজা, নূরুল হুদা ও বেনযীর আহমদের নিকট আসল কথা জানিতে পারিলাম। তারা যা বলিলেন তার সারমর্ম এই : আমি ছুটিতে যাওয়ার পর হইতেই মি. দত্ত হিন্দু মন্ত্রীদিগকে দিয়া আমাকে সরাইবার জন্য হক সাহেবের উপর চাপ দেওয়া শুরু করেন। হক সাহেব শেষ পর্যন্ত রাজি হন। কিন্তু নিজে ডিসমিস করিতে রাজি হন না। দত্ত সাহেব নিজেও ডিসমিসের পত্র দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাজেই অনেক বুদ্ধি-পরামর্শ করিয়া তিনি কাজী সাহেবকে ধরেন। কাজী সাহেবের সঙ্গে মি. দত্ত একা অনেক আলাপ করিতেন। সে আলাপে নূরুল হুদা ও বেনযীর আহমদকে কাজী সাহেবের কাছে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। তবে তারা শুনিয়াছেন কাজী সাহেবের সমস্ত দেনা শোধ করিবার ওয়াদা করিয়া মি. দত্ত কাজী সাহেবকে চিঠির বদলে টেলিগ্রাম করিতে রাজি করিয়াছেন। কাজী সাহেবের এই কাজের নিন্দা সকলেই করিলেন। আমিও মনে আঘাত পাইলাম। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কাজী সাহেবের তৎকালীন মানসিক অবস্থার কথা মনে পড়ায় তাঁর প্রতি নরম হইয়া গেলাম।

ফলে নবযুগ-এ ফিরিয়া যাওয়ার আশা ও চেষ্টা ত্যাগ করিলাম। তাঁর বদলে মাথায় একটা দুষ্ট-বুদ্ধি গজাইল। মাত্র কয়েকদিন আগে বোম্বাই হাইকোর্টের একটা রুলিং খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। তাতে বলা হইয়াছে নিয়োগ-পত্রে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত লেখা না থাকিলে সাংবাদিককে বরখাস্ত করিতে তিন মাসের নোটিস লাগিবে। আমি হক সাহেবকে সে কথা বলিলাম। তিনি খুশি হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন যে মি. দত্তের সঙ্গে আমার বনিবে না, তা তিনি জানিতেন। অথচ আমাকে ছাড়িতেও তাঁর মনে কষ্ট হইতেছিল। এখন আমি স্বেচ্ছায় সরিয়া যাইতে রাজি হওয়ায় তাঁর বুকের উপর হইতে একটা পাথর নামিয়া গেল। তিনি নিশ্চয় মি. দত্তকে দিয়া তিন মাসের বেতন দেওয়াইয়া দিবেন। বোধ হয় পরদিনই তিনি আমাকে জানাইলেন, মি. দত্ত টাকা দিতে রাজি হইয়াছেন। কিন্তু আমার দাবি-মত নয়শ টাকা নয়। কারণ আমার বেতন আড়াইশ।

ওরই তিন মাস হইবে। এলাউন্সের পঞ্চাশ টাকা নোটিসের সঙ্গে আসিবে না। বুঝিলাম এটা লইয়া দরকষাকষি করিয়া সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। সাড়ে সাতশ টাকা লইয়া সকল দাবি-দাওয়া ত্যাগের রশিদ লিখিয়া দিলাম। এই ভাবে আমার সাংবাদিক জীবনের তৃতীয় পর্যায় শেষ হইল।

# ২০. চতুর্থ পর্যায় ‘ইত্তেহাদ’

## অধ্যায় বিশ - চতুর্থ পর্যায়

### ১. ‘ইত্তেহাদ’

আমার সাংবাদিক জীবনের চতুর্থ এবং শেষ পর্যায় শুরু হয় ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব আমাকে সম্পাদক করিয়া একটি বাংলা দৈনিক বাহির করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লিমিটেড কোম্পানি করিয়া আমার বিশেষ বিশ্বস্ত বন্ধু নবাবদা হাসান আলী চৌধুরীকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও আমার অনুজ প্রতিম বন্ধু মি. ফারুকুল ইসলামকে সহকারী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করিতে শহীদ সাহেব রাজি হওয়ায় আমি সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে সম্মত হইলাম। আমি তখন কলিকাতা আলীপুরে উকালতি করি। ব্যবসাও ভাল জমিয়াছে। কাজেই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া শহীদ সাহেব বেতনে-ভাতায় আমাকে মোট এক হাজার টাকা মাহিয়ানা দিলেন। বিরাট ধুমধামে ইত্তেহাদ বাহির হইল। আমার গোটা সাংবাদিক জীবনের মধ্যে এইটাই আমার সবচেয়ে সুখ, আরাম ও মর্যাদার মুদ্দত ছিল। বরাবরের মত পূর্ণ সাংবাদিক স্বাধীনতা ত এখানে ছিলই, তার উপর ছিল অর্থ-চিন্তার অভাব এবং নবাবযাদা ও ফারুকুল ইসলামের সুষ্ঠু পরিচালনা।

### ২. আমার চরম সাফল্য

ইত্তেহাদ অল্পদিনেই খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইহার প্রচারসংখ্যা অনেক। পুরাতন দৈনিকের দুই-তিন গুণ হইয়া যায়। জনপ্রিয় রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থন, সু-সম্পাদন, সুন্দর ছাপা, কাগজ, সাইয, নিয়মিত প্রকাশ ও বিতরণ ইত্যাদি যে সব কারণে দৈনিক কাগজ জনপ্রিয় হইয়া থাকে, সে সব গুণ ইত্তেহাদ-এর ছিল। তবু ঐ সব গুণেই ইত্তেহাদ-এর জনপ্রিয়তা শেষ কথা ছিল না। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইত্তেহাদ-এর জনপ্রিয়তার গূঢ় তত্ত্ব অন্যত্র নিহিত ছিল। এক কথায়, সেটা সাংবাদিক চেতনা। প্রায় পঁচিশ বছর সাংবাদিকতার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এবং এ সম্পর্কে বিদেশি বই-পুস্তক ও সংবাদপত্র পড়িয়া সাংবাদিকের দায়িত্ব সম্পর্কে আমার সামান্য যা কিছু জ্ঞান। লাভ হইয়াছিল, তার সবটুকু ইত্তেহাদএ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা আমি করিয়াছিলাম। পরিচালকগণ সে সুযোগও আমাকে দিয়াছিলেন। আমার ঐ অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিয়াছিলাম :

(১) সাংবাদিকতা নিছক সংবাদ সরবরাহ নয়, সংবাদের সুষ্ঠু ব্যাখ্যাও বটে।

(২) সাংবাদিকতার সাথে রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাজনীতিতে পার্টিগত শ্রেণীগত মতভেদ অপরিহার্য। কিন্তু এই মতভেদ সত্ত্বেও সাধু সাংবাদিকতা সম্ভব।

(৩) বিরুদ্ধ পক্ষকে অভদ্র কটুক্তি না করিয়াও তার তীব্র সমালোচনা করা যাইতে পারে ভদ্রভাষায়। বস্তুত সমালোচনার ভাষা যত বেশি ভদ্র হইবে, সমালোচনা তত তীক্ষ্ণ ও ফলবতী হইবে।

(৪) প্রত্যেক মতবাদের সুষ্ঠু, উদার, বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা নিজের মতের পক্ষে এবং বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে জনমত তৈয়ার করা অধিকতর সহজসাধ্য।

(৫) মরহুম মৌলবী মুজিবর রহমান বলিতেন : সংবাদপত্রের কেবলমাত্র সম্পাদকীয় কলমটাই সম্পাদকের; বাকি সবটুকুই পাবলিকের। চিঠিপত্র কলমটা টাউন হল, সম্পাদকের বৈঠকখানা নয়। অতএব সংবাদ প্রকাশে নিরপেক্ষতা চাই। স্বয়ং সম্পাদকের নিন্দা-পূর্ণ পত্রও চিঠিপত্র কলমে ছাপিতে হইবে।

(৬) সাংবাদিকতা সাহিত্য, আর্ট, সায়েন্স, ইন্ডাস্ট্রি ও কমার্সের সমবায়। এর একটার অভাব হইলে সাংবাদিকতা ত্রুটিপূর্ণ এবং পরিণামে নিষ্ফল হইবে।

(৭) বিখ্যাত সাহিত্যিক থেচারে বলিয়াছেন : ছাপার মেশিনের মত সংবাদপত্র নিজেও একটা ইঞ্জিন। সকল যন্ত্রপাতির ঐক্য ও সংহতি অন্যান্য ইঞ্জিনের মত প্রেস ইঞ্জিনেরও অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু তার উপরেও প্রেস ইঞ্জিনে দরকার ইনটেলেকচুয়াল ইউনিটি।

এই সাতটি দফা ছিল বলিতে গেলে আমার জন্য সাংবাদিকতার ক, খ। কিন্তু আমার এইটুকু জ্ঞান লাভ করিতে-করিতে সাংবাদিকতা ঘোড়-দৌড়ে অনেক আগাইয়া গিয়াছিল। আমি পঁচিশ বছর আগে যখন সাংবাদিকতা শুরু করি, তখন সাংবাদিকতা ছিল একটা মিশন। প্রাইভেট স্কুল, হাসপাতাল চালাইবার মত একটা ব্যাপার। আর ১৯৪৭ সালে সাংবাদিকতা হইয়া উঠিয়াছিল একটি পূর্ণমাত্রার ইন্ডাস্ট্রি। এই সম্প্রসারণের ফলে সংবাদপত্র আর সম্পাদকের মন্তব্যসহ খবরের কাগজ মাত্র ছিল না। সাহিত্য শাখা, মহিলা শাখা, শিশু শাখা, সিনেমা শাখা, নগর পরিক্রমা ও খেলাধুলা ইত্যাদি বিভিন্ন ফিচার দিয়া আজকাল দৈনিক খবরের কাগজকে রীতিমত আকর্ষণীয় পঠিতব্য সাহিত্য করিয়া তোলা হইয়াছে। এই সমস্ত বিভাগ মোটামুটি অটনোমাস। সকল বিভাগের পৃথক-পৃথক সম্পাদক আছেন। কাজেই দৈনিক সংবাদপত্রের আর এখন একজন মাত্র সম্পাদক নাই, বহু-সংখ্যক সম্পাদক হইয়াছেন। ফলে কাগজের সম্পাদককে এখন আর শুধু সম্পাদক বলা চলে না। প্রধান সম্পাদক, এডিটর-ইন-চিফ অথবা চিফ এডিটার বলা হইয়া থাকে। এর ফলে আধুনিক দৈনিক খবরের কাগজের সম্পাদক কম-বেশি কনস্টিটিউশন্যাল মনার্কের মতই ফিগার-হেড মাত্র। সকর্মক দায়িত্ব তার সম্পাদকীয় লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দৈনিক খবরের কাগজের বিষয়-বস্তুর এই পরিব্যাপ্তি আমাদের দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই শুরু হয়। কাজেই আমি যখন ইত্তেহাদএর সম্পাদকতা গ্রহণ করি, তখন আমাকেও ইহাই করিতে হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে আমাকে বেশ খুঁজিয়া-পাতিয়া অজ্ঞাত মুসলিম ট্যালেন্ট বাহির করিতে হইয়াছে। একটু পরেই সে কথা বলিতেছি।

### ৩. মুসলিম সাংবাদিকতার অসুবিধা

আমি যে যুগে সাংবাদিকতা করিয়াছি, তখন মুসলমানের পক্ষে সাংবাদিকতা করা খুব দুরূহ ব্যাপার ছিল। বিশেষত বাংলার মুসলমানের সামনে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রও অতি ক্ষুদ্র ছিল। সংবাদপত্র যতই ইন্ডাস্ট্রিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল, মুসলমানের পক্ষে উহা ততই কঠিন হইতে থাকিল। খুব স্বাভাবিক কারণেই মুসলমান যুবকদের হিন্দু সংবাদপত্রে কাজ

পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। নিজস্ব দৈনিক কাগজ বাহির করার মত টাকাও মুসলমানের ছিল না। প্রধানত অর্থাভাবেই বহুকাল বহু মুসলিম নেতাদের এদিককার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আমার আমলেই মওলানা মো. আকরম খাঁ সাহেবের দৈনিক সেবক ও দৈনিক মোহাম্মদী ও মওলানা ইসলামাবাদী সাহেবের দৈনিক ছোলতান, স্যার এ কে গযনবীর দৈনিক তরক্কী, মৌ. এ কে ফজলুল হক সাহেবের দুই পর্যায়ের নবযুগ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের দৈনিক কৃষক প্রভৃতি বাংলা দৈনিক, স্যার আবদুর রহিমের মুসলিম স্ট্যান্ডার্ড মৌ. মুজিবর রহমান সাহেবের দৈনিক দি মুসলমান ও কমরেড প্রভৃতি ইংরাজি দৈনিক বাহির হইয়া বন্ধ হইয়াছে। এর ফলে একদিকে যেমন মুসলিম বাংলায় দৈনিক সংবাদপত্রের অভাব ছিল, ঠিক তেমনি সাংবাদিকেরও অভাব ছিল। আগেই বলিয়াছি, হিন্দু সংবাদপত্রে মুসলিম শিক্ষার্থীদের চান্স ছিল না। এটা আমি এত তীব্রভাবে অনুভব করিতাম যে যখনই সম্ভব ও সাধ্য হইয়াছে, তখনই ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাছিয়া-বাছিয়া মুসলমান নিয়াছি। অধিকতর যোগ্য হিন্দু বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত অযোগ্য মুসলমানকে চাকুরি দিয়াছি। এতে হিন্দুর প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ ছিল না। শুধুমাত্র মুসলমান যুবকদের সাংবাদিকতায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই এ কাজ করিয়াছি। মুসলমানের প্রতি আমার এই পক্ষপাতিত্বের মধ্যে যে কোনও হিন্দু-বিদ্বেষ ছিল না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে ইত্তেহাদ-এর সম্পাদকতা লিখার পূর্ব পর্যন্ত আমি ঘোরতর জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী ছিলাম। বাংলার হিন্দু ও মুসলিম মিলিয়া এক রাষ্ট্রীয় জাতি, এই মতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম। তা ছাড়া আমার সম্পাদিত কৃষক ও নবযুগউভয়টাই ছিল বিঘোষিত নীতি ও মতবাদের দিক দিয়াও অসাম্প্রয়িক দৈনিক কাগজ। তবু ঐ দুটি কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে লোক নিয়োগ করিবার সময় আমি মুসলমান প্রার্থীকে প্রাধান্য দিয়াছি। ইহাতে আমার অনেক হিন্দু সাংবাদিক বন্ধু ও হিতৈষী আমার এই কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সরলভাবে তাঁদের কাছে আমার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছি। অনেক দূরদর্শী হিন্দু বন্ধু আমার কথা বুঝিয়াছেন। এইভাবে আমি যখনই ক্ষমতা ও সুযোগ পাইয়াছি, তখনই মুসলিম যুবদিগকে সাংবাদিকতায় উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পরকেও এই কাজের উপদেশ একরূপ গায় পড়িয়াই দিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দৈনিক আজাদ-এর কথাই বলিতেছি। আজাদ-এর পরিচালকগণ তার সৃষ্টি হইতে ঢাকায় আসার পূর্ব-পর্যন্ত বার বছরকাল আজাদ-এর কপালে ছাপাইতেন মুসলিমবঙ্গ ও আসামের একমাত্র দৈনিক। এটা সুরুচির পরিচায়ক ছিল না। সে জন্য আমার মত অনেক সাংবাদিকও এতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তলাইয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে, আজাদ-এর এই দাবি অংশত সত্য। কারণ তকালের সমস্ত বাংলা দৈনিকের মধ্যে একমাত্র আজাই আর্থিক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলমান। পরিচালিত অন্যান্য দৈনিক টিকিয়া থাকিবে কিনা সে বিষয়ে তৎকালে স্বয়ং সাংবাদিকদেরই সন্দেহ ছিল। আজাদসম্বন্ধে সে সন্দেহ ছিল না। এই হিসাবে আজাদকে তকালের মুসলিম বাংলা ও আসামের একমাত্র 'দৈনিক' বলা যাইতে পারে। এই ধারণা হইতেই শুধুমাত্র চাকুরির সিকিউরিটির দিক বিবেচনা করিয়া মুসলিম সাংবাদিকরা সাধারণত অন্যান্য দৈনিকের চাকুরির চেয়ে আজাদ-এর চাকরি বেশি আকর্ষণীয় মনে করিতেন। ঠিক এই কারণেই মুসলমান সাংবাদিকদের উপর আজাদ পরিচালকের দায়িত্ব ছিল বেশি। আমি কৃষকও নবযুগ এবং পরে ইত্তেহাদ-এ শুধুমাত্র মুসলিম সাংবাদিক নিয়োগ করিবার সময় আজাদ কর্তৃপক্ষকেও এই অনুরোধ করিতাম। কিন্তু আজাদ এর পরিচালকরা আমার উপদেশে কর্ণপাত করিতেন না। তারা স্পষ্টই বলিতেন, তাঁদের নীতি অল্প বেতনে যোগ্য লোক নিয়োগ করা। হিন্দু শিক্ষিত বেকারের সুতরাং যোগ্য সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল মুসলমানের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

ফলে স্বভাবতই অল্প বেতনে অনেক বেশি যোগ্য হিন্দু সাংবাদিক পাওয়া যাইত। আজাদ কর্তৃপক্ষ তাই করিতেন। ফলে তৎকালে আজাদ-এর স্টাফের শতকরা আশিজন ছিলেন হিন্দু। এটা আমাকে খুব পীড়া দিত। সরকারি চাকুরিতে মুসলিম অংশ দাবির উত্তরে যোগ্যতার যে জবাব হিন্দুরা দিতেন, আজাদ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলে তাঁরা। খোলাখুলিই বলিতেন, সরকারের মত আর্থিক বুনিয়াদ যেদিন আজাদ এর হইবে, সেইদিনই তারা মুসলমানের কথা ভাবিবেন। বর্তমান অবস্থায় আজাদ টিকাইয়া রাখাই তাদের দায়িত্ব; মুসলমানদের সাংবাদিকতা শিখানোর পাঠশালা খোলা তাঁদের দায়িত্ব নয়।

৪. সমাজ-প্রাণতা বনাম বাস্তববাদিতা

কথাটা হয়ত ঠিক। এটাই ছিল বাস্তববাদী বুদ্ধিমান বিষয়ী লোকের কাজ। কিন্তু আমার মন তত্ত্বালে উহা গ্রহণ করে নাই। উহাদিগকে আমি তখন অপরিণামদর্শী সমাজ-প্রাণহীন স্বার্থপর লোক মনে করিতাম। এই স্বার্থপরতা জনসাধারণের মধ্যে দেখিলে তা সহ্য করা যায়। কিন্তু মুসলিম স্বার্থের কথায় যাদের মুখে খই ফুটে, তাদের মধ্যে এই বিষয়-বুদ্ধি' এমন বেমানান যে আমি এতে শুধু অসন্তুষ্ট হইতাম না; দস্তুরমত চটিয়া যাইতাম। স্বদেশি আন্দোলনের সময় যখন বাংলার অনেক যুবক দেশের জন্য প্রাণ দিতেছিল; নেতারা বিলাতী কাপড়ের বদলে দেশি কাপড় পরিবার আবেদনে গলা ফাটাইতে ছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের সময় নেতারাই যখন বিলাতী লবণ বয়কট করিয়া দেশি লবণ, করকচ লবণ খাইবার আবেদন। করিতেছিলেন; তখনও দেশের জনসাধারণকে সস্তায় মিহিন পাড়ের পাকা। রং-এর যুক্তিতে বিলাতী কাপড়, এবং স্বাদ ও চেহারার যুক্তিতে বিলাতী লবণ কিনিতে দেখিয়াছি। অজ্ঞ জনসাধারণ বুঝে না বলিয়া তাদেরে ক্ষমাও করিয়াছি। কিন্তু কলিকাতার মুসলিম লীগের নেতাদিগকে যখন ওয়াছেন মোল্লা, এল মল্লিকের দোকানের বদলে ইস্টবেঙ্গল সোসাইটি হইতে এবং আমার নিজের জিলার লীগ নেতাদিগকে যখন 'মৌলবীর দোকানে'র বদলে। 'বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রালয়' হইতে সওদা কিনিতে দেখিতাম সস্তার যুক্তিতে, তখন আমার মেজাজ ঠিক থাকিত না। আমি যখন ঘোরতর কংগ্রেসী ছিলাম এবং খদ্দর ছাড়া কিছু পরিতাম না। তখনও খদ্দর কিনিতে বাজারে গিয়া প্রথমে পরিচিত মুসলিম দোকানে খদ্দর তালাশ করিতাম; না পাইলে খদ্দরের স্টক রাখিবার উপদেশ দিয়া আসিতাম এবং দু-চার দিন অপেক্ষা করিতাম। আমার বেশ মনে পড়ে তৎকালে কংগ্রেস-বিরোধী হিন্দু-বিদ্বেষী বহু মুসলিম বন্ধু আমাকে হিন্দুর গোলাম বলিয়া গাল দিতে-দিতে সস্তা ও ভেরাইটির অজুহাতে হিন্দু দোকানে ঢুকিয়া পড়িতেন।

এঁদেরেও হয়ত ক্ষমা করা যায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে নয় প্রতিদিন যারা মুসলিম সমাজকে আত্মস্থ ও আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দিতেছেন; অন্য সমাজের প্রভাব ও শোষণ-মুক্ত হইবার জন্য কর্মপন্থাও নির্দেশ করিতেছেন, তাঁরাও সস্তার যুক্তিতে মুসলমানের বদলে হিন্দু সাংবাদিকদিগকে চাকুরি দিবেন, এটা আমার বিবেচনায় ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ছিল।

৫. 'ইত্তেহাদ'-এর প্রয়াস

কাজেই যখন ইত্তেহাদএর স্টাফ নিয়োগের ক্ষমতা আমার হাতে আসিল, তখন ইহাকে আমি মুসলিম সাংবাদিক গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিবার অপূর্ব সুযোগ মনে করিলাম। সে সুযোগের সাধ্যমত সদ্ব্যবহার করিলাম। সাংবাদিকতা-শিক্ষার্থী উচ্চ-শিক্ষিত যুবকরা দলে-দলে আসিয়া ভিড় করিল। কতকালের

বুভুক্ষা লইয়া যেন তারা অপেক্ষা করিতেছিল। মুসলিম শিক্ষিত যুবকরা সাংবাদিকতা লাইনে আসিতে চায় না বলিয়া কোনও-কোনও কাগজের কর্তারা যে অভিযোগ করিতেছিলেন, মুসলিম যুবকদের বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগ যে মিথ্যা এলাম এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া গেল। আমি শুধু সম্পাদকীয় বিভাগে যে পঁচিশ ছাব্বিশজন লোক নিয়োগ করিলাম তার মধ্যে কুড়িজনই ছিলেন গ্র্যাজুয়েট, তাঁদের দশ-বারজন ছিলেন এমএ। সরকারি চাকুরির প্রতি মুসলমান যুবকদের টান বেশি, এই অভিযোগের উত্তরে বলিতে চাই যে, উপযুক্ত পঁচিশ-ছাব্বিশজনের মধ্যে চৌদ্দ-পনেরজনই ছিলেন সরকারি কর্মচারী। তারা সাংবাদিকতায় হাত পাকান সাপেক্ষে সরকারি চাকুরি করিয়া যাইতেছিলেন মাত্র। আমি ইত্তেহাদ-এ তাদের চাকুরি কনফার্ম করামাত্র অধিকাংশই সরকারি চাকুরিতে ইস্তাফা দিতে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁরা এতই দৃঢ় ছিলেন যে, মুসলমান সরকারি কর্মচারীরা ইত্তেহাদ-এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতেছেন বলিয়া কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রে যখন আন্দোলন শুরু হয় এবং দৈনিক বসুমতী যখন তাদের নাম-ঠিকানা পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া দেন, তখনও উহাদের অধিকাংশেই অবিচলিত থাকেন।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ অন্যান্য শিল্প-মালিকদের মত সংবাদপত্রের কর্তারাও ষোল আনা গ্রহণ করিতেন। কাজেই সংবাদপত্রের স্টাফের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। বেতনের অল্পতার জন্যই শিক্ষিত যুবকরা সহজে সাংবাদিকতার দিকে আকৃষ্ট হইত না। হিন্দু যুবকরা যে মুসলমান যুবকদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় ঐ অল্প বেতনে চাকুরি করিতেছে, তা তারা ঐ অল্প বেতনে সন্তুষ্ট বলিয়া নয়, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হিন্দু সমাজে বেশি বলিয়া। কাজেই আমি ইত্তেহাদ এর স্টাফের এমন বেতনের সুপারিশ করিলাম, যা তাদের প্রয়োজনের মিনিমাম। এটা করিতে গিয়াও আমি প্রুফরিডারদের জন্য সর্বনিম্ন একশ এবং সাব-এডিটরদের জন্য সর্বনিম্ন সোওয়াশ বেতন ধার্য করিলাম। ম্যানেজারিয়াল ও কেরানির সর্বনিম্ন বেতন হইল প্রুফরিডারদের সমান। এই সমতা অনেক পুরাতন দৈনিক কাগজেই ছিল। অনেকেই পঞ্চাশ-ষাট টাকার প্রুফরিডারি ও সাব-এডিটারি করিতেছিলেন। অথবা যুদ্ধের পরিণামে মাংগা-বাজারের ফলে আফিস আদালতের পিয়ন-চাপরাশিরা পর্যন্ত এই সময় আশি টাকার বেশি পাইতেছিল।

### ৬. 'ইত্তেহাদ'-এর জনপ্রিয়তার কারণ

অবস্থা-মাফিক সংগত পরিমাণ বেতন ধার্য হওয়ায় ইত্তেহাদ আফিসে গোড়া হইতেই প্রতিভাবান মুসলিম তরুণদের সমাবেশ হইল। এঁদের অতি অল্প সংখ্যকই অভিজ্ঞ ছিলেন, বাকি সকলে স্বভাবতই নূতন ছিলেন। ইঁহাদের ট্রেনিং দেওয়ার উদ্দেশ্যে জার্নালিযম সম্পর্কে আমি এক আলমারি বই কিনাইয়া ফেলিলাম। তার মধ্যে পিটম্যানের প্রকাশিত ম্যানস ফিল্ডের কমপ্লিট জার্নালিযম এন্ড সাব এডিটিং; চার্লস রিগবির দি স্টাফ জার্নালিস্ট; মি. এস. কারের মডার্ন জার্নালিয়ম; টি. এ. বিডের রিপোর্টার্স গাইড উই লিকাম স্টিডের দি প্রেস ইত্যাদি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি স্টাফের সহকর্মীদের ঐ সব বই-পুস্তক পড়িতে উৎসাহ দিতাম। ঠিকমত পড়িলেন কি না, তা পরখ করিতাম। ফলে দুই-তিন মাসের মধ্যে ইত্তেহাদ এর স্টাফের অধিকাংশ কর্মী শুধু হাতে-কলমে নয়, পুঁথিগত বিদ্যাতেও মোটামুটি ভাল সাংবাদিক হইয়া উঠিলেন। ফলে হেডলাইন, ডিসপ্লে, মেক আপ, গেট-আপ, টাইপ বিতরণ, প্রফ রিডিংয়ে অল্পদিনেই ইত্তেহাদ কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বাংলা দৈনিকে পরিণত হইল। মি. ওয়ালীউল্লাহ, মি. মোহাম্মদ মোদাব্বের, মি. জনাব আলী,

মি. খোন্দকার ইলিয়াস, মি. কে. জি. মুস্তফা, মি. সিরাজুদ্দীন হোসেন, মি. রশীদ করীম প্রভৃতি বিখ্যাত সাংবাদিকরা সকলেই ইত্তেহাদ-এর বার্তা বিভাগের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব বহন করিয়াছেন। প্রথমে মিস হাযেরা খাতুন (পরবর্তীকালে মিসেস হাযেরা মাহমুদ) ও পরে মিস মরিয়ম খানম (পরে মিসেস হাশিমুদ্দীন) নামী দুইজন প্রতিভাবতী মহিলা গ্র্যাজুয়েট মহিলা শাখা সম্পাদন করায় মুসলিম মহিলাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইল। কবি আহসান হাবীব সাহিত্য শাখা, রুকনুযযামান খান ও মি. মোহাম্মদ নাসির আলী শিশু শাখা পরিচালনা করায় ঐ সব বিভাগ দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করিল। মি. কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, মি. তালেবুর রহমান, মি. খোন্দকার আবদুল হামিদ, মি. যহুরুল হক, মি. কবি গোলাম কুদুস, মি. এ এম শাহাবুদ্দীন প্রভৃতি প্রতিভাবান লেখকগণের প্রথম তিনজন আগাগোড়া এবং শেষ তিনজন সাময়িকভাবে এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর বা লিডার রাইটার ছিলেন। এতগুলি প্রতিভাশালী লেখকের লেখা হইলেও ইত্তেহাদ-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে সুরে-মতবাদে এমনকি ভাষায় একটা ঐক্য ছিল। তার কারণ এই যে আমি সকল এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরদেরে লইয়া সকালে আমার বাসায় কম-সে কম দুই ঘণ্টা বৈঠক করিতাম। চিফ এডিটরের বাড়িতে প্রতিদিন যাতায়াত করাটা যাতে এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরদের পক্ষে আর্থিক ক্ষতিকর না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি সকলের সম্মতিক্রমে আমার বাসায় উহাদের সকলের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই ব্যবস্থা আমার উপরও দুর্বহ আর্থিক বোঝা ছিল না সম্পাদকের টেবিল খরচা' বাবত আমাকে মাসে যে একশ টাকা এলাউন্স দেওয়া হইত, সে টাকা হইতে কিছু টাকা বাঁচাইয়া এই দিককার খরচা পোষাইয়া লইতে অথবা পাতলা করিতে পারিতাম। এই বৈঠকের উপকারিতা অল্পদিনেই সকলের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় বড়-বড় দৈনিকের অনেকেই তাদের সম্পাদকীয় বিভাগে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলেন। এই বৈঠকে চা সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঐদিনকার সম্পাদকীয় লেখার বিষয়বস্তু লইয়া। আলোচনা চলিত। ইত্তেহাদ-এ নিয়মিতভাবে দুইটা সম্পাদকীয় ও চার পাঁচটা মন্তব্য থাকিত। সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির হেডিং ছিল 'একনজর। এগুলি আমি নিজে লিখিতাম। সম্পাদকীয়গুলি সকলে ভাগ করিয়া নিতাম। সপ্তাহের সাত দিনে চৌদ্দটা সম্পাদকীয় যাইত। চৌদ্দটা সম্পাদকীয় পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করিলে গড়ে প্রতি সপ্তাহে এক-একজনের তিনটা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হইত। এটা ছিল সাধারণ নিয়ম। বিষয়-বস্তু-ভেদে এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইত। বিষয়-বস্তুর বৈশিষ্ট্য না থাকিলে ব্যক্তিগত সুবিধার খাতিরে একজনেরটা অপরজনও গছিয়া নিতে পারিতেন। কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম। সাধারণত প্রাতঃকালীন বৈঠকে বিষয়-বস্তু ও তাদের বিভিন্ন পয়েন্টসমূহ ঠিক হইয়া যাইত। যার উপর লেখার ভার পড়িত, তিনি সে সব পয়েন্টস নোট করিয়া নিতেন। তারপর তাদের সুবিধামত হয় বাসায় অথবা আফিসে বসিয়া সম্পাদকীয় লিখিয়া আমার টেবিলে রাখিয়া দিতেন। আমি নিজে বাসায় বসিয়া 'একনজর' ও আমার ভাগে সম্পাদকীয় লেখার ভার পড়িয়া থাকিলে তা লেখা শেষ করিয়া সন্ধ্যার দিকে অথবা সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া আটটার দিকে আফিসে যাইতাম। যার উপর যেদিন লেখার দায়িত্ব পড়িত না, সেদিন তিনি আফিসে যাইতে বাধ্য ছিলেন না। আর যাদের উপর লেখার ভার পড়িত, তারাও তাদের লেখা আমার টেবিলে রাখিয়া আফিস ত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু সাধারণত তারা আফিস ত্যাগ করিতেন না। আমি তাদের লেখা 'পাশ করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা আফিসে থাকিতেন। আমি তাদের লেখা 'পাশ করিয়া প্রেসে দিবার জন্য তাদেরই টেবিলে ফেরত পাঠাইতাম। এতে তারা তাদের ভুল-ত্রুটি বা আমার সাথে তাঁদের মতভেদ ধরিতে পারিতেন। আমার ঐসব সহকর্মী এতে অতি অল্পদিনেই

এমন পাকা হইয়া গেলেন যে, অতঃপর সকাল বেলার আলোচনাই যথেষ্ট হইত। তাঁদের লেখায় আমার কলম ধরিবার কোনও প্রয়োজনই হইত না। এঁদের অনেকে আমার মতবাদ প্রকাশ-ভঙ্গির ভাষা ও যুক্তি-তর্কের ধারা এমন রফত করিয়া ফেলিলেন যে, উচ্চ-শিক্ষিত সাহিত্যিক ও বৃদ্ধা পাঠকদেরও অনেকে তাদের লেখাকে আমার লেখা বলিয়া ভুল করিতেন। আমার হাজার প্রতিবাদেও তারা মত বদলাইতেন না। মনে করিতেন ও বলিতেন, আমার সহকর্মীদের ইজজত বাড়াইবার জন্যই আমি ঐ ভদ্রতা করিতেছি।

৭. 'পাঠকের মজলিস'

সাধারণভাবে সংবাদপত্র ও তাদের পাঠকদের মধ্যে এবং বিশেষভাবে ইত্তেহাদ-এর লেখক-গোষ্ঠী ও পাঠকদের মধ্যে একটা চিন্তাগত আত্মীয়তা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আমি ইত্তেহাদএ পাঠকের মজলিস' নামে একটা ফিচার খুলি। এই ধরনের ফিচার সংবাদপত্র-জগতে এটাই প্রথম। এটা প্রচলিত সম্পাদকের নামে চিঠিপত্র কলাম নয়। লেখার বিষয়-বস্তু, মর্যাদা ও বলার ভঙ্গি সকল দিক দিয়াই চিঠিপত্রের ও মজলিসের মধ্যে পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য সম্বন্ধে পাঠকগণকে সচেতন করিবার জন্য ইত্তেহাদএর চিঠিপত্র কলামও যথারীতি যথাস্থানে বজায় রাখা হইয়াছিল। পাঠকের মজলিস' ছিল পাঠকদের ডিবেটিং ক্লাব। এতে পাঠকরা সম্পাদকের দায়িত্ব ও অধিকার লইয়া কথা বলিতে পারিতেন। এতে বুদ্ধিমান পাঠকরা অল্পদিনেই এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন যে, বড়-বড় জটিল, গুরুতর, তর্কিত ও এখতেলাফী বিষয়েও সংক্ষেপে সুন্দর আলোচনা করিতেন। এইসব আলোচনার অনেকগুলি এত সুন্দর ও মূল্যবান হইত যে, আমাদের সম্পাদকীয়ের চেয়েও ভাল হইয়া যাইত। মরহুম মৌলবী মুজিবর রহমান সম্পাদকীয় কলম ছাড়া খবরের কাগজের বাকি সবটুকু অংশকে টাউন হল মনে করিবার যে উপদেশ দিতেন, সেই উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই আমি 'পাঠকের মজলিস' খুলিয়াছিলাম। এই মজলিসে স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাঠকদের ছিল। পাঠকরা ওতে স্বয়ং সম্পাদকের লেখার ও মতের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করিতে পারিতেন। এতে একদিকে যেমন পাঠকদের মধ্যে লেখক ও সম্পাদক হওয়ার সুপ্ত প্রেরণা জাগ্রত হইত, অপর দিকে তেমনি সকল মত ও দলের নিকট ইত্তেহাদ-এর নিরপেক্ষতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। ফলে পাঠকরা ইত্তেহাদকে শুধু নিরপেক্ষ সুবিচারী কাগজই মনে করিতেন না, ইহাকে তাদের নিজের কাগজ মনে করিতেন। এইভাবে এক বছর পুরা হইবার বহু আগেই ইত্তেহাদ আফিস বাংলার মুসলিম তরুণ চিন্তানায়কদের পীঠস্থানে এবং ইত্তেহাদ মুসলিম-বাংলার প্রগতিবাদীদের মুখপত্রে পরিণত হইল।

৮. পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উদারতা

ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বাটোয়ারা হইয়া পাকিস্তানের জন্ম হইল। বাংলা ভাগ হইল। কলিকাতা পশ্চিম বাংলার ভাগে পড়িল। ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হইল। ফলে স্বভাবতই মুসলিম-বাংলার সরকারি বেসরকারি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মেজরিটি আস্তে-আস্তে কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকায় আসিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় কলিকাতাস্থ পাকিস্তান-সমর্থক সমস্ত সংবাদপত্রের কলিকাতা ছাড়িয়া ঢাকায় চলিয়া আসা খুবই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু বাস্তব অসুবিধাহেতু কোনো কাগজই আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিলাম না। ভারতের বুকে বসিয়া পাকিস্তানের সংবাদপত্র চালাইয়া যাইতে লাগিলাম। পশ্চিম বাংলা ও ভারত সরকারের অসাধারণ কৃতিত্ব ও মহত্ত্ব এই যে,

তারা সমস্ত মুসলিম সংবাদপত্রকে অবাধে বিনা-অসুবিধায় চলিতে দিলেন। পশ্চিম বাংলা সরকার ও ভারত সরকারের এই উদারতা, মহত্ত্ব ও সহনশীলতার কথা মুসলিম বাংলার সাংবাদিকরা চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিবেন। এটা অতি স্পষ্ট কথা যে, দেশ ভাগ হওয়ার বহু আগে হইতেই মুসলিম সংবাদপত্রসমূহের লেখা হিন্দুদের বিরক্তি ক্রোধের উদ্রেক করিয়াছিল। দেশ ভাগ হওয়ার পর সম্পত্তি ও দায়-দেনার বাঁটোয়ারা লইয়া এই বিরক্তি ও ক্রোধে অধিকতর ইন্ধন ঢালা হইতেছিল। এক উত্তপ্ত পরিবেশে কলিকাতায় থাকিয়া সার্বিক কন্ট্রোলের ব্যবস্থার পশ্চিম বাংলার ভাগের নিউযপ্রিন্ট ব্যবহার করিয়া পশ্চিম বাংলা ও ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের পক্ষে কঠোর ভাষায় গলাবাজি করিতে দেওয়া কম উদারতা ও সহনশীলতার পরিচায়ক নয়। এসব লিখিতে গবর্নমেন্ট আমাদের কোনও বাধা-নিষেধ ত দেনই নাই; বরঞ্চ বেসরকারি স্তরের কেউ আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা করিবার চেষ্টা করিলে সরকার দৃঢ়হস্তে তা দমন করিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে। দেশ বাটোয়ারা ঘোষণা হওয়ার অব্যবহিত পরেই দেশের বিভিন্ন অংশে হিন্দু-মুসলমানে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। কলিকাতায়ই হয় বেশি। পুনঃপুন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উভয় পক্ষেই আক্রমণকারী হইলেও পাকিস্তানোত্তর কলিকাতার দাঙ্গায় স্বভাবতই হিন্দুরাই ছিল আক্রমণকারী। কাজেই মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং কলিকাতা আসেন এবং জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ দাঙ্গা পীড়িত এলাকায় অবস্থান অনশন করিতে থাকেন। এই সময় একদিন এক উন্মত্ত হিন্দু জনতা দৈনিক আজাদ আফিস আক্রমণ করে। ফলে একদিন আজাদ বাহির হইতে পারে নাই। আমরা প্রায় পঁচিশটি দৈনিক কাগজের সম্পাদকরা অমৃতবাজার-এর চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ সিটি আফিসে সভা করিয়া এই গুণ্ডামির প্রতিবাদ করি; সরকারের নিকট প্রতিকার দাবি করি; জনসাধারণের সদিচ্ছার আবেদন জানাইয়া সংবাদপত্রে বিবৃতি দেই। এই সভায় পঁচিশজন সম্পাদকের মধ্যে আমরা মাত্র তিনজন ছিলাম মুসলমান। একমাত্র স্টেটসম্যান-এর সম্পাদক মি. আয়ান স্টিফেন ছাড়া আর সবাই। ছিলেন হিন্দু। এ সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়া যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছিল, তাতে মুসলমান ছিলাম আমি একা। শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, মি. সোমনাথ লাহিড়ী ও মি. স্টিফেন প্রভৃতি সবাই ছিলেন অমুসলমান। পশ্চিম বাংলা সরকার এমন ক্ষিপ্রতার ও দৃঢ়তার সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে, পরদিনই বিনা-বাধায় আজাদ প্রকাশিত হইল।

পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডা. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ স্বাধীনতা লাভের চার পাঁচ মাসের মধ্যেই ১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি পদত্যাগ করায় আমরা মুসলমানরা বিশেষত মুসলিম সাংবাদিকরা বেশ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু ডা. বিধান চন্দ্র রায় অতঃপর ২০ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ডা. রায়, ডা. ঘোষের উদার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। মুসলমানদের মধ্যে সাহস সৃষ্টির জন্য তিনি আমার এবং কলিকাতা ও হাওড়া শহরের অন্যান্য অনেক মুসলিম নেতার সক্রিয় সহযোগিতা চাহিলেন। আমি নিজে মুসলিম-প্রধান এলাকাসমূহে সভা করিলাম। মন্ত্রিসভার উদার নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু রাষ্ট্র-নেতা, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরাও আমাদের সাথে বন্ধুত্বসূচক উদার ব্যবহার ও আমাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে লাগিলেন। পাক-ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে মূলনীতি নির্ধারণের আলোচনা সভাতেও সম্পাদক হিসাবে এবং সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে থাকিলেন। এই সমস্ত ঘটনার দুইটির উল্লেখ করা দরকার মনে করি। পশ্চিম বাংলা সরকার নিয়োজিত পরিভাষা কমিটির রিপোর্ট আলোচনায় আমাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল এবং আমার। মতামত রিপোর্টের বিরোধীও হইয়াছিল। সে কথা

অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। অপর ঘটনাটি এই : মহাত্মাজীর হত্যার পর পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রচার দফতরের উদ্যোগে মন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় মহাত্মাজী সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। এতে বাংলার বিখ্যাত চৌদ্দ-পনেরজন। সাহিত্যিক-সাংবাদিকের লেখা ছাপা হয়। আমারও একটি লেখা তাতে ছিল। আমার চিন্তায়ও মহাত্মাজীর প্রভাব ছিল অসাধারণ। কাজেই তার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা একটু বিশেষ ধরনের। এমন মহাত্মার হত্যায় আমি একরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এমন সময় পশ্চিম বাংলার সরকার মহাত্মাজীর হত্যা সম্পর্কে লেখা চাওয়ায় আমি সাগ্রহে লেখা দিলাম। লেখাটা ইত্তেহাদ-এর সম্পাদকীয়ের চেয়ে অনেক কড়া হইল। এ প্রবন্ধে কঠোর ভাষায় আমি যা লিখিয়াছিলাম, তার সারমর্ম এই : রোগের গুরুত্ব দিয়া চিকিৎসকের কৃতিত্ব বুঝা যায়। চিকিৎসকের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াও তেমনি রোগের কঠিনতা বুঝা যায়। ছোট রোগে কেউ বড় ডাক্তার ডাকে না। ভারতীয় হিন্দুরা যে চরম দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত জাতি, তা প্রমাণিত হইল মহাত্মাজীর হত্যায়। যে গান্ধী আফ্রিকার গভীর অরণ্যে খালি পায়ে, খালি গায়ে ঘুরিলেও তাকে সাপে-বাঘে মারিত না, তেমন মহাপুরুষকে হত্যা করিবার মত আততায়ী পাওয়া গেল হিন্দু সমাজে। এতে প্রমাণিত হইল, এই জাতি বন্য পশুর চেয়েও হিংস্র ও নিকৃষ্ট। এই হিন্দু জাতিকে ব্যাধি-মুক্ত করিবার জন্য আল্লাহ যে চিকিৎসক পাঠাইয়াছেন তিনি যে সত্য-সত্যই মহাত্মা আজ তা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইল। লেখাটা পাঠাইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, ওটা ছাপা হইলেও হয়ত বইয়ের শেষ দিকে স্থান পাইবে। কিন্তু বই যখন আসিল, তখন দেখিলাম আমার লেখা প্রথম দিকেই সম্মানজনক স্থান পাইয়াছে। এই পুস্তক বাজারে প্রচারিত হওয়ার পর স্বয়ং প্রফুল্ল বাবুসহ অনেক পরিচিত-অপরিচিত হিন্দু ভদ্রলোক মুখে ও টেলিফোনে আমাকে কংগ্রেচুলেট করিয়া ছিলেন। পাকিস্তানে বসিয়া মুসলমানকে অমন গাল দিলে মহাত্মাজীর পিছনে-পিছনেই আমাকেও পরলোকগামী হইতে হইত। ভারতে তা হইল না দেখিয়া বুঝিলাম, হিন্দু সমাজ নীচ বটে কিন্তু সে নীচতা বুঝিবার মত উচ্চতাও তাদের আছে।

সরকার যতই উদার ও সহিষ্ণু হউন না কেন, হিন্দু জনসাধারণ অমন উত্তপ্ত পরিবেশে উদার ও সহিষ্ণু থাকিতে পারে না, আজাদ-এর উক্ত ঘটনার পর হইতে আমরা সকলেই সে বিষয়ে সচেতন হইলাম। বিশেষত আমরা মুসলিম সাংবাদিকরা এটা বুঝিলাম, আমরা আসলে পশ্চিম-বাংলা সরকারের অতিথিমাত্র। কাজেই সেই আতিথেয়তার অপব্যবহার করা আমাদের উচিৎ নয়। হিন্দুস্থানের বুকে বসিয়া আমরা পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলিয়া হিন্দু জনসাধারণকে ক্ষেপাইব, আর সেই ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা হিন্দুস্থানি সরকারের ও পুলিশের পবিত্র দায়িত্ব বলিয়া দাবি করিব, এই মনোভাবকে কিছুতেই উৎসাহ দেওয়া যায় না। এমনিতেই নয়া স্বাধীন দেশের সকল সমস্যা তাদের মিটাইতে হইতেছে। দেশ ভাগ হওয়ার সাথে-সাথেই নেতাদের নিষেধ সত্ত্বেও লোকেরা লাখে-লাখে। দেশত্যাগ শুরু করিয়াছে। ফলে পাকিস্তানি সরকারের ন্যায় হিন্দুস্তানি সরকারও বাস্তুত্যাগী পুনর্বাসনের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। এই সমস্ত সমস্যার 'বোঝার উপর শাকের আঁটি স্বরূপ নূতন কোনও সমস্যায় হিন্দুস্তানি সরকারকে ভারাক্রান্ত করা কিছুতেই উচিৎ হইবে না।

## ৯. ‘ইত্তেহাদ’-এর অপমৃত্যু

কাজেই আমরা মুসলিম সংবাদপত্রেরা সকলেই কাল-বিলম্ব না করিয়া ঢাকায় আসিবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগিলাম। কিন্তু পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভার নিকট আমরা ইত্তেহাদ ওয়ালার কোনও অভ্যর্থনা বা সহানুভূতি পাইলাম না। সহানুভূতি বা অভ্যর্থনা আমরা আশাও করি নাই। কারণ ইত্তেহাদ সোহরাওয়ার্দী-সমর্থক কাগজ হিসাবে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভায় বিরোধীদলের সংবাদপত্র ছিল। কাজেই আমরা তাদের কোন বিশেষ অনুগ্রহ চাই নাই। শুধু সরকারের মামুলি দায়িত্ব পালনই আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভা আমাদের জবাব দিলেন ইত্তেহাদএর পূর্ব বাংলা প্রবেশ নিষিদ্ধ। করিয়া। প্রথমবারের নিষেধাজ্ঞা অবশ্য মাত্র পনের দিন স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু এটাই সবেমাত্র-আত্মপ্রতিষ্ঠ ইত্তেহাদ-এর আর্থিক মেরুদণ্ডে বিশাল আঁকি লাগাইয়াছিল। কারণ ইত্তেহাদ-এর বিপুল সাকুলেশনের, সুতরাং এই বাবত আয়ের, চৌদ্দ আনাই ছিল পূর্ব বাংলার। এই আঘাত সামলাইয়া উঠিতে-না উঠিতেই আরো দুই-দুইবার ইত্তেহাদএর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হইল। এই দুইবারই দীর্ঘদিনের জন্য এবং শেষবারের অনির্দিষ্টকালের জন্য ইত্তেহাদ-এর পূর্ব বাংলা প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এই মুদ্দতে ইত্তেহাদ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নবাবযাদা সৈয়দ হাসান আলী নিজে একাধিকবার ঢাকা আসিয়া ইত্তেহাদ-এর জন্য বাড়ি ভাড়া করিয়া ও তাতে প্রয়োজনীয় মেরামত করিয়া প্রচুর অর্থব্যয়ও করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব বাংলা সরকার তাঁর কাজে পদে-পদে বাধা সৃষ্টি করিয়া বিশেষত বিজলি সংস্থাপনের অসহযোগিতা করিয়া নবাবযাদার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন।

এইভাবে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে ইত্তেহাদ-এর অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু এটাও সত্য যে, দেশভাগ হওয়ার পরে ভারতের ভূখণ্ড হইতে পাকিস্তানি খবরের কাগজ বাহির হওয়ার কোনও যুক্তিও ছিল না।

## ১০. কলামিস্ট মাত্র

ইত্তেহাদএর মৃত্যুর পর আমারও সাংবাদিক জীবনের অবসান ঘটে। ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত চব্বিশ বছর ইংরাজি-বাংলা কাগজের কলামিস্ট হইয়া থাকাতেই আমার সাংবাদিকতা সীমাবদ্ধ ছিল। এটা ঘটে অবস্থাগতিকেই! পরিবার রক্ষার জন্য উকালতি ও পাকিস্তান রক্ষার জন্য রাজনীতি ধরিতে হইল। পেশায় ব্যস্ত উকিল ও রাজনীতিতে মেম্বর-মন্ত্রী হইলাম। জেল-যুলুমও খাঁটিতে হইল। এত ব্যস্ততায় সাহিত্য-সাধনা বিশেষ ব্যাহত হইল না সত্য, কিন্তু সাংবাদিকতায় কলামিস্টের বেশি কিছু হওয়া গেল না।

ঢাকার সম্পাদক-সাংবাদিকদের অধিকাংশই আমার কলিকাতার সাংবাদিক-জীবনের বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহাস্পদ সহকর্মী। হাজার ব্যস্ততার অজুহাতেও তাঁদের উপরোধ এড়ান গেল না। কলামিস্ট হইতে হইল। প্রথম বার বছরে ঢাকার প্রায় সব বাংলা দৈনিক-সাময়িকীর অন্তত বিশেষ সংখ্যায় গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা লিখিলাম অনেক। পরবর্তী বার বছরে ইংরাজি-বাংলা উভয় ভাষার কাগজেই লিখিলাম। এই মুদ্দতে একাধিক কারণে আমি সক্রিয় রাজনীতি থনে অবসর নিলাম। ফলে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উদারতা ও নিরপেক্ষতা লইয়া রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তর্কিত সমস্যা-ভিত্তিক নিবন্ধ লিখিতে-পারিলাম প্রচুর।

এইসব গল্প-উপন্যাস-রস রচনার প্রায় সবগুলিই প্রকাশকদের আগ্রহে জনপ্রিয় বই আকারে বাহির ত হইলই এমনকি ইংরাজি-বাংলা প্রবন্ধ নিবন্ধগুলির অনেকগুলিও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

কলামিস্ট হওয়াতেই বোধ হয় এতগুলি পুস্তকের মেটিরিয়াল স্বতই তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। সম্পাদক-সাংবাদিক থাকিলে এটা নাও হইতে পারে।

## ২১. দাম্পত্য জীবন

## সপ্তম খণ্ড

## আমার সংসার-জীবন

## অধ্যায় একুশ – দাম্পত্য জীবন।

### ১. বিবাহ

আমার বিবাহ হয় ইংরাজি ১৯২৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি, মোতাবেক বাংলা ১৩৩২ সালের ১৩ই ফাল্গুন। তখন আমার বয়স আটাইশ বছর সাত মাস। আমার স্ত্রীর জন্ম ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারি, মোতাবেক বাংলা ১৩২২ সালের ১৮ই পৌষ। অতএব তাঁর বয়স দশ বৎসর দুই মাস। এত ছোট নাবালিকাকে বিবাহ করিতে আমি রাজি হইয়াছিলাম কয়েকটি কারণে। আমার অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় আমার বাপ-মা মুখে না বলিলেও মনে-মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন, এটা আমি বুঝিয়াছিলাম দেরিতে। বাপ-মার এই অসন্তোষ দূর করিবার মতলবে শেষ পর্যন্ত বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিলাম। আমাদের তৎকালীন তরুণ কংগ্রেসী নেতা বিপ্লবী মধুদা'র (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন। ঘোষের) অনুপ্রেরণায় দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য চিরকুমার থাকিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। বাপ-মাকে খুশি করিবার উদ্দেশ্যে এই সংকল্প ভাঙ্গিলাম। সুতরাং বাপ-মার খেদমত করিবার জন্যই যে বিয়া, সে বিয়ার পাত্রী ছোট হোক, বড় হোক, তাতে কী আসে যায়? দ্বিতীয়ত, আমার এক বন্ধু (মৌ, আবদুল মান্নান খা আমার চাচাত ভায়রা) যখন এই বিয়ার প্রস্তাব নিয়া আসেন তখন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, পাত্রী আমার এক শ্রদ্ধেয় আলেম নেতার মেয়ে। মওলানা খোন্দকার আহমদ আলী আকালুবী সাহেবকে আমি ছাত্রজীবন হইতেই শ্রদ্ধা করিতাম। তার দুধে-আলতা রঙ্গের চেহারা, বিশাল কালো মিস মিসা চাপদাড়ি, বলিষ্ঠ গঠন, উন্নত নাসিকা শোভিত সুডৌল মুখমণ্ডল যে কোনও দর্শকের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিত। কাল আলপাকার শেরওয়ানি ও কালো ইরানি টুপিতে তাঁকে খুব মানাইত। এই পোশাকেই তাঁকে প্রথম দেখিয়াছিলাম। এই চেহারাটাই আজও আমার মনে দাগ কাটিয়া আছে। তার উপর ছিলেন তিনি কবি ও বক্তা। আসলে তিনি ছিলেন ইসলাম প্রচারক-মিশনারি। তৎকালে তার সহকর্মী সমাজ-সংস্কারকদের প্রায় সকলেই কবিতার বই লিখিতেন। যশোহরের মুনশী মেহের উল্লা, সিরাজগঞ্জের মুনশী মেহেরুল্লা ও মৌ. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি সকলেই কবি ছিলেন। অথচ নিছক কাব্য-সাধনা তাদের আদর্শ ছিল না। অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে জাগরণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই এরা যেমন মুখে বক্তৃতা করিয়া। বেড়াইতেন, লিখিবার বেলা তেমনি কবিতায় উপদেশ দিতেন। আমি পাঠশালার জীবন হইতেই এই শ্রেণীর যে কয়জন কবি-বক্তার ভক্ত হইয়াছিলাম তাদের মধ্যে মওলানা আকালুবী ছিলেন অন্যতম। আমার স্কুল জীবনে মওলানা আকালুবী সাহেবের শুভ-জাগরণ, সিরাজী সাহেবের অনল প্রবাহ, মুনশী মেহেরুল্লার বিধবা-গঞ্জনা ইত্যাদি বই সরকার কর্তৃক বাযেয়াফত হয়। এতে এঁদের প্রতি আমার বিদ্রোহী মন অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তারপর মওলানা সাহেবের সাত শ্যালক ও আমি একই হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশোনা করিতাম। তিনি প্রায়

প্রতি মাসেই এক-আধবার হোস্টেলে আসিতেন। আমি শ্রদ্ধা-ভরে দূর হইতে তাঁকে দেখিয়া গর্ববোধ করিতাম। এই মুদ্দতেই আমার চাচা মুনশী ছমিরুদ্দিনের সাথে মওলানা সাহেবের ঘনিষ্ঠতা হয়। মওকাটা ছিল। এক শিক্ষা সম্মিলনী উপলক্ষে উভয়েই একই ট্রেনে ঢাকা যাওয়া। আমিও চাচাজীর সঙ্গী ছিলাম। গোটা পথটাই চাচাজী ও মওলানা সাহেব আলাপে কাটাইয়াছিলেন। বাড়ি ফিরার পর চাচাজী সময় পাইলেই মওলানা সাহেবের তারিফে পঞ্চমুখ হইতেন। তাতেই আমরা জানিতে পারি যে, মওলানা সাহেব আমাদের জমাতি লোক এবং ঐ অঞ্চলের মোহাম্মদীদের সর্দার। শুধু তা-ই নয় মওলানা সাহেবের দাদা (বাপের বাবা) মৌলবী খোন্দকার যহিরুদ্দীন সাহেব আমার দাদা গাজী আশেকুল্লা সাহেবের সঙ্গে একই সময়ে জেহাদে গিয়াছিলেন এবং এক সঙ্গে বালাকোট ও অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে জেহাদ করিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে তিনিও গাজী সাহেব বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তবে ত মওলানা সাহেব আমাদের আপনজন। ঐ একটি মাত্র খবরেই মওলানা সাহেবের প্রতি আমাদের পরিবারের সকলের বিশেষত আমার একটা টান জন্মিয়া গেল। চাচাজীর নিকট হইতে আমরা আরো জানিয়াছিলাম যে, মওলানা সাহেবরা আসলে টাঙ্গাইলের লোক, জামালপুরের নহেন। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আকালুর খোন্দকার বংশের লোক তারা। আকালুর খোন্দকার মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল্লার পাঁচ পুত্রের মধ্যে মওলানা আকালুবী সাহেব অন্যতম। মওলানা সাহেবের অন্যান্য ভাইয়েরাও আলেম ও সুবক্তা। তারপর তিনি খিলাফত ও কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা ইসলামাবাদীদের সহকর্মীরূপে তিনি ইতিপূর্বেই এ জিলার আঞ্জুমানে-ওলামায়ে-বাংলার প্রচার ও সংগঠনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত এই সময়ে তিনি দুরারোগ্য ডায়েবিটিককার্বাঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। তাঁর সাহিত্য সেবা, রাজনীতি, ধর্ম-প্রচার সমস্তই যুগপস্তাবে বন্ধ হইয়া যায়। আমি এর পর মওলানা সাহেবের আর কোনও খোঁজখবর পাই নাই।

বন্ধু যখন বিবাহের প্রস্তাব প্রসঙ্গে উনার নামোল্লেখ করিলেন, তখন পূর্ববর্ণিত সব কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। যা-যা মনে ছিল না বন্ধু তা-ও স্মরণ করাইয়া দিলেন। স্বভাবতই আমি তার বর্তমান হাল-হকিকত জিজ্ঞাসা করিলাম। বন্ধু বলিলেন, মওলানা সাহেবের অবস্থা খারাপ। তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন। মেয়েদের বিবাহ শেষ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছেন। তাদের বিবাহযোগ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার মত সময় তাঁর নাই, এই বিশ্বাস তার হইয়া গিয়াছে। মওলানা সাহেবের প্রতি একটা সুপ্ত টান হঠাৎ পুনর্জীবিত হইয়া উঠিল। বাপ-মার সম্মতি সাপেক্ষে বন্ধুর প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। বন্ধু আমার সমবয়সী লোক। আলেম মানুষ। তখন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। বিবাহ হইলে আমার চাচাত ভায়রা ভাই হইবেন। সুতরাং তিনি তার কর্তব্যে ত্রুটি করিলেন না। অতি অল্প সময়েই আমার মুরুব্বিদের রাজি করিয়া ফেলিলেন। আমি তখন খদ্দর-ভূষিত লম্বা দাড়িওয়ালা প্রায় ছয়ফুট উঁচা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের জওয়ান। আর পাত্রী গোলাপের পাপড়ির মত কচি লক লকা দশ বছরের একটি শিশু। সার্থক ডাকনাম জিনত মানে বিউটি। আসল নামটি আরো অর্থবহ আকিকুন্নেসা মানে জুয়েল।

বিয়া হইয়া গেল। শ্বশুরের দিককার আত্মীয়-স্বজন ন্যায়তই বেশি খুশি হইলেন না। কিন্তু আমার শ্বশুর পঞ্চমুখে আমার প্রশংসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময় আমি সাহিত্যিক, গাল্পিক ও প্রাবন্ধিক হিসাবে কিছুটা পরিচিত হইয়াছি এবং তৎকালে সক্রিয়ভাবে সাংবাদিকতা করিতেছি। আমার শ্বশুর আমার লেখা ছাপা হইয়াছে এমন সংখ্যার সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

পড়িয়া শুনাইয়া-শুনাইয়া আমার অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমার স্ত্রীর ও আমার নিজের মধ্যে বয়স ও চেহারার এমন গরমিল ছিল যে, পরবর্তীকালে আমরা দুজন যখন কলিকাতার রাস্তায় ট্রামে ও ট্রেনে একত্রে চলাফেরা করিতাম, তখন অনেকেই আমাদেরে বাপ-মেয়ে বলিয়া ভুল করিত। আমার মেস-জীবনে আমার সিটের উপর দেওয়ালে আমার স্ত্রীর একটি জোড়া ফটো লটকাইয়া রাখিয়াছিলাম। ছবিটিতে আমি চেয়ারে বসিয়া আছি। আমার স্ত্রী আমার ডান-কাঁধে বাঁ হাত রাখিয়া চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মিসেস দাশের একটি জোড়াফটোর অনুকরণে আমি এই ফটোটি তুলাইয়াছিলাম। কাজেই ফটোটি আমার খুব প্রিয় ছিল। ফটোতে আমি দাড়িওয়ালা শেরওয়ানি-পরা নব্য প্রৌঢ় লোক। আর আমার স্ত্রী কালডুরি-পাড়ের সাদা শাড়ি-পরা নিরাভরণা একটি কচি খুকি। গহনা-পত্র ও নকশি শাড়িটাড়ি পরিলে তবু হয়ত একটু বউ-বউ মনে হইত। গহনা-পত্রহীনা সাদা শাড়ি-পরা অবস্থায় তাকে ‘বউ’ বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। আমার রুম মেটের এক নয়া মেহমান ঐ ফটো দেখিয়া মন্তব্য করেন : ‘মৌলবীর ত শখ কম না। মেয়েরে নিয়া ফটো তুলিয়াছে। বন্ধু জিভে কামড় দিয়া আঙুলে তার পেটে গুঁতা মারিয়া চোখ ইশারায় সাবধান করিয়া দিলে তিনি চুপ করেন। মেহমানের কোনও দোষ ছিল না। কারণ যখন তিনি এই মন্তব্য করিতেছিলেন, তখন আমি চাপদাড়ি ছাঁটিয়া ফ্রেঞ্চকাট করিয়াছি, শেরওয়ানির বদলে কোট-পায়জামা পরিয়া অনেকটা যুবক হইয়াছি। ঐ ফটোর মৌলবী সাব যে আমিই, তা বুঝিবার উপায় ছিল না।

২. বয়সের দূরত্ব লোপ

কিন্তু আমাদের এই বয়সের ও চেহারা-ছবির গরমিল আমার স্ত্রীর মনে কোনও বিরূপ ক্রিয়া করিয়াছিল বলিয়া আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই। আমি মুখে-মুখে যতই সন্ন্যাসীগিরি দেখাই না কেন, মনে-মনে আমি কবি ও প্রেমিক ছিলাম নিশ্চয়ই। সেই জন্যই বোধহয় বিয়ার দিনেই স্ত্রীকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। বাপ-মার সেবার একমাত্র উদ্দেশ্যে যে বউ ঘরে আনিলাম, বাপ-মার খেদমতে তাকে নিয়োগ না করিয়া কর্মস্থল কলিকাতায় নিয়া গেলাম। আমি নিশ্চয়ই তার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রতি কিসে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন? আকৃষ্ট যে হইয়াছিলেন তার প্রমাণ এই যে, আমি যেদিন তাঁর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা কর্মস্থলে চলিয়া যাইতাম সেদিন তিনি গোসল ও খানাপিনা ত্যাগ করিয়া যে বিছানা নিতেন। আমার মা-ফুফু-ভাবিরা হাজার জোর করিয়াও একাধদিন না গেলে কিছু খাওয়াইতে পারিতেন না। এগার বছরের বালিকার পক্ষে ত্রিশ বছরের স্বামীর বিরহে এমন ভাত-পানি ছাড়িয়া দেওয়া মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এটা তিনি করিতেন। এ বিষয়ে তার কোনও লজ্জা-শরম ছিল না; অথবা লজ্জা শরম কাকে বলে তা বুঝিবার বয়সই তার হয় নাই। এতদিন পরে বুঝিতেছি, বয়সের এই পার্থক্যটা আমি ভুলাইয়া দিতে পারিয়াছিলাম। আমাকে তুমি বলাইতে পারিয়াছিলাম। মাত্র এগার বছরের খুকির পক্ষে ত্রিশ বছরের একটা দাড়িওয়ালা জওয়ানকে ‘তুমি’ সম্বোধন করা নিশ্চয়ই খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু এটা আমার স্ত্রী পারিয়াছিলেন। এটা যখন পারিলেন তখন বয়সের পার্থক্যটা। বোধ হয় একদম তলাইয়া গিয়াছিল। তা যদি না হইবে তবে ঐটুকু ছোট্ট খুকি আমার উপর ধমকাইয়া হুকুম জারি করিতে পারিতেন না। আমার ভুল-ত্রুটির জন্য ধমকাইতে-শাসাইতে পারিতেন না। তাছাড়া আমি বুঝিয়াছিলাম ঐটুকু খুকির মধ্যেও একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধীনতা ছিল। বিয়ার পর বছর-খানেকের মধ্যেই যখন তাঁকে কলিকাতা নিয়া বাসা করি তখন তাঁকে সহায়তা

করার কেউ ছিল না। পাশের বাসার চাকরকে দিয়া বাজার করাইতেন, আর রান্না-বান্না নিজেই করিতেন। আমার দীর্ঘ আফিস আওয়ারে বাসায় একাই থাকিতেন। প্রথমবারের মুদ্দতে তিনি কলিকাতায় ছিলেন মাত্র এক বছর। এই এক বছরেই তিনি আমার বন্ধু-বান্ধবের স্ত্রী মহলে বিশেষত সওগাত আফিসে সমাগত মহিলা মহলে খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। এই সময়ে কাজী নজরুল ইসলাম, সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দিন, কবি গোলাম মোস্তফা, সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন, সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি মঈনুদ্দীন, হবিবুল্লা বাহার প্রভৃতি সবাই আমাদের বন্ধু মহল। এঁদের সবারই পরিবারের মধ্যে আমার স্ত্রীর যাতায়াত। এই মহলের মহিলারা সবাই বয়সে আমার স্ত্রীর অনেক বড়। তবু সওগাত আফিসে যে কয়বার মহিলাদের গ্রুফ ফটো তোলা হইয়াছে, তাতে আমার স্ত্রীকেই মধ্যমণি হিসাবে বসান হইয়াছে। এ সব দেখিয়া ক্রমে আমার মনেও এই প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, লেখাপড়া কম জানিয়া এবং বয়সে অপরিণত হইয়াও ব্যক্তিত্ব প্রজেকশনের ক্ষমতা তার মধ্যে জন্মগতভাবেই ছিল।

আমার শ্বশুর মওলানা আকালুবী সাহেব নারী শিক্ষার খুব জোর সমর্থক ছিলেন। বহু ধনী শাগরিদ-মুরিদকে তিনি মেয়েদেরে উচ্চশিক্ষা দিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের মেয়েদের কাউকে তিনি উচ্চশিক্ষা দেন নাই। তৎকালে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা খুব ব্যয়সাধ্য ছিল। মওলানা আকালুবী সাহেব গরীব মানুষ ছিলেন। কাজেই নিজের বাড়িতে বালিকাদের জন্য একটি স্কুল খুলেন। তাতে আরবি, ফারসি, বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ও সামান্য ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরাও সাধারণত কমপক্ষে বার বছরের বেশি কেউ অবিবাহিত থাকে না। এর পরেই হয় মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায়, নয়-ত বিবাহের যোগ্য মেয়েকে বাপ-মারা পর্দায় বন্ধ করিয়া থাকেন। মওলানা সাহেবের পাঁচ মেয়ের সবারই লেখা-পড়া ঐ স্কুল পর্যন্ত। আমার স্ত্রীও ঐটুকু বিদ্বান হইয়াই আমার ঘর করিতে আসেন। পাড়াগাঁয়ের আমার বাপ-মার খেদমত করার জন্য এইটুকু বিদ্যাই যথেষ্টের চেয়ে বেশি হইল। কিন্তু আমি তাকে সাংবাদিকের সহধর্মিণী হিসাবে যখন কলিকাতা নিয়া গেলাম, তখন স্বভাবতই তার আর একটু লেখা-পড়া জানার দরকার হইল। আমার কিছু বলিতে হইল না। আমার শ্বশুর ও সম্বন্ধীই আমার স্ত্রীকে তা বুঝাইলেন। দ্বিতীয় বার দেখা হইবার সময়েই দেখিলাম, তাঁরা এঁকে কিছু-কিছু নূতন পুস্তক কিনিয়া দিয়াছেন। আমিও দিলাম। গোড়াতে আমার নিজের ও আমার স্ত্রীর সংকল্প ছিল যে তিনি প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবেন এবং তদনুসারে কিছুদিন পড়াশোনাও চালাইলেন। কিন্তু দুই-এক বছরের মধ্যেই আপনা-আপনি তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া সংসারী হইয়া গেলেন এবং আমিও যেন তা বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইলাম।

কারণ তাঁর পনের বছর বয়স হইবার আগেই আমরা একটি পুত্র সন্তান লাভ করিলাম এবং আর দুই বছর পরে আরেকটি পুত্র সন্তান লাভ করিলাম। এটা খুবই নিষ্ঠুরতা হইয়াছিল। সতের বছর বয়সের নারী দুইটি সন্তানের মা হওয়া কোনও নারীর স্বাস্থ্যের পক্ষেই শুভ হইতে পারে না।

### ৩. কচি ঘাড়ে ভারী বোঝা

বিয়ার তিন বছর পরেই আমি উকালতি শুরু করিলাম। কলিকাতা ছাড়িয়া ময়মনসিংহ শহরে আসিলাম। নূতন উকিলের পক্ষে পেটে-ভাতের আয়ের বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। তবু আমি দুই সন্তানের মা সতের বছরের বয়সের বালিকাকে শহরে আনিয়া আমার অভাবের সংসারের

দায়িত্ব তার উপর চাপাইয়া দেই। এর আগে কলিকাতার জীবনে তাকে বিশেষ কোনও দায়িত্ব বহন করিতে হয় নাই। আমরা দুজনের জন্য একবেলা ডাল-তরকারি রাধিয়া দুই বেলা শুধু এক পোয়া চাউল সিদ্ধ করিলেই রান্না-বান্নার কাজ শেষ। কয়লার চুলাটাও তার নিজের ধরাইতে হইত না। প্রতিবেশী বন্ধু আমাদের বাজারটাও করিয়া দিতেন। তার চাকরটা আমাদের বালতির চুলাটাও ধরাইয়া দিত। কাজেই কলিকাতায় সপরিবারে বাস করা সত্ত্বেও আমি না শিখিয়াছি বাজার করিতে; আমার স্ত্রী না শিখিয়াছেন কয়লার চুলা ধরাইতে। কাজেই আমরা উভয়েই শুরু করিলাম ইংরাজিতে যাকে বলে ফ্রম দি ক্র্যাচ। আঁচড় হইতে।

কথায় বলে 'আম ছোট হইলে কী হইবে আঁটি বড় আছে'; আমারও আয়। কম ও বাবুর্চি নাবালিকা হইলে কী হইবে, আমার বাসায় মেহমানের জোর ছিল। এই সময় প্রতিমাসে আমার বাসায় চার মণ চাউল খরচ হইত। তার। মানে প্রতিবেলা গড়ে পনের-বিশ জন লোক খানা খাইতাম। এত লোক হইবার প্রধান কারণ এই যে আমি স্থানীয় লোক। আত্মীয়-স্বজন অন্য কাজেই শহরে আসুন, আর মামলা-মোকদ্দমা করিতেই আসুন, আমাকে দিয়াই মামলা করান, আর অপর উকিলকে দিয়াই মামলা করান, আমার বাসায় চারটা ডাল ভাত না খাইয়া গেলে আমি অসন্তুষ্ট হইতে পারি, এ সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজনরা সর্বদাই সচেতন ছিলেন। মেহমান বেশি হওয়ার দ্বিতীয় কারণ প্রজা আন্দোলনের নেতা ও প্রজা-সমিতির সেক্রেটারি হিসাবে সমিতির আফিসের লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থাটা আমারই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া মফস্বল হইতে নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসিলে তাঁদেরে সম্মান করা ও তাদের থাকা-খাওয়ার সুবিধার দিকে নজর রাখাও আমারই কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া আমার বৈঠকখানায় সমাগত ভদ্রলোকদের চা খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। আমার রাজনৈতিক গুরু মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেবের নিকট আমি এটা শিখিয়াছিলাম। তিনি সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন, যদি তোমরা নূতন কোনও মতবাদ প্রচার করিতে চাও, তবে নিজের বৈঠকখানাকে চায়ের আড্ডায় পরিণত কর। এই ধরনের চায়ের বৈঠকেই দুনিয়ার সমস্ত নূতন মতবাদ দানা বাঁধিয়াছে। মৌলবী সাহেবের এই উপদেশ আমি সাধ্যমত মানিয়া চলিতাম। ফলে বাসায় খাবার ব্যবস্থা যেমন থাকুক, চায়ের ব্যবস্থা থাকিতই। এ সবে যে খরচ খুব বেশি হইত তা নয়। কারণ চা তখন আট দশ আনা পাউন্ড। দুধ তখন টাকায় ষোল সের; চিনি পাঁচ আনা সের। ছয় পয়সা করিয়া তশতরিসহ চায়ের কাপ পাওয়া যাইত। সুতরাং ডজনে-ডজনে চায়ের কাপ কিনিতেও খুব কষ্ট হইত না। কিন্তু কষ্ট হইত আমার স্ত্রীর। একটি মাত্র চাকর লইয়া তিনি এতলোকের জন্য রান্না-বান্না ও চা তৈরি করিতেন। তা ছাড়া আমার মেহমানদারির কোনও ওয়াকত-বেওয়াকত ছিল না। মফস্বলে মিটিং করিতে গিয়া হয়ত রাত একটার সময় তিন-চারজন মেহমান লইয়া বাসায় ফিরিলাম। স্ত্রীকে জানাইলাম আমার নিজের অবশ্য ক্ষিধা নাই, না খাইলেও চলে। কিন্তু মেহমানদের ত আর ভুকা রাখা যায় না। কাজেই আর কিছু না হউক, কয়টা আলু, বেগুন বা শিম ভর্তা ও কয়টা আন্ডা ভাজা করিলেই চলিবে, আর কয় ছটাক চাউল সিদ্ধ করা, এই ত? আর কিছু করার দরকার নাই। সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা এই বালিকা আমার এই ভণ্ডামিতে রাগ করিতে পারিতেন। তার বদলে একটু হাসিয়া পাক ঘরে ঢুকিলেন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মেহমানসহ আমাকে খাওয়াইয়া দিতেন। এমনি ঘটিত প্রায়ই।

আয়-ব্যয়ের কোনো খোঁজখবর করিতাম না। আমি যা রোযগার করিতাম স্ত্রীর হাতেই আনিয়া দিতাম। যা খরচ করিতাম তাও স্ত্রীর কাছ থনেই চাহিয়া নিতাম। পনের-ষোল বছরের বালিকা স্ত্রীর

উপর এমন গুরুদায়িত্ব দেওয়াটা ছিল বিশ্বাস ও ভরসা উভয় দিকেই অসাধারণ। টাকা-পয়সার দায়িত্ব স্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার নজির খুবই বিরল। কাজেই আমার এমন ব্যবহার দেখিয়া-শিখার ব্যাপার নয়। তবে এটা আমি শিখিলাম কই? শিখিতে হয় নাই। অমনিতেই হইয়াছে। কিন্তু তারও ত একটা কারণ থাকার কথা? আমার মনে হয় সে কারণটা আমার স্ত্রীরই কৃতিত্ব। আর্থিক ব্যাপারে তাঁর তখনকার ব্যবহার সেটা ছিল নিতান্তই অসাধারণ। খুব হিসাবি মিতব্যয়ী স্ত্রীরাও স্বামীর টাকা-পয়সার ব্যাপারে নিজের খরচের বেলা মিতব্যয়ী হন না। কিন্তু আমার পনের-ষোল বছরের বালিকা স্ত্রীর মধ্যে আমি এর ব্যতিক্রম দেখিলাম। পুলকিত ত হইয়া ছিলামই, চমৎকৃতও হইয়াছিলাম। প্রথম ঘটনাটা এই :

স্ত্রীকে ময়মনসিংহ বাসায় আনার পর প্রথম শীতের আগমনেই স্ত্রীর জন্য আট টাকা দামে একটি গরম ফুলহাতা সুয়েটার কিনিয়াছিলাম। বাসায় ফিরিয়া গায়ে দিতেই বুঝা গেল আস্তিনটা তিন-চার ইঞ্চি খাট। বদলাইয়া আনিতে একাই দোকানে গেলাম। দুইটা অসুবিধা দেখা দিল। সুয়েটারের রং বদলাইতে হয়। আর পাঁচ টাকা দাম বেশি দিতে হয়। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করিতে বাসায় ফিরিলাম। স্ত্রী রং বদলাইতে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু পাঁচ টাকা বেশি খরচ করিতে আপত্তি করিলেন। তার বদলে তিনি পশমি মোটা সুতার একজোড়া বেবি হাফ মোজা কিনার হুকুম দিলেন। তাঁর নির্দেশমত আমি এক জোড়া পশমি হাফ মোজা কিনিলাম। কেন মোজা কিনিলাম বুঝিবার চেষ্টা করিলাম না। পাঁচ টাকার বদলে দশ আনার মোজা কিনিয়াই আমি খুশি হইলাম। পরদিন সন্ধ্যায় কোর্ট হইতে ফিরিয়াই দেখিলাম, কবজি-তক লম্বা আস্তিনের সুয়েটার গায় দিয়া আমার স্ত্রী আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তার মুখে মুচকি হাসি। বেবি হাফ মোজা দিয়া তিনি সে সুয়েটারের আস্তিন লম্বা করিয়াছেন, তাঁর ভাষায় এই ‘সোজা কাজটাও তিনি আমাকে নাশতা-চা দেওয়ার আগে বুঝাইলেন না। জোড়া মিলানের কৌশল ও অদৃশ্য সিলাইর নিপুণতা বুঝাটা আমার জন্য নিতান্ত সোজা কাজ ছিল না। তাঁর সিলাই নিপুণতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নিশ্চয়ই। কিন্তু অব্যক্ত আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম অন্য কারণে। তারই পোশাক বাবত স্বামীর টাকা খরচে অমন মিতব্যয়িতা? একটি বালিকা স্ত্রীর মধ্যে? আমি এক মুহূর্তে বুঝিলাম এই বালিকার উপর আমি সব ভার ছাড়িয়া দিতে পারি। দিলামও। এর পরও অমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। সবটাতেই আমি বুঝিয়াছি, আমি ভুল করি নাই।

## ৪. কুশলী নিপুণা গিন্নি

তাঁর এই আর্থিক স্বাধীনতা ও আমার একান্ত স্ত্রী-নির্ভরতা আমার জীবনের। অমূল্য সম্পদ। আমার সুখ-শান্তির আকর। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে ও বেপরোয়াভাবে উকালতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও সাংবাদিক জীবন যে আমি যাপন করিতে পারিয়াছি, তা একান্তভাবেই আমার এই বৈষয়িক নিশ্চিন্ত। সংসার পরিচালনায়, মেহমানদারিতে আমাকে কোনও দিন ভাবিতে হয় নাই। আমার স্ত্রী আমাকে ভাবিতে দেন নাই। টাকা নাই কোনও দিন বলেন নাই। আমারও তার এমনকি ছেলেদের (ততদিনে তিনি মনসুর আনাম ও মহবুব। আনাম এই দুই পুত্রের মা) কাপড়-চোপড়, জুতা-জামার ভাবনাও তিনি আমাকে ভাবিতে দেন নাই। কী কবে খাইব, কোন শেরওয়ানি-পাজামা-জুতা পরিয়া কোর্টে যাইব, তা-ও তিনিই আগে হইতে ঠিক করিয়া রাখিতেন। এটা ঘটিয়াছে অবশ্য সারাজীবনই। এটা বুঝিয়া ফেলিয়াছিলাম উকালতি জীবনের প্রথম দশ বছরেই। শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমি নই, আমার

সারা সংসার জীবনই তাঁর মুঠায়। আমার সংসারে তিনি নিজেও গলাতক ডুবিয়াছেন, তার প্রথম উপলব্ধি ঘটে আমার কৃষক-সম্পাদনার জন্য উকালতি ও ময়মনসিংহ ছাড়িয়া কলিকাতা যাওয়ার প্রাক্কালে। কলিকাতার প্রতি তার টান ছিল আগে হইতেই। কাজেই তিনি খুশিই হইলেন। কিন্তু অসুবিধাও দেখাইলেন। এই দশ বছরে তিনি সংসার কম গোছান নাই। এই ভাড়াটিয়া বাসায় তিনি গলাতক পুঁতিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিন ছেলের মা হইয়াছেন। বাড়িওয়ালাকে দিয়া বাড়ি কুশাদা করাইয়াছেন। ডাইনিং হল ও গেস্ট রুম করাইয়াছেন। তার উপযোগী টেবিল-চেয়ার-চৌকি-আলনা-মিটসেফ করিয়াছেন। প্রয়োজনমত লেপ-তোষক বাড়াইয়াছেন। গোসলের জন্য বাথরুম বানাইয়াছেন। বাড়ির মধ্যে ফুলের বাগান করিয়াছেন। উঠানের এক কোণে গোলাঘর করিয়াছেন। এতে তিনি চাউল-সরিষা ও কলাইর স্টক করেন। মওসুমের সময় সস্তা দামে কিনিয়া গোলাজাত করেন। বাজার চড়িলে বিক্রয় করিয়া লাভ করেন। এসব কাজে তিনি কোনও দিন আমার সাহায্য চান নাই। প্রজা-কর্মী বা মুহরী-মক্কেলদের সাহায্যে তিনি এ সব খরিদ-বিক্রি করিয়া থাকেন। নিজের খরচে হাঁস-মুরগি-কবুতরের ঘর বানাইয়াছেন, বাড়ির মধ্যে বেগুন, মরিচ, আলু, ডাটার ক্ষেত করিয়াছেন। লাউ-কুমড়া শসা-করল্লা-ঝিঙ্গার জাংলা করিয়াছেন। শাক-সবজি, তরি-তরকারি, মুরগ মুরগি তাঁর বাজার হইতে কিনিতে হয় না। বরঞ্চ চাকরকে দিয়া তিনি ঐ সব বিক্রি করিয়া থাকেন। এ সব সত্ত্বেও বাসার ভিতরে তিনি একটু ময়লা আবর্জনা হইতে দেন নাই। তিনি নিজ হাতে ঝটা-দা-কোদাল মারিয়া বাড়ির ভিতর ঝক-ঝকা রাখিতেন। দেওয়াল ঘেঁষিয়া ফুলের গাছ লাগাইয়াছেন। তার মাঝে-মাঝে লেবু-ডালিমের গাছ করিয়াছেন। এ সবই তিনি করিতেন আমার অজ্ঞাতে। কারণ বাসায় থাকিলে বৈঠকখানায় মক্কেল লইয়া বৈঠক করা, সারা দিন কোর্টে থাকা, সভা-সমিতি উপলক্ষে মফস্বলে বা কলিকাতায় কাটান, এত সব করিয়া আমি বেচারীর খোঁজখবর খুব কমই রাখিতাম। অবসর সময়ে এসবের জন্য যদি তার তারিফ করিতাম, তখন জবাব দিতেন : প্রশংসার আসল দাবিদার তার মা-আমার শাশুড়ি। কথাটা সত্য। তারই জন্য আমার স্ত্রীর পক্ষে রান্নাঘরের বাহিরে এতসব কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমার স্ত্রী তৃতীয় পুত্র মতলুব আনামকে প্রসব করিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁর এ নবজাত শিশুর দেখ-শোন করিবার জন্য আমার শাশুড়িকে বাসায় নিয়া আসি। স্ত্রীর অসুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়। শাশুড়িও থাকিতে বাধ্য হন। ওদিকে বাড়িতেও তার খুব তাকিদ ছিল না। তাঁর নিজের আর কোনও সন্তানাদি ছিল না। আমার শ্বশুরের এন্তেকালের পরে তিনি সৎ-পুত্রদের সাথেই থাকিতেছেন। ছয় মাস এক নাগাড়ে আমার বাসায় থাকার পর তিনি মাঝে-মাঝে নিজ বাড়িতে যাইতেন বটে কিন্তু দু-চার দিন না যাইতেই তাকে আমরা নিয়া আসিতাম। তিনিও নাতিদেরে ছাড়া থাকিতেন পারিতেন না। তাকে ছাড়া আমাদেরও চলিত না। এইভাবে তিন চার বছরের মধ্যে তিনি নাতিদের হাতে স্থায়ী বন্দিনী ও আমার সংসারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া পড়িলেন। আমার স্ত্রীর প্রচুর অবসর জুটিল। তিনিও বই-পুস্তক, সিলাইর কল ও বাড়ি-ঘর লইয়া মাতিলেন। এমনি অবস্থায় আমি যখন সপরিবারে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম আমার ছেলেরা নিজেদের দাবির জোরেই নানিকে টানিয়া গাড়িতে তুলিয়া নিল।

মেহমানের ভিড় নাই। কাজের বাড়াবাড়ি নাই। ছোট রান্নাঘরের সমস্ত দায়িত্ব আম্মার কাছে। কলিকাতা গিয়া আমাদের উভয়ের জীবনের মোড় ফিরিল। আমরা পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলাম। আমার স্ত্রীর মতে এ সময়টাই তাঁর সবচেয়ে বেশি সুখের মুদ্দত। কারণ প্রথম কয়দিন রাত খাঁটিয়া কাগজ চালু করিবার পর প্রায় সারাদিনই আমি স্ত্রীর কাছে থাকিতাম। বাসায় বসিয়া সম্পাদকীয় লিখিতাম। বিকালের দিকে আফিসে যাইতাম। দুই-এক ঘণ্টা আফিসে কাটাইয়া সন্ধ্যার একটু পরেই বাসায় ফিরিতাম। ছেলেদেরে শাশুড়ির হেফাযতে পড়ায় বসাইয়া চাকরকে রান্নার ভার দিয়া আমরা মিয়া বিবিতে গড়ের মাঠ, নিউ মার্কেটে বেড়াইতে অথবা সিনেমা দেখিতে যাইতাম। খুব কম দিনই এই প্রোগ্রামের ব্যতিক্রম হইত। স্ত্রী ছিলেন এতদিন উকিলের বিবি। ফিক্সড ইনকামের কোনও জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। সম্পাদক হিসাবে প্রতি মাসের প্রথম দিকে আড়াই শত টাকা আনিয়া তার হাতে দিতাম। খরচের জন্য তিনি এক সঙ্গে এত টাকা এর আগে আর কখনও পান নাই। এই নূতন পরিবেশে তিনি নূতন ব্যবস্থা করিলেন। তিনি মাসের পনের দিনে একবার বাজারে যাইতে আমাকে বাধ্য করিলেন। এই দিনে চাউল, ডাইল, লবণ, শুকনা মরিচ, পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, গরম মসল্লার একটা বিরাট তালিকা করিয়া আমার হাতে দিতেন। একেবারে এক মাসের বাজার। প্রতিদিনের বাজার তিনি চাকরকে দিয়াই করাইতেন। মাছ, গোশত, মুরগি, তরিতরকারি ও কাঁচা মরিচ, শাক-সবজি ছাড়া সারা মাসে তিনি আর কিছুর বাজার করাইতেন না। বাজে খরচ, গাড়ি ভাড়া, রিকশা ভাড়া, সিনেমা ইত্যাদির এবং কাপড়-চোপড় কিনার খরচ দুইজন একত্রেই করিতাম। আমার একার নিজস্ব খরচ বিশেষ-কিছু ছিল না। কারণ ট্রামে চলাচলের জন্য মাসিক টিকিট ছিল। আফিসে যাতায়াত তাই দিয়া চলিত। আফিসে বসিয়া যে চা-সিগারেট খাইতাম, তার দামও মাসের শেষে এক সঙ্গেই দিতাম।

ফলে পাকা গিন্নির মতই তিনি আমার অজ্ঞাতে বেশ কিছু টাকা সঞ্চয় করিলেন। এটা টের পাইলাম যখন আমার কৃষক-এর চাকুরি গেল। আমি উদ্বিগ্ন চিত্তে বিষণ্ন মুখে এই দুঃসংবাদ লইয়া যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন তিনি ভরসা দিলেন : কোনও চিন্তা করিও না। কিছুদিন চালাইতে পারিব। ইতিমধ্যে একটা চেষ্টা-চরিত কর। আমি ময়মনসিংহ ফিরিয়া উকালতি করিব বলায় তিনি খুব উৎসাহ দিলেন না। বলিলেন : সেটা ত হাতের পাঁচ আছেই। তার আগে কলিকাতা থাকার সবচেষ্টা শেষ করা দরকার। তার জন্য যে কয়দিন সময় লাগে, তিনি চালাইয়া নিতে পারিবেন। বুঝিলাম, কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন। চালাইয়া গেলেনও তিনি। কিন্তু বেশিদিন চালাইতে হইল না। দুই-তিন মাসের মধ্যেই হক সাহেবের নবযুগ-এর চাকুরি পাইলাম। বেতনও কৃষক-এর চেয়ে পঞ্চাশ টাকা বেশি। বিবি হাসিয়া বলিলেন : দেখ, সবুরে মেওয়া ফলে। সাহস করিতে হয়। সাহসই লক্ষ্মী।

কিন্তু লক্ষ্মী এক বছরও টিকিলেন না। নবযুগ-এর চাকুরি গেল। এবার ময়মনসিংহ ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। চাকুরিটা যাওয়ার সময় আমি সপরিবারে গ্রামের বাড়িতে ছুটি উপভোগ করিতেছিলাম। চাকুরি যাওয়ার খবরটা বাড়ি বসিয়াই পাইলাম। কাউকে কিছু না বলিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলাম। বিনা-নোটিসে আমাকে চাকুরি হইতে ডিসমিস করায় হক সাহেব আমাকে তিন মাসের বেতন দিয়া দিলেন। আমি এই টাকাটা হাতে করিয়া বিবি সাহেবাকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া

পত্র দিলাম জিনিস-পত্র গোছাইয়া ময়মনসিংহে ফিরিয়া যাইবার জন্য। ছেলেপিলেকে বাড়িতে রাখিয়া একা আসিতে তাকে উপদেশ দিলাম। তিনি উত্তরে তার আসিবার তারিখ জানাইলেন।

৬. সংকল্পে দৃঢ়তা

নির্ধারিত দিনে তাকে আনিবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। প্ল্যাটফরম টিকিট কিনিয়া ভিতরে ঢুকিলাম। কারণ বেচারী একা আসিতেছেন, কুলি ঠিক করিতে অসুবিধায় পড়িতে পারেন। লম্বা ট্রেন। যাত্রীর ভিড়। কাজেই এক-ধারসে সব কামরা দেখিয়া-দেখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হঠাৎ দূর হইতে 'আব্বা আব্বা' বলিয়া ছেলেদের সমবেত কণ্ঠস্বর শুনিলাম। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, বিছানা-পত্রের হোল্ড-অলের লট বহরের মধ্যে চার ছেলেরে লইয়া বিবি সাহেবা দাঁড়াইয়া আছেন। তিন ছেলে দৌড়িয়া আমার কাছে আসিয়া সালাম করিল। মেজো-সেজো আমাকে জড়াইয়া ধরিল। কোলেরটি হাত নাড়িয়া আনন্দ জানাইতে লাগিল। বিবি সাহেবা মুচকি-মুচকি হাসিতে থাকিলেন। আমি রাগে ভিতরে-ভিতরে ফাটিয়া পড়িতেছিলাম। মেয়ে লোকটার বিবেচনা দেখ! আমার চাকুরি গিয়াছে। জিনিসপত্র গোছাইতে দুইদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। অথচ নিয়া আসিয়াছেন সব ছেলে-পিলেকে। মনে হয় যেন লটবহর কিছু বাড়াইয়া আনিয়াছেন। যে কয়টা টাকা আছে, এদের যাতায়াত ও ফুট-ফরমায়েশ সারিতেই ত শেষ হইবে। কিন্তু প্ল্যাটফরমে অতলোকের মধ্যে ত স্ত্রীর উপর রাগ দেখাইতে পারি না। আচ্ছা চলো যাই আগে বাসায়। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। ছেলেদের আর দোষ কী? ওরা কী বুঝে? কাজেই ওরা যখন কাড়াকাড়ি করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল, তখন ওদেরে আদর করিলাম। কোলের ছেলেটা ৪র্থ–মনজুর আনাম হাত বাড়াইয়া থাকায় তাকে কোলেও লইলাম।

ফিটনে চড়িয়া বাসায় ফিরিবার পথে স্ত্রী কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন : তুমি খুব রাগ করিয়াছ জানি। কিন্তু এখন কিছু বলিব না বাসায় গিয়া সব কথা বলিব। সব শুনিলে তোমার রাগ থাকিবে না।

রাগ তখনই পড়িয়া গেল। বিবির সব কথা শোনার আর দরকারই হইল না। যা বলিলেন তাই যথেষ্ট। তাতেই রাগের স্থান দখল করিল দুশ্চিন্তা। বিনা কারণে এত ব্যয়বহুল কাজ করার মেয়ে ত তিনি নহেন। তবে কি বাড়িতে কোনও অসন্তোষ বা অমঙ্গলের কারণ ঘটিয়াছিল? দুশ্চিন্তা অসহ্য হইয়া উঠিল। কী ঘটিয়াছে তা না বলিয়া আমিই উল্টা তাকে খোশামুদি করিতে লাগিলাম। কিন্তু বাসায় গিয়া ঠাণ্ডা হইয়া সব বলিব' বলিয়া তিনি আমার দুশ্চিন্তা আরো বাড়াইয়া বোধহয় মনে-মনে কৌতুক উপভোগ করিতেছিলেন।

পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া ময়মনসিংহ জিলার অধিবাসী কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা সমিতির আমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী আবদুল রশিদ খাঁ সাহেবের বাসায় আমাদের নাশতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দুইজনের নাশতার কথা বলিয়া আমি শিয়ালদহ চলিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু খাঁ সাহেব খুব সাবধানী মানুষ। তিনি একটু বেশিই করিয়াছিলেন। এক রকমে সকলের নাশতা হইয়া গেল। ছেলে পেলেরা সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া খাঁ সাহেব দুপুরের খাবার ব্যবস্থায়ও নিজের বাসাতেই করিলেন। কাজেই গোসল-নাশতা সারিয়া আমরা নিশ্চিন্তে আলাপ করিতে লাগিলাম। বিবি সাহেবা কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া আসল কথায় আসিলেন। বলিলেন : কলিকাতা ছাড়িব না বলিয়াই ছেলেদেরে লইয়া

আসিয়াছি। অনেক তর্ক করিলাম। তার সংকল্পের অসম্ভাব্যতা দেখাইলাম। সাংবাদিকতার চাকুরির দুর্লভতা এবং প্রধান সম্পাদকতা করিবার পর কোনও কাগজের নিম্নতর চাকুরি নেওয়ায় আমার অসম্মানের কথা সবই বলিলাম। তিনি জবাবে বলিলেন যে তিনি সংবাদপত্রের চাকুরির কথা বলিতেছেন না। উকালতির কথা বলিতেছেন। আমি তার সরলতায় ঠাট্টার হাসি হাসিয়া বলিলাম : উকালতি করিব বলিলেই ত হয় না। নিজের জিলাতেই সংসার খরচ চালাইবার মত রোযগার করিতে আমার তিন-চার বছর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই বিদেশ-বিভুঁয়ে কলিকাতার মত বিশাল শহরে হাজার-হাজার উকিলের মধ্যে কে আমাকে কেস দিবে? তাছাড়া কলিকাতার বাসা খরচও অনেক বেশি। কী খাইয়া এখানে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিব?

সমান আত্মবিশ্বাসে তিনি বলিলেন : রাখে আল্লাহ মারে কে! তুমি সে জন্য চিন্তা করিও না। যত কষ্টই হোক, কলিকাতায় আমাদের থাকিতেই হইবে। ময়মনসিংহে তোমার ফিরিয়া যাওয়া হইবে না।

এতক্ষণে বিবি সাহেবা আসল কথা বলিতেছেন মনে করিয়া আমার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। তার চোখের দিকে চাহিয়া বলিলাম: কেন?

সুরে একটু আবেগ মাখিয়া তিনি বলিলেন : কলিকাতা ছাড়িয়া নিজের জিলায় ফিরিয়া যাওয়া হইবে পশ্চাৎ গমন। সেটা হইবে তোমার পরাজয়। এই পরাজয় মানিয়া নিতে আমি তোমাকে দিব না।

এটা ভাবালুতা। কিন্তু উচ্চ ও মহৎ ভাবালুতা, আত্মসম্মানবোধের কথা সুতরাং এতে যথেষ্ট জোর আছে। আমার আত্মসম্মান ও জয়-পরাজয়ে স্ত্রীর এই অনুভূতিতে আমি গর্ববোধ করিলাম। কিন্তু উপায় কী? উপায়ান্তর নাই বলিয়া তাকে ঐ পরাজয় মানিয়া নিতে বলিলাম। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন : উপায় একটা আল্লাই করিয়া দিবেন।

এ কথার কোনও জবাব নাই। সুতরাং চুপ করিয়া হুঁক্কা টানিতে লাগিলাম। তিনি উঠিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। ভাবটা এই যে, তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এতে আর আলোচনার কিছু নাই। চিন্তা করিব না বলিলেই ত হয় না। আমার মাথা জুড়িয়া চিন্তা কিলবিল করিতে লাগিল। বিবি সাবের এই জিদের পিছনে নিশ্চয়ই শক্তি আছে। সে শক্তির উৎস কী? তাঁর হাতে কি তবে কিছু টাকা আছে। আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কতই বা থাকিতে পারে? সংসার খরচ সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নাই। কোনও দিন তার খোঁজখবর করি নাই। কাগজে-কলমে ত দূরের কথা মনে-মনেও কোনও দিন হিসাব করি নাই। এখন হিসাব করিতে বসিলাম। এ যাত্রায় চার বছর কলিকাতায় আছি। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রোযগারের এই চার বছরে হাজার পনের টাকা আমি আয় করিয়াছি এটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু কত খরচ হইয়াছে? তার ধারণার আশপাশ দিয়াও যাইতে পারিলাম না। বাজে খরচের বিভিন্ন দফা ধরিয়া-ধরিয়া হিসাব করিতে লাগিলাম। হাজার কষিয়া খরচ করিলেও দুইশ টাকার কম মাস চলে নাই। তাতে চার বছরে দশ হাজার টাকা লাগিয়াছে। চার বছরে কমসেকম আট বার দেশে যাওয়া হইয়াছে। প্রতিবারে পাঁচশ করিয়া খরচ করিয়া আসিলেও আট বারে চার হাজার চলিয়া গিয়াছে। বাকি থাকিল মাত্র হাজার টাকা। এই টাকার চার-পাঁচ মাসের বেশি চলিতে পারে না। তার উপর এই টাকা হইতে উকালতির প্রস্তুতির জন্য কিছু প্রাথমিক ব্যয়

করিতে হইবে। গাউন, বই-পুস্তক ও ফার্নিচারের একটা বড় খরচ আছে। না, হাজার টাকা মূলধন লইয়া এত বড় রিস্ক নেওয়া যায় না। অথচ বিবি সাব ত কোনও যুক্তি মানিতেছেন না।

অথচ তাকে শক্ত কথা বলিতেও পারি না। বিয়ার চার বছর পরেই পনের বছরের বালিকার উপর সংসার চালাইবার ভার দিয়াছিলাম। এটা চরম নিষ্ঠুরতা হইয়াছিল, দরদি অনেক বন্ধুই আমাকে তা বলিয়াছিলেন। কিন্তু যার উপর নিষ্ঠুরতা করিলাম, তিনি কিছু বলেন নাই। কোনও দিন প্রতিবাদ করেন নাই। বরঞ্চ তিনি আমার মনে এই ধারণা সৃষ্টি ও বদ্ধমূল করিয়াছেন যে আমি যা রোযগার করি তাতে স্বচ্ছন্দে আমার সংসার চলিয়া যায়। আমার নিজের এবং ছেলেদের অথবা স্ত্রীর নিজের পোশাকপাতি, লেখাপড়ার খরচা, সিনেমা-বায়স্কোপের ব্যয়, বাড়িভাড়া, ইনশিওরেন্সের প্রিমিয়াম, দেশের জমি-জিরাতের ট্যাক্স-খাযনা, দেনার কিস্তি, অসুখ ও বিসুখে চিকিৎসা খরচা কোনটাই আদায়ের সময় তিনি বলেন নাই : টাকা নাই। যখন যেটার প্রয়োজন হইয়াছে, ঠিকমত ও সময়মত তা করিয়া গিয়াছেন। ঈদ-পরবাদিতে শুধু ছেলেদের নয়, আমাদের উভয়ের জন্য কাপড়-চোপড় কিনিয়াও বাড়িতে আমার মা, বহিন, ভাই-ভাবি-ভাতিজাদের জন্যও কাপড়-চোপড় কিনিতেন। এক একবার বাড়ি যাইবার সময় তিনি সকলের জন্যই কিছু না কিছু নিয়া নিতেন। আমার পরামর্শ বা অনুমতির অপেক্ষা রাখিতেন না। নিজের বাপের বাড়ির কারো জন্য কিছু কিনার কথা না ভাবিয়া, না বলিয়া, আমার বাপের বাড়ির লোকজনের কথা তিনি চিন্তা করেন দেখিয়া আমি মনে-মনে খুশিই হইতাম। দেশের বাড়িতে গেলে গরীব আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে কিছু কিছু সাহায্যও করিতেন। তাঁর এই সব কাজ অনেক সময় আমার কাছে দান খয়রাতের বিলাসিতা বলিয়া মনে হইত কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বলিতাম না। এসব ব্যাপারে তার স্বাধীনতা তিনি যেন ধরিয়াই লইতেন।

কিন্তু আজকার ব্যাপার তা নয়। এ ব্যাপারে স্ত্রীর উপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। অথচ দৃঢ়তা দেখাইবার সহজ পদ্ধতি খুঁজিয়া পাইতেছি না। বিষম ভাবনায় পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে কামরায় ঢুকিয়া আমাকে সেই অবস্থার চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। হাত ধরিয়া বলিলেন : কী অত-শত ভাবিতেছ? আমার প্রস্তাবে তুমি রাজি আছ ত?

দৃঢ়তা দেখাইবার এই উপযুক্ত সময়। আমি রাজি না বলিলেই বোধহয় সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। কিন্তু তা বলিতে পারিলাম না। তার বদলে বলিলাম : সংসার চালাইবা তুমি। কষ্ট হইবে তোমার। তুমি কষ্ট করিতে রাজি থাকিলে আমার রাজি-গররাজিতে কী আসে যায়?

তিনি দুই হাতে আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিলেন। দরদ দিয়া বলিলেন; না না তুমি অমন কথা বলিও না। বলো তুমি মনের খুশিতে রাজি। হইয়াছ।

এ ভারি মজার কথা! একগুয়েমি করিয়া নিজের জিদ বহাল রাখিবেন। অথচ শুধু সে জিদ মানিয়া নিলেই চলিবে না, খুশিও হইতে হইবে। খুশি নাখুশি মনের ব্যাপার। কারো ফরমায়েশ মত খুশি হওয়া যায় না। তবু যখন সহধর্মিণী-জীবনসঙ্গিনী খুশি হইতে বলিতেছেন, তখন অগত্যা বলিলাম : হাঁ, খুশিতেই রাজি হইলাম।

বলিয়া হাসিলাম। চেষ্টা করিয়া হাসিতে হইল না। স্বতই হাসি আসিল। নিজের ঐ উপায়হীনতা সত্যই হাসির ব্যাপারই ছিল। স্ত্রী তাতেই সন্তুষ্ট হইলেন।

## ৭. বিবিই জিতিলেন

সন্ধ্যার সময় তিনি আমাকে আমার সোদর-প্রতিম বন্ধু খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলামের বাসায় পার্ক সার্কাস নিয়া গেলেন। খান বাহাদুর সাহেব এই সময় বাংলা সরকারের অফিসিয়েটিং জুডিশিয়াল সেক্রেটারি। আমার স্ত্রীর সাথে তার পাতা-ভাই-বহিন সম্পর্ক। ভাই-বহিনে গোপনে আলাপ হইল। তারপর খান বাহাদুর সাহেব আমাকে যা বলিলেন, আমার স্ত্রীর কথার সঙ্গে সবই মিলিয়া গেল। তার দৃঢ়মত এই যে আমার ময়মনসিংহ ফিরা চলিবে না। কলিকাতা আলীপুরে প্র্যাকটিস শুরু করিতে হইবে। তিনি আমার ভার নিলেন। আমাকে কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। চিন্তা সত্যই করিতে হইল না। ভার তিনি সত্যই নিয়াছিলেন। এইভাবে আমার কলিকাতা থাকা হইয়া গেল। অল্প দিনেই ভাল রোযগার হইতে লাগিল। সম্পাদকতা করিয়া যে টাকা পাইতাম, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার মুখ দেখিতে লাগিলাম। স্ত্রী হাসি-মুখে সংসার চালাইতে লাগিলেন। আমি প্রায় রোজই একবার মনে করিতাম এই বুঝি তিনি বলিলেন : কেমন আমার কথা ঠিক হইল? তোমার কথামত ময়মনসিংহ চলিয়া গেলে কত বড় ভুল হইত।' বহু দিন এই কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিলাম। জবাবটাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। বলিতাম : 'সত্যই। এর জন্য অসংখ্য প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। কিন্তু অনেক দিন চলিয়া গেল। তিনি ঐ ধরনের কোনও কথাই বলিলেন না। তৈরি জবাবটা দিয়া স্ত্রীকে খুশি করিবার কোনও মওকা কাজেই পাইলাম না। অগত্যা আমি নিজেই একদিন বলিলাম : 'এ সবই তোমার বদৌলতে। তোমার উপদেশ না মানিলে মস্তবড় ভুল করিতাম।' তিনি আমার প্রশংসাটা গায় না মাখিয়া বলিলেন : 'ওসব কথা রাখ। প্রশংসা তোমারও নয়, আমারও নয়। সব প্রশংসা আল্লার। আল্লা এখানেই আমাদের রেযেক রাখিয়াছেন। তুমি তা বদলাইতে কিরূপে?' এই কলিকাতায় থাকা-না থাকার উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক ঘটনা নির্ভরশীল ছিল। ময়মনসিংহে চলিয়া আসিলে এর চেয়েও আর্থিক ভাল হইত কি মন্দ হইত, সেটা অবশ্য বুঝিবার বা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু কলিকাতায় থাকার দরুন যা-যা ঘটিয়াছিল, কলিকাতায় না থাকিলে তা না ঘটিবার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। কলিকাতার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতা, রেনেসাঁ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হওয়া, মুসলিম লীগে যোগ দেওয়া, গণ-পরিষদের মেম্বর হওয়া, সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক লীগের নমিনেশন পাওয়া, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক হওয়া, ইত্তেহাদ-এর সম্পাদক হওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলিকে যদি আমার রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ধরা হয়, তবে এটাও ধরিতে হইবে যে কলিকাতায় উপস্থিত না থাকিলে এর অনেকগুলিই না ঘটিতে পারিত। আমার কলিকাতার থাকার জন্য একমাত্র আমার স্ত্রীই দায়ী। সুতরাং নির্ভয়ে বলা চলে আমার জীবনের এইসব ঘটনার জন্য আমার স্ত্রীই দায়ী।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে মুখের উপর স্ত্রৈণ বলিতেন। কথাটা হয় ত সত্য। কারণ আমার জীবনের সব ক্ষেত্রেই তার প্রভাব অল্প-বিস্তর ছিল। উপরের ঘটনাবলিতে তাঁর দায়িত্ব স্পষ্টই বুঝা যায়, তবে তার প্রভাব ওতে তত সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু এর পর যা ঘটিল তাতে তার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যাইবে।

## ৮. বিবির প্রভাবের ব্যাপকতা

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের এক বছর আগে হইতেই নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছিল। সে তোড়জোড়ের আমি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। আওয়ামী লীগের কাউন্সিল মিটিং

হইল ময়মনসিংহে। আমি অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। আমার বাসায় নেতাদের যাতায়াত ও সমাগম। সবটাতেই আমি আছি। কিন্তু বরাবরের মত আমি আগেই ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছি, আমি নিজে নির্বাচনে দাঁড়াইব না। হক সাহেব ভাসানী সাহেব ও শহীদ সাহেব সকলেই আমার এই সংকল্পের কথা জানিতেন। তারা আমার দাঁড়াইবার পক্ষে অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়াছেন। অনেক আদেশ-নির্দেশ দিয়াছেন। আমি রাজি হই নাই। মওলানা ভাসানী ও হক সাহেব আমার স্ত্রীর সঙ্গে কি আলাপ-আলোচনা করিলেন আল্লাই জানেন। এরপর তিনিও আমাকে ক্যানভাস করিতে লাগিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম শুধু হক সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মত মুরুব্বিদ্বয়ের অনুরোধেই বিবিসাহেব আমাকে এই কথা বলিতেছেন। আমাকে অনুরোধ করিয়াই তিনি তার কর্তব্য শেষ করিবেন।

কিন্তু ও খোদা! আমার 'না' বরাবরের ন্যায় মানিলেন না। বরঞ্চ তিনি অন্য পথ ধরিলেন। বলিলেন : বেশ। তবে তোমার সংকল্পই ঠিক থাক। তুমি তবে কোনও প্রকার রাজনীতিই করিতে পারিবা না।

তর্ক বাধিয়া গেল। তিনি বলিলেন : হয় আমাকে পুরাপুরি রাজনীতি করিতে হইবে অর্থাৎ আইনসভায় যাইতে হইবে। নয় ত একদম ছাড়িতে হইবে। মাঝামাঝি রাজনীতি তিনি আমাকে করিতে দিবেন না। তর্ক করিতে-করিতে তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। আবেগ-ভরা ওজস্বিনী ভাষায় তিনি বলিলেন : পঁচিশ বছর ধরিয়া রাত জাগিয়া তোমার কর্মী বন্ধুদেরে ভাত খাওয়াইয়াছি। কোনও কথা বলি নাই। কোনও আপত্তি করি নাই। জীবন-ভরা পরের জন্য খাঁটিয়া শরীর খারাপ করিয়াছ, পরের জন্য ভোট ভিক্ষা করিয়া আত্মমর্যাদা নষ্ট করিয়াছ, ভোটারদের কাছে ওয়াদা করিয়াছ তোমার নিজ মুখেই কিন্তু সে ওয়াদা পূরণের দায়িত্ব দিয়াছ অপরের কাঁধে। এটা আমি আর হইতে দিব না। হয় তুমি নিজে প্রার্থী হইবা, নয় ত আজই আওয়ামী লীগের সভাপতিত্বে রিযাইন দিবা। এই দুইটার একটা তোমাকে করিতেই হইবে। আজই করিতে হইবে।

এর ফলে সকলেই জানেন। মওলানা ভাসানী ও হক সাহেব আমার মত পরিবর্তনে মোটেই বিস্মিত হন নাই। তাঁরা বলিয়াছিলেন, এটা যে হইবে তারা তা জানিতেন। জানিতেন হয়ত ঠিকই কিন্তু তাঁরা বোধ হয় এটা জানিতেন না যে আমার স্ত্রী অমন বেঁকিয়া না বসিলে আমি কিছুতেই মত বদলাইতাম না। কারণ এটা কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, কথাটা সত্য যে মেম্বরগিরি বা মন্ত্রিত্বে আমার কোনও লোভ ছিল না। এ মনোভাব আমার কংগ্রেস হইতেই শিক্ষা। আমার চিন্তা-ধারার উপর এটা মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব। আমি ভয়ানক রাজনৈতিক চিন্তক ছিলাম। দেশের সমস্ত সমস্যা আমার মাথায় কিলবিল করিত ও করে। সে সব সমস্যা সমাধানেরও চিন্তা আমি করিতাম ও করিয়া থাকি। ঐসব সমস্যার সমাধান করিয়া দেশবাসীর কল্যাণ করিয়া যশ ও সম্মান অর্জনের বাসনাও আমার খুবই তীব্র। অথচ বিপ্লবে আমি বিশ্বাস করি না। আমার মতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ঐসব সংস্কার করিতে হইবে। তা করিতে গেলে আইনসভার মেম্বাররাই ঐ সব করিবেন। শুধু মেম্বর হইলেই চলে না। মন্ত্রীও হইতে হয়। এসব ব্যাপারে আমার কোনও দ্বিমত বা দ্বিধা-সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এসব করিতে হইলে আমাকেই মেম্বর-মন্ত্রী হইতেই হইবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না। কংগ্রেসে মহাত্মাজী ছাড়াও অনেকে ছিলেন এবং আছেন যারা মেম্বর-মন্ত্রী না হইয়াও দেশের সেবা করিতেছেন এবং দেশবাসীর শ্রদ্ধা-সম্মান যশ ও প্রভাবের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁদের যশ-মর্যাদা

মন্ত্রীদের চেয়ে কম নয়। এঁরাই আমার আদর্শ। কাজেই মেম্বর-মন্ত্রী না হওয়াটাকে আমি কোনও ত্যাগ মনে করিতাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী এবং অনেক ভক্ত-অনুরক্ত সহকর্মী মনে করিতেন, আমি দলের সাফল্যের জন্যই এইভাবে আত্মত্যাগ করিতেছি। মেম্বর হইলেই আমি মন্ত্রীও হইব এটা আমার সহকর্মীরা ও আমার স্ত্রী বিশ্বাস করিতেন। আমি নিজেও করিতাম। আমি মন্ত্রী হইবার যোগ্য। দলের মধ্যে আমার চেয়ে যোগ্য লোক খুব বেশি নাই, এ আত্মবিশ্বাসও আমার ছিল এবং আছে। হয়ত আমার স্ত্রী এই চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার আশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনও দোষের ব্যাপার নয়। তেমনি কোনও নারীর পক্ষে উকিলের বিবি হইতে মন্ত্রীর বেগম হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকাও দোষের নয়। যদি আমার স্ত্রীর মনে অমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তবে সেজন্য আমি তাকে দোষ দেই না। কিন্তু তেমনি কথা তিনি আমাকে বলেন নাই। বরঞ্চ আমার মেম্বর-মন্ত্রী না হওয়ার অভিপ্রায়কে তিনি দায়িত্ব এড়াইবার মনোভাব বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন : তুমি দায়িত্ব লইতে ভয় পাও। পরের কাঁধে বন্দুক রাখিয়া শিকার করিতে চাও। নিজে বন্দুক কাঁধে লইতে চাও না।

এটা ভীরুতা-কাপুরুষতার অভিযোগ। এ অভিযোগ এর আগে কেউ আমার বিরুদ্ধে করেন নাই। আমিও নিজেকে কাপুরুষ মনে করিতাম না। বরঞ্চ আমি একরূপ বেপরওয়া রেকলেস ছিলাম। কাজেই দায়িত্ব এড়াইয়া চলিবার অভিযোগ, ভীরুতার কটাক্ষ, আমাকে খেপাইয়া দিয়াছিল। তাই বোধ হয় এবার অতি সহজে ত্রিশ বৎসরের সংকল্প একদিনে বিসর্জন দিতে পারিয়াছিলাম। কাজেই দেখা যাইতেছে আমার মেম্বর-মন্ত্রী হওয়ার গোড়ায় রহিয়াছে আমার স্ত্রীর প্রভাব। দেশের রাজনৈতিক কর্মীদের চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা যা, আমার বেলা তা পূর্ণ হইয়াছে। আমি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মেম্বর, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এমনকি পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীও হইয়াছি। এইদিক হইতে আমার স্ত্রীর গর্ব করিবার অধিকার আছে। এ সবের প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। এই একই কারণে দুঃখও তাঁর সবচেয়ে বেশি। কারণ ১৯৫৩ সালে জোর-যবরদস্তি না করিলে পাকিস্তানের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হইতাম না। এটা যেমন সত্য, তেমনি দুর্নীতির অভিযোগের আসামিও হইতাম না, এটাও সত্য। বেচারীর এই দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আমাকে গ্রেফতার করিয়া জেলে নেওয়ার সময় তিনি বলিয়াছিলেন : "তোমাকে আমিই জেলে পাঠাইলাম। জীবনে একথা আমি ভুলিতে পারিব না। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছি এই বলিয়া : তুমি আমাকে মন্ত্রী হইতেই বলিয়াছিলা; ভুল বা অন্যায় করিতে ত বল নাই।

৯. আমার স্বাস্থ্যের দিকে অতন্দ্র দৃষ্টি

আমার শরীর-স্বাস্থ্য, রোগ-চিকিৎসা সম্বন্ধে তিনি কতটা অধিকার খাটাইতেন, তার প্রমাণ পাইয়াছিলাম করাচিতে মন্ত্রী থাকাকালে। একবার আমার পায়ের চিকিৎসা করিতে গিয়া ডাক্তাররা ঠিক করিলেন আমার বা উরাতে সাফেনাস নামক রগ একটি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। হাসপাতালে মন্ত্রীর উপযোগী ব্যবস্থাদি করিয়া ডাক্তাররা আমাকে নিতে আসেন। আমার স্ত্রী ডাক্তারদেরে জেরা করিয়া কী ধরনের অপারেশন হইবে, তা জানিয়া নেন এবং তাতে আপত্তি করেন। আমাকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে ঔষধে সকল প্রকারের চেষ্টা শেষ না করিয়া অপারেশনে আমার রাজি হওয়া উচিৎ নয়। আমি জবাব দিলাম এ ব্যাপারে ডাক্তারদের মতকে চূড়ান্ত বলিয়া মানা উচিৎ। উত্তরে তিনি বলিলেন : পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধান-প্রধান ডাক্তারদেরে না দেখাইয়া করাচির

ডাক্তারদের মতকে তিনি চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া নিতে রাজি নন। আমি বিবি সাহেবের এই অযৌক্তিক জিদে বড়ই বেকায়দায় পড়িয়া যাই। যারা করাচিতে আমার চিকিৎসা করিতেছেন তারা সকলেই নামকরা বড় ডাক্তার। কেউ ফিজিশিয়ান, কেউ সার্জন। তাঁদের অভিমতের নির্ভুলতার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। তিনি আমার কথার জবাবে বলিলেন: তাদের নির্ভুল মত দুদিন পরেও নির্ভুলই থাকিবে। ইতিমধ্যে দুই-একদিনের জন্য ঢাকা গিয়া ওখানকার ডাক্তারদের কনসাল্ট করিয়া আসিতে দোষ কী?' আজ শিরাটা না কাটিলেও দু'দিন পরে কাটা যাইবে। কিন্তু একবার কাটিয়া ফেলিলে পুনর্বহাল করা যাইবে না। ডাক্তাররা যথেষ্ট শ্রদ্ধা-বিনয়ের ভাব দেখাইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইলেন যে মন্ত্রী-হিসাবে আমার স্বাস্থ্যের জিম্মাদার তাঁরা। বেগম সাহেবের তাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও অধিকার নাই। অধিকারের প্রশ্ন তোলায় বিবি সাহেব আগুন হইয়া গেলেন। ডাক্তারদেরে বলিলেন : মন্ত্রী হওয়ার দরুন যদি স্বামীর চিকিৎসার উপর আমার কোনও হাত না থাকে, এই মন্ত্রিত্বই যদি আপনাদেরে এই একক অধিকার দিয়া থাকে, তবে আমি তাঁকে এই মুহূর্তে মন্ত্রিত্বে পদত্যাগ করাইব। তবু আজ অপারেশনের জন্য আমার স্বামীকে আপনাদের হাতে ছাড়িয়া দিব না।'

আমার স্ত্রী অগ্নিমূর্তি ও এই দৃঢ়তা দেখিয়া ডাক্তাররা প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। তার অজ্ঞতায় কৌতুক বোধ করিলেন। ফলে নরম হইলেন। ভাবিলেন বোধ হয় অজ্ঞ মেয়েলোকের সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল। ডাক্তাররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া অপারেশনের দিন পিছাইয়া দিলেন এবং মুখে খাইবার ঔষধ দিয়া বিদায় হইলেন। ডাক্তাররা বিদায় হইলে বিবি সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারিকে দিয়া তৎক্ষণাৎ সেই-রাত্রের প্লেনেই ঢাকা আসিবার দু'খানা টিকিট করিয়া ফেলিলেন। এর ফলে পরদিন সকালে সাতটার সময় আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের একজন রোগী। বিবি সাহেবের কথাই ঠিক। ঢাকা ও মির্যাপুরের সব ডাক্তাররাই একমত হইলেন যে, বিবি সাহেব অপারেশন বাধা দিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছেন। ঐ অপারেশন মস্ত বড় ভুল হইত। জীবনের নামে বাঁ-পা হারাইতাম।

শুধু এইবার নয়। আরেকবার করাচির বড়-বড় সার্জন-ফিজিশিয়ানরা একমত হইয়া আমার গল-ব্লাডার অপারেশন করিতে চাহিয়াছিলেন। এ বারও বিবি সাহেব বাধা দেন এবং আবার এক্স-রে করাইয়া ঢাকার ডাক্তারদের দেখাইয়া প্রমাণ করেন যে, আমার গল-ব্লাডারে কোনও স্টোন হয় নাই।

এই সব ঘটনা হইতে এটাই বুঝা যাইবে যে, আমার স্ত্রী নিজেকেই সকল ব্যাপারে আমার গার্ডিয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন এবং আমি তা সানন্দে মানিয়া লইয়াছি। সানন্দে মানিয়া লইয়াছি এই জন্য যে স্ত্রীর এই অভিভাবকত্ব কখনো আমার কাছে প্রভুত্ব বলিয়া ঠেকে নাই। বরঞ্চ কথায় ও কাজে আমার সুখ-সুবিধার জন্য শারীরিক পরিশ্রমে তিনি প্রমাণ করিতেন, আজও করেন, তিনি আমার দাসী মাত্র। কাজেই দাম্পত্য জীবনে আমি পরম সুখী এ কথা শুধু আমার একার কথা নয় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরাও তা বলিয়া থাকেন।

## ১০. সুখী দাম্পত্য জীবন

আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবের ধারণা এবং সে ধারণা তাঁরা মুখে প্রকাশও করিয়া থাকেন যে, দাম্পত্য জীবনে এই নিরঙ্কুশ সুখই আমার প্রতিভা বিকাশে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। তাঁদের দু-চারজন খুব কঠোর ভাষায় কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে বলিয়াছেন : তুমি বউ-এর আঁচলে বাধা গৃহপালিত পশু

“ডোমিটিকেটেড এনিম্যাল” মাত্র। আর্ট-সাহিত্যে মৌলিক কিছু দিবার দিন তোমার ফুরাইয়াছে। শুধু আমাকে একা নয় আরো অনেককেই একথা তাঁরা বলিয়াছেন। সারা দুনিয়ার বহু দৃষ্টান্ত দিয়া এঁরা দেখাইয়া থাকেন যে, চিরস্মরণীয় মনীষীরা কেউই দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন না। মনীষী বলিতে তারা নিশ্চয়ই কবি-সাহিত্যিক ও দর্শনী-বিজ্ঞানীদেরেই বুঝাইয়া থাকেন। কারণ দাম্পত্য জীবনে পরম সুখী বহু লোক রাষ্ট্রনেতা হিসাবে চরম সাফল্য লাভ করিয়াছেন। অসুখী স্বামী ইব্রাহিম লিংকনের মোকাবিলা আমরা অনেক রুযভেল্ট, চার্চিল, গান্ধীর নাম করিতে পারি। তবে কবি-সাহিত্যিকদের বেলা বন্ধুদের কথায় জোর আছে বলিয়া আমার মনে হয়। অনুভূতির তীব্রতা ছাড়া উকৃষ্ট কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না। মনের দিক হইতে সুখী লোকের অনুভূতি তীব্র হওয়ার অসুবিধা আছে। পাথরে পাথর ঘষিলে যেমন আগুন ক্ষরিত হয়, তেমনি বেদনার আঘাতেই মন হইতে তীব্র অনুভূতি বিচ্ছুরিত হয়। সুখের অপর নাম সন্তোষ। দাম্পত্য-সুখের অপর নাম গৃহ-প্রীতি বা ঘরমুখিতা। এই সন্তোষ ও ঘরমুখিতা মানুষের কল্পনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বেপরোয়া সাহস ভুতা করিয়া দেয়। এমন লোক মৌলিক শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির শক্তি হারাইয়া ফেলে। ঘরে বা পরিবারে যার মন বাঁধা পড়িল, তার চিন্তার পরিধিও স্বভাবতই ছোট হইয়া গেল। ঐ সংকীর্ণ মন ও সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়া কেউ বড়-কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না।

এ সব কথাই ঠিক হইতে পারে। হইতে পারে কেন, বোধ হয় সত্যই ঠিক। কিন্তু যে কথাটা আমার জীবনকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করিয়াছে, তা এই যে সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের জীবনের যেটা সবচেয়ে সুন্দর দিক সেটা মানুষের সভ্যতা। সভ্যতার প্রাথমিক ইউনিট পরিবার। পরিবারের ইউনিট দম্পতি। সুতরাং দাম্পত্য জীবনই সভ্যতার প্রাথমিক ইউনিট। ইউনিটের সঙ্গে ইউনিটির, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির যেমন শত্রুতার সম্পর্ক থাকিতে পারে না, পরিবারের সঙ্গে তেমনি জাতির ও মানবতার শত্রুতা থাকিতে পারে না। যে বিরোধ দৃশ্যত দেখা যায়, সেটা আমাদের ভ্রান্ত নীতিরই কুফল। অন্যের সুখই আমার অসুখের হেতু, অন্য কথায় আমাকে সুখী হইতে হইলে অপরকে অসুখী করিতে হইবে, এই মনোভাবই আমাদের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ।

দাম্পত্য জীবন লইয়া আমরা স্বামী-স্ত্রীতে অনেক আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিয়াছি। সাধারণ জ্ঞানের বই-পুস্তক ছাড়া যৌনবিজ্ঞানের বইও আমি অনেক পড়িয়াছি। আমার স্ত্রীও কম পড়েন নাই। তাতে আমরা উভয়েই জ্ঞান লাভ করিয়াছি নিশ্চয়ই। কিন্তু জীবন-পুস্তক-পাঠলব্ধ জ্ঞান বই-পুস্তক পাঠ-লব্ধ জ্ঞানের চেয়ে কোনও অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের চতুর্থ পুত্র মনজুর আনাম ও পঞ্চম পুত্র মহফুজ আনামের আজ্ঞা যে ছয়-সাত বছর, তা এই জ্ঞানেরই সুফল। বিদ্যা ও বয়সের শ্রেষ্ঠত্বের জোরে আমি তাকে শিখাইয়াছি অনেক। কিন্তু বয়সে ছোট ও বিদ্যায় কম হইয়াও তিনিও আমাকে অনেক শিখাইয়াছেন। সে গর্ব তিনি তাঁর লেখা ও কথায় যাহির করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বহুবার বলিয়াছেন : আমার স্বামী আমাকে গড়িয়াছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আমিও তাকে গড়িয়াছি।’ কথাটা সত্য। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে স্পষ্টতই তার একটা নিজস্ব মতবাদ আছে। তিনি এ সম্পর্কে আধুনিক স্ত্রী ও আধুনিক স্বামী নামে দুইখানি জনপ্রিয় বই লিখিয়াছেন। উচ্চ-শিক্ষিত ডিগ্রিধারী বান্ধবীদের সাথে তুমুল বাদ-বিতণ্ডা করিয়া অবশ্য তাঁর মতবাদ গড়িয়াছে। আমার বা তাঁর বন্ধু-বান্ধব যারাই তাঁকে চিনেন, তাঁরা সবাই জানেন, তিনি একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। আমিসহ পরিবারের এবং আত্মীয়স্বজনের সবাই আমরা সেই ব্যক্তিত্ব মানিয়া চলি।

কিন্তু মতবাদের দিক দিয়া আমিও কম একরোখা নই। তবু মতবাদ লইয়া আমাদের মধ্যে কদাচ বিরোধ হয় নাই। বন্ধু-বান্ধবরা বলেন, আমরাও জানি যে, আমরা সুখী দম্পতি। এ সুখের বয়স প্রায় অর্ধশতাব্দী। আমাদের এ সুখের গূঢ় কথা এই যে, মতবাদের দিক দিয়া আমরা আন্তরিকভাবেই টলারেন্ট। আর সব বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তিনি রবারের মত নমনীয়। পোশাক-পাতি ও সাজ-সজ্জা সম্পর্কে তিনি বলেন যে আমার মতই তাঁর মত। তাঁর মত-মতে স্ত্রীর সাজ-সজ্জা ত স্বামীর জন্যই। কাজেই আমি যা বলি, তিনি তাই করেন। আমি যে পোশাক পছন্দ করি, তাই তিনি পরেন। প্রসিদ্ধ পীর-আলেমের পর্দানশীন মেয়ে হইয়াও তিনি বোরকা ছাড়িয়া 'বেপর্দা' হইতে পারিয়াছিলেন এই কারণে। তিনি আমার সকল বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিশিলেন, বব কাটিয়া 'মেম সাব' হইলেন। হবিবুল্লা বাহারের কলমে আজাদ-এর পৃষ্ঠা তিনি তৎকালে 'বব কাটা ভাবি' রূপে মশহুর হইয়াছিলেন।

রাজনীতিক মতবাদে আমি তাঁকে প্রভাবিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু তিনি আমাকে করিয়াছেন অনেক বেশি। ত্রিশ দশকে আমি তাঁকে কংগ্রেসি রাজনীতিতে দীক্ষা দিয়াছিলাম। জিলা স্তরে তিনি মহিলা কংগ্রেসের আফিস বিয়ারার এবং প্রাদেশিক স্তরে সক্রিয় মেম্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু দশ বছর পরে চল্লিশের দশকে তিনিই আমাকে পাকিস্তানি মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন। কৃষক ও নবযু-এর সম্পাদনকালে আমি যখন ঘঘারতর 'সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী, তিনিই তখন অতি সাবধানে ধীরে-ধীরে মুসলিম রাজনীতি'র দিকে আমার নজর ফিরান। আমার তিন ছেলে মনসুর আনাম, মহজুব আনাম ও মতলুব আনাম তখন ৮/১০/১২ বছরের কলিকাতা মাদ্রাসার নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র। এদেরই মুসলিম লীগের 'ন্যাশনাল গার্ডের মিছিলে শামিল দেখিয়া একদিন ধমক দিলাম। জানিতে পারিলাম, তাদের আম্মার অনুমতি নিয়াই তারা এটা করিতেছে। আস্তে আস্তে বুঝিলাম আমার গোটা পরিবারই 'পাকিস্তানি' অগত্যা আমিও হইলাম। এই কারণেই বলিয়াছি, রাজনীতিতে আমার স্ত্রীই আমাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করিয়াছেন। আমি যে তাঁকে কংগ্রেসি করিয়াছিলাম সেটা ছিল স্বল্পমেয়াদি। আর তিনি যে আমাকে পাকিস্তানি, বানাইয়াছিলেন, সেটা হইয়াছে দীর্ঘমেয়াদি। বস্তুত সারা জীবন স্থায়ী। আমার রাজনৈতিক জীবনে যদি কিছু সাফল্য ঘটিয়া থাকে, তার সবটুকু কৃতিত্বই, অতএব, আমার স্ত্রীরই প্রাপ্য।

কিন্তু এক ব্যাপারে আমি তাকে মোটেই প্রভাবিত করিতে পারি নাই। সেখানেই আবশ্যক ছিল সহিষ্ণুতা। সেটা ছিল ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপার। আমিও ধর্মবিশ্বাসী ছিলাম ও আছি। কিন্তু তিনি বরাবর আনুষ্ঠানিক ধার্মিক। এই আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারেই তিনি ছিলেন এবং আছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে মুদ্দতে তিনি আমার সহচর, পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে 'অতি-আধুনিক হইয়াছিলেন, তখনও তিনি নামাজ-রোযা ছাড়েন নাই। আমার কথায়ও না, আধুনিকতার খাতিরেও না। কিছু বলিলে দৃঢ়তার সাথে জবাব দিতেন : দাস ফার, এন্ড নো ফাদার। ওটাই তোমার এলাকার সীমানা। এর পরের এলাকা আমার বিবেক ও আমার আল্লার।

এই অধ্যায়ের শেষ কথা হিসাবে আমার তরুণ বন্ধুদের একটিমাত্র উপদেশই দিতে পারি : 'স্ত্রীকে বিশ্বাস কর এবং সেটা শুরু কর প্রথম দিন হইতেই।

# ২২. উকালতি জীবন

## অধ্যায় বাইশ - উকালতি জীবন

### ১. শুরুতে নৈরাশ্য

১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে উকালতির সনদ লই ময়মনসিংহ জজকোর্টে প্র্যাকটিস করিবার জন্য। কিন্তু কলিকাতার সাংবাদিক জীবন গুটাইয়া আসিতে-আসিতে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি হইয়া যায়। পঁচাশি টাকা মাহিয়ানার সাংবাদিকতা ছাড়িয়া উকালতি ধরিতে সাধ্যমত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন যারা উকালতি করিতেছিলেন, চিঠি-পত্র লিখিয়া আগে হইতেই তাদের মতামত লইয়াছিলাম। প্রায় সকলেই জানাইয়াছিলেন যে আমার পক্ষে গোড়া হইতেই মোটামুটি দুই হইতে তিনশ টাকা মাসে রোযগার করা মোটেই কঠিন হইবে না।

তিনশ টাকা? তবে আর চিন্তাটা কী? স্নেহময় মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেবকে যামিন দিয়া বাটারওয়ার্থ কোং হইতে দুই হাজার টাকার আইন বই লইয়া ময়মনসিংহে পৌঁছিলাম। আটাশ টাকা মাসের এক নূতন দালান ভাড়া করিলাম। উকিলের বাসার উপযোগী নয়া ফার্নিচার কিনিলাম। সাইনবোর্ড লটকাইলাম। নয়া বই-বোঝাই নয়া আলমারি-টেবিল চেয়ারে চেম্বার সাজাইয়া বসিলাম। আস দেখি এইবার কত মওক্কেল আসিতে পার।

কিন্তু মওক্কেল আসিল না। এক মাস-দুই মাস-তিন মাস গেল। শেষে চার মাসও যায়। নূতন উকিলকে কোর্ট গার্ডিয়ান করা হয়। এই গার্ডিয়ান গিরির ফিস বাবত প্রথম মাসে সাড়ে চার টাকা, দ্বিতীয় মাসে ন'টাকা, তৃতীয় মাসে ফের সাড়ে চার, চতুর্থ মাসে একদম শূন্য। বাড়ি ভাড়া বকেয়া পড়িয়াছে চার মাসে সোওয়াশ। বাটারওয়ার্থের কিস্তি খেলাফ চার মাসে দুইশ। চাচা উকিল, তার বাসায় খাই। তাই উপাস থাকি নাই।

ঘাবড়াইয়া গেলাম। স্ত্রী-পুত্র লইয়া নূতন দালানে ধুম-ধামে থাকিবার যে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, প্রবল ধাক্কায় সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; চোখে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করিলাম না। বাইরে ভড়ক ঠিক রাখিলাম।

এমন সময় দি মুসলমান-এর শেয়ার বিক্রয় সফলে মৌ. মুজিবর রহমান সাহেব ময়মনসিংহে আসিলেন। তিনি আমার দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া আমাকে তার কাছে ফিরাইয়া নিতে চাইলেন। আমি রাজি না হওয়ায় তিনি নিজে খোঁজ-তালাশ করিয়া আট টাকা ভাড়ার ছোট বাসায় রাখিয়া গেলেন। আর নগদ চারশ টাকা দিয়া গেলেন। বাটারওয়ার্থের নিকট আরো সময় নিবেন, আশ্বাস দিয়া গেলেন। মৌলবী সাহেবকে বিদায় দিয়া স্টেশন হইতে সোজা বাসায় আসিলাম। কৃতজ্ঞতায় অঝোরে চোখের পানি ফেলিলাম।

এরপর আস্তে-আস্তে দু-একজন করিয়া মওক্কেল আসিতে লাগিল। তারা বড় গরীব। যা দিত চোখ বুঝিয়া তাই লইতাম। বন্ধু পরামর্শ দিলেন, অভিজ্ঞ মুহরি না রাখিলে কেস পাওয়া যাইবে না। তা

ত বুঝি। কিন্তু মুহরি রাখি কেমনে? ছোট বাসা। অন্যলোক রাখিবার জায়গা নাই। স্টোভে নিজ হাতে পাক করিয়া খাই। মুহরিকে খাওয়াইব কেমনে?

জ্ঞানী-অভিজ্ঞ পুরান উকিলরা বলিলেন : যদি ঝর-ঝরা কাঁচা টাকা চাও ফৌজদারি প্র্যাকটিস কর। আর যদি মরিবার দিন পর্যন্ত রোযগার করিতে চাও, তবে দেওয়ানি প্র্যাকটিস কর। আমার যা অবস্থা, তাতে আমি আগে ঝর-ঝরা কাঁচা টাকার সন্ধানে ফৌজদারি কোর্টেই গেলাম। কিন্তু টাকা ধরা দিল না। বুঝিলাম, আয়ের বেশির ভাগ টাকা টাউটকে না দিলে সেখানে কেস পাওয়া যাইবে না। অনেক হিতৈষী বন্ধু যুক্তি দিলেন : একদম না পাওয়ার অপেক্ষা অর্ধেক পাওয়া ভাল। যুক্তি অকাট্য। কিন্তু মনকে প্রবোধ দিতে পারিলাম না।

দেওয়ানিতেই মনোযোগ দিলাম। দেওয়ানি প্র্যাকটিসে যারা হাত পাকাইয়াছেন, তাঁরা হুঁশিয়ার করিলেন : কমসেকম পাঁচ বৎসর পেটে-ভাতে থাকিতে হইবে।

তাই রাজি। পেটে-ভাতেই থাকিলাম।

বরাবরের মত স্টোভে আন্ডাভাজি ও চাউল সিদ্ধ করিতেছি, এমন সময় খান সাহেব সাহেব আলী 'উকিল সাব' 'উকিল সাব' চিৎকার করিতে করিতে আমার বৈঠকখানায় ঢুকিলেন। দুইটি মাত্র কামরা। সামনেরটি চেম্বার, পিছনেরটি শোবার ঘর। শোবার ঘরেই স্টোভ ধরাইয়াছি। চিল্লাইয়া ডাকিলাম : ভিতরে আসুন।

২. খান সাহেব সাহেব আলী

খান সাহেব ছিলেন পিতৃতুল্য ব্যক্তি। প্রবীণ মোখতার। আমার স্কুলজীবন হইতেই তাকে চিনি। স্কুল-কলেজের কোনও সভা-সমিতি হইতেই তিনি বাদ যাইতেন না। তিনি আমার লেখা ও বক্তৃতার খুব তারিফ করিতেন। আমাকে তিনি তখন হইতেই খুব স্নেহ করিতেন। পরবর্তীকালে আমি কংগ্রেসি হইয়া যাওয়ায় তিনি মর্মাহত হইয়াছিলেন। বলিতেন : মুসলমান সমাজের একটা জুয়েল হিন্দুদের পাল্লায় পড়িয়া নষ্ট হইল। তা সত্ত্বেও তিনি আমার হিত-চিন্তা করিতেন। আমাকে মুক্তি দিবার জন্য আল্লার কাছে দোওয়া করিতেন। পথে-ঘাটে, সময়ে-অসময়ে কংগ্রেস ছাড়িবার উপদেশ দিতেন।

এমন মুরুব্বি খান সাহেবের কাছে আমার কিছুই গোপনীয় নাই। কাজেই ভিতরে ডাকিলাম। তিনি আমাকে রান্না-রত দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন : নিজ হাতে রান্না করিয়া খাওয়া খুবই সওয়াবের কাজ। কিন্তু সেটা ফকির-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর কাজ; উকিল-মোখতারের কাজ নয়। রান্না-বান্নায় আমি যে সময় নষ্ট করিতেছি, ঐ সময় আইন বই পড়ায় নিয়োজিত করিলে খুবই উপকার হইবে।

আমি যখন বলিলাম যে আমি সওয়াবের আশায় নিজ হাতে পাকাই না। চাকর রাখিতে পারি না বলিয়াই এটা করি, তখন তিনি অতি সহজ গলায় বলিলেন : চাকরের দরকার নাই, বউ-মাকে নিয়া আসেন।

আমিও সরলভাবে বলিলাম : ওদেরে আনিয়া খাওয়াইব কী? প্র্যাকটিসের কথা ত আপনি জানেনেই।

খান সাহেব গম্ভীরভাবেই বলিলেন : জানিয়াই এ কথা বলিতেছি। রেযেকের মালিক আপনি নন, আল্লাহ। বউ-মা ও ছেলেদেরে ধানীখোলা রাখিয়াছেন বলিয়া আল্লাহ তাদের রেযেক সেখানে পাঠাইতেছেন। শুধু আপনার একার রেযেক এখানে পাঠাইতেছেন। আপনি ওদেরে নিয়া আসেন। দেখিবেন, ওদের খোরাকি আল্লাহ এখানে পাঠাইতেছেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন।

আশি-বৎসরের এই বৃদ্ধের এই কথার আন্তরিকতা তাঁর চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল। আমি বলিলাম: আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু এই বাড়িতে ওদেরে আনি কেমন করিয়া?

উত্তরে খান সাহেব যা বলিলেন তাতে বুঝিলাম তাঁর আজিকার এ আগমন আকস্মিক নয়। তিনি আমার সপরিবারে থাকিবার বাড়ি ঠিক করিয়াই আসিয়াছেন। সামনের বাড়িটা দুই-একদিনের মধ্যে খালি হইতেছে। ও-বাড়ি তিনি আমার জন্য ঠিক করিয়া বাড়িওয়ালার সঙ্গে চূড়ান্ত কথা ঠিক করিয়া আসিয়াছেন। পরের রবিবারে যেন বউমাকে লইয়া আসি। ঐ বাড়ি যেদিন খালি হইবে, সেইদিনই যেন আমি উক্ত বাড়িতে প্রবেশ করিয়া বিছানা-পত্র, আসবাব-পাতি ঠিক-ঠাক করিয়া রাখি। বাড়িওয়ালার সাথে আমার কথা বলিবার দরকার নাই। আমার মঙ্গল চিন্তায় এই অনাত্মীয় বৃদ্ধের নিঃস্বার্থ আগ্রহ ও তৎপরতা দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া উঠিল। আমি এই নূতন ব্যবস্থার আর্থিক দিকটার কথা ভাবিয়া শুধু বলিলাম : কিন্তু ও-বাড়ির ভাড়া যে অনেক বেশি।

তিনি হাসিয়া জবাব দিলেন : বউমা ও ছেলেদের খোরাকিটা যিনি পাঠাইতে পারিবেন, তিনি তাদের থাকার বাড়িটার ভাড়াও পাঠাইতে পারিবেন।

### ৩. নূতন অভিজ্ঞতা

আমি তাঁর পরামর্শ-মত কাজ করিলাম। দিনে-দিনে বুঝিলাম, খান সাহেবের কথা একেবারে মিথ্যা নয়। রোযগার বাড়িতে লাগিল। কায়ক্লেশে নয় বেশ স্বচ্ছন্দে ও সুখেই দিন যাইতে লাগিল। মওক্কেল বেশ বাড়িল। অবশ্য মওক্কেল যত বাড়িল, মেহমান বাড়িল তার চেয়ে অনেক বেশি। মওক্কেল যা আসিলেন, তাঁদের অধিকাংশেই আত্মীয় অথবা চিনাজানা ‘দেশের লোক’। লজ্জায় তাদের কাছে ফিস চাইতে পারিতাম না। নিতান্ত বাধ্য হইয়া চোখ-কান বুজিয়া যখন চাহিতাম তখন অসামান্য সরলতার সাথে তারা জবাব দিতেন : ‘বাবাজি, টাকাই যদি দিতে পারি, তবে আর আপনার কাছে আসিব কেন?’ কথাটার তাৎপর্য না বুঝিয়াই হয়ত এমন কথা তাঁরা বলিতেন। কিন্তু অর্থ যাই হোক, আমি ফিস পাইতাম না। আর ফিস তারা আমাকে দেন বা না দেন আত্মীয়তা হইতে তাঁরা আমাকে বঞ্চিত করিতেন না। অন্য উকিলকে ফিস দিয়া তারা রাত্রে আমার মেহমান হইতে বিন্দুমাত্র লজ্জা পাইতেন না। শহরে থাকিবেন অথচ আমার মত নিকট আত্মীয়ের বাসায় না উঠিয়া অন্যত্র উঠিলে আমিই বা কী মনে করিব, আর লোকেই বা কী বলিবে? এইভাবে মক্কেলের চেয়ে মেহমান বেশি হওয়ায়ও খোদার ফযলে একরকমে চলিয়া যাইত। এইখানেই খান সাহেবের কথার সত্যতা আরো বেশি করিয়া ঠিক প্রমাণিত হইল। খান সাহেব মাঝে-মাঝেই আমার খোঁজখবর করিতে আসিতেন। আমার বৈঠকখানা ভর্তি লোক দেখিয়া পরিতৃপ্তির হাসি-হাসিয়া বিদায় হইতেন। বৈঠকখানার লোকের শতকরা নব্বই জন যে মওক্কেল নয়, বাকি দশের অর্ধেক যে বিনা-পয়সার মওক্কেল তা-ও তিনি জানিতেন। কারণ কোর্টে সে কথা বলিতেন এবং সাহস দিতেন। বলিতেন, আগে ভিড় হউক। এই ভিড় হইতেই মওক্কেল বাহির হইবে।

আমার বিদ্যা-বুদ্ধি ও বাগ্মিতার প্রতি বাপজীর আস্থা ছিল অসীম। কাজেই উকিল হওয়ামাত্র আমার চারপাশে মওক্কেল মৌমাছির মত ভেনভেন করিয়া ঘুরিতে শুরু করিবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু বউমার নিকট ও লোক মুখে আমার অবস্থার কথা শুনিয়া তিনিও ঘাবড়াইয়া উঠিলেন। তাঁর মত নিরীহ সরল মানুষও বাড়ি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আমাকে কেস দিবার জন্য তিনি আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি-বাড়ি ক্যানভাস করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একজনের কথা আমি ভুলিতে পারি নাই। তখন তার উপর রাগ করিয়াছিলাম। এখন ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া সে রাগ আর নাই।

এই আত্মীয়টি একজন মৌলবী সাহেব। তিনি অনেক জমি-জমা-ওয়ালা অবস্থাশালী বলিয়া তাঁর নিজেরও অনেক মামলা-মোকদ্দমা ছিল। তার চেয়ে বেশি তিনি আশ-পাশের মামলাবাজ লোকদের মামলারও তদবিরাদি করিতেন। ফলে সপ্তাহে ছয় দিনই তিনি কোর্টে হাজির থাকিতেন। বাপজী এঁকেই আমার মুরুব্বি ধরিলেন। আমাকে কেস দিবার জন্য তাকে জোর করিয়া পাকড়াইলেন। মৌলবী সাহেব কেস ত দিলেনই না, কোরআন হাদিস আওড়াইয়া বাপজীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উকালতি পেশা মুসলমানের নয়; ওটা পেশাকারের ব্যবসার মতই হারাম। আমার মত একটা ভাল ছেলেকে ঐ হারাম ব্যবসায়ে দিয়া আমার বাপ গোনাহ্ করিয়াছেন। মৌলবী সাহেব নিজে ঐ পাপ কাজের সহায়তা করেন কেন, বাপজীর এই কৌতূহলের উপরে তিনি বাপজানকে এই জ্ঞানের নূর দান করেন : মুসলমানের জন্য নাপাক দুনিয়ায় দুনিয়াবি কাজের জন্য মামলা-মোকদ্দমার মত গোনার কাজ করিতেই যখন হয়, তখন সেটা মালাউন-কাফের-হিন্দুদের দিয়া করাই ভাল। বাপজীর মত ধার্মিক আত্মীয়ের প্রিয় পুত্রকে দিয়া তিনি এই পাপ করাইতে পারেন না।

মৌলবী সাহেবের কথিত উদ্দেশ্যে না হইলেও অন্য কারণে তৎকালে অধিকাংশ অবস্থাশালী মুসলমান হিন্দু উকিলদেরই কেস দিতেন। তৎকালে এই ধারণা খুব প্রবল ছিল যে, হিন্দুরাই ভাল উকিল; মুসলমানরা ভাল উকিল নয়। ধারণাটা নিতান্ত মিথ্যা ছিল না। মুসলমান উকিলদের অধিকাংশই ফৌজদারি কেস নিতেন। কয়েক দিন হাত-মুখ পাকাইয়াই তারা এসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর হইবার আশায় অফিসারদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ আরম্ভ করিতেন। এর ফলে আরেকটা ধারণা মক্কেলদের মধ্যে হইয়াছিল যে মুসলমান উকিলরা দেওয়ানি মোকদ্দমা বুঝেন না। এই ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই আমাকে উকালতি, তা-ও দেওয়ানি উকালতি চালাইয়া যাইতে হইল। কোনও মতে বাসা খরচ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেও আমার কোনও আপত্তি ছিল না।

### ৪. 'অনুকিলী'-সততা

এই সময়ে উকিল হিসাবে আমি দুইটি কাজ করিলাম, যার ফলে উকিলরা যেমন আমার উপর খাফা হইলেন, মওক্কেল সাধারণ বিশেষত মুসলমান মওক্কেলরা আমার উপর তেমনি সন্তুষ্ট হইলেন।

প্রথমটি উকিলের বৈঠকখানায় মওক্কেলদের বসিবার ব্যবস্থা। তৎকালে ময়মনসিংহ শহরে প্রায় দুই-আড়াইশ উকিল। তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র জন ত্রিশেক। বাকি সকলেই হিন্দু। তাদের মধ্যে দুই-তিনজন ব্যারিস্টার ছিলেন। হিন্দু উকিলদের চেম্বারে সাধারণ মুসলমান মওক্কেলরা

চেয়ারে বসিতে পারিতেন না। তাঁদের জন্য ছিল টুল। প্রত্যেক হিন্দু উকিলের বৈঠকখানায় এককোণে মুসলমান মক্কেলদের জন্য একটি পানি-ছাড়া ডাবা (নারিকেলী হুক্কা), কতকটা ভুষি তামাক এবং কিছু টিক্কা থাকিত। মওক্কেলরা নিজ হাতে তামাক সাজিয়া খাইতেন। নিতান্ত শিক্ষিত ভদ্রবেশী ছাড়া আর সব মুসলমান মক্কেলকেই উকিলরা 'তুমি' বলিতেন। ময়মনসিংহ হিন্দু জমিদার-প্রধান জিলা। এখানে জমিদার ও তাদের কর্মচারী-আমলা সবাই মুসলমান প্রজাদেরে ছোট-বড়-ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে 'তুমি' বলিয়া থাকেন। উকিলরা তাদেরই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। কাজেই জমিদার কাছারির এই আদব-কায়দা খুব স্বাভাবিকভাবেই উকিলের শেরেস্তায় ঢুকিয়াছে। এই জন্য হিন্দু উকিলের শেরেস্তায় মুসলমানদের অমর্যাদার, এই অবমাননার, এই নীচুতার, এই অছুৎ-অছুৎ ভাবটা বিশেষ কারো চোখে দৃষ্টিকটু লাগিত না। আমার কাছেও না।

কিন্তু আমি উকালতি করিতে আসিয়া দেখিলাম যে, শুধু হিন্দু উকিলদের নয়, মুসলমান উকিলদের বাসাতেও এই ব্যবস্থা। মুসলমান উকিলদের অধিকাংশেই আমারই মত কৃষক-সম্প্রদায়ের লোক। তাদের আত্মীয়স্বজন যারা মামলা করিতে আসেন, তাঁরাও অধিকাংশ শিক্ষাদীক্ষায় পোশাকে পরিচ্ছদে নিতান্ত সাধারণ লোক। মুসলমান উকিলের বাসাতে আসিয়াও তাঁরা বরাবরের অভ্যাস-মত টুলেই বসিতেন, চেয়ারে বসিতেন না।

হুঁক্কার অবস্থাও প্রায় তাই। এই ব্যবস্থা আমার মনে পীড়া দিল। দুই একজন ঘনিষ্ঠ মুসলিম বন্ধুর কাছে কথাটা তুলিলাম। তাদের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলাম। তারা আমার ভাবালুতার নিন্দা করিলেন। ব্যবসা করিতে গেলে ওসব সেন্টিমেন্টালগিরি চলিবে না। মামলায় মুসলমান মওক্কেলদেরে চেয়ারে বসিতে দিলে তারা মাথায় উঠিবে। হিন্দু উকিলরা আমাদের বৈঠকখানায় আসিবেন না। হিন্দু-মুসলিম উকিলদের মধ্যে পরস্পরের বৈঠকখানায় আড্ডা মারার যে একটা ভ্রাতৃত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে, এটা নষ্ট হইবে। এতে মুসলমান উকিলদেরই ক্ষতি হইবে। বন্ধুরা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই এসব কথা বলিলেন। দুই-তিনজন গোড়ার দিকে নাকি আমার মতই চিন্তা করিতেন এবং কাজও এইরূপ শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থেই ঐ ভাবালুতা ত্যাগ করিয়াছেন।

বন্ধুদের কথা আমার পছন্দ হইল না তাই তাদের অভিজ্ঞতার খুঁটি-নাটি জানিতে চাহিলাম। কে কবে কোন মুসলিম মওক্কেলকে চেয়ারে বসিতে দেখিয়াছিলেন, কোন হিন্দু বন্ধু তার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি জানিবার চেষ্টা করিলাম। বুঝিলাম, এঁরা কেউ কিছুই করেন নাই। কোনও হিন্দু বন্ধুও প্রতিবাদ করেন নাই। কাজেই অমন কোনও ঘটনাই ঘটে নাই। ঘটিয়া থাকিলেও এঁরা দেখেন নাই। অনুমানেই এঁরা এই চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলেন। যা হইতে পারে, হওয়া খুব সম্ভব, তাই হইয়াছে বলিয়া ইহারা চালাইয়া দিয়াছেন।

কাজেই এই ব্যবস্থা আমি মানিলাম না। আমার বৈঠকখানায় চেয়ারের সংখ্যা বাড়াইলাম। যে কোনও মওক্কেল আসিলেই আমি হাতের ইশারায় চেয়ারে বসিতে বলিতাম।

অনেক মওক্কেল আনন্দে আসন গ্রহণ করিতেন। কিন্তু অধিকাংশেই আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া টুলেই বসিতেন। আমি তাঁদেরে চেষ্টা করিয়া আনিয়া চেয়ারে বসাইতাম। তারা জড়-সড় হইয়া চেয়ারের কিনারায় বসিতেন। স্পষ্টই দেখিতাম তারা চেয়ারে বসিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছেন। তখন

মামলার আলোচনা ফেলিয়া বসার ব্যবস্থা মান-সম্মান এবং মওক্কেলের অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুরু করিতাম। উকিল-মোখতারদের সমস্ত বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা, টেবিল-চেয়ার ও খাট-পালং-এর প্রতিটি ইট-কাঠ মওক্কেলদের টাকায় হইয়াছে, এদিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতাম। মওক্কেলরা উকিলদের অন্নদাতা মনিব, উকিলরা মওক্কেলদের দিন চুক্তির কামলা, এই সব কথা বলিতাম। কে কোথায় কবে শুনিয়াছেন যে মনিবকে চাকর তুই-তুংকার করে? কে কোথায় দেখিয়াছেন যে চাকর চেয়ারে বসিয়া থাকে আর মনিব তার সামনে চেয়ারে না বসিয়া টুলে বসিয়া থাকে? দস্তুরমত কৃষক-প্রজার পাবলিক মিটিং-এর বক্তৃতা।

আমার বক্তৃতায় ক্রিয়া শুরু হইল। আমার চেম্বারে লুঙ্গি-পরা, খালি গা, গামছা-কাঁধে মওক্কেলদেরে চেয়ারে বসিয়া থাকিতে রাস্তার লোকেরা দেখিতে পাইল। নিতান্ত অল্প-বয়স্ক ছেলেদেরে ছাড়া আর সকল শ্রেণীর মক্কেলদেরে আমি আপনি সম্বোধন করিতে লাগিলাম। এমনকি, দেশের বাড়িতে, রাস্তা ঘাটে ও হাটে-বাজারে, যাদেরে আমি 'তুমি' বলিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতাম, কোর্টে-কাছারিতে-এজলাসে-কাঠগড়াতে, বার লাইব্রেরিতে তাঁদেরই 'আপনি' 'অমুক সাহেব' বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। মাতবর শ্রেণীর মওক্কেলরা আমার বৈঠকখানায় বসিয়া আমার ফরসি হুঁক্কা আর গড়গড়ায় তামাক খাইতে লাগিলেন। আমি নিজে হুক্কা টানিবার পর নিজ হাতে টেবিলের উপর দিয়া গড়গড়ার নল মওক্কেলের দিকে বাড়াইয়া বলিতাম : হুক্কা মরজী করেন।

কথাটা বনের আগুনের মতই শহর-সুদ্ধা ছড়াইয়া পড়িল। আমার নিকট প্রতিবেশী উকিল বন্ধু ছিলেন একজন জমিদার। তার সাথে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সাহিত্যামোদী ছিলেন। তা ছাড়া তিনি আমার সাথে ক্রসওয়ার্ড ও দাবা খেলিতেন। আমার বৈঠকখানায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠান তিনিই প্রতিবাদ করিলেন সকলের আগে। আমার মক্কেলদের মধ্যে তারা নিজের প্রজার সংখ্যাও কম ছিল না। যদিও তিনি বরাবর শহরে থাকিতেন বলিয়া প্রজাদের অনেকেই তাকে চিনিত না, এবং তিনি নিজেও কোনও প্রজাকেই চিনিতেন না, তবু প্রজা ত? তাদের সাথে তিনি একত্রে চেয়ারে বসেন কী করিয়া? কাজেই তিনি আমার বাসায় আসা বন্ধ করিলেন। ঐ সব কাজের জন্য এবং দাবা খেলিতে অতঃপর তিনি তাঁর বৈঠকখানায় আমাকে ডাকিয়া নিতেন।

যা হোক আমার বাসায় এই সুবিধার কথা শুনিয়া মওক্কেল সাধারণের অধিকার বোধ ও আত্মমর্যাদা জ্ঞান বাড়িল। তারা প্রায় সব উকিলের বাসায় অমন ব্যবহার পাইবার আশা করিতে লাগিলেন। অনেকেই কাজে-কর্মে তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। উকিলদের অনেকেই আমার নিন্দা করিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে না হইলেও কথাটাও বার লাইব্রেরিতে উঠিল। এই সময় বার লাইব্রেরিতে কনসালটেশানের জন্য অর্থাৎ মওক্কেলদেরে লইয়া কথাবার্তা বলিবার জন্য কোনও নির্দিষ্ট কামরা ছিল না। আমার প্রবর্তিত নয়া অধিকার খাটাইতে গিয়া অনেক মওকেল বার লাইব্রেরিতে উকিলদের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার খালি পাইলেই বসিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার প্রবর্তিত নয়া ব্যবস্থারই এটা কুফল বলিয়া সকলে আমার ভুল চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাতেও পরাজয় স্বীকার না করায় অবশেষে মওক্কেলদের আক্রমণ হইতে উকিলদের চেয়ার রক্ষার উদ্দেশ্যে কনসালটেশনের জন্য অর্থাৎ মওক্কেলদের জন্য একটি কামরা আলাদা বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়টি এই : তৎকালে কোর্ট ফি আইন অনুসারে পঞ্চাশ টাকার বেশি মূল্যের মামলার দরখাস্তে লাগিত বার আনার কোর্ট ফি; এর কম মূল্যের মামলার দরখাস্তে লাগিত দুই আনার কোর্ট ফি। এই দরখাস্ত বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষেই লাগে। অধিকাংশ মামলার বিশেষত বকেয়া খাযনা মামলার দাবি প্রায়ই পঞ্চাশের কম থাকিত। আমি নয়া উকিল হিসাবে দেখিলাম যে পঞ্চাশ টাকার উপর-নিচ-নির্বিশেষে সমস্ত মামলার দরখাস্ত কোর্ট ফি খরচা বার আনা আদায় করা হইতেছে। আমি অনেক পুরাতন মামলাবাজ লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিলাম : দুই আনা কোর্ট ফির কমেও দরখাস্ত হইতে পারে, এ কথা তারা জানেন না। এমন অদ্ভুত কথা তারা কোনওদিন শুনেনও নাই। আমি দুই-একজন প্রবীণ উকিলকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; তারা বলিলেন : ওটা উকিলদের 'ট্রেড-সিক্রেট'। মক্কেলদেরে ও-কথা জানাইতে নাই। আমি আমার মুহরিকে এ কথা বলিলাম। তিনিও অপর উকিলদের কথা সমর্থন করিলেন। সকলেই বলিলেন : বেশির ভাগ মওক্কেলই বড় পাজি। তাঁরা উকিল-মুহরির ন্যায্য পাওনা দিতে চান না। তাঁদের নিকট হইতে কোর্ট ফি, পেশকার, শেরেস্তাদার, দাখিলি-রেজিস্ট্রারি ইত্যাদির বাজে দোহাই দিয়া টাকা আদায় করিতে হয়। আমি তাদের যুক্তি গ্রহণ করিলাম না। চিনা পরিচিত মওক্কেলদেরে এই 'ট্রেড সিক্রেট' বলিয়া দিলাম। তৎকালে কোর্ট ফি আইনের সংক্ষিপ্তসার বাংলায় দু-চার আনা দামের পুস্তিকাকারে কলিকাতায় পাওয়া যাইত। আমি অনেক মামলাবাজ লোককে দিয়া ঐ পুস্তিকার এক-এক কপি কিনাইলাম। ইহাতে উকিল-মুহরিদের অনেকেই আমার উপর ভয়ানক খাফা হইলেন। কিন্তু মক্কেলদের নিকট আমি খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিলাম। আমার পসার বাড়িয়া গেল।

৫. ফিস আদায়

কিন্তু ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের দেশের মফস্বলের মক্কেলরা বাস্তবিকই উকিলের ন্যায্য ফিস দিতে কৃপণতা করেন। এঁরাই আবার হাকিম, পেশকার, দারোগা, শেরেস্তাদার বাবত মুক্তহস্তে টাকা খরচ করেন। আমার নিজের বেলাতে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। মওক্কেল আমার ফিস বাবত দুটা টাকা দিলেন না। পকেট ঝাড়িয়া দেখাইলেন, বাড়ি ফিরিবার ট্রেন ভাড়া বাবত মাত্র চারি আনা পয়সা আছে। আজ দিতে পারিবেন না। দুই-এক দিনের মধ্যেই আমার ফিস লইয়া আসিতেছেন। আমার নিজের নিষ্ফলতা দেখিয়া আমার মুহরি আমাকে গোপনে বলিলেন : আপনি যদি ফিস আদায়ের ক্ষমতা আমাকে দেন এবং পরে কিছু না বলেন, তবে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। আমি অনুমতি দিয়া বার লাইব্রেরিতে বসিয়া আড্ডা মারিতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া মুহরি সাহেব আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়া বলিলেন : আজকার দুই টাকা, আগের পাওনা তিন টাকা। আমি বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতার সাথে বলিলাম : এটা কিরূপে সম্ভব হইল? মুহরি সাহেব বলিলেন : সে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।

জিজ্ঞাসা করিলামও না। অতঃপর আমার ফিস আদায়ের ভার মুহরি সাহেবের উপরই ছাড়িয়া দিলাম। আস্তে-আস্তে আমার ফিসসহ মামলা খরচের টাকা-পয়সা আদায় আমি একদম ছাড়িয়া দিলাম। মওক্কেলরা উপযাজক হইয়া আমার হাতে দিতে চাহিলেও আমি নিতাম না। বলিতাম : মুহরি সাবের হাতে দেন। অনেক বড়-বড় মওক্কেল এতে চটিতেন। এটাকে অপমান মনে করিতেন। কিন্তু আমি বুঝাইতাম : হিসাবের সুবিধার জন্য খাতায় তারিখ-মত টাকা-পয়সা জমা করিবার সুবিধার জন্যই এটা দরকার। কারণ পয়সা-কড়ির ব্যাপারে আমি একেবারে ছেলেমানুষ।তখন তারা

নিরস্ত হইতেন। ফলে আমার উকালতি জীবনের শেষ পর্যন্ত মক্কেলদের সঙ্গে টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমার সোজাসুজি সম্পর্ক ছিল না। মুহরিই আমার পক্ষ হইতে সকল টাকা-কড়ি আদায় করিতেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থার একটা খারাপ দিকও ছিল। উকিল নিজ হাতে টাকা নিতে না পারেন, কিন্তু তাঁর ফিস কত, মুহরির পাওনা কত, কোর্ট ফি-আদি বাবত খরচ কত, এসব কথা মক্কেলের জানা উচিৎ। তা না করিয়া মওক্কেলকে অন্ধকারে রাখিয়া মুহরির উপর টাকা-পয়সা আদায়ের ভার দিলে টাকা-পয়সা আদায়ের যে সুবিধা হয়, সে কথা আগে বলিলাম। কিন্তু এর দোষের দিকটাও আমাদের দেখা উচিৎ। সাধারণ মওক্কেলরা উকিল-মুহরির ন্যায্য পাওনা দিতে চায় না বলিয়াই মুহরিরা পেশকার-শেরেস্তাদারের নামে টাকা আদায় করিতে বাধ্য হয়, এই হইল সাধারণ মত। কিন্তু কথাটা পুরাপুরি ঠিক নয়। শুধু মওক্কেলদেরে একতরফাভাবে দোষ দেওয়া চলে না। উকিল-মুহরিরাও এতে সমানভাবে দোষী। মওক্কেলরা উকিল-মুহরির নামে টাকা না দিয়া পেশকার-শেরেস্তাদারের নামে টাকা দেন, এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মওক্কেলরা তাদের কেসের ব্যাপারে উকিলের চেয়ে পেশকার-শেরেস্তাদারকেই বেশি গুরুত্ব দিয়া থাকেন। ভাবটা এই : পেশকার-শেরেস্তাদার পক্ষে থাকিলে উকিল না হইলেও চলে। অজ্ঞ সাধারণ মওক্কেলের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে কে? উকিল-মুহরিরাই। একদিনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় নাই। আস্তে আস্তে অনেক দিনে এই ধারণার জন্ম হইয়াছে। উকিল-মুহরিরাই নিজেদের কাজে-কর্মে ও কথাবার্তায় এই ধারণার জন্ম দিয়াছেন। আয় ও মর্যাদা উভয় দিক হইতেই এতে আইন ব্যবসায়ীর লোকসান হইয়াছে।

৬. টাউট প্রথা এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে যে আরেকটা কুপ্রথা আইন ব্যবসায়ে ঢুকিয়াছে তার নাম টাউট প্রথা। অবস্থা এমন দাঁড়িইয়াছে, টাউট না ধরিয়া আইন ব্যবসা, বিশেষত ফৌজদারি আইন ব্যবসা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। গোড়াতে এই প্রথার পক্ষেও একটা নৈতিক ও আইন-সম্মত যুক্তি দেওয়া হইত, তাঁদেরে টাউট না বলিয়া এক শ্রেণীর 'প্রাইমারি-লিগ্যাল এডভাইয়ার' বলা যাইতে পারে। সুদূর পাড়াগাঁয়ের অজ্ঞ মামলা-ওয়ালাদের পথ-ঘাট চিনাইয়া ঠক-রাহাজান-পকেট-মারের হাত হইতে বাঁচাইয়া নির্ভরযোগ্য উকিল-মোখতারের শেরেস্তায় পৌঁছাইয়া দেওয়াও এডমিনিস্ট্রেশন-অব জাসটিসের একটা অঙ্গ। সুতরাং উকিল-মোখতারের মত তাদেরও একটা ফিস পাওয়া উচিৎ। এ ফিসটা ন্যায়ত মওক্কেলরই দেওয়া উচিৎ। কিন্তু নানা কারণে ওঁরা মক্কেলের কাছে তা সোজাসুজি চাইতে পারেন না। কাজেই উকিল-মোখতাররাই ঐ পাওনাটা আদায় করিয়া দেন। তাহা আদায় করিতে গিয়া কেউ নিজের ফিসটাই প্রয়োজন-মাফিক বাড়াইয়া আদায় করেন, কেউ পেশকার-শেরেস্তাদার এবং কোর্ট-এর নামে আদায় করিয়া থাকেন। কোর্ট শব্দ দ্বারা তারা অবশ্য মিন করেন কোর্ট ইন্সপেক্টর বা কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর। কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহারের মধ্যে উচ্চারণ-সুবিধা ছাড়াও আরেকটা উদ্দেশ্য লুক্কাইত থাকে। কোর্ট অর্থে যে কেউ-কেউ হাকিম-ম্যাজিস্ট্রেট বুঝেন তাতে টাকা আদায় সহজও হয়। অথচ হাকিমের নামে ঘুষ আদায়ের রিস্কও থাকে না। এইভাবে গোড়াতে টাউট প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে আজ এ প্রথা আফিস-আদালতের করাপশন প্রথার মতই অকটোপাসের শক্তি অর্জন করিয়াছে।

আমি যখন উকালতিতে ঢুকি, তখন অনেক হিতৈষী মুরুব্বি প্রবীণ উকিল আমাকে এই প্রথার উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এঁদের বিরুদ্ধতার বিপদ সম্বন্ধেও আমাকে সজাগ করিয়াছেন। এক মুরুব্বি প্রবীণ উকিল নিজের সময়ের অভাবহেতু একটি দায়রা মামলা আমার

কাছে পাঠাইয়াছিলেন। মামলায় জিতিয়াছিলাম। কাজেই মুরুব্বির প্রশংসা। পাইয়াছিলাম। কিন্তু এক কারণে তিরস্কৃতও হইয়াছিলাম। তদবিরকারককে আদায়ী ফিসের অংশ না দেওয়ায় তিনি উক্ত প্রবীণ উকিলের কাছে নালিশ করেন। মুরুব্বি আমার ঐ কাজকে 'প্রফেশন্যাল মিসকন্ডাক্ট' বলিয়াছেন। আরেকজন সিনিয়র ফৌজদারি উকিলের এই সুনাম ছিল যে তিনি আদায়ী ফিসের শতকরা পঁচাত্তর টাকা টাউটকে দিয়া থাকেন। আমি এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি টাউট প্রথার উপকারিতা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তাঁর মধ্যে মুদ্দা কথা ছিল দুইটা : (১) তুমি এক দিনে একটা কেস করিয়া পাইবে দশ টাকা; আর আমি একদিন দশটা কেস করিয়া পাইব দশদশং একশ। টাউটদের পঁচাত্তর বাদ দিয়াও আমার থাকিবে নেট পঁচিশ। (২) টাউট ছাড়া কেস করিয়া হারিলে মওক্কেলের গাল খাইতে হয়। উকিলের; আর টাউটদের মাধ্যমে কেস করিয়া হারিলে উকিলের গাল খাইতে হয় না, সে গাল খায় হাকিম। টাউট একশ একটা যুক্তি প্রমাণ দিয়া মওক্কেলকে চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিবেন এই উকিলের মত সুন্দর করিয়া কেস কেউ করিতে পারিত না। কিন্তু অপর পক্ষ হাকিমকে মোটা ঘুষ দিয়া মামলা জিতিয়াছে।

উভয় প্রবীণ মুরুব্বির কথার কঠোর সত্যতা পরে বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু তাদের উপদেশ মানিয়া চলিতে মনকে কিছুতেই রাজি করিতে পারি নাই।

৭. 'নোবল প্রফেশন'

উকালতি ব্যবসাকে আমি উঁচু দরের মহান বৃত্তি 'নোবল প্রফেশন' মনে করিতাম। এখনও করি। আমাদের দেশের বড়-বড় উকিল-ব্যারিস্টারের মতামত এবং বই-পুস্তক পড়িয়াই আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে। অবশ্য এর বিরুদ্ধ কথাও শুনিয়াছি পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় একদা প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন : 'উকিল ও বেশ্যা একই শ্রেণীর ব্যবসায়ী; একদল সতীত্ব বিক্রয় করিয়া খায়, অপর দল সততা বিক্রয় করিয়া খায়।' আচার্য রায় ছাড়াও আরো অনেক বিজ্ঞানী ও শিক্ষক উকিলদেরে লইয়ার' না বলিয়া 'লায়ার' বলিয়াছেন।

তলাইয়া বিচার করিলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাইবে যে, উভয় মতের মধ্যেই সত্য আছে। এডমিনিস্ট্রেশন-অব-জাসটিস'কে যদি মহৎ কাজ বলিতে হয়, কোর্ট-আদালত, হাকিম-হুঁকামাকে যদি সভ্যতার অলংকার বলিতে হয়, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার রক্ষাকে যদি মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলিতে হয়, তবে উকিল সম্প্রদায়কে অমন উচ্চ মর্যাদার আসন না দিয়া উপায় নাই। উকিলরা যে এই এডমিনিস্ট্রেশন-অব-জাসটিসের অপরিহার্য অঙ্গ, সেটা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার দরকার নাই।

বলা যাইতে পারে উকালতি মানুষের মন ও চরিত্রকে 'এনোবল' করে। মানুষের হৃদয়কে উদার, চিন্তাকে উন্নত ও দৃষ্টিকে প্রসারিত করে না। কারণ আসলে উকিলরা নিজেদের মক্কেলকে জিতাইতেই চান, সুবিচার চান না। মামলা জিতিবার জন্য তারা মওক্কেল ও সাক্ষীকে মিথ্যা কথা শিখান। ধর্মের নামে হলফ করিয়া মানুষ যে আদালতের কাঠগড়ায় ডাহা মিথ্যা কথা বলিয়া আসে, তা কেবল এই বিদ্বান-বুদ্ধিমান উকিলদের পরামর্শেই।

অভিযোগ মিথ্যা নয়। একটু পরেই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নজির দিতেছি। কিন্তু তার আগে একটু ভূমিকা করিয়া লইতে চাই।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে কোনও ব্যবসা বা রোযগারের পথই মানুষকে পুরাপুরি এনোবল করে না। সব রোযগারের পথেই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি আছেই। সব ব্যবসাতেই মানুষ নিজের স্বার্থের দিকটা সকলের আগে দেখিয়া থাকে। দৃশ্যত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা যে মসজিদের এমামতি, মন্দিরের পৌরাহিত্য, গির্জার ক্লার্জিম্যানগিরি, তবলিগ বা মিশনারিগিরি, এমনকি মাস্টার-প্রফেসারগিরি, এ সব ব্যবসাও স্বতই মানুষের আত্মাকে উন্নত করে না। অন্যান্য ব্যবসার কথা ত উঠেই না। সব ব্যবসা ও রোযগারের ব্যাপারেই ভাল-মন্দ দুই দিক আছে। একজন চরিত্রহীন পাষণ্ড লোককে সৎপথে আনিয়া একজন মুবাল্লেগ বা মিশনারি, একটা বখাটে বাউণ্ডেল ছেলেকে পরীক্ষা পাশ করাইয়া একজন শিক্ষক যে আনন্দ পাইবেন, একজন কঠিন-পীড়াগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগীকে আরোগ্য করিয়া একজন ডাক্তার যে আনন্দ পাইবেন, একজন নিরপরাধ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড হইতে খালাস করিয়া একজন উকিলও ঠিক তেমনি আনন্দ পাইবেন। কাজেই মিশনারি শিক্ষক, ডাক্তার ও উকিলরা সমান মর্যাদার অধিকারী। পক্ষান্তরে বেহেশতের টিকিট বিক্রয় করিয়া মুবাল্লেগ-মিশনারি, পরীক্ষার প্রশ্ন অগ্রিম বিক্রয় করিয়া শিক্ষক, কায়দায় পাইয়া রোগীর নিকট হইতে গলা-কাটা ভিজিট আদায় করিয়া ডাক্তার যে পাপ করিয়া থাকেন, উকিলদের এই শ্রেণীর পাপও ওঁদের পাপের সমান, কিছুমাত্র বেশি নয়।

## ৮. মিথ্যাই সত্য

উকিলরা নিজেরা মিছা কথা কন, মওক্কেল ও সাক্ষীদেরও মিছা কথা কওয়ান। আগে তাঁদের নিজেদের মিথ্যা ভাষণেরই বিচার করা যাউক। উকিল যদি মওক্কেলের ক্ষতি না করেন; মওক্কেলের ভালর জন্য যদি দু চারটা মিছা কথা বলান এবং বলেন, তবে সেটা দোষের হইবে কেন? এমনকি খোদ মওক্কেলকেও যদি ফাঁকি দেন, তবে সব-সময় তা দোষের হইবে না। ধরুন একটি লোক বাড়িতে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া হলফ করিয়া আসিয়াছেন, পরদিনই তিনি বাটোয়ারা মামলা দায়ের করিবেন। সমস্ত টাকা-পয়সা ও প্রয়োজনীয় দলিলপত্র আপনাকে বুঝাইয়া দিয়া তিনি পরদিনই মামলা দায়ের করিতে বলিলেন। আপনি তার সহিত তর্ক করিলেন না। তাঁর কথামত কাজ করিতে রাজি হইয়াই মামলা গ্রহণ করিলেন। আপনি যদি বলিতেন অত তাড়াতাড়ি করিবার মত সময় আপনার নাই, কিম্বা যদি বলিতেন অত তাড়াতাড়ি করিলে আরজিতে ভুল-ভ্রান্তি থাকিয়া। যাইতে পারে, যদি তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে, মামলাতে তামাদির কোনও প্রশ্ন নাই, তাড়াহুড়ার কোনও দরকারও নাই, ধীরে-সুস্থে মামলা দায়ের করিলেই চলিবে, তবে তিনি আর আপনার মক্কেল থাকিতেন না। কারণ তিনি ক্রুদ্ধ মানুষ। তিনি পরদিনই মামলা দায়ের করিতেই আসিয়াছেন। পরেও মামলা দায়ের করা যাইতে পারে-এই যুক্তি শুনিতে তিনি আসেন নাই। সেই যুক্তি তাঁর আগে হইতেই জানা আছে। কাজেই আপনি অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোকের মতই বিনা-তর্কে মামলা গ্রহণ করিলেন। তাঁর কথামতই মামলা দায়ের হইবে বলিয়া তাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু বাড়ি ফিরিয়াও ভদ্রলোকের শান্তি নাই। একদিন পরেই তিনি আপনার কাছে আসিয়া খোঁজ করিলেন, মামলা দায়ের হইয়াছে কিনা? আপনি তার কাগজ পত্র পড়িয়াছেন। আরজিও মুসাবিদা করিয়াছেন। ফারায়েযটা আবার রিভাইয করিতে হইবে। আর একদিনে মুসাবিদাটা ঠিক হইয়া

যাইবে। আপনি সাধ্যমত তাড়াতাড়ি করিয়াছেন। গত দুই রাত্র একটু বেশি রাত্র পর্যন্ত জাগিয়াছেন। কাজেই আপনার মুহরি এবং আপনি নিজেও মওক্কেলকে বলিয়া দিলেন তার মামলা দায়ের হইয়া গিয়াছে। মিথ্যা কথা। কিন্তু এ মিথ্যা কথা আপনি মওক্কেলের অনিষ্ট করিবার জন্য বলেন নাই; এ মিথ্যার ফলে মওক্কেলের কোনও ক্ষতিও হইবে না। বরঞ্চ মওক্কেলের মনটা প্রফুল্ল এবং তার এলাকায় তাঁর মস্তক উন্নত রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। এই মিথ্যার ফলে মওক্কেলের ভালই হইবে, কারণ আপনি তাড়াহুড়া না করিয়া ধীরে-সুস্থে আরজি মুসাবিদা করায় তাতে ভুল-ভ্রান্তি থাকিবে না।

এটা ত গেল উকিলদের নিজের মিছা কথা কওয়ার আবশ্যকতার নজির। মওক্কেলদেরে দিয়াও যে মিছা কথা বলান কত দরকার, কিভাবে দরকার, তাও আমাদের বিচার করিয়া দেখা দরকার। সরলভাবে স্বীকার করা দরকার যে, মওক্কেলকে ও সাক্ষীগণকে দিয়া মিছা কথা না বলাইয়া মামলা জিতা যায় না। কিন্তু সেগুলি আসলে মিছা কথা নয়, সত্য কথাই একটু গোছাইয়া সাজাইয়া বলা। মাটি, কাঠ ও পাথর দিয়া শিল্পী যেমন সুন্দর মূর্তি গড়েন, একই ঘটনাকে তেমনি বিভিন্ন রূপে ও আকারে সাজাইয়া হাকিমের সামনে উপস্থিত করিতে হয়; তবেই হাকিমরা বিচার করিতে পারেন। শিল্পীর নৈপুণ্যে অনেক সময় নকল জিনিসও আসল বলিয়া ভুল হয়। হাকিমরাও তাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভুল বিচার করেন। কিন্তু ঐরূপ না সাজাইয়া শুধু সত্যের ও তথ্যের ঢেলা হাকিমের নাক বরাবর ছুড়িয়া মারিলে হাকিমরা ভুল করিতেন আরো বেশি। এইজন্য আইনও সে ব্যবস্থা করিয়াছে। পুলিশের কাছে যবানবন্দিকে আইন সাক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে না। অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিবার অধিকার আসামিকে দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য দেওয়ানি মামলার বাদী-বিবাদীর আরজি-জবাব উকিলরা মুসাবিদা করিয়া কোর্টে দাখিল করেন; পক্ষগণকে সোজাসুজি আদালতের সামনে দাঁড়াইয়া নিজের কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়া দেন না। অর্থাৎ হাকিমের কাছে মক্কেলদের কথা উকিল বলেন আগে, মওক্কেল নিজে বলেন তার পরে। কাজেই মওক্কেলের কথা উকিল মানিয়া চলেন না, মওক্কেলই উকিলের কথামত চলেন। এ বিষয়ে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

### ৯. সত্যের জন্যে মিথ্যার ভূমিকা

একদিন এক বুড়ো হাজী সাহেব মামলা লাগাইতে আসেন। একজন তাঁর নিকট হইতে প্রায় দেড় হাজার টাকা দামের ধান-সরিষা নিয়াছে। তলব তাগাদায় দেনা শোধ করে নাই। আমি হাজী সাহেবের সঙ্গে খানিক আলাপ করিয়া মুহরির হাওলা করিয়া অন্য কাজে ব্যস্ত হইলাম। কোর্ট ফি, উকিলের ফিস, মুহরির তহুরি ইত্যাদি সব খরচাদি আদায় করিয়া মুহরি খানিক পরে হাজী সাহেবকে আমার সামনে উপস্থিত করেন। আমি এক খণ্ড সাদা কাগজ টানিয়া লইয়া আরজির পয়েন্টস লিখিয়া লইতে লাগিলাম। হাজী সাহেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বাদী-বিবাদীর নাম, তাদের পিতার নাম, গ্রাম, থানা, ধান-সরিষার পরিমাণ ও দাম লিখিলাম। কিন্তু ঋণ নিবার সময়-তারিখ লিখিতে গিয়া কলম ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলাম এবং হাজী সাহেবের নিকট চাহিলাম। বলিলাম : হাজী সাহেব, সন-তারিখ ঠিকমত বলিতেছেন ত? কোনও ভুল করেন নাই ত?

হাজী সাহেব মাথা নাড়িয়া জোরের সঙ্গেই বলিলেন : আমার ভুল হইবার উপায় নাই। সব আমার মুখস্থ। কত তাগাদা করিয়াছি। শালার বেটা কি আমারে কম ঘুরাইয়াছে।

আমি বিষণ্ন মুখে বলিলাম: বড়ই আফসোসের কথা হাজী সাহেব; আপনার মামলা চলিবে না; দাবি আপনার তামাদি হইয়া গিয়াছে।

হাজী সাহেব আসমান হইতে পড়িলেন। বলিলেন : তামাদি হইয়াছে? কেন হইয়াছে? কেন মামলা চলিবে না? হক টাকার আবার তামাদি? আমি হাজী সাহেবকে বুঝাইলাম, আইনের বিধান। তিন বছরের একদিন বেশি হইলেই দাবি পচিয়া গেল। পাওনা যতই হক হোক, আর মামলা চলে না। হাজী সাহেব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এখন তবে উপায় কী? আমি বলিলাম, উপায় একটা আছে। আপনার দাবি মাত্র তিন মাসের জন্য তামাদি হইয়া গিয়াছে। আপনি যদি ধান-সরিষার নেওয়ার তারিখ তিন মাস পিছাইয়া বলেন অর্থাৎ যদি পৌষের বদলে ফাল্গুন মাস বলেন, তবেই আপনার তামাদি রক্ষা হয়।

হাজী সাহেব কানে হাত দিয়া তাওবা-আসতাগফারুল্লাহ পড়িলেন। কী! মিথ্যা কথা বলিব? দেড় হাজার টাকার জন্য? মাফ করিবেন উকিল সাহেব। আমি আল্লার ঘর যিয়ারত করিয়া আসিয়াছি। দেড় হাজার ত দূরের কথা, দেড় লাখের জন্যও মিছা কথা বলিতে পারিব না।

হাজী সাহেবের ইমানদারিতে যেমন খুশি হইলাম, তার হক টাকাটা মারা যাইতেছে দেখিয়া তেমনি দুঃখিতও হইলাম। বোধহয় আমার মনের অগোচরে কেসটা হারাইবার আশঙ্কাও কাজ করিতেছিল। তাই হাজী সাহেবকে বুঝাইবার চেষ্ট করিলাম : এটা আসলে মিথ্যা নয়, সত্যের খাতিরে কথা একটু ঘুরাইয়া বলা মাত্র। ঐ লোকটা যে হাজী সাহেবের ধান-সরিষা নিয়াছে, এটা সত্য কথা। সে যে টাকা দেয় নাই, এটাও সত্য কথা। হাজী সাহেব যে লোকটার কাছে দেড় হাজার টাকা পাইবেন, এটাও সত্য কথা। এই হক টাকা ঐ নিমকহারাম লোকটা শোধ করিতেছে না। কাজেই নিরীহ হাজী সাহেবকে কোর্ট করিতে হইতেছে। আল্লার আইনে হক টাকার তামাদি নাই। অথচ গবর্নমেন্ট একটা আইন করিয়াছেন যে পাওনা সত্যই হক হোক, তিন বছর পর হইয়া গেলেই সেটা নাহক হইয়া যায়। আইনটা যে আল্লার নয়, গবর্নমেন্টের, গবর্নমেন্ট যে খৃষ্টান, হাজী সাহেবকে তা-ও বলিলাম। সুতরাং ঐ আইনের সাথে মিল রাখিবার জন্য যদি হাজী সাহেব লেন-দেনের মাসটা সনও নয় তারিখও নয়-একটু নড়চড় করেন, তবে কোনও গোনাহ হইবে না। কারণ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি এটা করিতেছেন। ফতোয়াটা আরো মযবুত করিবার জন্য বলিলাম : হক পাওনা শোধ করা আল্লার আইন, আর তিন বছরে তামাদিটা খৃষ্টানদের আইন। খৃষ্টানের আইন আল্লার আইনের উপরে যাইতে পারে না।

কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেকের এই ওজস্বিনী বক্তৃতায়ও কোনো কাজ হইল না। হাজী সাহেব এর পরেও বলিলেন : 'না উকিল সাহেব, বুড়ো বয়সে এই কয়টা টাকার জন্য মিছা কথা বলিয়া ঈমান নষ্ট করিব না। মামলা আর করিব না, যদি হক্কে থাকে টাকা পাইব, না থাকিলে পাইব না।'

বলিয়া হাজী সাহেব উঠিলেন। আমি মুহরি সাহেবকে বলিলাম : হাজী সাহেবের টাকা ফেরত দাও।

মুহরি সাহেব একতাড়া নোট আনিয়া এমন জোরে টেবিলের উপর রাখিলেন যাতে আমার মনে হইল ঐ নোটের তাড়া দিয়া তিনি আমার মাথায় বাড়ি মারিলেন।

হাজী সাহেব চলিয়া গেলে আমাকে নিরালা পাইয়া মুহরি সাহেব রাগ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন : এই রকমে উকালতি চলিবে না, সার। দেখলেনও ত একটা সামান্য কথায় কতগুলি টাকা হারাইলাম?

মুহরি সাহেব আমার একদিনের ফিস বত্রিশ টাকা ও নিজের তহুরি বাবত পাঁচ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। এ ছাড়া দাখিলি, শেরেস্তা, পেশকার, আমলা, নম্বর ইত্যাদি বাবতও আরো দশ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। তার উপর আরজির কোর্ট ফি দেড় হাজার টাকা দাবির উপর যা আদায় করিয়াছিলেন তাতেও লাভ থাকিত। পরের টাকা হাতাইয়াও আরাম আছে। কথায় বলে : পরের হলদি বাটিলেও হাতে রং লাগে। কাজেই মুহরি। সাহেবের রাগের কারণ বুঝিলাম। ঠাণ্ডা হাসি হাসিয়া বলিলাম : কি দোষ করিলাম?

মুহরি : তামাদির কথা বলিতে গেলেন কেন?

আমি বিরক্ত-মাখা চোখে চাহিয়া বলিলাম : বলো কী? দাবি তামাদি হইয়া গিয়াছে, মক্কেলকে তা বলিব না? মিথ্যা করিয়া বলা উচিৎ ছিল সব ঠিক আছে?

মুহরি গম্ভীর সুরে বলিলেন : মিথ্যা বলিবেন কেন? কিছু না বলিলেই হইত। আরজি লিখিবার সময় আমরা ঠিক ফালগুন মাসের লেন-দেন লিখিয়া দিতাম। হাজী সাহেবকে পরে বুঝাইলেই তিনি তা মানিয়া নিতেন।

আমি যখন দৃঢ়স্বরে জানাইলাম যে, মুহরি সাহেবের সহিত আমি একমত নই, তখন তিনি বলিলেন, অন্য যে কোনও উকিল তার মত-মতেই কাজ করিতেন। করিবেনও তাই। হাজী সাহেব অন্য উকিলের হাতে পড়িবেন। মামলা দায়েরও হইবে। মাঝখান হইতে আমার ফিসটা মারা গেল। মামলাটা খুবই কনটেটেড হইবে। আরো অনেক ফিস পাওয়া যাইত। আমাদের টাকাও গেল। বদনামও হইল। অন্য উকিল হাজী সাহেবকে বুঝাইবেন, তাঁর মামলা মোটেই তামাদি হয় নাই। যে উকিল তামাদির কথা বলিয়াছে, সে কিছু আইন জানে না। হাজী সাহেব সে কথা বিশ্বাস করিবেন। নাহক আমাদের ফিসটা মারা গেল।

আমি মুহরি সাহেবকে সান্ত্বনা দিলাম, ঐ টাকা আমাদের হক্কে ছিল না বলিয়াই পাইলাম না। যদি ওটা কিসমতে থাকে, তবে ঘুরিয়া-ফিরিয়া তা আসিবেই।

মুহরি সাহেব বিনয়ের নিচে রাগ গোপন করিয়া বলিলেন : 'টাকা পকেটে পাইয়াও যদি আমরা ফেলিয়া দেই, তবে তা আবার আমাদের পকেটে ফিরিয়া আসিবে টাকার এমন হাত-পা নাই।

মুহরি সাহেব নামাজি মানুষ। খুব সকালে উঠিয়া তিনি কালামুল্লাহ তেলাওত করিতেন। আমি রাগ করিয়া বলিলাম : তুমি নামাজি মানুষ। তাই আল্লার উপর তাওয়াক্কুল না রাখিলেও বোধ হয় তোমার চলে। কিন্তু আমার যে তাওয়াক্কুল ছাড়া চলে না। তুমি দেখিয়া লইও কিসমতে থাকিলে এই মামলা আবার আসিবেই।

সপ্তাহ না যাইতেই হাজী সাহেব আসিয়া হাজির। সেদিন তিনি তার বড় ছেলেকে সঙ্গে আনিয়াছেন। ছেলেও প্রৌঢ়। হাজী সাহেব যা বলিলেন তার মর্ম এই : তিনি সকলের সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শ করিয়া

দেখিয়াছেন। আমার কথাই ঠিক। হক পাওয়ার জন্য আইনের বিধান মানিতে গিয়া কথা একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলা যাইতে পারে। অতএব তিনি মামলা করিবেন। ইতিমধ্যে দুই

একজন উকিল এবং অনেক মুহরি এই মোকদ্দমা হাত করিবার জন্য হাজী সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত গিয়াছেন। আমার চেয়ে কম ফিসে ও কম খরচে মামলা জিতাইয়া দিবেন বলিয়াছেন। কিন্তু হাজী সাহেব তাঁদের কাছে মামলা দেন নাই। আমারই কাছে আসিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিলেন : 'আমার ছেলেরা ও বিবি সাব বলিলেন, মামলা যদি করিতেই হয়, তবে প্রথমে যে উকিলের কাছে গিয়াছেন, তার কাছে যান। আমার নিজেরও ইচ্ছাও তাই। কিন্তু বিবি সাহেব আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া বড় ছেলেকে সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।

আমি হাজী সাহেবের কথা শুনিতে-শুনিতে মাঝে-মাঝে মুহরি সাহেবের দিকে তাকাইতেছিলাম। তিনি একবার আমার চোখে-চোখে চাহিয়াই মাথা হেঁট করিলেন।

হাজী সাহেব কোমর-প্যাঁচা থলি খুলিতে-খুলিতে বলিলেন : আইনের যখন বিধান, তখন হক টাকার জন্য লেনদেনের সময়টা বদলাইতে রাজি আছি তবে তিন-তিনটা মাসের অতবড় মিছা কথাটা না বলিয়া মাস খানেকের কথা বলিলে হয় না?

আমি হাসিয়া বলিলাম : তিন মাসেও যে মিছা হইবে, এক মাসেও সেই মিছাই হইবে।

অবিশ্বাসের মাথা নাড়াইয়া হাজী সাহেব বলিলেন : উকিল সাহেব, আমি উম্মী মানুষ, কিন্তু একেবারে নাদান নই। তিন মাসের মিছা আর এক মাসের মিছার গোনা সমান হইতেই পারে না। এক টাকার চুরি আর একশ টাকার চুরির গোনাও সমান হইতে পারে না।

আমি হাজী সাহেবের সঙ্গে তর্ক বাড়াইলাম না। বলিলাম : আপনার কথাই বোধ হয় ঠিক। কিন্তু তিন মাসের কমে আপনার মামলার তামাদি রক্ষা হয় না। এখন কী করিবেন?

হাজী সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অর্ধ সমর্থনের সুরে বলিলেন : দেন তবে আল্লার নামে মামলা দায়ের করিয়া। তিনি মাসই পিছাইয়া দেন। কী করি? হক টাকার জন্য মিছা কথা বলিতে হইবে। আয় খোদা তুমি সাক্ষী থাকিও।

যথাসময়ে মামলার শুনানির দিনে হাজী সাহেব নিজে সাক্ষী দিতে আসিলেন এবং সঙ্গে আরো দুইজন হাজী সাক্ষী ও একজন ইউনিয়ন মেম্বর সাক্ষী হইয়া আসিলেন। সকলে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ধর্মত হলফ করিয়া ফাল্গুন মাসের লেন-দেনের কথা, জুম্মার মসজিদে তলব-তাগাদার কথা এবং বিবাদীর দাবি স্বীকার করার কথা বেদেরেগ বলিয়া গেলেন। বিবাদীর উকিলের জেরার মুখে অগ্রহায়ণ মাসে লেনদেনের কথা খুব জোরের সঙ্গে অস্বীকার করিয়া গেলেন। হাজী সাহেবের মামলা পুরাপুরি ডিক্রি হইল। এবং আপিল পর্যন্ত সে ডিক্রি বহাল রহিল।

### ১০. আলীপুরে

উকিল হিসাবে আমি খুব বড় কেউকেটা ছিলাম না। সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করার দরুনই হোক আর আমার অযোগ্যতার দরুনই হোক কথাটা সত্য। কাজেই উকিল হিসাবে আইন-ঘটিত ব্যাপারে

কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনা আমার বলিবার নাই। তবু আলীপুর জজকোর্টের অভিজ্ঞতা কিছুটা না বলিলে আমার উকিল জীবনের কাহিনী অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

আলীপুরের কথা বলিবার আগে বলিতে হয় যিনি আমাকে আলীপুরে নিলেন, তাঁর কথা। ইনি খান বাহাদুর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। এর সঙ্গে আগের পরিচয় থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা হয় তিনি যখন ময়মনসিংহের মুনসেফ। ঘটনার সময় তিনি বাংলা সরকারের এসিস্ট্যান্ট জুডিশিয়াল সেক্রেটারি। সেক্রেটারি না থাকায় তিনিই তখন অফিশিয়েটিং জুডিশিয়াল সেক্রেটারি। নিতান্ত অকস্মাৎ নবযুগএর চাকুরি যাওয়ায় আমি যখন কী করি, কী করি করিতেছিলাম, তখন সেই বন্ধু ফেরেশতার মত আমার জীবনে উদয় হইলেন। নিজের আইনের বই-পুস্তক দিলেন। বাপের পরিত্যক্ত গাউনটা আমার কাঁধে তুলিয়া দিয়া বলিলেন : উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর কাঁধে উঠিল এটা। তার বাবা অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও সেশন জজ মৌ, আবদুল খালেক। শুধু বই-পুস্তক ও গাউনই দিলেন না। তিনি আমাকে নিয়া আলীপুরের সমস্ত জজ-মুনসেফ ও কলিকাতা স্মল ক্যু কোর্টের জজদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন।

এর ফল হাতে-হাতে পাইলাম। উকালতির শুরুতে হাকিমদের সহায়তা, সুনজরের পৃষ্ঠপোষকতা যে কত মূল্যবান, সে কথা বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। মামলা পরিচালনার সময় জেরা-বানবন্দির সময় যদি হাকিম বলেন, 'চমঙ্কার', 'বেশ করিতেছেন', 'ওয়েল ডান ফর এ বিগিনার', তবে নূতন। উকিলের শুধু আত্মবিশ্বাস ও সাহসই বাড়ে না, জনপ্রিয়তা ও পসারও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে ঐ সময় হাকিম যদি বলেন, 'তৈয়ার হইয়া আসেন নাই', 'আইন-কানুন কিছু জানেন না', 'মওক্কেলের সর্বনাশ করিতেছেন' তবে সে নূতন উকিলের প্র্যাকটিসের বারটা বাজিয়া যায়। সিনিয়রদের জন্য অবশ্য হাকিমের ভাব-গতিকে বেশি কিছু আসে যায় না; কিন্তু নবাগতের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুবর সিরাজুল ইসলাম। এইভাবে আমাকে প্র্যাকটিসের পাকা সড়কে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আমি সারাজীবনেও তাঁর এ দেনা শোধ করিতে পারিব না।

আলীপুরের মর্যাদার অভিজ্ঞতাও তেমনি আমার মনে থাকিবে। প্রথমত, উকিল-মুহরির সম্পর্ক। আলীপুরের মুহরিদিগকে আমি সলিসিটর উপাধি দিয়াছিলাম। কার্যত হাইকোর্টের সলিসিটর যা আলীপুরের মুহরিও তাই। অন্যান্য স্থানে মুহরিকে জিজ্ঞাসা করা হয় : 'আপনি কোন উকিলের শেরেস্তায় কাজ করেন? আর আলীপুরের উকিলদেরে জিজ্ঞাসা করা হয় : 'আপনি কোন মুহরির শেরেস্তায় কাজ করেন? বস্তুত 'শেরেস্তা মুহরিদেরই। উকিলদের প্রায় কারুরই শেরেস্তা নাই। সেখানে মওক্কেল আসে মুহরিদের কাছে। তারাই কেস নেন; কাগজ-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ বুঝিয়া লন। টাকা পয়সা লন। উকিলের ফি আদায় করেন তারাই। কেসের শ্রেণী ও গুরুত্ব হিসাবে উকিল নিযুক্ত করেন তাঁরাই। উকিলকে ফিসও দেন তাঁরাই। এ কাজের জন্য তাদের প্রত্যেকের নিকট বিস্তারিত ও বড় নোট বই আছে। সে নোট বইয়ে বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্রও আছে। এসব কাজ করিতে গেলে যে আইন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার, আলীপুরের মুহরিদের অধিকাংশের মধ্যেই তা আছে অন্তত আমার আমলে ছিল। আমার মুহরির নাম ছিল মোহাম্মদ আমজাদ আলী মিয়া। অর্থাৎ আমি তাঁরই শেরেস্তার উকিল ছিলাম। লেখক সাহিত্যিক হিসাবে আমার নাম জানিতেন বলিয়াই। গোড়াতে তিনি দয়া করিয়া আমাকে তাঁর শেরেস্তার জুনিয়র উকিলের তালিকাযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনেই তিনি আমাকে সিনিয়র লিটিতে নেন এবং আরো কিছুদিন পরে

তিনি আমাকে তাঁর শেরেস্তার প্রধান করেন। তার কাছে আমি উকালতির অনেক প্যাঁচ-মোচড় ও মামলার প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কাজকর্ম অনেক কিছু শিখিয়াছি। ভদ্রলোক ত মুহরি নন, পাশ-না-করা সনদহীন একজন উকিল।

মোকদ্দমার তদারককারীদের সকলেই যে টাউট নয়, এ অভিজ্ঞতাও হয় আমার আলীপুরেই। সেখানেই আমি প্রথম জানিতে পারি শিক্ষিত অবস্থাশালী ও অবসর-প্রচুর দুই-একজন গ্রাম্য মাতব্বরের এটা শখ, এটা তাদের অবসর বিনোদনের একটা স্পোর্টস। আলীপুরে কয়েক মাস কাটিবার পর আমজাদ মিয়া এক ভদ্রলোককে আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন। বলেন : ভদ্রলোক আমার বই-পুস্তক বিশেষত আয়নার একজন সমঝদার। আমার একজন ভক্ত। ভদ্রলোকের নাম সিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক। পাড়াগাঁয়ের একজন হিন্দু ভদ্রলোক আমার লেখার ভক্ত শুনিয়া খুশি হইলাম। আমি যতদিন আলীপুরে ছিলাম, এই ভদ্রলোক ততদিনই মাসে গড়ে দুই-তিনটা বড়-বড় কেস আমাকে দিতেন। প্রথম দিন যখন কেস আমাকে দেন, সেদিন তাঁকে আমি বড় রকমের টাউট মনে করিয়াছিলাম। আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং মোকদ্দমার ইনস্ট্রাকশনে তার উৎসাহপূর্ণ অংশগ্রহণ হইতেই আমার এই ধারণা হইয়াছিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলে আমজাদ মিয়ার নিকট আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলে তিনি জিভ কাটিয়া বলেন : উনি তেমন লোক নন। রোদ বৃষ্টি-ঝড়-তুফান তিনি অগ্রাহ্য করিয়া ভদ্রলোক অমন নিঃস্বার্থভাবে মাসে দুই-তিন বা তার চেয়েও বেশি বার আমার কাছে পরের কেস নিয়া আসেন দেখিয়া নিজের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার' তার শখে আমি সত্যই আশ্চর্য হইয়াছিলাম। তার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কিন্তু এর পরে আরো বিস্মিত হইয়াছিলাম, যখন জানিতে পারিলাম তিনি হিন্দু নন, মুসলমান। ঘটনাচক্রেই এটা জানিতে পারিলাম। আমার সামনে একটা কাগজে নিজের নাম দস্তখত করিতে গিয়া পিতার নাম লিখিলেন আইনুদ্দীন প্রামাণিক। সিদ্ধেশ্বর প্রামাণিকের পিতার নাম আইনুদ্দীন প্রামাণিক? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিলাম; ভদ্রলোক আর্য সমাজীর পাল্লায় পড়িয়া শুদ্ধি হইয়াছেন নাকি?

ভদ্রলোক আমার বিস্ময় বুঝিতে পারিয়া সব বলিলেন। তাঁর আসল নাম সিদ্দিকুর রহমান প্রামাণিক। শৈশবে বাবা মারা যান। হিন্দু-প্রধান এলাকা। প্রতিবেশীরা তাঁকে সিদ্ধেশ্বর' বলিয়া ডাকিত। হিন্দু বাড়িতে হাইস্কুল। সব শিক্ষক হিন্দু। কাজেই স্কুলের রেজিস্ট্রারিতেও তাঁর নাম উঠিল সিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক। সেটেলমেন্ট-পর্চায়, সাবরেজিস্টারি আফিসে, জমিদারের শেরেস্তায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডের খাতায় তিনি এখন সিদ্ধেশ্বর প্রামাণিক। নাম-সংশোধন করা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

নিজের গ্রামের কথা মনে পড়িল। সেখানে দুইজন প্রতাপশালী সম্মানী হিন্দু মাতব্বর ছিলেন। একজন ইনছান দাস (ঈশ্বান চন্দ্র দাস), অপরজন ওমর সরকার (উমাচরণ সরকার)। এঁরা নিজ মুখেই ইনছাস দাস' ও 'ওমর সরকার' বলিতেন। কারণ আসল নাম বলিলে রাতের অন্ধকারে কেউ চিনিতও না; হয়ত তাদের প্রাপ্য সম্মানও দিত না। কিন্তু তাঁদেরও নাম খাতা পত্রে ঠিক ছিল সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের মত এমন 'ঢাকী-শুদ্ধা বিসর্জন' তাঁদের দিতে হয় নাই।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৫০ হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহেই উকালতি করিলাম। আমার আগেকার মুহরি আখতারুদ্দীন খা আমার সাহচর্যে পেটি-ফগিং ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলেন। কাজেই আমি ময়মনসিংহ ছাড়ার পরে তিনিও মুহরিগিরি ছাড়িয়া বাড়িতে অবসর

জীবন যাপন করিতেছিলেন। কারণ তাঁর অবস্থা ভাল। আমি পুনরায় উকালতি শুরু করায় তিনি আসিয়া আমার মুহরিগিরি নিলেন।

কিন্তু বার বছর আগে ময়মনসিংহ ছাড়িবার সময় আমি যা ছিলাম তা আর নাই। এখন বয়স হইয়াছে, স্টাইল বাড়িয়াছে, আমিরি শিখিয়াছি; পরিবার বড় হইয়াছে, সুতরাং খরচও বাড়িয়াছে। তাই আয়ও অনুপাতে বাড়া দরকার। শুধু দেওয়ানিতে তাড়াতাড়ি অত টাকা আসিবে না। কাজেই ফৌজদারিতে যাওয়া দরকার। আখতার মিয়ার সঙ্গে গভীর পরামর্শ করিলাম। ফৌজদারির প্রতি তাঁরও ঘৃণা ছিল খুব বেশি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফৌজদারিতে যাওয়া ঠিক হইল। নিম্ন আদালতে বেল-টেলের ব্যাপারে দুই-একদিন গেলামও।

অমনি টাউট মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইল। তাঁদের পক্ষে এক দল প্রতিনিধি বেশি রাতে আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। তাঁরা নিতান্ত ভদ্রভাবে মিষ্টি ভাষায় যা বলিলেন, তার সারমর্ম এই : আমি ফৌজদারি লাইনে আসায় তারা আনন্দিত। কিন্তু তাদের সহানুভূতি ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে আমি উদ্যোগী হইয়া তাদের অনেককে জিলা জজ ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়া টাউটনোটিফাই করাইয়াছিলাম, সে কথা তারা মনে রাখিবেন না। পুরাপুরিই আমাকে সাহায্য করিবেন। তাদের সহায়তা নিলে আমি কেস করিয়া দম ফেলিতে পারিব না। টাকা রাখিবার স্থান পাইব না। তাঁরা এখন এসোসিয়েশন ফার্ম করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে তাঁরা একজনকে আসমানেও তুলিতে পারেন, পাতালেও নামাইতে পারেন। তাঁদের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখিলে মামলায় খুব বেশি খাঁটিবার দরকার নাই। সব মামলা জিতিবারও দরকার নাই। হারি আর জিতি মওক্কেল আমার হাতছাড়া হইবে না। কারণ জিতিলেও জিৎ হারিলেও জিৎ। যদি মামলায় জিতি, তবে আমার সেটা কৃতিত্ব। তখন আমার তারিফে তারা দেশের আকাশ-পাতাল মুখরিত করিবেন। আর যদি হারি, তবে দোষ হইবে হাকিমের জুরির। হাকিম ও জুরিরা অপর পক্ষের মোটা টাকা খাইয়া আমার জিতা মামলাটার বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। আপিলে ও হাইকোর্টে সব ঠিক হইয়া যাইবে। স্থানীয় আপিল হইলে আবার ফিস পাইব। আর হাইকোর্ট হইলে নিজের লোককে কেস দিয়া সেখানেও অংশ পাইব। এত সুবিধা। আর যদি তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখি, তবে মামলা হারিলে হার, জিতিলেও হার। যদি জিতি তবে তারা প্রচার করিবেন, অমন সহজ মামলায় উকিলের দরকারই ছিল না। যে কোনও জুনিয়র অথবা একজন মোখতার দিয়া ওর দশভাগের একভাগ খরচে মামলা হইয়া যাইত। সরল মওক্কেল পাইয়া আমি অমন। গলাকাটা ফিস নিয়াছি। আর যদি হারি, তবে ওরা বলিয়া বেড়াইবে এটা হারিবার মামলাই নয়। আমি ভুল জেরা করিয়া বাদী পক্ষের কেস প্রমাণ করিয়া দিয়াছি। মানুষ বুঝিয়া কারো কাছে তাঁরা বলিবেন, কবি-সাহিত্যিক মানুষ রাতদিন বই লিখিয়া কাটান, আইনের বই পড়ার সময় কই? সব আইন ভুলিয়া গিয়াছেন। আর কারো কাছে বলিবেন, অপর পক্ষের কাছে টাকা খাইয়া মওক্কেলের এই সর্বনাশ করিয়াছেন। শুধু এই মওক্কেল না, আরো অনেকেরই এইরূপ সর্বনাশ করিয়াছেন। আমাকে কেস দেওয়া মানেই ফাঁসির দড়ি নিজ গলায় দেওয়া ও জেলের দরজা নিজ হাতে খুলিয়া দেওয়া।

বার বছর আগে হইলে এঁদেরে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতাম। কিন্তু এবার দিলাম না। কারণ স্পষ্টই দেখিলাম, এঁদের কথায় অতিশয়োক্তি থাকিলেও মোটামুটি সত্য। কাজেই তাঁদেরে চা-পান খাওয়াইয়া এবং চিন্তা করিয়া দেখিবার ওয়াদা করিয়া বিদায় করিলাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের নিকট মাথা নত করিলাম না। অন্য উপায় অবলম্বন করিলাম। মোখতারদের সঙ্গেই অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলাম। ফিসের অংশ যখন দিতেই হইবে, তখন মোখতারদেরেই দিব, টাউটকে দিব না। মোখতাররা আমাদের 'সহব্যবসায়ী। তাঁরাও সনদধারী। তারাও উকিলদের মতই আদালতের অফিসার। কিন্তু ব্যাপারটাকে সুষ্ঠু ও বিবেক সংগত করিবার জন্য মোখতারের অংশটার নাম দিলাম 'জুনিয়র ফিস'। আমার ফিস আদায়ের ক্ষমতাও ছাড়িয়া দিলাম তাদেরই হাতে। অতঃপর ফৌজদারি প্র্যাকটিসেও আমার অসুবিধা থাকিল না। বলা হয়, উকালতি রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কথাটা সত্য শুধু আইন সভার মেম্বর হওয়া পর্যন্ত। মন্ত্রী হইলেন ত উকালতি গেল। মন্ত্রিত্ব যাওয়ার পর এক্স-মিনিস্টার হিসাবেও সুবিধা হয়; কিন্তু সেটা শুধু ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিসে। দেওয়ানি প্র্যাকটিসে একবার কনটিনিউটি ভাঙ্গিলে আর সহজে জোড়া লাগে না। আমারও লাগে নাই।

# ২৩. বিষয়ী জীবন

## অধ্যায় তেইশ – বিষয়ী জীবন

### ১. বংশগত দুর্বলতা

যাকে বলা হয় বাস্তব বিষয় বুদ্ধি', কাণ্ডজ্ঞান' কমনসেন্স', সেটার কিছু-কিছু অভাব বোধ হয় পাইয়াছিলাম বাপ-দাদার কাছ হইতেই। ছেলেবেলা শুনিতাম, আমার বাপ-দাদাকে প্রায় সকলেই সরল-সিধা-মানুষ' বলিত। আহম্মক বলিত না বোধ হয় সম্মান করিয়া। মাঠ হইতে কামলারা একদিন উত্তেজিত হইয়া আসিয়া দাদাজীর কাছে নালিশ করিল, ফলানারা অমুক ক্ষেতের বাতর কাটিয়া আমাদের প্রায় এক হাত জমি তাদের ক্ষেতভুক্ত করিয়াছে। দাদাজী ক্ষেত দেখিতে গেলেন। ভিড় করিয়া বহু হিতৈষী প্রতিবেশী সঙ্গে গেল। সকলেই দাদাজীকে উস্কানি দিতে লাগিল : এমন বাড়াবাড়ি কিছুতেই সহ্য করা যায় না। আজ বেটাদেরে আক্কেল দিতেই হইবে। কিন্তু দাদাজী উল্টা আক্কেল দিলেন নিজের কামলাদেরে। কোথায় একহাত জমি কাটিয়া লইয়াছে? আমাদের ক্ষেত উঁচা অপর পক্ষেরটা নিচা। আমাদের আইলটাই কালক্রমে ধসিয়া-ধসিয়া ওদের ক্ষেতে পড়িয়াছে। কোদালে ক্ষেতের কানি সাফ করিবার সময় ঐটুকুই মাত্র কাটিয়াছে। প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা একটা বড় রকমের দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখিবার আশা করিতেছিল, তারা নিরাশ হইয়া বাড়ি ফিরিল। ফরাযীরা আসলে ভীরু কাপুরুষ।

আরেকটা ঘটনা বাপজীর আমলের। বাড়ি হইতে দূরে এক ক্ষেতের মধ্যে বড় একটা আমগাছ ছিল। খুব আম ধরিত। একবার চাকর আসিয়া নালিশ করিল পাড়ার পুলা-পানে সব কাঁচা আম পাড়িয়া ফেলিতেছে। উপস্থিত সকলেই আশা করিল ব্যাপার একটা কিছু ঘটিবেই। ঘটিলও। বাপজী চাকরকে ধমক দিলেন : কাঁচা আম পুলা-পানে খাইব না ত বুড়ারা খাইব? যা তুই দেখ গিয়া পুলাপান যাতে আম পাড়িতে গিয়া নালিয়া ক্ষেত পাড়াইয়া ভাঙ্গে।

পরে সকলেই মন্তব্য করিয়াছিল, এমন দিনে-দুপুরে অত্যাচার অবিচারেরও যদি প্রতিকার না করে, তবে ফরাযীরা গ্রামে থাকিতেই পারিবে না। বাপ-দাদার এই দুর্বলতাকে আমি নিজেও ছেলে-বেলা পছন্দ করিতাম না। পরে পছন্দ করিয়াছিলাম। বয়স হইলে বুঝিয়াছিলাম আমার বাপ-দাদার কথাই ঠিক। কী হইত ঐ তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মানুষের সাথে ঝগড়া করিয়া? বরঞ্চ উল্টা ক্ষতিই হইতে পারিত। সত্যই তাই। এক-আধ-ইঞ্চি জমির দখল লইয়া দু-চারটা আম-কাঁঠাল লইয়া কত মামলা মোকদ্দমা দেখিয়াছি। উকিল হইয়া আরো বেশি দেখিয়াছি। হাজার-হাজার টাকা খরচ হইতে দেখিয়াছি। দশ-বিশজন খুন-জখম হইতে দেখিয়াছি। দু-দশজনের জেল-জরিমানা হইতে দেখিয়াছি। গোড়াতে একপক্ষ সবুর করিলে এ সব হইত না।

## ২. উস্তাদের শিক্ষা

হক-নাহক জ্ঞানও পাইয়াছিলাম বাপ-দাদার নিকট হইতেই। আই-এ পড়ার সময় নিতান্ত অভাবের দিনেও রাস্তায় বাইশ টাকা পড়িয়া পাইয়া টাকাটা হজম করিতে পারিলাম না ত ঐ কারণেই। ও-টাকা যে আমার নয় পরের, এটা বুদ্ধি-বিবেচনা, চিন্তা-ভাবনা করিয়া বুঝি নাই। এমনি স্বভাবতই আপনা হইতেই উৎপ্রেরণা বশেই বুঝিয়াছিলাম।

বাপ-দাদার-দেওয়া এই মতিগতি আরো জোরদার হয় মৌলবী মুজিবর রহমানের সংশ্রবে আসিয়া। তিনি তখন দি মুসলমান দৈনিক করিবার আশায় টাকার জন্য বর্মা-বাংলা দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। তবু যথেষ্ট টাকা উঠিতেছে না। তেমনি একদিনে তৎকালীন মন্ত্রী নবাব মোশাররফ হোসেন মৌ, সাহেবের নিকট প্রস্তাব দেন, যদি দি মুসলমান নবাব সাহেবের মন্ত্রিত্ব সমর্থন করেন, তবে তিনি দি মুসলমান-এ পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনিবেন। এই মুহূর্তে পঁচিশ হাজার। সমর্থনে একটা এডিটরিয়েল লেখার পরই বাকি পঁচিশ হাজার। প্রস্তাবটা তিনি সোজাসুজি মৌলবী সাহেবের কাছে করেন নাই। তিনি মৌলবী সাহেবকে ভাল করিয়াই জানিতেন। প্রস্তাব করেন দি মুসলমান-এর ম্যানেজার মৌলবী সাহেবের কনিষ্ঠ চাচাত ভাই মি. রফিকুর রহমান সাহেবের কাছে। রফিকুর রহমান সাহেব এমএ। দু চারটা ভাল-বেতনের চাকুরি ইচ্ছা করিলেই তিনি পাইতে পারিতেন। কিন্তু মৌ. সাহেবের অনুপ্রেরণায় তিনিও আমাদের সমান অল্প বেতনে দি মুসলমান-এর ম্যানেজারি করিতেছিলেন। সততা-সাধুতায় তিনিও প্রায় মৌলবী সাহেবের অনুসারী। তবু বিষয়-জ্ঞানে তিনি আমাদের মতই বাস্তব। জ্ঞানী ও হিসাবি লোক। কিন্তু মৌলবী সাহেবের কাছে নবাব সাহেবের প্রস্তাব লইয়া তিনি নিজে যাইতে সাহস পাইলেন না। নবাব সাহেব নিজের এই প্রস্তাবের সৎ ব্যাখ্যা দিয়া মৌ, সাহেবের সামনে উপস্থিত করিবার মত সুন্দর যুক্তি-তর্কও দিয়াছিলেন। নবাব সাহেব কস্মিনকালেও এটাকে ঘুষ রূপে দিতেছেন না। তিনি সত্যি-সত্যি মুসলমানদের একটা ইংরাজি দৈনিকের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। মৌলবী সাহেবই এ কাজের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। দি মুসলমান-এর তিনি একজন পুরা সমর্থক। সেই হিসাবেই তিনি দৈনিক মুসলমান তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছেন। তবে কিনা একটু...ইত্যাদি। রফিক সাহেব আমাকে সব কথা। বলিলেন এবং আমাকেই এ কাজের দায়িত্ব দিলেন। আমাকে মৌলবী সাহেব অতিশয় স্নেহ করিতেন বলিয়া যা-তা বলিবার সাহসও আমার ছিল। আমি যথাসম্ভব গোছাইয়া নবাব সাহেবের যুক্তিগুলি পুরাপুরি বরঞ্চ রং লাগাইয়া মৌলবী সাহেবের কাছে বলিলাম। একদিন দুইদিন নয়, বেশ কয়েক দিন তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। তিনি অনড়-অটল। আমার সব যুক্তির জবাবে তিনি বলিলেন ও সব যুক্তিই তার জানা। সব জানিয়া শুনিয়াও নিরুপায়ের নীরব থাকা সম্পর্কে কলিকাতায় সর্বজন পরিচিত একটা প্রবাদ চালু আছে : "নিমতলার ঘাটও চিনি, কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি। কিন্তু কথা বলতে পারি না। আমি যে মরে আছি।" মৌলবী সাহেব হাসিয়া এই প্রবাদটি আমাকে শুনাইলেন। এর পরেও আমি পরাজয় মানিলাম না। এই অভাবের দিনে এমন হাতে-পাওয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হইয়া যাইতেছে এর উত্তরে তিনি বলিলেন : "দেখ আবুল মনসুর, এক-একজনের এক-একটা নেশা থাকে। মদ-মেয়ের নেশাতেই কত ধনী ও বিদ্বান লোক কত ধন-দৌলত নষ্ট করিতেছে। হাজার সদুপদেশ দিয়াও তাদেরে ফিরান যায় না। ধর এ অবাস্তব সাধুতা আমার একটা নেশা। এ নেশা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া তোমরা সফল হইবে না। এরপর পরাজয় স্বীকার করিতেই হইল।

## ৩. সাধু থাকা কঠিন না

এমন দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই আমার জীবন প্রভাবিত করিয়াছিল। টাকা পয়সার প্রতি আমার খুব বেশি আগ্রহ ছিল না। তার মানে প্রয়োজন-মাফিক টাকা পাইলেই আমার হইয়া যাইত। উঠন্ত বয়সের অবিবাহিত স্বাধীন কলিকাতা প্রবাসী যুবকদের অনেকের যেসব দোষ ছিল, আমার সে সব দোষের একটাও ছিল না; এই কারণেই কলিকাতায় পঞ্চাশ-ষাট টাকার সাংবাদিকতা করিয়াও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করিতে পারিয়াছিলাম। পাঁচ-ছয় টাকা মেসের খোরাকি, এক টাকা সিট-রেন্ট দিয়া থাকিতে পারিলে কতই বা টাকার দরকার? পোশাক-পরিচ্ছদ? এক টাকা আঠার আনার একটা খদ্দরের ধুতি কিনিয়া একটা তহবন্দ ও একটা পাঞ্জাবি বানাইতাম। কাটি-কুটিতে একটা গান্ধী টুপি হইয়া যাইত। সিলাই লাগিত পাঞ্জাবিতে ছয় আনা, তহবন্দ ও টুপিতে এক কানা করিয়া দুই আনা। এমনি করিয়া দুই খানা ধুতিতে সোওয়া দুই টাকা ও সিলাইয়ে এক টাকা খরচ করিলে বছরের পোশাক হইয়া যাইত। ধুপা-লনড্রি খরচ ছিল না। পাঁচ আনায় দু'সের এক নম্বর নূতন ঢাকাইয়া সাবান কিনিতাম। সপ্তাহে দুইবার নিজ হাতে কাপড় ধুইতাম। তাতেই পনের দিন যাইত। শীতবস্ত্র হিসাবে বউ-বাজার চোরা বাজার হইতে তিন-চার টাকায় একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গরম কোট কিনিয়া আমি পাঁচ বছর চালাইতাম। উড়নার জন্য খদ্দরের একটা মোটা শাল' কিনিতাম আড়াই-তিন টাকায়। সেটাও চার-পাঁচ বছর নিতাম। যাতায়াত খরচা বেশি ছিল না। পারতপক্ষে ট্রামে উঠিতাম না, হাঁটিয়াই আফিস করিতাম। উঠিতে হইলেও সেকেন্ড ক্লাসে উঠিতাম। ভাড়া ছিল তিন পয়সা। 'অপব্যয়ের মধ্যে ছিল দুইটা। একটা সিনেমা দেখা। রোজ সিনেমা দেখিতাম। মাঝে-মাঝে দিনে দুইবারও দেখিতাম। কোনও কোনও দিন তিনবারও দেখিতাম। কিন্তু টিকিট কিনিতাম সর্বনিম্ন ক্লাসের। চৌরঙ্গী অঞ্চল হইলে চার আনা। উত্তর কলিকাতা হইলে তিন আনা। এতেই মাসে পনের টাকা যাইত। আরেকটা বাতিক ছিল পুরাতন বই কিনা। কলেজ স্কোয়ারের বড়-ছোট পুরাতন পুস্তকের দোকান, তথাকার ফুটপাথ ও ধর্মতলা-ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের ফুটপাথের দোকানের সবগুলিতে আমি ছিলাম একটা পরিচিত উৎপাত। দু-চার ঘণ্টায় দোকানের সব-পুস্তক ঘাঁটিয়া কিনিতাম দু'চার আনার একখানা বই। কিন্তু কিনিতাম। সেজন্য কোনও দোকানদারই আমার সাথে অভদ্রতা করিত না। ইচ্ছামত বই ঘাঁটিতে দিত। কারণ তারা জানিত, শেষে একখানা আমি কিনিবই। ফলে পয়সা যাইত আমার সারাদিনে হয়ত ছয় আনা-আট আনা। কিন্তু সময় যাইত আমার চার-পাঁচ ঘণ্টা। বন্ধুরা বলিত আমি সময়ের অপচয় করিতেছি। কিন্তু আমি জানিতাম তাদের ধারণা ভুল। কারণ এই সব পুরাতন পুস্তকের দোকান ছিল আমার ফ্রি রিডিং রুম।

আমি ইচ্ছা করিয়া সঞ্চয় কখনও করি নাই। কিন্তু সঞ্চয় আমার অমনি হইয়া গিয়াছে। অত অল্প আয়ের সব টাকা আমি খরচ করিয়া সারিতে পারিতাম না। কারণ সব জিনিসই আমার কাছে অসাধারণ টিকসই হইত। কাপড়-চোপড় ছিড়িতেই চাইত না। ১৯১৩ সালে সতের টাকায় একটা সাইমা লন্ডন হাতঘড়ি ও আড়াই টাকায় একটা ব্ল্যাকবার্ড ফাউন্টেন পেন কিনিয়াছিলাম। ১৯২৭ সালেও দুইটাই চালু ছিল। এই সালে জানালার ফাঁক দিয়া চোর আমার কোটটা চুরি করে। সেই কোটের পকেটে আমার হাতঘড়ি ও ফাউন্টেন পেন ছিল। চুরি না হইলে ওরা কতদিন চলিত আমিও বলিতে পারি না। ১৯১১ সালে আমি একটি ছাতা কিনিয়াছিলাম। ১৯২৬ সালে সেটা কোনও এক দোকানে ফেলিয়া আসি। আর পাই নাই।

৪. নবাব সাহেবের উপদেশ

বুদ্ধি ও বিশ্বাসের সংঘাত সম্পর্কে অতি মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন নবাব মোশাররফ হোসেন সাহেব। তিনি তখন মন্ত্রী। তাঁর এক কাজের সমালোচনা করিতে গিয়া দি মুসলমানএর সম্পাদকীয়তে নবাব সাহেবের কাজকে নির্বুদ্ধিতা (ফুলিশনেস) বলিয়াছিলাম। এতে নবাব সাহেব রাগিয়া আমাদের অফিসে আসিয়া আমার কৈফিয়ত তলব করিলেন। বলিলেন : তুমিও বি এল, আমিও বি-এল। তুমি মাসে পঁচাশি টাকা রোযগার কর। আমার বার্ষিক ইনকাম চার লাখ। তুমি আমাকে "ফুল" বলিয়া গাল দাও কোন মুখে?' নবাব সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। সুতরাং শক্ত কথা বলার অধিকার তাঁর ছিল। আমিও তাকে শক্ত বলিতে পারিতাম। বলিলাম : চার লাখ টাকা আয়ের শ্বশুরের মেয়ে বিয়া করিলে আমারও ঐ ইনকাম হইত। শ্বশুরের খুঁটা দেওয়ায় নবাব সাহেব চটিলেন না। বরঞ্চ হাসিয়া বলিলেন : তেমন শ্বশুরের মেয়ে বিয়া বুদ্ধিমানরাই করিতে পারে, নির্বোধরা পারে না। তর্কে-তর্কে নবাব সাব বলিলেন : যে নিজেকে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে, তার মত নির্বোধ আর নাই। তোমাকে লোকে অত ঘন-ঘন ঠকায় কেন? যেহেতু তুমি নিজেকে মস্তবড় বুদ্ধিমান মনে কর। তোমাকে কেউ ঠকাইতে পারিবে না এই বিশ্বাসেই তুমি সবাইকে বিশ্বাস কর। ঐ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়াই সবাই তোমাকে ঠকায়। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, তুমি জীবন-ভর ঠকিবে। জীবনে কোনও দিন সফল হইতে পারিবে না। যদি জীবনে সফল হইতে চাও, তবে আমার কথা শোেন। জীবন রং-এন্ডে' নয়, 'রাইট-এন্ডে' শুরু কর। অর্থাৎ সকলকে বিশ্বাস করিয়া নয়, অবিশ্বাস করিয়া শুরু কর। যারা কাজে-কর্মে তোমার বিশ্বাস অর্জন করিবে তাদেরই শুধু বিশ্বাস কর। অন্য সবাইকে অবিশ্বাস কর। দেখিবে কেউ তোমাকে ঠকাইবে না। অবশেষে সবাই তোমার বিশ্বাসী হইবে। আর তা না করিয়া তুমি যদি ঐ 'রং-এন্ডে' আরম্ভ করিতেই থাক, তবে সবাই তোমাকে ঠকাইবে। অবশেষে তোমার কারো উপর বিশ্বাস থাকিবে না। চারদিকে কেবল অবিশ্বাসী-বিশ্বাসঘাতক দেখিবে। শেষ জীবন তোমার বড় দুঃখে কাটিবে। আমি তোমাকে বদ-দোওয়া করিতেছি না। শুধু হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি মাত্র।

চল্লিশ বছর আগের কথা। মাঝে-মাঝেই মনে হইয়াছে, নবাব সাহেবের কথাই বোধহয় ঠিক। কিন্তু মৌলবী মুজিবর রহমানের মূর্তি নবাব সাহেবের মূর্তিকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে। আমি এই সান্ত্বনা দিয়াছি মনকে : পরকে ঠকাইতে পারার আনন্দের চেয়ে নিজে ঠকিতে পারার আনন্দে মজা অনেক বেশি। একবার এক হোস্টেল মেটের হাতে পাঁচ টাকা ঠকিয়া যে সম্পদ অর্জন করিয়াছিলাম, প্রতিশোধ নিতে গিয়া তাকে দশ টাকা ঠকাইবার আগুনে সে সম্পদ পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছি। তারপরেও আগুন নিবে নাই। জীবন সায়াহ্নে আজো আমি বিশ্বাস করি : অবিশ্বাস করিয়া ঠকার চেয়ে বিশ্বাস করিয়া ঠকা ভাল।

অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার যৌবন হইতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মনে করি, আজো তাই আছে। মনে আছে, ছাত্র-জীবনে একবার ত্রিপুরা স্টেট লটারির টিকিট কিনিয়াছিলাম। তৎকালে ওর প্রথম পুরস্কার ছিল এক লাখ। টিকিট কিনিয়া আমার ঘুম নষ্ট হইল। যদি ফার্স্ট প্রাইয পাই, তবে ঐ লাখ টাকা দিয়া আমি করিব কী? আমি যৌবনের সোনালি স্বপ্নের অনেক চিত্র মনে-মনে। আঁকিলাম। কিন্তু লাখ টাকা খরচের কোনও উপায় বাহির করিতে পারিলাম না। রূপান্তরে সে মনোভাব আমার আজো আছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকাকে আমি সত্যই ভয় পাই। পাকিস্তান সরকারের শিল্প-বাণিজ্য

মন্ত্রী হওয়ায় আমার চার কোটি টাকার বদনাম হইয়াছে। এ নিয়া কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুসহ ডন-এর এডিটার আলতাফ হোসেনের সাথে আমার রম্য আলাপ হইতেছিল। বন্ধু বলেন : 'শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রিত্ব একটা সাংঘাতিক ক্ষমতার পদ। এই দুইটা গদিতে একই ব্যক্তি বসিলে তার কাছে চার কোটি কেন, তার চেয়ে বেশি টাকার অফার আসিতে পারে। তুমি কি বলিতে চাও তোমার কাছে কোনও অফার আসে নাই?' আমি সত্য কথা সরলভাবে স্বীকার করিলাম : নিশ্চয় আসিয়াছে, পরোক্ষভাবে।

বন্ধু বলেন : 'ঘুষের অফার ইনডিরেকটলিই আসে। সোজা আসে না। তুমি কি এতই একটা ফেরেশতা যে ঐ সব লোভ তুমি সম্বরণ করিয়াছ শুধু সাধুতার খাতিরে?' আমি সরলভাবে বলিলাম : সাধুতার খাতিরে নয়, অফারের বিশালতার ভয়ে।

৫. অর্থম-অনর্থম

মানুষের আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে আমার মনের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল একদা আকস্মিকভাবে। আলাপ হইতেছিল এক জজ সাহেবের সাথে। তখন আমি ময়মনসিংহে উকালতি করি (অনুমান ১৯৩৫-১৯৩৬ সাল)। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রবীণ সাব-জজ। খুব কড়া ও যশস্বী বিচারক। আইনের পোকা। আমার মত জুনিয়র উকিল ত দূরের কথা তার কোর্টে দাঁড়াইতে অনেক সিনিয়র উকিলেরও হাঁটু কাঁপিত। আমার বাসায় যাইতে এই জজ সাহেবের বাসার সামনে দিয়াই যাইতে হইত। কোর্ট-ফেরতা প্রায়ই এক সঙ্গে যাইতাম। উকিল হিসাবে জুনিয়র হইলেও কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির নেতা হিসাবে আমি গণ্যমান্য লোক ছিলাম। নগেন বাবু রাজনীতির 'রা'ও জানিতেন না বটে, কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে সদালাপী ছিলেন। বাসায় ফিরিতে এই সবই আলোচনা হইত।

বাসায় ফিরিবার পথে প্রায় প্রতিদিনই তিনি নিজে বাজার করিতেন। বাজার মানে দুই আনা-দশ পয়সার গুড়া মাছ, কয়েক আনার তরি-তরকারি। কলাপাতা বা কচু পাতার ঠোঙ্গায় মাছ বাম হাতে এবং তরি-তরকারি ডান হাতে লইয়া নূতন বাজার হইতে বাহির হইতে নগেনবাবুকে প্রায়ই দেখা যাইত।

একদিন আমি তাকে বলিলাম : এত টাকা মাহিয়ানা পান, খাওয়ায় এত কৃপণতা করেন কেন?

দুঃখিত হইয়া নগেনবাবু বলিলেন : অত টাকা মাহিয়ানা দেখিলেন কই?

আমি যখন স্মরণ করাইয়া দিলাম, তার মাহিয়ানা সাড়ে তেরশ টাকা, তখন তিনি বলিলেন : ঐ শুনিতেই শুধু তেরশ।

অতঃপর তিনি ইনকাম ট্যাক্স, ইনশিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড, সেভিং ব্যাংক ইত্যাদির সঠিক অঙ্ক উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতে আসে মাত্র আড়াইশ টাকা। আমি জবাবে বলিলাম যে, এক ইনকাম ট্যাক্স ছাড়া আর সব খরচই তার ইচ্ছাধীন। তাঁর অত-অত টাকা জমা করার কোনও আবশ্যকতা নাই। তিনি তখন সঞ্চয়ের আবশ্যকতা বুঝাইলেন। অসুখ-বিসুখ, আপদ-বিপদ কতটাই ত আছে।

আমি তখন মৌলিক কথায় চলিয়া গেলাম। বলিলাম: তাহা হইলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, আপনার মাসিক প্রয়োজন মাত্র আড়াইশ টাকা। এর বেশি যে টাকা আপনি বেতন পান, সেটা বাহুল্য।

সেটা কৃষক-প্রজা আন্দোলনের যুগ। জমিদারি উচ্ছেদ, মন্ত্রী-বেতন হাজার টাকা, শাসন-ব্যয় হ্রাস, সরকারি কর্মচারীদের বেতন কমান, তৎকালে প্রাত্যহিক স্লোগান। রাস্তা-ঘাটের আলাপের এবং খবরের কাগজের আলোচনার বিষয়। নগেনবাবু আমার কথার বাস্তব অর্থ করিলেন। ব্যগ্রতার সঙ্গে বলিলেন : আপনারা কি সত্য-সত্যই অফিসারদের বেতন কমাইতে চান? বিচার বিভাগের লোকেরও?

আমি যখন বলিলাম 'নিশ্চয়ই', তখন তিনি আন্তরিক ব্যাকুলতার সঙ্গে মুনসেফ-জজদের রাতদিন গাধার খাটুনির তুলনায় বেতনের স্বল্পতা, দেড়শ টাকায় মুনসেফি শুরু করিয়া তেরশতে পৌঁছাতক প্রায় কুড়ি বছরের দুঃখ কষ্ট, অভাব-অনটনের কথা বিস্তারিত বলিলেন। তিনি অন্তত মুনসেফ-সাব জজদের বেতন না কমাইবার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। এটা তিনি এমনভাবে করিলেন, আমিই যেন কমানের কর্তা এবং আজই যেন সে অর্ডার দিতেছি।

আমিও সরলভাবে আমাদের প্রোগ্রামের যৌক্তিকতা তাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। আমাদের ন্যাশনাল ইনকাম, পার-ক্যাপিটা ইনকাম, সে ইনকামের সাথে সরকারি কর্মচারীদের আনুপাতিক পার্থক্য, মাথাভারী শাসন ব্যয়ের জন্যই আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব ইত্যাদি উচ্চ পলিটিক্যাল-ইকনমিকসের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করিলাম। উপসংহারে বলিলাম : ব্যাংক ব্যালেন্স, ইনশিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফান্ড, জুয়েলারি, গহনা-পত্র, অনাবশ্যক সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর, সাজ-সরঞ্জাম যার যত আছে সব সরকারে বাযেয়াফত করাই আমাদের প্রোগ্রাম।

আলাপে-আলাপে নগেনবাবুর বাসার সামনে আসিয়া পড়ায় আদাব দিয়া বিদায় হইলাম। কিন্তু বাসায় ফিরিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িতে-না-ছাড়িতেই নগেনবাবু আমার বৈঠকখানায় ঢুকিয়া 'উকিল সাব' 'উকিল সাব' বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিলেন। রাজা-মহারাজা, লাট-মন্ত্রী হইলেও এ সময়ে নাশতা-চা না খাইয়া বাহির হইতাম না। কিন্তু এ যে হাকিম। ঐ অবস্থায়ই বাহির হইয়া আসিলাম। নগেনবাবু সোজাসুজি বলিলেন : 'এ ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত না করিলে আজ আমার আহার-নিদ্রা হইবে না। তাই একটা ফয়সালা করিতে আসিলাম।'

ক্ষুধায় আমার মেজাজ গরম হইয়াছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু পরম দক্ষতার সহিত তা গোপন করিয়া হাসি মুখে বলিলাম : আপনারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে টাকা পান, তা আপনারা জমা করেন ভবিষ্যৎ অসুখ-বিসুখ ও আপদ-বিপদে খরচ করিবার জন্য, এই ত? কিন্তু আপনারা কি জানেন না যে, ঐ সঞ্চয়ের দ্বারাই আপনারা নিজেদের অসুখ-বিসুখ ও আপদ-বিপদ ডাকিয়া আনেন?

নগেনবাবু : সেটা কেমন?

আমি : আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন?

নগেনবাবু দাঁতে জিভ কাটিয়া বলেন : কন কি মনসুর সাব? আমি ভগবান মানি না?

বলিয়া তিনি জোড়হাত কপালে ঠেকাইলেন। আমি বলিলাম : আপনি চিত্রগুপ্তের নাম শুনিয়াছেন?

নগেনবাবু যেন অপমানিত হইলেন। বলিলেন : আমি হিন্দু, চিত্রগুপ্তের নাম শুনি নাই আমি?

আমি : বেশ। তা হইলে এই চিত্রগুপ্তের কাজটা কি তাও আপনি জানেন। চিত্রগুপ্ত ভগবানের ফাইন্যান্স মিনিস্টার, চ্যান্সেলার-অব-দি-এক্সচেকার, প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, একাউন্টেট-জেনারেল ও অডিটর-জেনারেল। তিনি চতুর্দশ, যমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যম। মানেন আপনি?

নগেনবাবু জীবন ফাটাইয়াছেন মোকদ্দমার ফাইল ও আইনের পুস্তক পড়ায়। অত কথা তিনি জানেন না। তবু আমার মত আইনজ্ঞের কাছে সে কথা স্বীকারও করিতে পারেন না। তাই শুধু সম্মতিসূচক মাথা ঝুকাইলেন।

৬. চিত্রগুপ্তের বাজেট

আমি বলিতে লাগিলাম : মানুষের জীবন-মৃত্যু, অসুখ-বিসুখ, সুখ-সম্পদ ও আপদ-বিপদের মালিক এই চিত্রগুপ্ত। ভগবান এই চিত্রগুপ্তকে কনসাল্ট করিয়াই এ সব বিলি-বণ্টন করিয়া থাকেন। আমাদের গবর্নমেন্ট যেমন বছরের গোড়াতে ফাইনান্স মিনিস্টারের মারফত বাজেট রচনা ও ঘোষণা করিয়া থাকেন, ভগবানও তেমনি প্রতি বছর শিবরাত্রিতে চিত্রগুপ্তের মারফত এটা করিয়া থাকেন। মুসলমানদের আল্লাহ এ বাজেট করেন শবে-বরাতে। অসুখ-বিসুখ ও আপদ-বিপদের কথাটাই ধরা যাউক। শিবরাত্রে ভগবান সভাসদ লইয়া বাজেট করিতে বসেন। চিত্রগুপ্ত বসেন তাঁর খাতা-পত্র লইয়া। ভগবান চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া বলেন : দেখ ত অমুক মহারাজের অসুখ-বিসুখের তহবিলে কত টাকা আছে। চিত্রগুপ্ত খাতা দেখিয়া বলিলেন : এক লাখ। ভগবান বলিলেন : দেও তারে একটা ক্যানসার। ভগবান বলেন : দেখ ত অমুক রাজা-বাহাদুরের ঐ তহবিলে কত আছে? চিত্রগুপ্ত বলেন : পঞ্চাশ হাজার। ভগবান বলেন : দেও তারে একটা করোনারি থ্রম্বসিস। এরপর দেখ ত অমুক রায় বাহাদুরের ঐ তহবিলে কত আছে? চিত্রগুপ্ত বলিলেন : বিশ হাজার। ভগবান বলেন : দেও তারে একটা টিবি। তারপর দেখ ত সাব-জজ নগেনবাবুর ঐ তহবিলে কত আছে? চিত্রগুপ্ত খাতার পাতা উল্টাইয়া বলেন : দশ হাজার। ভগবান বলেন : দেও তারে একটা ডায়েবেটিস। তারপর দেখ ত সরকারি উকিল সতীশ দত্তের ঐ তহবিলে কত আছে? চিত্রগুপ্ত বলিলেন : মাত্র পাঁচ হাজার সার। ভগবান বলিলেন : দেও তারে একটা টায়ফয়েড। তারপর দেখ ত উকিল উপেন দের ঐ তহবিলে কত আছে? চিত্রগুপ্ত দুই-তিনবার পাতা উল্টাইয়া আঙুলে গনিয়া বলেন : মাত্র পাঁচ শ টাকা মহারাজ। ভগবান ঘাড় ও মাথা চুলকাইয়া অবশেষে বলেন : কি আর দিবে ওকে? দেও একটা সর্দি-জ্বর। তারপর দেখ ত অশ্বিনী মোখতারের ঐ তহবিলে কত আছে? চিত্রগুপ্ত অত বড় খাতাটার এক মলাট হইতে অপর মলাট পর্যন্ত দুই-তিনবার উল্টাইয়া অবশেষে বলিলেন : এক পয়সাও নাই, ভগবান। ভগবান তখন সকলের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলেন : দেও, ও-হতভাগাকে ছাড়িয়াই দেও।

আমি গোড়াতে ক্ষুধার মেজাজে রাগ করিয়া নগেনবাবুকে উত্যক্ত করিবার জন্যই বোধহয় কথাগুলি শুরু করিয়াছিলাম। কিন্তু অল্পক্ষণেই অনুপ্রেরণার উচ্চস্তরে উঠিয়া গেলাম। ক্ষিধা বেশি লাগিলে

আমার বক্তৃতা ভাল জমে। সেদিনও বোধ হয় তাই হইয়াছিল। দেখিলাম নগেনবাবু হাঁ করিয়া আমার কথাগুলি গিলিতেছেন।

আমার কথা শেষ হইলে তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন : আপনি যে সব কথা বলিলেন, তা সত্যি-সত্যি শাস্ত্রের কথা নাও হইতে পারে কিন্তু কথাগুলি সত্য। নিজের জীবনেই আমি তার ফল পাইয়াছি। আপনার কথা শুনিবার পর আজ তা বুঝিলাম। আপদ-বিপদ অসুখের নামে যত বেশি জমাইয়াছি, সত্য-সত্যই আপদ-অসুখ তত বাড়িয়াছে। তার এক ছেলে যে মারা গিয়াছে, তার এক মেয়ে যে বিধবা হইয়াছে, তার সঙ্গে নিজের ঐ সময়ের সঞ্চয়ের কার্য-কারণ সম্পর্কে দেখাইলেন।

নগেনবাবু চলিয়া গেলে নিজের কথাগুলিই অনেকক্ষণ পর্যালোচনা করিলাম। চা-নাশতা করিতে করিতে ঐ লইয়া স্ত্রীর সাথে রসিকতা করিবার চেষ্টাও করিলাম। বাধ-বাধ ঠেকিল। বুঝিলাম, রসিকতা করিতে গিয়া অন্তরের কথাই বলিয়াছি। এই কারণেই বোধহয় জীবনে টাকা সঞ্চয় করিলাম না। ব্যাংকের একাউন্ট খুলিলাম না। যেমন আয় তেমনি ব্যয়। এই জন্যই আমি সঞ্চয়কে আহাম্মকি মনে করিয়া থাকি। নিজে না খাইয়া টাকা জমাইয়া যারা বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পদ করে, তাদেরে বিদ্রূপ করিয়া আমি অনেক রচনা লিখিয়াছি। কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ-এর সুরম্য প্রাসাদগুলিতে বাস করেন ভোগ-বিলাসী ভাড়াটিয়ারা। আর বাড়িওয়ালা বাস করেন বড় বাজারের তুলাপট্টির কবুতরের খোপে। মাসে লাখ-লাখ টাকা তারা রোযগার করেন, জমা করেন। কিন্তু কাগজের চেক, সোনার মোহর বা রুপার টাকা নয়। ব্যাংকে যা জমা হয় তাও সোনা-রুপা নয়, শুধু ফিগার : লাখের পর কোটি, কোটির পর পরার্ধ্ব। মিলিয়নের পরে বিলিয়ন, তারপর ট্রিলিয়ন। এমনিভাবে কোটিপতি তুলাপট্টির কবুতরের খোপেই মারা যান। পুত্র যদি বাপের মত সাধু-সজ্জন হয়, তবে সে কোটিকে করে পরার্ধ্ব। পরে বাপের মতই মারা যায়। আর সে যদি বুদ্ধিমান হয় তবে মদে-মেয়েলোকে ও রেসে সব উড়াইয়া দেউলিয়া হয়। এইই সঞ্চয়ের পরিণাম। এই সঞ্চয়েরই যারা প্রাণপাত করে, তারা আমাকে নির্বোধ বলিতে পারে, কিন্তু আমিও তাদেরে বুদ্ধিমান বলি না।

সব মতবাদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক দুইটা দিকই আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই সঞ্চয়কে ক্যাপিটেল কর্মেশন বলে। আমি বলি এটা হোর্ডিং। সব দ্রব্য হোর্ডিং-এর মত এটাও আমার মতে পাপ।

কিন্তু বাড়ি করা সম্পর্কে আমার মতামত আরো অদ্ভুত। ওটা নিছক অর্থনীতিক। ওর কোনও নৈতিক দিক নাই। আমি নিজে বাড়ি না করিয়া ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকার পক্ষপাতী। হিতৈষীরা আমাকে নিজের বাড়ি তৈরি করিতে বহু হিতোপদেশ দান করিয়াছেন। কিন্তু আমাকে রাজি করিতে পারেন নাই।

## ৭. নিজের বাড়ি

নিজস্ব বাড়ি তৈয়ার করিতে আমার কোনও নৈতিক আপত্তি ছিল না। আপত্তিটা ছিল নিছক বিষয়-বুদ্ধির হিসাব-নিকাশের কথা। আমার যুক্তিটা ছিল এইরূপ : আমি বর্তমানে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়া সে বাড়িতে আছি তা তৈয়ার করিতে কম-সে-কম পঁচিশ হাজার টাকা লাগিয়াছে। এই রকম সুবিধার নিজস্ব বাড়ি তৈয়ার করিতে বর্তমানে আরো বেশি টাকা লাগিবে। তেমন আর্থিক ক্ষমতা আমার

নাই। যদি থাকিতও, তবু আমি ঐ টাকা খরচ করিয়া নিজস্ব বাড়ি করিতাম না। কারণ তার অর্থ এই হইত যে, মাসে-মাসে বাড়ি ভাড়া না দিয়া আমি পঞ্চাশ বছরের ভাড়া অগ্রিম দিয়া একটি বাড়ি ভাড়া করিলাম। তাতেও রক্ষা নাই। কোয়ার্টারে-কোয়ার্টারে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, বছর-বছর জমির খাযনা, বছর-বছর হোয়াইট ওয়াশ, কিছুদিন পরে-পরে তাতেও এ সব খরচা আমাকে করিয়া যাইতেই হইত। ভাড়াটিয়া বাড়িতে। এসব খরচা আমার নাই। পক্ষান্তরে পঁচিশ হাজার টাকা না থাকা সত্ত্বেও যদি আমাকে নিজের বাড়িতে থাকার গৌরবলাভ করিতে হয়, তবে অল্প টাকা খরচ করিয়া শহরতলিতে ছোট বাড়ি করিয়া থাকিতে হয়। শুধু নিজ বাড়িতে থাকিবার নিছক মানসিক ও কল্পিত অহংকারের খাতিরে আমাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, যাতায়াতের সুবিধা, শহরের অভ্যন্তরের সুন্দর বাড়ি ছাড়িয়া অসুবিধাজনক বেকায়দায় অসুন্দর বাড়িতে থাকিবার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। বন্ধুরা বলিতেন : 'তবু ত নিজের বাড়ি। আমি বলিতাম : ভাড়াটিয়া বাড়িইবা আমার নিজের বাড়ি নয় কেন? আমি ত ভাড়াটিয়া বাড়িকেই নিজের বাড়ি মনে করি। ফুলের বাগান করি শাক-সবজির গাছ লাগাই। এমনকি ফলের গাছ লাগাই। ছোটখাটো মেরামত নিজে করাই। কই, কখনও ত মনে হয় না পরের বাড়িতে আছি!' বন্ধুরা বলিতেন : মাসে-মাসে ভাড়া দাও যখন, তখন কি তোমার মনে পড়ে না পরের বাড়িতে আছ? ভাড়া না দিলেই ত বাড়িওয়ালা তোমাকে উঠাইয়া দিবে। আমি বলিতাম : 'বছর বছর নিজের বাড়ির ট্যাক্স ও জমির খানা দিতে হইবে। ঐ খাযনা-ট্যাক্স না দিলেও ত জমিদার বা সরকার বাড়ি নিলাম করিয়া আমাকে উঠাইয়া দিবেন। পক্ষান্তরে রীতিমত ভাড়া দিলে কোনও বাড়িওয়ালাই আমাকে উঠাইতে পারিবেন না। আমি পুরুষানুক্রমে এই বাড়িতে থাকিতে পারি। আমার 'পুরুষানুক্রমে' কথায় বন্ধুরা বলিতেন : নিজের জন্য না হউক ছেলে-পিলের জন্য তাদের মাথা খুঁজিবার আশ্রয়স্থল হিসাবে একটা বাড়ি নিশ্চয়ই থাকা উচিৎ। তুমি চোখ বুজিলে ছেলে-পিলেরা দাঁড়াইবে কোথায়? আমি হাসিয়া বলিতাম : 'আমার নিজের জন্য তা হইলে তোমাদের আর ভাবিবার নাই। ছেলেদের কথা? আমার ছেলেরা, সব বাপের ছেলেরাই, মাত্র তিন রকমের হইতে পারে। হয় তারা আমার মত হইবে, নয় আমার চেয়ে ভাল হইবে, অথবা আমার চেয়ে খারাপ হইবে। এই তিন অবস্থার কোনও অবস্থাতেই আমার-তৈরি বাড়ি তাদের কাজে লাগিবে না। প্রথমত, তারা যদি আমার মত হয়, তবে তারাও আমারই মত ভাড়াটিয়া বাড়িতে আমারই মত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে পারিবে। সুতরাং তাদের জন্য আমার বাড়ি করার দরকার নেই। দ্বিতীয়ত, তারা যদি আমার চেয়ে ভাল ও বড় হয়, তবে তারা কেউ ঢাকায়, কেউ করাচিতে, কেউ বিদেশে থাকিবে। ময়মনসিংহের মত ছোট শহরে থাকিয়া তারা সুখ পাইবে না। সুতরাং তাদের জন্য আগে হইতে বাড়ি করিয়া রাখা বেকার। তৃতীয়ত, আমার ছেলেরা যদি আমার চেয়ে খারাপ হয়, তবে মূর্খ হইতে পারে, চরিত্রহীন হইতে পারে, নির্বোধ হইতে পারে, চোর-গাঁজা-খোর হইতে পারে। তা হইলে তারা কেউ আমার তৈরি বাড়িতে থাকিবে না। ভাই-এ ভাই-এ মারামারি করিয়া, ভাগাভাগি করিয়া, বিক্রয় করিয়া অথবা বন্ধক দিয়া অন্যত্র নিম্নমানের বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং এদের জন্যও আমার বাড়ি করার দরকার নাই। নিজস্ব বাড়ির এই শোচনীয় ভষ্যিৎ দেখাইয়া আমি উপসংহার করিতাম : 'যে টাকায় বাড়ি করিব, সেই টাকা খরচ করিয়া ছেলেদেরে পড়া-শোনা করাইব, দুধ-ঘি খাওয়াইয়া স্বাস্থ্যবান করিব। আত্মমর্যাদাবান, ভদ্র ও চরিত্রবান করিব। তা যদি করিতে পারি, তবে ভষ্যিতে তাদের মাথা পুঁজিবার ঠাইয়ের জন্য এখন হইতে আমাকে চিন্তা করিতে হইবে না।'

## ৮. নিজের বাড়ি বনাম ভাড়াটিয়া বাড়ি

বলা বাহুল্য এর একটাও নীতিবাক্য নয়, নিছক বিষয়-বুদ্ধির কথা। আমি প্রেরণা-বশে বা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনায় এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলাম তা নয়। আমার পরম শ্রদ্ধেয় তিনজন চিন্তাবিদের কথা ও কাজ হইতে এই প্রেরণা আমি লাভ করিয়াছিলাম। এই তিন মনীষী হইতেছেন, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মি, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং ডা. নরেশ চন্দ্র সেন। পরবর্তী দুই মনীষী সাহিত্য সেবায় এবং কৃষক-প্রজা আন্দোলনে আমাকে প্রচুর প্রেরণা দিয়াছেন। উকালতি করিয়া এঁরা বিপুল টাকা রোযগার করিতেন। বহু টাকা ভাড়া দিয়ে সুন্দর-সুন্দর প্রাসাদ-তুল্য বাড়িতে পরম বিলাস-ব্যসনে থাকিতেন। কিন্তু নিজের বাড়ি তৈরি করিবার কল্পনাও তারা করিতেন না। মওলানা সাহেবেরও টাকা-পয়সার অভাব ছিল না। তিনি অনেক টাকার ভাড়ার বাড়িতে থাকিতেন। বিপুল পুস্তকরাজির বিশাল লাইব্রেরি ছিল তাঁর। মাসে-মাসে তিনি হাজার-হাজার টাকার বই কিনিতেন। নিত্য-নূতন ট্যাক্সিতে চড়িতেন। নিজে মোটর কিনিতেন না। বিশ্ববিখ্যাত চিন্তা-নায়ক বার্ট্রান্ড রাসেলেরও এই মত। তাঁর পুস্তক পড়িয়াই সর্বপ্রথম জ্ঞান লাভ করি যে, ইউরোপ মার্কিন মুল্লুকের বহু কোটিপতির নিজস্ব কোনও বাড়ি-ঘর নাই। তারা পুরুষানুক্রমে হোটেলে ও জাহাজে বাস করিয়া আসিতেছেন। লর্ড রাসেল লিখিয়াছেন, নিজস্ব বাড়ি ও ভাড়াটিয়া বাড়ির মধ্যে সাধারণ লোকেরা যে পার্থক্য করিয়া থাকে, সেটার ভিত্তি শুধু পযেসরী ইনসৃটিংক্ট। ওটা অবৈজ্ঞানিক সংস্কার মাত্র। অতঃপর এই মতবাদ আমার ঈমানের অঙ্গ হইয়া উঠে। বই-পড়া এই মতবাদ ছাড়াও আমার স্বতঃপ্রণোদিত একটা অভ্যাস ছিল। ভাড়াটিয়া বাড়িহে আমি সত্য-সত্যই নিজের মনে করিতাম। ছোট খাটো অল্প-ব্যয়সাধ্য মেরামত আমি নিজেই করিতাম, বাড়িওয়ালার করার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম না। জানিতে পারিয়া বাড়িওয়ালা খরচাটা দিলে নিতাম, না দিলে চাহিতাম না। ধরুন, ঝড়ে আমার বাড়ির একটা জানালার পাল্লার কব্‌জা খুলিয়া পড়িয়াছে; কিম্বা পানির কলটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমি বহুবার দেখিয়াছি ঐরূপ ঘটনায় আমার প্রতিবেশী বাড়িওয়ালাকে মেরামতের জন্য মুখে, টেলিফোনে তাগাদা করিতেছেন। শেষ পর্যন্ত ভাড়া বন্ধ করিবার ও উকিলের নোটিস দিবার ভয় দেখাইতেছেন। ইতিমধ্যে ভাঙ্গা জানালা দিয়া বৃষ্টির পানি আসিয়া তাঁর বিছানা ভিজিতেছে, খোলা-কলে পানি পড়িয়া ছাদের উপরস্থ টাংকির পানি শেষ হইয়া গিয়াছে। বাথরুমের পানির অভাবে রান্না ও গোসলের ভয়ানক অসুবিধা হইতেছে। ভিস্তিওয়ালাকে দিয়া রাস্তার কল হইতে পানি আনাইয়া তিনি কাজ চালাইতেছেন। বাড়িতে ভিজা বিছানা-বালিস রোজ রোদে দিতেছেন। তবু ঐ সামান্য মেরামতের কাজটুকু নিজে করিতেছেন না। পক্ষান্তরে এইরূপ ঘটনায় আমি তৎক্ষণাৎ একটা প্লাম্বারকে চার আনা ও একটি সূতার মিস্ত্রিকে আট আনা দিয়া ঐ কল ও জানালার পাল্লা মেরামত করাইয়া ফেলিয়াছি এবং দিব্যি আরামে জানালা ও পানির কল ব্যবহার করিয়াছি।

আমার এই মনোভাব কোনও নৈতিক আদর্শের মনোভাব নয়, নিতান্ত বিষয়-বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের কথা। কাজেই এটা বুঝা সহজ হওয়া উচিৎ সকলের পক্ষেই। তাই প্রতিবেশী বন্ধুকে এটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতাম, মানুষের মালিকানাবোধ, বার্ট্রান্ড রাসেল যাকে পযেসরী ইনসৃটিংক্ট বলিয়াছেন তা অতিশয় প্রবল। ভাড়া দিয়া যে বাড়িতে থাকেন, সে বাড়ি যে তার নয় অপরের, এই বোধ সব ভাড়াটিয়ার মনে অতিশয় তীব্র। পরের বাড়িতে তিনি নিজের এক পয়সাও খরচ করিবেন কেন? এ বুদ্ধি তাদের টন-টনা। কিন্তু আমার মত তাঁরা বার আনা পয়সা

ব্যয় না করিয়া যে বৃষ্টিতে ভিজিলেন, রান্না-গোসলের কষ্ট ভোগ করিলেন, সে কষ্ট ও দুর্ভোগের দাম যে বার আনার চেয়ে অনেক বেশি, সে কথাটা তাঁদের আক্কেলে ধরা দেয় না। এই নিজস্ব মালিকানা-বোধের অভাবে এবং পরস্ববোধের প্রভাবে তারা ভাড়াটিয়া বাড়িতে ফলের গাছ। লাগান, ফুলের বাগান করা, টব বসানো বা অন্য প্রকারে সাজানকে পরের বাড়িতে অর্থের অপব্যয় মনে করেন। বাগানের ফুলের খোশবু যে তিনিই ভোগ করিবেন; বাড়িওয়ালা করিবেন না, বাড়ির সাজসজ্জা যে তারই নিজের ও তার পরিবারের মনে আনন্দ দান করিবে, বাড়িওয়ালার মনে করিবে না, এটাও বুঝিতে চান না। এই পরস্ববোধের জন্যই এই শ্রেণীর ভাড়াটিয়ারা বাড়ির এখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলিয়া থাকেন, দা হাতুড়ি দিয়া মেঝের সিমেন্ট ও দেয়ালের আস্তর বিনষ্ট করিয়া থাকেন, ছেলে-মেয়েরা কয়লা ও পেনসিল দিয়া দেওয়ালে ‘চিত্র আঁকিয়া থাকে, চাকর-চাকরানিরা দেওয়ালে হাঁড়ি-পাতিলের কালি মাখিয়া রাখে। পরের বাড়ির এই ধরনের অনিষ্ট করিয়া তাঁরা যেন একটা আনন্দ পান। অথচ এই কদর্যতা, অপরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যহীনতা বাড়িওয়ালা ভোগ করেন না। করিতে হয় ভাড়াটিয়ার নিজেরই। এটাই হইয়া থাকে ঐ পযেসরী ইনসটিংক্ট হইতে। অথচ এ মালিকানাবোধ যে কত ভ্রান্ত, পণ্ডিত রাসেল তা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। একটু ধীরচিত্তে বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে শেষ পর্যন্ত আমি যেখানে যখন আছি, তখনকার জন্য সেই স্থানটিই আমার বাসস্থান। আমার সুখ-সুবিধা ও আনন্দের জন্য যা করা দরকার তাই আমাকে করিতে হইবে। এমনকি পথিকও রাস্তার ধারে গাছতলায় বিশ্রাম করিতে বসিলে বসার জায়গাটি ঝাড়িয়া-পুছিয়া পরিচ্ছন্ন করিয়া লয়। জায়গাটি নিজের নয় পরের, সে কথা তার মনেও পড়ে না। আমার বিশ্বাস এই মামুলি কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে মানুষ নিজের বাড়ি ও ভাড়াটিয়া বাড়ির মধ্যে। পার্থক্য করিতে পারে না। ভাড়াটিয়া বাড়ির জন্য যেমন ভাড়া দিতে হয়। নিজের বাড়ির জন্যও তেমনি খাযনা-ট্যাক্স দিতে হয়। ওটা না দিলে যেমন বাড়ি থাকে না, এটা না দিলেও তেমনি থাকে না। কাজেই নিজের বাড়িতে বাস করার স্বপ্নে সারা জীবন কষ্ট করার চেয়ে পরের-তৈরি ভাড়াটিয়া বাড়িতে যারা জীবন কাটায়, তারাই বুদ্ধিমান। আহাম্মকেরা ভোজের আয়োজন করে, বুদ্ধিমানেরা তা খায়, ইংরাজি এই প্রবাদটি বাড়ির ব্যাপারেও সত্য।

## ৯. জ্ঞান ও বুদ্ধি

শুধু বাড়ি করার ব্যাপারে নয়, সব ব্যাপারেই বন্ধুরা আমাকে বুদ্ধিমান-জ্ঞানী বলিতেন। আমিও মনে-মনে তৃপ্তি, এমনকি গর্ব বোধ করিতাম। এই বুড়া বয়সে বার্ধক্যের জ্ঞান আমার কিছুটা থাকিলেও বিষয়-বুদ্ধি নাই। জ্ঞান ও ‘বুদ্ধি’ দুইটা গুণকে এক করিয়া ভাবাতেই এই বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে। আসলে দুইটা এক নয়। জ্ঞানটা জানায় সীমাবদ্ধ। বুদ্ধিটা করায় প্রসারিত। বিষয়ী জীবনের জন্য থিওরেটিক্যাল জ্ঞান যথেষ্ট নয়। প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধিও দরকার। এমনকি বিষয়ী জীবনের সাফল্যের জন্য জ্ঞান অত্যাবশ্যক নয়, শুধু বুদ্ধি থাকিলেই চলে। বুদ্ধিমানেরা জ্ঞানীর’ জ্ঞান ধার করিয়া শুধু বুদ্ধির জোরে জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সমাজের সকল স্তরে এর ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সাংবাদিক হিসাবে কলিকাতা জীবনে আমি যখন মেসে থাকি, তখন আমার রুমমেট ও আমি এক বেকার বন্ধুকে আমাদের রুমে বিনা ভাড়ায় থাকিতে দিয়াছিলাম। বেকার বন্ধুর তখতপোশ ও বিছানা-পত্র কিনিবার সাধ্য ছিল না। সারাদিন কাজের তালাশে ঘুরিতেন। রাত্রে মেঝের মাদুরে শুইয়া থাকিতেন। আমরা তাঁকে স্বাধীন ব্যবসার উপদেশ ও ব্যবসায় চালাইবার জ্ঞান দান করি। দরকারি কাগজ-পত্র মুসাবিদা করিয়া দেই। আমরা কলিকাতা থাকিতেই ঐ বন্ধুর দু’তলা বাড়ির

ভাড়াটিয়া ছিলাম। থিওরেটিক্যাল জ্ঞান ও প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির পার্থক্য এইখানে। আসলে প্র্যাকটিক্যাল না হইলে জ্ঞানও পূর্ণ হয় না।

আমি যে মোটেই প্র্যাকটিক্যাল নই, এ কথা বলিলেও নিজের উপর অবিচার করা হইবে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আয়েশ ও আর্থিক সচ্ছলতায় আমি মোটেই উদাসীন ছিলাম না। কিন্তু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা, আর্থিক সচ্ছলতা ও ধনী হওয়া, এক জিনিস নয়, এ বিষয়েও সচেতন ছিলাম। আমি সন্ন্যাস, ফকিরি, কৃপণতা, কৃচ্ছ-সাধনা ও অপরিচ্ছন্নতার বিরোধী। সুস্থ দেহ ও সৎ মন যা খাইতে, পরিতে এবং যেভাবে থাকিতে চাহিবে, সেভাবেই খাওয়া-পরা-থাকার আমি পক্ষপাতী। সুস্থ মনের কোনও স্ট্যান্ডার্ড নাই, এ কথা আমি মানি না। যে মন নিজের ও অপরের প্রয়োজনের সীমা সরহদ্দ চিনে, সেটাই সুস্থ মন। কড়ার ফকির হাজার টাকার মালিক হইলে সে লক্ষ টাকা চাহিবে, লক্ষ পাইলে কোটি চাহিবে, মিলিয়ন পাইলে বিলিয়ন চাহিবে এটা সাধারণ ব্যাপার হইলেও সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়। সুস্থ মন জানে, খাওয়া-পরার মতই মানুষের সব ভোগের একটা সীমা আছে। টাকা-পয়সার প্রয়োজনেরও সীমা আছে। এ সীমা লঙ্ঘনের ফলেই অর্থে অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

তবে এই সীমার যেমন ম্যাক্সিমাম আছে, তার একটা মিনিমামও আছে। এই মিনিমাম চিনিতে হইলে জ্ঞান ও বুদ্ধির সমন্বয় দরকার। নিজস্ব বাড়ি করার ব্যাপারে আমার থিওরির জ্ঞানে বুদ্ধির বেড়া দেন আমার স্ত্রী। তারই প্রাধান্যে আমি আজ শহরে বাড়ির মালিক হইয়াছি। নিজের বাড়িতে পুতনাতি লইয়া সপরিবারে পরম সুখে বাস করিতেছি। বার্ট্রান্ড রাসেলের আদর্শ আমার নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ ঠেকাইতে পারে নাই। এটা ঘটিয়াছে বুদ্ধির জোরে। সে বুদ্ধিটাও আমার নয়, আমার স্ত্রীর। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন সিএন্ডবি মিনিস্টার আমার পরম বন্ধু কফিলুদ্দিন চৌধুরীর সাথে একরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াই আমার স্ত্রী আমার অজ্ঞাতে ও অনুপস্থিতিতে ধানমন্ডিতে জমি বন্দোবস্ত নেন। পরে হাউস বিল্ডিং হইতে টাকা নিয়া বাড়ি করা হয় তাঁরই উদ্যোগে ও আমার সক্রিয় সহযোগিতায়। ততদিনে আমার আদর্শের জোর ও আমার ব্যক্তিগত প্রভাব কমিয়া গিয়াছে। স্ত্রীরও জোর বাড়িয়াছে। ছেলেরা বড় হইয়াছে। আমি তখন বড় পরিবারের অনেকের একজন মাত্র। ক্যাবিনেট সিস্টেমে আমি তখন নাম্বার ওয়ান এমাংস্ট ইকুয়ালস মাত্র। তাছাড়া ততদিনে আমার এই বোধধাদয় হইয়া গিয়াছে যে, সুফি-দরবেশ ও বিজ্ঞানী দর্শনীর জন্য যাই হউক, বিষয়ীর জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকা ভাল।

## ১০. আহাম্মকের পাহারাদার তকদির

বিষয়ী জীবনের টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমি খানিকটা বুদ্ধিহীন ছিলাম ঠিকই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তকদির আমার পাহারাদারি করিয়াছে। অসাবধানতায় যা হারাইয়াছি, বরাত তা ফিরাইয়া দিয়াছে। হারানো বস্তু ফেরত পাওয়া সৌভাগ্যের লক্ষণ–এমন একটা প্রবাদ আমাদের দেশে চালু আছে। আমার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। কাজেই আমাকেও ভাগ্যবান বলা যাইতে পারে। সাধারণ অবস্থা ছোট-খাটো বস্তু হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়া খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু তৎকালে পঞ্চাশ লক্ষ বাসেন্দার ভিড়ের শহর কলিকাতায় ট্রামে-বাসে হাজার টাকা-ভরা মানিব্যাগ পকেটমার যাওয়ার পরও তা ফিরিয়া পাওয়া সত্যই একটা অসাধারণ ব্যাপার। এটাও বরাতে ঘটিয়াছিল। ব্যাপারটা ঘটে এই ভাবে :

ইত্তেহাদ-এর সম্পাদকরূপে প্রথম মাসের বেতন পাইয়াছি হাজার টাকা। এত টাকা একসঙ্গে বেতন পাই নাই কোনও দিন এর আগে। প্রথম সুযোগেই বাসায় ফিরিলাম। বিবির হাতে টাকাটা দিলাম। তিনি নোটগুলি খানিক হাতাইয়া সেগুলি আমার হাতে দিলেন। বলিলেন : উকালতির টাকাতেই কিছুদিন চলিয়া যাইবে। বেতনের টাকা দিয়া একটা ব্যাংক একাউন্ট খোলো।

ব্যাংক একাউন্ট একটা ভোলাই ছিল। কৃষক-এর সম্পাদকতাকালে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির কংগ্রেস নেতা মি. ধীরেন মুখার্জির সদ্যপ্রতিষ্ঠিত হুগলি ব্যাংকে আমাকে দিয়া একটা সেভিং একাউন্ট খুলান। ঐ খুলা তকই। বহুদিন পরে ঐ একাউন্টের কথা মনে পড়িল। বিবির হুকুম-মত পরদিন সকালে আফিসে কিছুক্ষণ কাজ করার পরই ব্যাংকে রওয়ানা হইলাম।

কলিকাতা তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত। ট্রাম বন্ধ। বাসও আংশিক বন্ধ। শুধু বিশেষ বিশেষ রুটে কিছু বাস চলে। কলুটোলা ও পার্ক সার্কাসের মধ্যে মুসলিম প্রধান-এলাকায় যোগাযোগ রক্ষার জন্য যে সার্ভিসটি চালু ছিল, তা বরাবরের লোয়ার সার্কুলার রুটে না গিয়া ইলিয়ট রোড, রয়েড স্ট্রিট, ওয়েলেসলি, ধর্মতলা, বেন্টিক স্ট্রিট, লোয়ার চীৎপুর দিয়া যাকারিয়া স্ট্রিটে নাখোদা মসজিদ পর্যন্ত যাইত। হুগলি ব্যাংক ধর্মতলা স্ট্রিটে। কাজেই আমি পার্ক-সার্কাস হইতে এই বাস ধরিলাম। ধর্মতলায় হুগলি ব্যাংকের কাছাকাছি গিয়া বাস হইতে নামিলাম। দুতলাস্থ ব্যাংকে গেলাম। কাউন্টারে টাকা দিতে গিয়া দেখিলাম পকেটে মানিব্যাগ নাই। ধরিয়া নিলাম বাসেই পকেটমার গিয়াছে। বুঝিলাম, ওটা ফেরৎ পাওয়ার চেষ্টা পাগলামি। কিন্তু কিসের তাড়নায় পাগলামিটাই করিলাম। দুতলা হইতে ছুটিয়া রাস্তায় নামিলাম। দেখিলাম, অদূরেই বাসটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে। দু-চারজন বাসযাত্রী উঠিতেছে। আমি সেদিকে ছুটিতেই বাসটি স্টার্ট দিল। আমি চিৎকার করিতে-করিতে বাসের পিছনে ধাওয়া করিলাম। ধরিলাম। বাসে উঠিলাম। দরজায় দাঁড়ানো কন্ডাকটরকে হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ব্যাপারটা বলিলাম। সে আমার এ পাগলামিতে একটু হাসিল। কিন্তু তার মনে দয়া হইল। সে চিল্লাইয়া বলিল : এ বাসে একজনের পকেট-মার গিয়াছে। যারা নামিবেন, তাদেরে আমরা সার্চ করিব। কন্ডাকটরের সহকারী ছিল দুইজন। তারাও এমনি ঘোষণা করিল। পথে অনেক স্টপেজে বাস থামিল। অনেক যাত্রী উঠিল। কিন্তু দু-একজন ছাড়া কেউ নামিল না। যারা নামিল, তারা নিজেরাই নিজ-নিজ পকেট-টকেট দেখাইয়া গেল। তাদেরই খালি করা সিটের একটিতে আমাকে বসাইল। শেষ পর্যন্ত বাসটি নাখোদা মসজিদের সামনে অস্থায়ী টার্মিনালে থামিল। যাত্রীরা নামিতে লাগিল। কন্ডাকটরদের নামমাত্র তল্লাশি করিতে হইল। কারণ সবাই স্বেচ্ছায় পকেট-টকেট দেখাইতেছিল। আমার বুকের ধড়ফড়ানি দ্রুত বাড়িয়া অবশেষে প্রায় শেষ। আর আশা নাই। পাথরের মত বসিয়া আছি। সবাই নামিয়া গেল। আমার মানিব্যাগ উদ্ধার হইল না। কন্ডাকটররা আমাকে সমবেদনা জানাইতে আসিয়া দেখিল আমার পাশেই একজন যাত্রী বসা। তাদের সন্দেহ হইল। তাকে ধাক্কাইয়া তুলিল। দেখা গেল, তার পাছার নিচেই আমার মানিব্যাগ। ব্যাগটা আমাকে দিল। কাঁপা হাতে খুলিয়া দেখিলাম সব ঠিক আছে। আমি শোকরানার মোনাজাত করিলাম। কন্ডাকটররা লোকটাকে বেদম মারপিট করিতে লাগিল। আমি তাকে ছাড়িয়া দিতে কাকুতি-মিনতি করিলাম। ততক্ষণে বাস ঘেরিয়া বিপুল জনতা। অনেকে আমার সমর্থন করিল। লোকটাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কন্ডাকটররা ও জনতার অনেকে সব শুনিয়া আমাকে কংগ্রেচুলেট করিলেন। আনন্দ পুলকে আমার চোখে পানি দেখা দিল। আমি শুধু মেহেরবান আল্লাহকে দেখিলাম না। কন্ডাকটররাও আমার নজরে ফেরেশতা মনে হইল। আমাকে হেফাযত করিতে আল্লাই ওঁদেরে

পাঠাইয়াছেন। আমি তাদেরে বখশিশ ত নয় নজরানা দিতে চাহিলাম। নিদান পক্ষে চা-নাশতা খাওয়াইতে চাহিলাম : তারা কিছু গ্রহণ করিল না। বরঞ্চ একজন বিশ্বস্ত ট্যাক্সিওয়ালা ডাকিয়া আমাকে বাসায় পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিল। বাসায় পৌঁছাইবার পর ট্যাক্সিওয়ালাও মিটারে উঠা ভাড়া ছাড়া একপয়সা অতিরিক্ত নিল না আমার সাধাসাধি সত্ত্বেও। ট্যাক্সিটা ফিরিয়া গেল। আমি রাস্তার মোড় না ফেরা পর্যন্ত সেদিকে চাহিয়া রহিলাম। মনে হইল আল্লাহর পাঠানো ফেরেশতাদের মধ্যে ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভারটিও একজন।

১১. 'অজাতশত্রু'

জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া আমার আরেকটা কথা মনে পড়িয়া গেল। কথাটা মামুলি। তরুণদেরও জানা কথা। জ্ঞানীর পক্ষে অহংকারী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আত্মসম্মান, গর্ব, অহংকার, সেলফ-রেসপেক্ট, প্রাইড ও ভ্যানিটির পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। খারাপ অর্থে দম্ভ, অহংকার ও তুকাব্বরির দুইটা রূপ : এক, নিজেকে বড় মনে করা। দুই, অপরকে ছোট মনে করা। দুইটাই খারাপ। জ্ঞানীর জন্য ও বিষয়ীর জন্য প্রথমটার মধ্যে অপর' অনুপস্থিত অপরকে ছোট মনে না করিয়াও, তার মানে, আর কারো কথা মোটেই চিন্তা না করিয়াও নিজেকে। 'বড়' মনে করা সম্ভব। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হইবে, এটা মন্দের ভাল। কারণ এ মনোভাবেরও দুইটা মুখ আছে। একটা সুন্দর, অপরটা অসুন্দর। অহংকারের এই রূপে মানুষ নিজেকে অজাত শত্রু মনে করে। আমি এত বড়, এত ভাল, এত গুণবান যে আমাকে সবাই শ্রদ্ধেয় মনে করে। আমি সমাজের একটা সম্পদ। কাজেই আমার কোনও শত্রু নাই। আমি অজাত শত্রু। এটাও যে নিরর্থক দম্ভ তা আমি বুঝিয়াছিলাম অধিক বয়সে। বিনয়ী, শিষ্টাচারী ও আদব-কায়দা-দুরস্ত হওয়ার শিক্ষা পাইয়াছিলাম শৈশব হইতেই। মুরুব্বি, গুরুজন, শিক্ষক-অধ্যাপকরা সবাই এসব গুণের জন্য আমার তারিফ করিতেন। ভাল' বলিতে-বলিতে মানুষ সত্য-সত্যই ভাল হইয়া যায়, এটা অংশত সত্য হইলেও পূর্ণ সত্যটা এই যে যাকে ভাল' বলা যায় সে নিজেকে ভাল মনে করিয়া বসে। বিশ্বাস করে। আমিও বিশ্বাস। করিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমি ঐ তারিফের পুরামাত্রায় যোগ্য হইবার চেষ্টাও করিতে লাগিলাম। সর্বদা হুঁশিয়ার থাকিলাম, লোকমুখের ঐ তারিফের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। লোকে নিন্দা করিতে পারে, ভদ্রতার খেলাফ হইতে পারে, এমন কোনও কাজই করিতাম না।

আচার-ব্যবহারের এই বাহ্যিক রূপ নিশ্চয়ই অন্তরেও সংক্রমিত হইয়াছিল। বাহিরে কারো অনিষ্ট ত করিতামই না, অন্তরেও অনিষ্টের চিন্তা করিতাম না। বাহিরে যাঁকে যত শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইতাম, অন্তরেও তাঁকে ততখানি ভাবিবার চেষ্টা করিতাম। এইভাবে আমার মনে এই ধারণা ও বিশ্বাস জন্মিল যে আমি যখন কারো ক্ষতি বা অনিষ্ট করি নাই, তখন অপরেও আমার ক্ষতি বা অনিষ্ট করিবে না। আমি যখন কারো অনিষ্ট চিন্তা করি না, তখন অপরেও আমার অনিষ্ট চিন্তা করে না। এ সবেরই যোগফলে আমার বিশ্বাস হইল আমি 'অজাতশত্রু'। এ বিশ্বাস আমার এতই দৃঢ় ছিল যে আমি পাড়াগাঁয়ে অন্ধকার রাতেও একা-একা পথ চলিতে ভয় পাইতাম না। লোকেরা বা বন্ধু-বান্ধব ভয় দেখাইলে বলিতাম : 'আমার কোনও শত্রু নাই। ভয় কিসের?

এই মনোভাবটায় যে আসলে সাহসের চেয়ে অহংকারই ছিল বেশি, সেটা আমাকে বুঝাইয়াছিলেন সুভাষবাবু। তিনিই সর্বপ্রথম আমার এই অহংকারে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিলেন। সেটা ছিল ১৯৩৮ সালের শেষ দিক। তিনি তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইচ্ছা। এলগিন

রোডের বাসায় পারিষদবর্গের সঙ্গে আলোচনা। পারিষদদের মধ্যে আমিও একজন। তর্কে তর্কে কথার পিঠের কথায় আমি বড়াই করিয়াছিলাম : 'আমার কোনও শত্রু নাই।' তাঁর সুন্দর মুখখানিতে মৃদু হাসি ফুটাইয়া সুভাষবাবু বলিয়াছিলেন : আপনার ধারণা ভুল। বোবারই শত্রু নাই। আপনি বোবা নন।

সুভাষবাবুর কথায় তখন বেজার হইয়াছিলাম, পরে বুঝিয়াছিলাম, তার কথাই সত্য। কিন্তু বুঝিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। তখন আরো বুঝিয়াছিলাম যে কথাটা সুপ্রাচীন বলিয়াই আমরা উহার সংকীর্ণ অর্থই করিয়া থাকি। আসলে ও-বাবার অর্থ শুধু 'বোবা' নয়। কালাও। অজাতশত্রু হইতে গেলে শুধু বোবা হইলেই চলে না, কালাও' হইতে হয়।

১২. সততা ও তুকাব্বরি

সৎ-সাধু হওয়ার দরুন গর্ববোধ করা, টন-টনা আত্মসম্মানবোধ থাকা দোষের নয়। সততা-সাধুতার ওটা পুরস্কার। কিন্তু সে সততা-সাধুতার গর্ব যদি দম্ভ অহংকারে প্রসারিত হয়, সে অহংকার যদি অপরকে ঘৃণা-অবজ্ঞা করিতে শিখায়, তবে সেটা হয় তখন আযাযিলের তুকাব্বরি। এই তুকাব্বরি মহৎ মানুষকে নীচ করে, বড় মনকে ক্ষুদ্র করে। ফলে সৎ-সাধু লোকেরা নিতান্ত স্পর্শকতার হইয়া পড়েন। সমালোচনাকে তারা নিন্দা মনে করেন। হিতোপদেশ-দাতাদের তারা অশিষ্ট ধরিয়া লন। এটা নিজের দিক। অপরদিকে পরের উপর তারা অবিবেচক, অসহিষ্ণু, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হইয়া পড়েন। মহাপুরুষদের এই মহাকাব্য, 'পাপকেই ঘৃণা করিও, পাপীকে ঘৃণা করিও না', বেমালুম ভুলিয়া যান তাঁরা। নিজের সততা-সাধুতার অন্ধ অহংকারে তারা গুনাহে-সগিরা ও গুনাহে-কবিরার পার্থক্য ভুলিয়া যান। লঘু গুরুর জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।

আমার জীবনেই এটা ঘটিয়াছিল। প্রয়োজনবোধের সীমাজ্ঞান হইতেই হক-নাহকের নীতিবোধের জন্ম। ছেলেবেলা হইতেই আমি জমিদার মহাজনদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-লালসার মতই ঘুষ রেশওয়াতেরও প্রচণ্ড নিন্দুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। জমিদারদের মাথট-আবওয়াব, মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি সুদের মতই মোল্লা-মৌলবীদের দান-খয়রাত, পীর-ফকিরদের নজরানাকেও অন্যায় যুলুম ও নাজায়েয উশুল বলিতাম। পরবর্তীকালে উকিল হইয়া কোর্টে-আদালতে আসিয়া কেরানি-পেশকার ও পিয়ন চাপরাশিদের উপরি বখশিশকেও ঘুষ আখ্যা দিতাম। ধুচিয়া গাল পাড়িতাম। শুধু মুখে গাল দিতাম না। অন্তরেও ঘৃণা করিতাম। মাত্র বিশ টাকা মাহিয়ানায় পিয়ন-চাপরাশির, আর মাত্র চল্লিশ টাকা বেতনে কেরানি পেশকারের চলে না। কিছু উপরি পাওনা ওদের দরকার। এসব যুক্তি আমি মানিতাম না। অবস্থা ভেদের মাত্রাজ্ঞান আমার ছিল না। পান হইতে চুন খসিলেই আমি ক্ষেপিতাম। মামলা-মোকদ্দমার টাউটদের আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারিতাম না। তাদেরে আমি আমার বৈঠকখানায় ঢুকিতে দিতাম না। লোকাল বোর্ড, ডিসট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান-মেম্বরদের তৎকালে বদনাম ছিল। লোক-মুখে তাঁদের দুর্নীতির কাহিনী শুনিয়াই তাঁদের নিন্দা শুরু করিলাম। শহরে টাউন হল প্রাঙ্গণে এবং মফস্বলে মাঠে-ময়দানে সভা করিয়া তাঁদের নিন্দায় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে লাগিলাম। আমার এই অভিযানে কারো কোনও ক্ষতি বা আর্থিক লোকসান হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই।

কিন্তু অন্তত একজনের বস্তুত একটা পরিবারের সত্য-সত্যই এতে বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল। আমার জীবনে এটা একটা অনুশোচনার স্মৃতি। সেটা ১৯৩২-৩৩ সালের ঘটনা। লাহোর হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি মি. রবার্ট ইয়ং এই সময়ে কোর্টে দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে একটি 'এন্টি-কোরাপশান' সংঘ গঠন করেন এবং সারা ভারতের হাইকোর্টে ও তাদের অধীনস্থ আদালতসমূহে তার শাখা স্থাপনের প্রস্তাব দেন। তদনুসারে ময়মনসিংহেও একটি শাখা স্থাপিত হয়। মি. হেন্ডারসন (পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ) এই সময়ে ময়মনসিংহের জিলা জজ। তারই উদ্যোগে হাকিম-উকিলদের যুক্ত সভায় একটি কমিটি গঠিত হয়। অন্যতম মুনসেফ মি. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (পরে জুডিশিয়াল সেক্রেটারি ও খান বাহাদুর) এই কমিটির সভাপতি ও আমি সেক্রেটারি নির্বাচিত হই। ঐ কমিটির রিপোর্টে একজন কেরানি প্রথমে সাসপেন্ড ও পরে ডিসমিস হন। সাসপেন্ড থাকাকালে তিনি ছেলেমেয়েসহ সপরিবারে আমার বাসায় আসেন। তিনি নিজে আমাকে এবং তার স্ত্রী আমার স্ত্রীকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ ও কাকুতি-মিনতি করেন। নিজেদের ও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দোহাই দেন মর্মস্পর্শী ভাষায়। তিনি এও জানাইলেন যে, তার উপরওয়ালারা তাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে আমার। একটা ভাল রিপোর্ট পাইলেই জজ সাহেব তার চাকরি বহাল রাখিবেন। এর পরেও আমার মন গলিল না।

পরবর্তীকালে এই নীতিবাগিশতাই আমার অনুশোচনার কারণ হইয়াছে। কিন্তু চরম শাস্তি আমার তখনও পাওয়া হয় নাই। ১৯৪৭ সালে আমার এই অহংকারের গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন শেরেবাংলা হক সাহেব। তার সাথে তর্কে-তর্কে কথার পিঠে কথার বড়াই করিয়াছিলাম : কই, আমার নিন্দা ত কেউ করে না। হক সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন : 'শেওড়া গাছে কেউ ঢিল মারে না। আম গাছেই মারে।

এরও দশ বছর পরে আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। নিজেই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলাম। সত্য-সত্যই গায় ঢিল পড়িয়াছিল। তখন দশ বছর আগে কওয়া হক সাহেবের কথা হইতে আম গাছের তসল্লি পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু যতবার সে চেষ্টা করিয়াছি ততবার সে তসল্লি ঠেলিয়া পঁচিশ বছর আগের ময়মনসিংহ কোর্টের সেই কেরানি ও তাঁর অসহায়। ছেলেদের মুখ আমার দিকে চাহিয়া শেখ সাদীর বয়েত আওড়াইয়াছে : তাকাব্বর আজাজিলেরা খাবে কর্দ।

খোদাকে ধন্যবাদ। আমার তুকাব্বরি আমাকে খোয়ার করে নাই। হুঁশিয়ার করিয়াছে মাত্র।

# ২৪. শেষ কথা

আমার এ আত্মজীবনীর ‘শেষ কথা’ আমার জীবনের মুদ্দা কথা। সে কথাটা এই যে, আমি জীবনে সুখী হইয়াছি। আর দশজনের মত জীবনে আমি সুখ চাহিয়াছিলাম। সুখ আমি পাইয়াছি। এ সুখ মনের শান্তি। আত্মার তৃপ্তি। অন্তরের সন্তোষ। চাওয়া-পাওয়া লইয়াই মানবজীবন। আমি যা চাহিয়াছি, তাই পাইয়াছি। জীবনের কাছে আমার আর কোনও পাওনা নাই। কোনও দেনাও নাই। দুনিয়ার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নাই। সমাজের বিরুদ্ধে আমার কোনও অসন্তোষ নাই। মানুষের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিমান নাই। আশি বছর বয়সে আমার মন তৃপ্ত। আমার দেহ শান্ত। আমার অযোগ্যতা, অসম্পূর্ণতা, আমার অনধিকার ও অসংখ্য ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও এই সুখ, তুপ্তি ও মর্যাদা আমাকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার প্রতিবেশী, আমার সহকর্মী, আমার নেতা-মুরুব্বি, আমার সমাজ, আমার দেশ, সর্বোপরি আমার আল্লার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ কথা বলিবার জন্যই আমার এই আত্মজীবনী লেখা।

কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত জীবন। এই ব্যক্তিগত জীবনেই আমি সুখ, শান্তি, তৃপ্তি, সন্তোষ ইত্যাদি মানবিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছি। এমনকি ব্যক্তিগত জীবনের যেটুকু বাহিরে প্রসারিত সেখানেও আমি সাফল্য, সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি ভোগ করিয়াছি। যশ ও পদ-মর্যাদাও লাভ করিয়াছি। শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতে চাহিয়াছি, উচ্চশিক্ষা পাইয়াছি। জ্ঞানলাভের জন্য অসংখ্য বই-পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। রোযগারের তালাশে উকালতিতে গিয়াছিলাম, সফল উকিল হইয়াছি। সাংবাদিক হইতে গিয়াছিলাম, তিন-তিনটা দৈনিকের সম্পাদক হইয়াছি। সাহিত্যিক হইতে চাহিয়াছিলাম, বই-পুস্তক লিখিয়া অর্থ, যশ, প্রশংসা, এওয়ার্ড ও স্বর্ণপদক পাইয়াছি। রাজনীতি করিতে চাহিয়াছিলাম, মেম্বর মন্ত্রী হইতে, এমনকি প্রধানমন্ত্রিত্ব করিতে পারিয়াছি। কাজেই বলা যায়, ভিতর ও বাহির সর্বত্র আমি ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য, সুখ ও সন্তোষ লাভ করিতে পারিয়াছি। নিজের বুদ্ধিতে যেখানে কুলায় নাই, তকদির সেখানে সহায়তা করিয়াছে।

২.

কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, দেশ ও সমাজের তাতে কী লাভ হইয়াছে? জনগণের জন্য কোন ভাল কাজটা সমাধা করিতে পারিয়াছি? স্পষ্টতই পারি নাই। কাজেই বলা চলে আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার স্বপ্ন-সাধ পূর্ণ হইলেও দেশ-সমাজের ক্ষেত্রে আমার স্বপ্ন-সাধ সফল হয় নাই। দেশ, সমাজ ও জনগণ সম্বন্ধে আমার উচ্চ আদর্শ ও রঙ্গিন স্বপ্ন ছিল। তার একটাও সম্যক সফল হয় নাই। জনগণের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, তাদের উপর শোষণ-নির্যাতন, যুলুম-নিপীড়ন, অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকারের স্বপ্ন দেখিয়াছি। যুদ্ধ বিগ্রহ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-শাসনের অবসান চাহিয়াছি। দেশের সকল প্রকার আন্দোলনের শরিক হইয়াছি। সাধ্যমত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি। জেল-যুলুম-দুর্নাম সহিয়াছি। মনে হইয়াছে, সবটাতেই সফল হইয়াছি। আসলে তা হয় নাই। নিচের তলার জনগণের দারিদ্র্য-নিরক্ষরতা, শোষণ নির্যাতন আগের মতই আছে। উপরের তলার কতিপয় আগের মতই বিলাসের প্রাচুর্যে গড়াগড়ি দিতেছে, আমার ছেলেবেলা এদের, মানে শোষক-শোষিতের ও নিপীড়ক-নিপীড়িতের, যারে যেখানে যে অবস্থায়। দেখিয়াছি, আজও ঠিক সেখানেই দেখিতেছি। এ

সবই আমার সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের স্বপ্নের অসাফল্য। রাজনীতিতেও তাই। স্বাধীন ভারত, স্বাধীন পাকিস্তান, স্বাধীন বাংলাদেশ কোনওটাই আমার স্বপ্ন কল্পনামত হয় নাই। দেশের মাটি স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু মাটির মালিকরা স্বাধীন হয় নাই। ফলে আমার রাজনৈতিক স্বপ্নও পুরাপুরি সফল হয় নাই। এক কথায় আমার পাবলিক লাইফ, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবন, অতৃপ্ত অসুখী।

৩.

এ কথার তাৎপর্য এই যে আমি প্রাইভেট লাইফে, ব্যক্তি-জীবনে তৃপ্ত, সন্তুষ্ট ও সুখী; আর পাবলিক লাইফে সমাজ-জীবনে অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট ও অসুখী। এটা কি করিয়া সত্য হইল, সম্ভব হইল? সত্য ও সম্ভব হইয়াছে বলিয়া এটাই আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য। দম্ভ-অহংকার না করিয়াও আমি বলিতে পারি, এটাই আমার জীবনের শিক্ষা। আজকার তরুণরা অন্তত এইটুকুর জন্য আমার জীবন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

৪.

শিক্ষণীয় বিষয়টা এই : মানুষ সামাজিক জীব হইলেও তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। ঐ ব্যক্তিত্বে সে একা ও স্বাধীন। এই বইয়ের ভূমিকাতেও আমি ইশারায় এই কথাটাই বলিয়াছি। তার এই ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার কর্তব্য, দায়িত্ব, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, আপদ-সম্পদ সম্পূর্ণ তার একার।

কিন্তু এই ব্যক্তি-জীবনের বাইরে সে সমষ্টির অংশ। সেখানে সে একাও নয়, স্বাধীনও নয়। তথায় সে একার ইচ্ছায় একা কিছু করিতে পারে না। সেখানকার ভাল-মন্দ, সফলতা-নিষ্ফলতা, আপদ-সম্পদ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ বিষাদ তার একার নয়, সমষ্টির। সেখানকার দায়িত্ব-কর্তব্যও কাজেই তার একার নয়। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের নিন্দা-প্রশংসাটা তার নিজের একার। কিন্তু সমাজ-জীবনের ভাল-মন্দের নিন্দা-প্রশংসার অধিকারী সে একা নয়। সুফল-কুফলও সে একা ভোগ করে না।

মানুষের প্রাইভেট ও পাবলিক এই যে দুইটা জীবন সে দুইটা আলাদা ভাবে যাপন করিবার কায়দা যারা জানিতে পারিয়াছে, তারাই এক জীবনে অতৃপ্ত থাকিয়াও অপর জীবনে তৃপ্ত হইতে পারিয়াছে। খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি এদের মধ্যে একজন।

৫.

প্রাইভেট লাইফে আমি সবুরী। পাবলিক লাইফে আমি গণতন্ত্রী। উভয় জীবনেই উচ্চাশা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দশজনের মতই আমার ছিল। কিন্তু তার যতটুকু আমার পূর্ণ হইয়াছে, তাতেই আমি তৃপ্ত। আমার পাওয়ার যতটুকু আমি পাইয়াছি, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আমার প্রাপ্যের পরিমাণ, আমার যোগ্যতার পরিমাপ ও আমার অধিকারের সীমানা উপরের কোনও অদৃশ্য শক্তির অসীম জ্ঞান যে-যেখানে নির্ধারণ করিয়াছেন, সেটাই নিশ্চয় ঠিক। এই উপলব্ধি হইতে আমার বেশি সময় লাগে নাই এটা বোধহয় আমার সহজাত। আমার বাপ-মা ও দাদা-দাদিকে আমি এমনি সবুরী পাইয়াছিলাম। আমাদের এটা নাই, ওটা হইল না, এ ধরনের কথা তাদের মুখে শুনি নাই। যৌবনে

স্ত্রীর মুখে এবং বার্ধক্যে ছেলেদের মুখেও ঐ ধরনের কথা শুনি নাই। আমার ব্যক্তিগত তৃপ্তি ও সন্তুষ্টিই যেন আমার সংসারের আবহাওয়া।

কিন্তু পাবলিক লাইফে ব্যক্তিগত সবুরে চলে নাই। গণতান্ত্রিক উপলব্ধির দরকার হইয়াছে। সে জীবনেও আমার ব্যক্তিগত মর্যাদা প্রাপ্যাধিকই পাইয়াছি। কিন্তু পাবলিকের জন্য কী পাইয়াছি? দেশ, জাতি ও কৃষক শ্রমিকদের মুক্তির জন্য যে সব কথা বলিয়াছি ও লিখিয়াছি, ওয়াদা করিয়া মেম্বর-মন্ত্রী হইয়াছি, সেগুলি ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। ও-সবে ত আপোস করিবার, অল্পে তুষ্ট হইবার কোনও অধিকার আমার ছিল না। তবু তৃপ্ত হইলাম এই উপলব্ধিতে যে ও-সব প্রচারেই আমার অধিকার। প্রয়োগে নয়। এটাই গণতন্ত্র। আমার নির্দেশিত পথটা যতই ঠিক হউক, জোর করিয়া তা প্রয়োগ করা যাইবে না। করিলে সেটা হইবে ডিক্টেটরশিপ। ডিক্টেটররা পরিণামে জনগণের কল্যাণ করেন না। ক্ষমতার লোভেই তারা ক্ষমতা খাটান। জনতার জিন্দাবাদ-ধ্বনির লোভ বড় লোভ।

ব্যক্তিজীবনে ধন-লোভের তৃপ্তি নাই। রাষ্ট্র-জীবনে ক্ষমতা-লোভেরও তৃপ্তি নাই। ডিক্টেটররা ক্ষমতা ছাড়িতে এবং রাষ্ট্র-নেতারা রিটায়ার করিতে পারেন না, এই কারণে। সব জীবনের এটাই চরম শিক্ষা।